Barcode - 4990010228143
Title - Chhinna Patrabali
Subject - LITERATURE
Author - Tagore, Rabindranath
Language - bengali
Pages - 551
Publication Year - 1960
Creator - Fast DLI Downloader
https://github.com/cancerian0684/dli-downloader
Barcode EAN.UCC-13

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

Presented

by

Visva-Bharati Publications Calcutta

तमसो मा ज्योतिर्गमय

SANTINIKETAN
VISWA BHARATI
LIBRARY

T4

64.2

রবীন্দ্র শতবর্ষপূর্তি গ্রন্থমালা

পত্রধারা

রবীন্দ্রনাথ

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর -অঙ্কিত প্রতিকৃতি। ১৮৯৩-৯৫

ছিন্নপত্রাবলী

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

116794

VISVA—BHARATI
LIBRARY.

বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়
২ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় স্ট্রীট। কলিকাতা

ছিন্নপত্রাবলী

ভ্রাতুষ্পুত্রী ইন্দিরাদেবীকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের পত্রাবলী

রচনা : ১৮৮৭ সেপ্টেম্বর - ১৮৯৫ ডিসেম্বর

গ্রন্থপ্রকাশ : আশ্বিন ১৩৬৭ বঙ্গাব্দ : ১৮৮২ শক

বাংলা ১৩১৯ সনে প্রকাশিত ছিন্নপত্র গ্রন্থে, ভ্রাতুষ্পুত্রী ইন্দিরাদেবীকে লিখিত ১৪৫টি পত্র রবীন্দ্রনাথ বিশেষভাবে সংক্ষেপণ ও সম্পাদন -পূর্বক সংকলন করেন। বর্তমান গ্রন্থে শ্রীমতী ইন্দিরাদেবীকে লেখা আরও ১০৭টি পত্র সংকলিত ; তাহা ছাড়া এই গ্রন্থে পূর্বপ্রকাশিত 'ছিন্ন পত্র' -সমূহেরও পূর্ণতর পাঠ পাওয়া যাইবে।

প্রায় প্রত্যেক পত্রের সূচনায় পত্র লেখার এবং পত্রশেষে উহা পৌঁছিবার স্থান-কালের উল্লেখ সংকলিত।

© বিশ্বভারতী ১৯৬০

প্রকাশক শ্রীপুলিনবিহারী সেন

বিশ্বভারতী। ৬/৩ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন। কলিকাতা ৭

মুদ্রক শ্রীসূর্যনারায়ণ ভট্টাচার্য

তাপসী প্রেস। ৩০ কর্নওআলিস স্ট্রীট। কলিকাতা ৬

২'১

ইন্দিরাদেবী

…তোকে আমি যে-সব চিঠি লিখেছি তাতে আমার মনের সমস্ত বিচিত্র ভাব যে রকম ব্যক্ত হয়েছে এমন আমার আর কোনো লেখায় হয় নি।… তোকে আমি যখন লিখি তখন আমার এ কথা কখনো মনে উদয় হয় না যে, তুই আমার কোনো কথা বুঝবি নে, কিম্বা ভুল বুঝবি, কিম্বা বিশ্বাস করবি নে, কিম্বা যেগুলো আমার পক্ষে গভীরতম সত্য কথা সেগুলোকে তুই কেবলমাত্র সুরচিত কাব্যকথা বলে মনে করবি। সেই জন্যে আমি যেমনটি মনে ভাবি ঠিক সেই রকমটি অনায়াসে বলে যেতে পারি। যখন মনে জানি পাঠকরা আমাকে ভালো করে জানে না, আমার অনেক কথাই তারা ঠিকটি বুঝবে না এবং নম্র-ভাবে বোঝবার চেষ্টাও করবে না, এবং যেটুকু তাদের নিজের মানসিক অভিজ্ঞতার সঙ্গে মিলবে না সেটুকু আমার উপর বিশ্বাস স্থাপন করে গ্রহণ করবে না— তখন মনের ভাবগুলি তেমন সহজে ভাষায় প্রবাহিত হতে চায় না এবং যতটুকু প্রকাশ হয় তার মধ্যে অনেকখানি ছদ্মবেশ থেকে যায়। এর থেকেই বেশ বুঝতে পারি আমাদের সব চেয়ে যা শ্রেষ্ঠ প্রকাশ সে আমরা কাউকে নিজের ইচ্ছা-অনুসারে দিতে পারি নে। আমাদের ভিতরে সব চেয়ে যা গভীরতম উচ্চতম অন্তরতম সে আমাদের আয়ত্তের অতীত; তা আমাদের দান-বিক্রয়ের ক্ষমতা নেই …… আমরা দৈবক্রমে প্রকাশ হই, আমরা ইচ্ছা করলে চেষ্টা করলেও প্রকাশ হতে পারি নে— চব্বিশ ঘণ্টা যাদের সঙ্গে থাকি তাদের কাছেও আপনাকে ব্যক্ত করা আমাদের সাধ্যের অতীত। …… তোর এমন একটি অকৃত্রিম স্বভাব আছে, এমন একটি সহজ সত্যপ্রিয়তা আছে যে, সত্য আপনি তোর কাছে অতি সহজেই প্রকাশ হয়। সে তোর নিজের গুণে। যদি কোনো লেখকের সব চেয়ে ভালো লেখা

তার চিঠিতেই দেখা দেয় তা হলে এই বুঝতে হবে যে, যাকে চিঠি লেখা হচ্ছে তারও একটি চিঠি লেখাবার ক্ষমতা আছে। আমি তো আরও অনেক লোককে চিঠি লিখেছি, কিন্তু কেউ আমার সমস্ত লেখাটা আকর্ষণ করে নিতে পারে নি। ... ... তোর অকৃত্রিম স্বভাবের মধ্যে একটি সরল স্বচ্ছতা আছে, সত্যের প্রতিবিম্ব তোর ভিতরে বেশ অব্যাহতভাবে প্রতিফলিত হয়।...

—রবীন্দ্রনাথ

ছিন্নপত্রাবলী

১

দার্জিলিং

। সেপ্টেম্বর ১৮৮৭ ।

এই তো দার্জিলিং এসে পড়লুম। পথে বেলি খুব ভালো রকম behave করেছে। বড়ো একটা কাঁদে নি। খুব চেঁচামেচি গোলমালও করেছে, উলুও দিয়েছে, হাতও ঘুরিয়েছে এবং পাখিকে ডেকেছে যদিও পাখি কোথায় দেখতে পাওয়া গেল না। সারা-ঘাটে স্টিমারে ওঠবার সময় মহা হাঙ্গাম। রাত্রি দশটা— জিনিস-পত্র সহস্র, কুলি গোটাকতক, মেয়ে মানুষ পাঁচটা এবং পুরুষ মানুষ একটিমাত্র। নদী পেরিয়ে একটি ছোটো রেলগাড়িতে ওঠা গেল— তাতে চারটে করে শয্যা, আমরা (মাখন-সুদ্ধ) ছটা মনিষ্যি। মেয়েদের এবং অন্যান্য জিনিস-পত্র ladies' compartmentএ তোলা গেল— কথাটা শুনতে যত সংক্ষেপ হল কাজে ঠিক তেমনটা হয় নি। ডাকাডাকি হাঁকাহাঁকি ছুটোছুটি নিতান্ত অল্প হয় নি— তবু নদিদি বলেন আমি কিছুই করি নি। অর্থাৎ, আমার মতো ডাগর পুরুষ মানুষের পক্ষে পাঁচজন মেয়ে নিয়ে এর চেয়ে ঢের বেশি ডাকাডাকি হাঁকাহাঁকি এবং ছুটোছুটি করা উচিত ছিল, মাঝে মাঝে যেখানে সেখানে নেবে হিন্দুস্থানি বুলিতে platform-ময় দাপিয়ে বেড়ানো উচিত ছিল। অর্থাৎ, একখান আস্ত মানুষ একেবারে আস্ত রকম ক্ষেপলে যে রকমটা হয় সেইপ্রকার মূর্তি ধারণ করলে ঠিক পুরুষ মানুষের উপযুক্ত হত। আমার ঠাণ্ডা ভাব দেখে নদিদি নিতান্ত disappointed। কিন্তু এই দু দিনে আমি এত বাক্স খুলেছি এবং

বন্ধ করেছি এবং বেঞ্চির নীচে ঠেলে গুঁজেছি এবং উক্ত স্থান থেকে টেনে বের করেছি, এত বাক্স এবং পুঁটুলির পিছনে আমি ফিরেছি এবং এত বাক্স এবং পুঁটুলি আমার পিছনে অভিশাপের মতো ফিরেছে, এত হারিয়েছে এবং এত ফের পাওয়া গেছে এবং এত পাওয়া যায় নি এবং পাবার জন্যে এত চেষ্টা করা গেছে এবং যাচ্ছে যে, কোনো ছাব্বিশ বৎসর বয়সের ভদ্র সন্তানের অদৃষ্টে এমনটা ঘটে নি। আমার ঠিক বাক্স-phobia হয়েছে, বাক্স দেখলে আমার দাঁতে দাঁতে লাগে। যখন চার দিকে চেয়ে দেখি বাক্স, কেবলই বাক্স, ছোটো বড়ো মাঝারি হাল্কা এবং ভারী, কাঠের এবং টিনের এবং পশুচর্মের এবং কাপড়ের— নীচে একটা, উপরে একটা, পাশে একটা, পিছনে একটা— তখন আমার ডাকাডাকি হাঁকাহাঁকি এবং ছুটোছুটি করবার স্বাভাবিক শক্তি একেবারে চলে যায়— এবং তখন আমার শূন্যদৃষ্টি শুষ্কমুখ এবং দীনভাব দেখলে নিতান্ত কাপুরুষের মতো বোধ হয়— অতএব আমার সম্বন্ধে নদিদির যা মত দাঁড়িয়েছে তা ঠিক— আমি বিবিধ-বিচিত্র-মূর্তি বাক্সর মধ্যে পড়ে কী এক রকম হয়ে গিয়েছিলুম। সুরেনকে বলিস আমার এই অবস্থার একটা ছবি আঁকতে। যাক্। তার পরে আমি আর একটা গাড়িতে গিয়ে শুলুম। সে গাড়িতে আর দুটি বাঙালি ছিলেন। তাঁরা ঢাকা থেকে আসছেন, দেখেই কেমন ঢাকাই বলে মনে হয়— তাঁদের মধ্যে একজনের মাথা টাকে প্রায় পরিপূর্ণ এবং ভাষা অত্যন্ত বাঁকা— তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনার পিতা দার্জিলিঙে ছিল?' লক্ষ্মী থাকলে এর যথোচিত উত্তর দিতে পারত; সে হয়তো বলত, 'তিনি দার্জিলিং ছিল কিন্তু তখন দার্জিলিং বড়ো ঠাণ্ডা ছিলেন ব'লে তিনি বাড়ি ফিরে গেছে।' আমার উপস্থিতমত এ রকম বাংলা জোগালো না।

সিলিগুড়ি থেকে দার্জিলিং পর্যন্ত ক্রমাগত সরলার উচ্ছ্বাস-উক্তি— **exclamations**। 'ওমা কী চমৎকার' 'কী আশ্চর্য' 'কী সুন্দর'—

কেবলই আমাকে ঠেলে আর বলে, 'রবিমামা, দেখো দেখো।' কী করি, যা দেখায় তা দেখতেই হয়— কখনো বা গাছ, কখনো বা মেঘ, কখনো বা একটা দুর্জয় খাঁদা-নাক-ওয়ালী পাহাড়ী মেয়ে, কখনো বা এমন কত কী যা দেখতে না দেখতেই গাড়ি চলে যাচ্ছে এবং সরলা দুঃখ করছে যে রবিমামা দেখতে পেলে না, কিন্তু তার জন্যে রবিমামা কিছুমাত্র দুঃখিত নয়। গাড়ি চলতে লাগল। বেলি ঘুমোতে লাগল, বন পাহাড় পর্বত ঝর্না মেঘ এবং বিস্তর খাঁদা নাক এবং বাঁকা চোখ দেখা দিতে লাগল। ক্রমে ঠাণ্ডা, তার পরে মেঘ, তার পরে নদিদির সর্দি, তার পরে বড়দিদির হাঁচি, তার পরে শাল কম্বল বালাপোষ, মোটা মোজা, পা কন্‌কন্‌, হাত ঠাণ্ডা, মুখ নীল, গলা ভার-ভার, এবং ঠিক তার পরেই দার্জিলিং। আবার সেই বাক্স, সেই ব্যাগ, সেই বিছানা, সেই পুঁটুলি। মোটের উপর মোট, মুটের উপর মুটে। ব্রেক থেকে জিনিস-পত্র দেখে নেওয়া, চিনে নেওয়া, মুটের মাথায় চাপানো, সাহেবকে রসিদ দেখানো, সাহেবের সঙ্গে তর্কবিতর্ক, জিনিস খুঁজে না পাওয়া, এবং সেই হারানো জিনিস পুনরুদ্ধারের জন্যে বিবিধ বন্দোবস্ত করা— এতে আমার ঘণ্টা দুয়েক লেগেছিল, ততক্ষণ নদিদিরা ডুলিতে চ'ড়ে, বাড়িতে গিয়ে, শালটি মুড়ি দিয়ে, সোফায় শুয়ে, বিশ্রাম করছিলেন এবং কল্পনা করছিলেন যে রবি ঠিক পুরুষ মানুষের মতো নয়।

কলকাতা

১৬ সেপ্টেম্বর ১৮৮৭

২

দার্জিলিং

। ১৮৮৭ ।

আমার কোমরের সমস্ত খবর সুরির চিঠিতে পাবি। কোমরটা যে কেবল-মাত্র কাছা এবং কোঁচা গুঁজে রাখবার জায়গা তা আর কক্‌খনো মনে করব না— মনুষ্যের মনুষ্যত্ব এই কোমর আশ্রয় করে আছে। আজকের এই চিঠিটা যদি একঘেয়ে (dull) রকম হয়, অর্থাৎ যদি এর মধ্যে কোনো movement না থাকে— বিষয় হতে বিষয়ান্তরে, ভাব হতে ভাবান্তরে, খবর হতে খবরান্তরে আমার কলম যদি ভালো করে না সরে— তবে জানবি সে আমার এই ভাঙা কোমরের দোষ— তার জন্যে আর কারও দোষ দেওয়া যায় না। এর উপরে আবার মাঝে মাঝে এক একটা বিপর্যয় হাঁচি বেরোচ্ছে— মনে হচ্ছে যেন শরীরের ঊর্ধ্বভাগ ভাঙা কোমর থেকে ছিটকে পড়ে যাবে। কিন্তু এই পর্যন্ত। কোমরের কথা আর লিখব না। প্রতিজ্ঞা করে বলছি কোমরের কথা আর লিখব না! ভারী তো কোমর তার আবার কথা! একে তো aestheticsএর সমস্ত আইন অবহেলা করে তিনি হাতে বহরে ক্রমিক উন্নতি লাভ করছিলেন, তার উপরে আবার থেকে থেকে তাঁর সহস্র রকম বাহানা। এই কোমরের কথা যাকে বলি সেই হাসে, কারও করুণা আকর্ষণ করে না; কোমর ভাঙা যেন হৃদয় ভাঙা অপেক্ষা কোনো অংশে কম! কিন্তু চাই নে কাউকে বলতে— চাই নে কারও করুণা—

আমার কোমর আমারই কোমর,
বেচি নি তো তাহা কাহারও কাছে!
ভাঙাচোরা হোক, যা হোক তা হোক,
আমার কোমর আমারই আছে!

কিন্তু কবিতায় যতই অহংকার করি না কেন— সত্যি কথা বলতে কী, আমার খুব ইচ্ছে করছে আমার কোমর যদি আর কারও কোমর

হত! নিজের চরকায় তেল দেওয়া ভালো বরাবর শুনে আসছি এবং স্বীকার করেও আসছি— কিন্তু কোমরের কথা যদি বল তো মুক্তকণ্ঠে বলতে হয় যে, নিজের কোমরে গরম শর্ষের তেল মালিশ করার চেয়ে পরের কোমরে তেল দেওয়া আমি ঢের prefer করি। এ বিষয়ে আমার sentiments সম্পূর্ণ unselfish, এমন-কি almost Christian! কিন্তু থাক্, কোমরের কথা যখন বলব না প্রতিজ্ঞা করেছি তখন বলব না। কারণ, কোমর ছাড়াও মানুষের অন্যান্য অংশ আছে, তার মন আছে, তার হৃদয় আছে, তার আত্মা আছে— কিন্তু যাই বলো, তার কোমরও আছে— এবং খুবই আছে—

প্রমোদে ঢালিয়া দিনু মন,
তবু কোমর কেন টন্‌টন্ করে রে!
চারি দিকে চলা ফেরা,
আমার কোমর কেন টন্‌টন্ করে রে!

হৃদয় ভেঙে গেলে লোকে সান্ত্বনালাভের জন্যে পাহাড়ে বেড়াতে আসে, কিন্তু কোমর ভেঙে গেলে সমতল ক্ষেত্রই সকলের চেয়ে ভালো। এ সময়ে পার্ক্ স্ট্রীটের সেই তাকিয়াগুলো মনে পড়ছে এবং তার সঙ্গে সঙ্গে আরও গোটাকতক পূর্বস্মৃতি মনে আসছে— কিন্তু থাক্— কোমরের কোনো প্রসঙ্গ আর পাড়ব না— পূর্বে কবে কোমরে ব্যথা হয়েছিল সে একেবারে ভুলে যাব, কিন্তু এখন যে কোমরে ব্যথা হয়েছে সেটা ভুলি কী করে?—

বীণা তবে রেখে দে, গান আর গাস নে,
কেমনে যাবে বেদনা!

নদিদি বলছেন, এক উপায় আছে— 'Rush Tox 6th dilution দু ঘণ্টা অন্তর খাও'। আমিও তাই মনে করেছি। সরলা দাঁড়িয়ে আছে আমার চিঠি প'ড়ে contradict করবে। কিন্তু সে বেচারা ভারী নিরাশ

হবে— আমার কোমরের মধ্যে কী হচ্ছে তা তার দেখবার জো নেই, সেখেনে তার মেয়েলি prying instinct প্রবেশ করবার জো নেই, সেখেনে no admittance except for শর্ষের তেল ointment। কিন্তু তবু সরলা যে ছাড়বে এমন বোধ হয় না। বিদেশে তোদের কাছ থেকে যে একটু sympathy পাব তা তার সহ্য হবে না। কিন্তু এবার তোকে স্বীকার করতেই হবে যে, আমার কোমরের সম্বন্ধে আমিই সব চেয়ে বিশ্বাসযোগ্য, এমন-কি সরলাও এ বিষয়ে আমার চেয়ে better authority নয়। কিন্তু বব, আমার কোমরের কথা তোরা কিছুই ভাবিস নে— আমার এই কোমরের কষ্ট আমিই নীরবে সমস্ত সহ্য করব। কিন্তু নারবে ঠিক হয়ে উঠছে না, থেকে থেকে নড়তে চড়তে এমন চীৎকার করছি যে তাকে ঠিক নীরব বলা যায় না। আর আজ তোকে যে চিঠি লিখলুম একেও ঠিক নীরব বলা যায় না। প্রথমে মনে করেছিলুন সুরেনের চিঠিতেই আমার কোমরের সমস্ত অবগত হবি -- তোর কাছে আমার কোমরের কোনো কথা বলব না, তুলব না, পুরোনো তেল-মালিশের স্মৃতি আর জাগাব না— কিন্তু কী হতে কী হল ! কিন্তু—

সেই সব সেই সব, সেই হাহাকার-রব,
সেই অশ্রুবারিধারা, কোমর-বেদনা।

কিন্তু আর কোমরের কথা বলব না— তার প্রধান কারণ হচ্ছে বলবার আর জায়গা নেই। যদি জায়গা থাকত তবে আমি আজ থেকে Doomsday পর্যন্ত বরাবর বলে যেতে পারতুম। কিন্তু Doomsdayর দিন কি এই কোমর নিয়ে উঠে দাঁড়াতে পারতুম ! ভেঁপু বাজত, সবাই উঠত, আর আমি কোমরে হাত দিয়ে আর্তনাদ করতুম। কিন্তু এটা বোধ হচ্ছে ঠাট্টার বিষয় নয়, তুই একটুখানি চটতেও পারিস। যা হোক, কোমরের কথা এবং আমার চিঠি এইখেনে ফুরোলো।

কলকাতা। ১৮৮৭

৩

শিলাইদহ

। ১৮৮৮।

শিলাইদহের অপর পারে একটা চরের সামনে আমাদের বোট লাগানো আছে। প্রকাণ্ড চর— ধূ ধূ করছে— কোথাও শেষ দেখা যায় না— কেবল মাঝে মাঝে এক এক জায়গায় নদীর রেখা দেখা যায়— আবার অনেক সময়ে বালি'কে নদী বলে ভ্রম হয়— গ্রাম নেই, লোক নেই, তরু নেই, তৃণ নেই— বৈচিত্র্যের মধ্যে জায়গায় জায়গায় ফাটল-ধরা ভিজে কালো মাটি, জায়গায় জায়গায় শুক্‌নো সাদা বালি — পূর্ব দিকে মুখ ফিরিয়ে চেয়ে দেখলে দেখা যায় উপরে অনন্ত নীলিমা আর নীচে অনন্ত পাণ্ডুরতা, আকাশ শূন্য এবং ধরণীও শূন্য, নীচে দরিদ্র শুষ্ক কঠিন শূন্যতা আর উপরে অশরীরী উদার শূন্যতা। এমনতর desolation কোথাও দেখা যায় না। হঠাৎ পশ্চিমে মুখ ফেরাবামাত্র দেখা যায় স্রোতোহীন ছোটো নদীর কোল, ও পারে উঁচু পাড়, গাছপালা, কুটির, সন্ধ্যাসূর্যালোকে আশ্চর্য স্বপ্নের মতো। ঠিক যেন এক পারে সৃষ্টি এবং আর এক পারে প্রলয়। সন্ধ্যাসূর্যালোক বলবার তাৎপর্য এই— সন্ধ্যার সময়ই আমরা বেড়াতে বেরোই এবং সেই ছবিটাই মনে অঙ্কিত হয়ে আছে। পৃথিবী যে বাস্তবিক কী আশ্চর্য সুন্দরী তা কলকাতায় থাকলে ভুলে যেতে হয়। এই-যে ছোটো নদীর ধারে শান্তিময় গাছপালার মধ্যে সূর্য প্রতিদিন অস্ত যাচ্ছে, এবং এই অনন্ত ধূসর নির্জন নিঃশব্দ চরের উপরে প্রতি রাতে শত সহস্র নক্ষত্রের নিঃশব্দ অভ্যুদয় হচ্ছে, জগৎ সংসারে এ-যে কী একটা আশ্চর্য মহৎ ঘটনা তা এখানে থাকলে তবে বোঝা যায়। সূর্য আস্তে আস্তে ভোরের বেলা পূর্ব দিক থেকে কী এক প্রকাণ্ড গ্রন্থের পাতা খুলে দিচ্ছে এবং সন্ধ্যা পশ্চিম থেকে ধীরে ধীরে আকাশের উপরে যে-এক প্রকাণ্ড পাতা উলটে দিচ্ছে সেই

বা কী আশ্চর্য লিখন— আর, এই ক্ষীণপরিসর নদী আর এই দিগন্তবিস্তৃত চর আর ওই ছবির মতন পরপারধরণীর এই উপেক্ষিত একটি প্রান্তভাগ— এই বা কী বৃহৎ নিস্তব্ধ নিভৃত পাঠশালা ! যাক্ । এ কথাগুলো রাজধানীতে অনেকটা 'পৈট্রি'র মতো শুনতে হবে, কিন্তু এখানকার পক্ষে কথাগুলো কিছুমাত্র বেখাপ নয়। যা হোক, সন্ধেবেলা এই বৃহৎ চরের মধ্যে ছাড়া পেয়ে আমরা সপরিবারে কিছুকাল বিচ্ছেদের পরম সুখ অনুভব করি— অনুচর-সমেত ছেলেরা এক দিকে যায়, বলু এক দিকে যায়, আমি এক দিকে যাই, দুটি রমণী আর-এক দিকে যায়। ··· ··· ইতিমধ্যে সূর্য সম্পূর্ণ অস্ত যায়, আকাশের সুবর্ণ আভা মিলিয়ে যায়, অন্ধকারে চার দিক অস্পষ্ট হয়ে আসে, ক্রমে আপনার পাশের ক্ষীণ ছায়া দেখে বুঝতে পারি বাঁকা কৃশ চাঁদখানির আলো অল্প অল্প ফুটেছে— পাণ্ডুবর্ণ বালির উপরে এই পাণ্ডুবর্ণ জ্যোৎস্নায় চোখে আরও কেমন বিভ্রম জন্মিয়ে দেয়— কোথায় বালি কোথায় জল, কোথায় পৃথিবী কোথায় আকাশ, নিতান্ত অনুমান করে নিতে হয়। কাজেই সবটা জড়িয়ে ভারী একটা অবাস্তবিক মরীচিকাজগতের মতো বোধ হয়। ··· ··· গতকল্য এই মায়া-উপকূলে অনেক ক্ষণ ধরে বিচরণ করে বোটে ফিরে গিয়ে দেখি — ছেলেরা ছাড়া আমাদের দলের আর কেউ ফেরেন নি। একবার ভাবলুম ডেকে পাঠাই, কিন্তু স্বার্থ এবং দয়া উভয়ে একত্রে মিলে আমাকে নিরস্ত করলে। অর্থাৎ, কতকটা নিজের সুখ এবং কতকটা তাঁদের সুখের প্রতি দৃষ্টি করে আমি একখানি easy chairএ স্থির হয়ে বসলুম— Animal Magnetism -নামক একখানা অত্যন্ত ঝাপসা subjectএর বই একখানি বাতির ঝাপসা আলোতে বসে পড়তে আরম্ভ করলুম। কিন্তু কেউ আর ফেরেন না।

··· বইখানাকে খাটের উপরে উপুড় করে রেখে বেরোলুম। উপরে

উঠে চার দিকে চেয়ে কালো মাথার কোনো চিহ্ন দেখতে পেলুম না— সমস্ত ফ্যাকাশে ধূ ধূ করছে। একবার বলু ব'লে পুরো জোরে চীৎকার করলুম— কণ্ঠস্বর হূ হূ করতে করতে দশ দিকে ছুটে গেল, কিন্তু কারও সাড়া পেলুম না, তখন বুকটা হঠাৎ চার দিক থেকে দমে গেল, একখানা বড়ো খোলা ছাতা হঠাৎ বন্ধ করে দিলে যেমনতর হয়। গফুর আলো নিয়ে বেরোল, প্রসন্ন বেরোল, বোটের মাঝিগুলো বেরোল, সবাই ভাগ করে ভিন্ন ভিন্ন দিকে চললুম— আমি এক দিকে 'বলু' 'বলু' করে চীৎকার করছি— প্রসন্ন আর-এক দিকে ডাক দিচ্ছে 'ছোটো মা'— মাঝে মাঝে শোনা যাচ্ছে মাঝিরা 'বাবু' 'বাবু' করে ফুকরে উঠছে। সেই মরুভূমির মধ্যে নিস্তব্ধ রাত্রে অনেকগুলো আর্তস্বর উঠতে লাগল। কারও সাড়াশব্দ নেই। গফুর দুই-এক বার অতি দূর থেকে হেঁকে বললে 'দেখতে পেয়েছি', তার পরেই আবার সংশোধন করে বললে 'না' 'না'— আমার মানসিক অবস্থাটা একবার কল্পনা করে দেখ্। কল্পনা করতে গেলে নিঃশব্দ রাত্রি, ক্ষীণ চন্দ্রালোক, নির্জন নিস্তব্ধ শূন্য চর, দূরে গফুরের চলনশীল একটি লণ্ঠনের আলো— মাঝে মাঝে এক এক দিক থেকে কাতর কণ্ঠের আহ্বান এবং চতুর্দিকে তার উদাস প্রতিধ্বনি— মাঝে মাঝে আশার উন্মেষ এবং পরমুহূর্তেই সুগভীর নৈরাশ্য —এই সমস্তটা মনে আনতে হবে। অসম্ভব রকমের আশঙ্কা সকল মনে জাগতে লাগল। কখনো মনে হল চোরা বালিতে পড়েছে, কখনো মনে হল বলুর হয়তো হঠাৎ মূর্ছা কিম্বা কিছু একটা হয়েছে, কখনো বা নানাবিধ শ্বাপদ জন্তুর বিভীষিকা কল্পনায় উদয় হতে লাগল। মনে মনে হতে লাগল— 'আত্মরক্ষা-অসমর্থ যারা, নিশ্চিন্তে ঘটায় তারা পরের বিপদ।' স্ত্রী-স্বাধীনতার বিরুদ্ধে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে উঠলুম— বেশ বুঝতে পারলুম বলু বেচারা ভালোমানুষ, দুই বন্ধনমুক্ত রমণীর পাল্লায় পড়ে বিপদে

পড়েছে। এমন সময়ে ঘণ্টাখানেক পরে রব উঠল এঁরা চড়া বেয়ে বেয়ে ও পারে গিয়ে পড়েছেন, আর ফিরতে পারছেন না। তখন ছুটে বোট-অভিমুখে চললুম— বোটে গিয়ে পৌঁছতে অনেক ক্ষণ লাগল। বোট ও পারে গেল, বোট-লক্ষ্মী বোটে ফিরলেন— বলু বলতে লাগল, 'তোমাদের নিয়ে আমি আর কখনো বেরোব না।' সকলেই অনুতপ্ত, শ্রান্ত, কাতর, সুতরাং আমার ভালো ভালো উপাদেয় ভর্ৎসনাবাক্য হৃদয়েই রয়ে গেল— পরদিন প্রাতঃকালে উঠেও কোনোমতেই রাগতে পারলুম না। সুতরাং এত বড়ো একটা ব্যাপার পরস্পরে হেসেই উড়িয়ে দিলে, যেন ভারী একটা তামাসা হচ্ছিল। যা হোক, তোকে তিন দিন ধরে এই বিষয়টা বিস্তৃত করে লিখে আমার মন অনেকটা খোলসা হয়ে গেল।

ঐ রে! মৌলবী সাহেব এক দঙ্গল প্রজা নিয়ে এসে সেলাম করছে— আমার বলতে ইচ্ছে করছে—

> 'ধিক্ তুমি, ধিক্ প্রজা, ধিক্ জমিদারি—
> জমিদারি গোল্লায় যাক মৌলবী লয়ে সাথে!'

কলকাতা
২ ডিসেম্বর ?
১৮৮৮

৪

কলকাতা

। জুন ১৮৮৯ ।

গাড়ি ছাড়বার পর বেলি চার দিক চেয়ে গম্ভীর হয়ে বসে রইল, ভাবলে দিদিরা কোথায় গেল, আমি কোথায় যাচ্ছি— এ সংসারে কোথা থেকে আগমন, কোথায় গতি, জীবনের উদ্দেশ্য কী— ভাবতে ভাবতে ক্রমে দেখলুম ঘন ঘন হাই তুলতে লাগল, তার পরে খানিক বাদে আয়ার কোলে মাথা রেখে পা ছড়িয়ে নিদ্রা আরম্ভ করে দিলে। আমার মনেও সংসারের সুখ দুঃখ সম্বন্ধে নানাবিধ চিন্তার উদয় হয়েছিল, কিন্তু ঘুম এল না। সুতরাং আপন মনে ভৈরবী আলাপ করতে লাগলুম। ভৈরবী সুরের মোচড়গুলো কানে এলে জগতের প্রতি এক রকম বিচিত্র ভাবের উদয় হয় তা বোধ হয় জানিস— মনে হয় একটা নিয়মের হস্ত অবিশ্রাম আর্গিন যন্ত্রের হাতা ঘোরাচ্ছে এবং সেই ঘর্ষণবেদনায় সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মর্মস্থল হতে একটা গম্ভীর কাতর করুণ রাগিণী উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠছে— সকাল বেলাকার সূর্যের সমস্ত আলো ম্লান হয়ে এসেছে, গাছপালারা নিস্তব্ধ হয়ে কী যেন শুনছে, এবং আকাশ একটা বিশ্বব্যাপী অশ্রুর বাষ্পে যেন আচ্ছন্ন হয়ে রয়েছে —অর্থাৎ, দূর আকাশের দিকে চাইলে মনে হয় যেন একটা অনিমেষ নীল চোখ কেবল ছল্ ছল্ করে চেয়ে আছে। … খিড়কি স্টেশনের কাছাকাছি আমাদের সেই আকের ক্ষেত, গাছের সার, টেনিস-ক্ষেত্র, কাঁচের-জানলা-মোড়া বাড়ি দেখতে পেলুম; দেখে মনটা হঠাৎ কেমন হু হু করে উঠল। এই এক আশ্চর্য! যখন এখানে বাস করতুম তখন এ বাড়ির উপরে যে সবিশেষ স্নেহ ছিল তা নয়— যখন এ বাড়ি ছেড়ে তোদের সঙ্গে সোলাপুর গিয়েছিলুম তখনও যে বিশেষ কাতর হয়েছিলুম তাও বলতে পারি নে— অথচ দ্রুতগতি ট্রেনের বাতায়নে বসে যখন কেবল নিমেষের মতো দেখলুম সেই একলা বাড়ি তার

খেলার জায়গা এবং ফাঁকা ঘরগুলো নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে, তখন সমস্ত হৃদয়টা বিদ্যুৎবেগে সেই বাড়ির উপরে ঝাঁপিয়ে গিয়ে পড়ল এবং মনে হতে লাগল তেমনি করে সকলে মিলে ঐ বাড়িটাতে গিয়ে জটলা করে বসলেই যেন আপাতত সংসারের সমস্ত অভাব দূর হয় এবং জীবনের উদ্দেশ্য অনেকটা সফল হয়।··· যেমনি বাড়িটা দেখলুম অমনি একটা ঘা পড়ল— বুকের ভিতর বাঁ দিক থেকে ডান দিক পর্যন্ত ধক্ করে একটা শব্দ হল, হুস্ করে গাড়ি চলে গেল— আকের ক্ষেত মিলিয়ে গেল— বাস্, সমস্ত ফুরোল— কেবল হঠাৎ ঘা খাওয়ার দরুন মনের বড়ো বড়ো দু চারটে তার প্রায় দেড় সুর আন্দাজ নেবে গেল। কিন্তু গাড়ির এঞ্জিন এ-সকল বিষয়ে বড়ো-একটা চিন্তা করে না, সে লোহার রাস্তার উপর দিয়ে এক রোখে চলে যায়, কোন্ লোক কোথায় কী ভাবে যাচ্ছে সে বিষয়ে তার খেয়াল করবার সময় নেই— সে কেবল গল্ গল্ করে জল খায়, হুস্ হুস্ করে ধোঁওয়া ছাড়ে, গাঁ গাঁ করে চীৎকার করে এবং গড়্ গড়্ করে চলে যায়। সংসারের গতির সঙ্গে এর সুন্দর তুলনা দেওয়া যেতে পারত, কিন্তু সেটা এত পুরোনো এবং অনাবশ্যক যে কেবল একবার নির্দেশ করে ক্ষান্ত থাকা গেল। খাণ্ডালার কাছাকাছি এসে মেঘ এবং বৃষ্টি। সেই-সব পাহাড়-গুলোর উপরে মেঘ জ'মে ঝাপসা হয়ে গেছে— ঠিক যেন কে পাহাড় এঁকে তার পরে রবার দিয়ে ঘষে দিয়েছে— খানিক-খানিক outline দেখা যাচ্ছে এবং খানিকটা পেন্সিলের দাগ চার দিকে ধেবড়ে গেছে। ···অবশেষে গাড়ির ঘণ্টা দিলে— দূর থেকে গাড়ির নিদ্রাহীন লাল চক্ষু দেখা গেল; ধরণী থর্ থর্ করে কাঁপতে লাগল; স্টেশনের কর্তারা চটিজুতো, ঘুন্টি-দেওয়া চাপকান এবং টিকির উপরে তক্‌মা-দেওয়া গোল টুপি নিয়ে নানা ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ল— বিপুল হাতল্যাণ্ঠন চার দিকে আলো নিক্ষেপ করতে লাগল; খানসামাবর্গ সচকিত হয়ে যে

যার জিনিস-পত্র আগলে দাঁড়ালে ; বেলি ঘুমোতে লাগল ; আমার বুক ধড়াস্ ধড়াস্ করতে লাগল।… আয়াকে বললুম, 'শীঘ্র বেলিকে কোলে করে নিয়ে এসো।' বেলি আসতে না আসতে দেখা গেল এক-জোড়া মেম-সাহেব দ্রুতগতিতে আমাকে উত্তীর্ণ হয়ে সেই খালি গাড়ির প্রতি লক্ষ করেছে— আমি মনে মনে বললুম 'যেমন করে হোক ও গাড়িতে আমি উঠবই'। মেমসাহেবও খালি গাড়ির সুমুখে দাঁড়ালেন আমিও দাঁড়ালুম, গার্ড্ এসে উপস্থিত— গার্ড্কে জিজ্ঞাসা 'এটা কি লেডী-জাতীয় গাড়ি'। শুনে চট্ করে মেমটা তাকে বললে, 'অবিশ্যি আবশ্যক হলে এটা লেডিদের জন্যে reserve করা যেতে পারে।' গার্ড্টা সে কথার কোনো উত্তর না দিয়ে জিজ্ঞাসা করলে আমি কোথায় যাচ্ছি, আমি বললুম কলকাতায়। সে বললে : You may get in sir ! মেয়েটাও সে গাড়িতে ওঠবার উদ্যোগ করতে লাগল, তার স্বামীটা তাকে বারণ করলে। এমন সময়ে গার্ড্টা আমাকে জিজ্ঞাসা করলে আমার লেডী কোথায়। আমি বললুম আমার লেডি নেই, একটা maid servant আছে— শুনে মেয়েটা কিছু দূরে গিয়ে হো হো করে হেসে উঠল এবং সাহেবকে বললে : His maid servant ! অর্থাৎ, ঐ কালো লোকটা যাকে maid servant বলছে সে might be his wife as well !… যা হোক, মনে মনে বললুম, হেসে নাও, আমিও খালি গাড়ি পেলুম। কিন্তু একটা মজা দেখলুম সাহেবটার ইচ্ছে নয় আমার কোনোরকম অসুবিধে হয়। সে না থাকলে spite করে মেয়েটা গাড়িতে উঠে বসত— অথচ অন্য গাড়িতে জায়গা ছিল। আমার দৃঢ় বিশ্বাস এই-সব নাক-তোলা রূপসী ইংরেজ মেয়েগুলো যদি ভারতবর্ষে না আসত তা হলে ইংরেজরা আমাদের উপরে ঢের ভালো ব্যবহার করতে পারত ; এরাই Anglo-Indian ভাবের মূল ভিত্তি। এরা নাকি বড্ড delicate, ভারী অল্পে মাথা ধরে

এবং shocked হয়, তাই কালো জাতের উপরে এদের সহৃদয়তা জন্মাতে পারে না। হায় রে, এত সাবান মাখলুম, এত খানা খেলুম, এত *Cherry Blossom*এর শিশি খালি করলুম, তবু ঐ সাদা নাকগুলির ডগা কুঁচকেই রইল। অভিশাপ দিতে ইচ্ছে করে, 'তোরা যেন পরজন্মে দাক্ষিণাত্যে নারী হয়ে জন্মাস এবং স্বামীরা যেন ঐ নাকের ডগাগুলি ছেদন করে দেয়।' ··· বেলিটা অকারণে খুঁৎ খুঁৎ আরম্ভ করলে। বেলা বাড়তে লাগল, যদিও রোদ্দুর নেই তবুও গরম বোধ হতে লাগল। ··· কিন্তু সময় আর কাটে না। প্রত্যেক মিনিটকে যেন স্পর্শ করে ঠেলে ঠেলে এগুতে হচ্ছে। ··· Anna Karenina পড়তে গেলুম, এমনি বিশ্রী লাগল যে পড়তে পারলুম না —এ রকম সব sickly বই পড়ে কী সুখ বুঝতে পারি নে। আমি চাই বেশ সরস সুন্দর মধুর উদার লেখা— কূটকচালে অদ্ভুত গোলমেলে কাণ্ড আমার বেশিক্ষণ পোষায় না। সৌভাগ্যক্রমে খানিক দূর গিয়ে ঘোরতর বৃষ্টি আরম্ভ হল। চার দিক বন্ধ করে কাঁচের জানলার কাছে বসে মেঘ বৃষ্টি দেখতে বেশ লাগল। এক জায়গায় একটা বর্ষার নদীর কাণ্ড যে দেখলুম সে আর কী বলব। সে একেবারে ফুলে ফেঁপে, ফেনিয়ে, পাকিয়ে ঘুলিয়ে, ছুটে, মাথা খুঁড়ে, পাথরগুলোর উপরে প'ড়ে আছড়ে বিছড়ে, তাদের ডিঙিয়ে, তাদের চার দিকে ঘুর্‌পাক খেয়ে একটা বিশ্রী কাণ্ড করতে লাগল। এ রকম উন্মত্ততা আর কোথাও দেখি নি। সোহাগপুরে বিকেলে এসে যখন ডিনার খেলুম তখন বৃষ্টি থেমেছে, যখন গাড়ি ছাড়লে তখন দেখলুম সূর্য অত্যন্ত রাঙা হয়ে মেঘের মধ্যে অস্ত যাচ্ছে। আমি প্রায় তোদের কথা মনে করছিলুম, ভাবছিলুম খাওয়াদাওয়া গল্পসল্প খেলাধুলো পড়াশুনোর মধ্যে তোদের সময় কেমন অলক্ষিতভাবে কেটে যাচ্ছে— সময় তোদের উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে যাচ্ছে, তার অস্তিত্বই তোরা টের পাচ্ছিস নে

—আর আমি সময়ের উপরে সাঁতার কেটে চলেছি, সমস্ত অগাধ সময়টা আমার বুকে মুখে সর্বাঙ্গে লাগছে।···

যথাসময়ে গাড়ি হাওড়ায় গিয়ে পৌঁছল। প্রথমে বাড়ির জমাদার, তার পরে যোগিনী, তার পরে সত্য, একে একে দৃষ্টিপথে পড়ল। তার পরে সেকেণ্ড্ ক্লাসের ছাতের উপর গুটানো বিছানা, আয়ার দোমড়ানো টিনের বাক্স এবং নাবার টব (তার মধ্যে দুধের বোতল, লোটা, হাঁড়ি, টিন্‌পট, পুঁটুলি ইত্যাদি) চাপিয়ে বাড়ি পৌঁছন গেল। একটা কলরব, লোকের ভিড়, দরোয়ানদের সেলাম, চাকরদের প্রণাম, সরকারদের নমস্কার, আমাদের মধ্যে কে মোটা হয়েছি কে রোগা হয়েছি সে সম্বন্ধে সাধারণের সম্পূর্ণ মতভেদ, বেলাকে নিয়ে স্বয়ম্প্রভা এণ্ড্ কোম্পানির লুটোপুটি, চায়ের টেবিলে লোকসমাগম, স্নান, আহার ইত্যাদি– এ সমস্ত তুই বেশ কল্পনা করতে পারিস। হঠাৎ দাদা এসে সহজ জ্ঞান নিয়ে ঘোরতর বক্তৃতা দিতে লাগলেন— একটা ভারী গোলমাল বেধে গেল। খোকাকে দেখে ভারী নতুন রকম বোধ হল। মস্ত গোল মাথা, নিতান্ত হাঁদা, বেশ একটু কালো, মাথা নেড়া, ফুলো গাল, পরম নির্‌বুদ্ধির মতো চোখ মুখের ভাব সর্বদা টল্‌মল্, হাতগুলো ফুলো-ফুলো মোটা-মোটা মুঠো-করা— কোনো প্রকার অঙ্গভঙ্গী বা শব্দপ্রয়োগের দ্বারা তার মনোযোগ আকর্ষণ করলে হাসে, চটকে কিম্বা নেড়ে দিলে হো হোঃ শব্দে পরিতোষ প্রকাশ করে। এই তার general chracteristics— কিন্তু এ সকল বিষয়ে তার সমবয়স্ক মানবসন্তানের সঙ্গে তার বিশেষ কোনো প্রভেদ দেখি নে।···

বিজাপুর

১২ জুন ১৮৮৯

৫

সাজাদপুর

। জানুয়ারি ১৮৯০ ।

এখানকার এন্ট্রান্স্ স্কুলের ছাত্রেরা একটা সুনীতিসঞ্চারিণী সভা করেছে, তাতে তারা নীতি সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন, সেই সভার মুখ উজ্জ্বল করবার জন্যে এখানকার মাস্টাররা আমাকে পাক্‌ড়াও করতে এসেছিলেন। আমার কবিত্ব এবং অন্যান্য বিবিধ সদ্‌গুণ সম্বন্ধে যখন তাঁরা সকলে মিলে লাগলেন— যখন সকল মাস্টার এবং সকল পণ্ডিতের মধ্যে আমার গুণব্যাখ্যা নিয়ে রীতিমত রোখ চেপে গেল, একজন যেখেনে থামেন আর-একজন সেখেন থেকে আরম্ভ করেন— একজন যদি বলেন কবি, আর-একজন বলেন শ্রেষ্ঠ কবি, আর-একজন বলেন যেমন ভাষা তেমনি ভাব, চতুর্থ বলেন সকলই নূতন, বাংলা সাহিত্যে ইতিপূর্বে এমন কিছু হয় নি— পঞ্চম যা বললেন তা লোকসমাজে প্রকাশযোগ্য নহে, ষষ্ঠের কথা শুনে আমার কর্ণাগ্রভাগ রক্তিমাবর্ণ ধারণ করলে— সপ্তম কিছু বলবার পূর্বেই আমি অগোণে তাঁদের সুনীতিসঞ্চারিণী সভায় উপস্থিত হতে সম্মতি দান করলুম। এখানকার স্কুলের সেকেণ্ড্ মাস্টার আমার হেঁয়ালি নাট্যের বিশেষ ভক্ত। তিনি বললেন, আমার 'হেঁইলি নাট্য' বাংলা ভাষায় সম্পূর্ণ নূতন— 'পড়্যা আমরা হেস্তা কুট্‌পাট্!' পর্‌শুদিন সুনীতিসঞ্চারিণী সভায় যাওয়া গেল। ছেলেতে বুড়োতে মিলে শ' পাঁচ-ছয় লোক উপস্থিত— কেউ বা একরত্তি, পায়ে জুতো নেই, বেঞ্চির উপরে বসে পা দোলাচ্ছে আর খক্ খক্ করে কাশছে; কেউ বা মস্ত ডাগর, কালো আল্‌পাকার চাপকানের উপর ঘড়ির চেন, অর্থাৎ আমাদের মুন্সেফ উকিল ইত্যাদি। আমি নিতান্ত মুষড়ে বসে আছি, হাত পা ঠাণ্ডা হয়ে গেছে, মুখ লাল হয়ে উঠেছে— এমন সময়ে এক ব্যক্তি প্রস্তাব করলেন ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করুন্। মুন্সেফবাবু বললেন,

'আমি অনুমোদন করি।' বিনাবাক্যব্যয়ে সভাপতির আসন গ্রহণ করলুম। ছাত্রেরা আজ বিনয় সম্বন্ধে বক্তৃতা করবেন। সেই অপেক্ষা করে বসে আছি। ... ... তার পরে ওরই মধ্যে একটি ডাগর-ডোগর ছেলে উঠে modesty সম্বন্ধে ইংরিজি ভাষায় একটি বক্তৃতা পাঠ করলে। বললে: Modesty is an ornament of mind. Modest men are praised and immodest men are blamed by all. Every man is pleased to see a modest man, but a proud man is very much disliked. Newton was a modest man. When his dog upset an ink bottle on his papers Newton said to his dog, 'My friend, you do not know what harm you did to me'— such was his modesty. Brethren, let us all be like Newton. One day Chaitanya was walking in the street— a dog was lying on his way— Chaitanya said, 'My friend, please move a little'— the dog moved away at once— such was the force of modesty. The dog required no beating. We should treat every man like this dog। এই রকম অনেক সদুপদেশ দিয়েছিল। দ্বিতীয় ছাত্র উঠে সুললিত বঙ্গভাষায় বলতে লাগল: একদা সঙ্গীগণ-সমভিব্যাহারে ভ্রমণ করিতেছিলাম। নিদাঘমার্তণ্ডতাপে পরিতাপিত হইয়া এক বিহঙ্গকূজিত মনোরম উপবনের মধ্যে প্রবেশ করিলাম। (সুদীর্ঘ বর্ণনা।) এক স্থানে দেখিলাম একদল পুরুষ পরুষ বাক্য -উচ্চারণ-পূর্বক ঘোরতর কলহে প্রবৃত্ত হইয়াছে। জানিতে পারিলাম না ইহারা কে— সঙ্গীগণ পশ্চাদ্‌বর্তী হইয়া পড়াতে তাহাদিগকেও জিজ্ঞাসা করিতে পারিলাম না। আরও কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া এক কুমুদকহ্লারশোভিত

হংসসারসসেবিত সুশীতল সরোবরতীরে উপস্থিত হইলাম। (দীর্ঘ বর্ণনা।) সেখানে কতকগুলি অপূর্বসুন্দরী যুবতী জলক্রীড়া করিতেছে দেখিয়াই বোধ হইল তাহারা দেবকন্যা। পরে জানিতে পারিলাম পূর্বোক্ত পুরুষগণ ঔদ্ধত্য অহংকার এবং এই সুন্দরী যুবতীগণ বিনয়। বিনয়ের অশেষ গুণ। যতগুলি গুণে সৃষ্টিকর্তা জগদীশ্বর মানবকলেবর বিভূষিত করিয়াছেন তন্মধ্যে বিনয় সর্বশ্রেষ্ঠ গুণ। আহা! মানবের মধ্যে বিনয়গুণ সন্দর্শন করিলে নয়ন আনন্দাশ্রুজলে প্লাবিত ও অন্তঃকরণ হর্ষপারাবারে নিমগ্ন হয়। ইত্যাদি। তার পরে আর একটি ছেলে উঠেই আরম্ভ করে দিলে—

বিনয়ের তুল্য গুণ আর কোথা নাই।
বিনয়ীর বশ হয় সর্বলোকে ভাই।
পিতামাতা সকলের বাধ্য হয়ে রবে—
তবে তো তোমারে সবে বিনয়ী কহিবে।
ইত্যাদি।

আর একটি ছেলে বিনয় থেকে আরম্ভ করলে, শেষ করলে প্রকৃত প্রেম কাকে বলে এবং ঈশ্বরের অনন্ত মহিমা। প্রত্যেক বক্তৃতার পরে খানিকক্ষণ চটাপট্ হাততালি পড়তে লাগল। আমি তো নিতান্ত হতবুদ্ধি হয়ে বসে আছি। এমন সময়ে Headmaster এসে বললেন, 'আরও অনেক রচনা আছে, কিন্তু আপনার বক্তৃতা শোনবার জন্যে সকলে উৎসুক হয়ে আছেন।' মুখটুক শুকিয়ে, হাত পা কাঁপিয়ে, কানের মধ্যে ভোঁ ভোঁ করতে লেগে, কেষে কুমে দাঁড়িয়ে আরম্ভ করে দিলুম। বললুম, বিনয় সম্বন্ধে কিছু বলবার পূর্বেই একান্ত বিনীতভাবে বলা আবশ্যক, আমার বলবার শক্তি নেই— বিশেষতঃ বিনয় সম্বন্ধে আমি যে বেশি কথা বলতে পারব এমন সাধ্য আমি রাখি নে। বিনয় যে একটা সদ্‌গুণের মধ্যে সে সম্বন্ধে আমার পূর্ববক্তা ছাত্রবৃন্দের আমি সম্পূর্ণ

অনুমোদন করি। নিউটন বিনয়ী ছিলেন বটে, তার আর কোনো সন্দেহ নেই।— এইরকম তো ব্যাপার। ক্রমে ক্রমে বলতে বলতে দুটো চারটে কথা বেরিয়ে গেল। তার পরে আমি বসলে পর, পরে পরে দুজন উঠে আমার এবং আমার পিতৃপিতামহের গুণব্যাখ্যা করতে লাগল। প্রথমে উঠলেন হেড-পণ্ডিত। তিনি বললেন তাঁর বলবার ক্ষমতা নেই, কিন্তু আমার বক্তৃতা শুনে এমনি মুগ্ধ হয়েছেন যে সামলাতে পারছেন না— কবিত্বশক্তি বক্তৃতাশক্তি এবং তার উপরে সংগীতশক্তি আমি ছাড়া আর কোথাও পাওয়া যায় না। এই বলে ধপ্ করে বসে পড়লেন। সেকেন্‌ড্-মাস্টার উঠে বললেন— 'পণ্ডিত মহাশয় যা বললেন তাতে আমার মন তৃপ্ত হল না, যথেষ্ট বলা হয় নি। যিনি আজ আমাদের সভায় উপস্থিত আছেন তিনি বড়ো সাধারণ লোক নন— স্বর্গীয় মহাত্মা (এইখেনে প্রায় পাঁচ মিনিট-কাল তাঁর নাম মনে পড়ল না, পাশের থেকে কে বলে দিলে) দ্বারকানাথ ঠাকুরের নাম কে না জানে, সমস্ত পৃথিবীতে তাঁর নাম রাষ্ট্র বললে অত্যুক্তি হয় না— তিনি এঁর পিতামহ— রাজর্ষি বললেও হয় মহর্ষি বললেও হয় দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এঁর পিতা!' তার পরে এল কবিত্বশক্তি এবং 'হেঁইলি নাট্য'। আমি শুনে অপ্রস্তুত। তার পরে বললেন বিনয় সম্বন্ধে বক্তৃতা দেবার দরকার কী— Example is better than precept— ইনিই বিনয়ের দৃষ্টান্তস্থল। ইত্যাদি। ইত্যাদি। সবাই হাততালি দিলে। তার পরে সভা ভঙ্গ হল।

জোড়াসাঁকো

২৩ জানুয়ারি ১৮৯০

১১ মাঘ বৃহস্পতিবার

৬

সাজাদপুর

। জানুয়ারি ১৮৯০ ।

কাজেই দুপুর বেলা পাগড়ি প'রে কার্ডে নাম লিখে পাল্কি চড়ে জমিদার বাবু চললেন। সাহেব তাঁবুর বারান্দায় বসে বিচার করছেন, দক্ষিণ পার্শ্বে পুলিসের চর। বিচারপ্রার্থীর দল মাঠে ঘাটে গাছতলায় পড়ে অপেক্ষা করে আছে— একবারে তার নাকের সামনে পাল্কি নাবালে, সাহেব খাতির করে চৌকিতে বসালে। ছোকরা-হেন, গোঁফের রেখা উঠেছে, চুল খুব কটা, মাঝে মাঝে একটু একটু কালো চুলের তালি দেওয়া, সে ভারী অদ্ভুত দেখতে হয়েছে— হঠাৎ মনে হয় বুড়ো মানুষ, অথচ মুখ নিতান্ত কাঁচা। সাহেবের সঙ্গে বিস্তর আপ্যায়িত করা গেল; বললুম, 'কাল রাত্রে আমার সঙ্গে খেতে এসো।' সে বললে, 'আমি আজই আর-এক জায়গায় যাচ্ছি pig stickingএর জোগাড় করতে।' (আমি মনে মনে উৎফুল্ল) বললুম, নিতান্ত দুঃখের বিষয়। সাহেব বললেন, 'আবার সোমবারে ফিরে আসব।' (শুনে মন বড্ড দমে গেল) বললুম, 'তবে সোমবারেই খেয়ো।' সে তৎক্ষণাৎ রাজি। যা হোক, সোমবারটা একটু তফাতে আছে মনে করে নিশ্বেস ফেলে বাড়ি চলে এলুম। ভয়ানক মেঘ করে এল— ঘোরতর ঝড়, মুষলধারে বৃষ্টি। বই ছুঁতে ইচ্ছে করছে না, কিছু লেখা অসম্ভব, মনের মধ্যে ভারী একটা চাঞ্চল্য উপস্থিত, যাকে কবিত্বের ভাষায় বলে—কী যেন নেই, কে যেন থাকলে বেশ হ'ত, কিন্তু তাকে যেন কাছাকাছি কোথাও পাওয়া যাচ্ছে না ইত্যাদি। এ ঘর থেকে ও ঘরে পায়চারি করে বেড়াতে লাগলুম— অন্ধকার হয়ে এসেছে, গড়্ গড়্ শব্দে মেঘ ডাকছে, বিদ্যুতের উপর বিদ্যুৎ, হু হু করে এক-একটা বাতাসের দমকা আসছে আর আমাদের বারান্দার সামনের বড়ো নিচুগাছটার ঘাড় ধরে যেন তার দাড়ি-সুদ্ধ মাথাটা নাড়িয়ে

দিচ্ছে— দেখতে দেখতে বৃষ্টির জলে আমাদের শুকনো খালটা প্রায় পুরে এল।··· ··· ঐ রকম আরেকটা লিখতে ইচ্ছে করে, কিন্তু বোধ হয় আর কিছু লেখবার নেই। যাই হোক এই রকম করে বেড়াতে বেড়াতে হঠাৎ আমার মনে হল ম্যাজিস্ট্রেটকে এই বাদলায় আমাদের বাড়িতে আশ্রয় নিতে অনুরোধ করা আমার কর্তব্য। চিঠি লিখে দিলুম, 'সাহেব, এ বর্ষায় pig stickingএ বেরোনো তোমার কর্ম নয়— যদিও তুমি সাহেবের বাচ্চা, এবং তাঁবুতে বাস করাও স্থলচর-জাতীয় জীবের পক্ষে দুঃসাধ্য, অতএব শুকনো ডাঙা যদি ভালো মনে কর তো আমার আশ্রয়ে এসো।' চিঠি পাঠিয়ে দিয়ে ঘর তদারক করতে গিয়ে দেখি, সে ঘরে দুটো বাঁশের ঝোলার উপর তাকিয়া গদি ময়লা-লেপ টাঙানো— চাকরদের গুল টিকে তামাক, তাঁদেরই দুটো কাঠের সিন্দুক, তাঁদেরই মলিন লেপ, ওয়াড়হীন তৈলাক্ত বালিশ ও মসীবর্ণ মাদুর, এক টুকরো ছেঁড়া চট ও তার উপরে বিচিত্রজাতীয় মলিনতা— কতকগুলো ··· ··· বাক্সর মধ্যে নানাবিধ জিনিসের ভগ্নাবশিষ্ট— যথা মর্চেপড়া কাৎলির ঢাক্‌নি, তলাহীন ভাঙা লোহার উনুন, অত্যন্ত ময়লা একটা দস্তার চাদানি, কতকগুলো কাঁচের ··· ··· গ্লাসের পায়া, ভাঙা সেজের কাঁচরাশি ও ময়লা শামাদান, দুটো ফিলটার, meat safe, একটা সুপ-প্লেটে খানিকটা পাৎলা গুড়, ধুলো পড়ে পড়ে সেটা গাঢ় হয়ে এসেছে, অনেকগুলো ভাঙা এবং আস্ত প্লেট, গোটাকতক ময়লা কালীবর্ণ ভিজে ঝাড়ন— কোণে প্লেট ধোবার গামলা, গফুর মিয়ার একটা ময়লা কোর্তা এবং পুরোনো মক্‌মলের skull cap— একটা জীর্ণ পোকা-কাটা জলের দাগ- তেলের দাগ- দুধের দাগ- গুড়ের দাগ- কালো দাগ- brown দাগ- সাদা দাগ- এবং নানা মিশ্রিত দাগ- বিশিষ্ট আয়নাহীন dressing table — তার পারা-ওঠা ভাঙা আয়নাটা অন্যত্র দেয়ালে ঠেসান-দেওয়া—

তার খোপের মধ্যে ধুলো, খড়কে, ন্যাপ্‌কিন, পুরোনো তালা, ভাঙা গেলাসের তলা এবং সোডা ওআটার বোতলের তার, কতকগুলো খাটের খুরো, ডাণ্ডা এবং চাল— একটা পায়া-ভাঙা washhand stand, একটা দুর্গন্ধ, দেয়ালময় অনেকগুলো দাগ এবং গোটাকতক পেরেক— ব্যাপার দেখে আমার চক্ষুস্থির।— 'ডাক্‌ লোকজন, নিয়ে আয় নায়েব, ডেকে আন্‌ খাজাঞ্চি, জোগাড় কর্‌ কুলি— আন্‌ ঝাঁটা, আন্‌ জল, মই লাগা, দড়ি খোল্‌, বাঁশ খোল্‌, তাকিয়া লেপ কাঁথা টেনে ফেল্‌, ভাঙা কাঁচের টুকরোগুলো খুঁটে খুঁটে তোল্‌, পেরেকগুলো একে একে উপড়ে ফেল্‌— ওরে তোরা সব হাঁ করে দাঁড়িয়ে রয়েছিস কেন, নে-না— একটা একটা করে জিনিস নে-না— ওরে ভাঙলে রে সব ভাঙলে— ঝন্‌ ঝন্‌ ঝনাৎ— তিনটে সেজ ভেঙে চুরমার— খুঁটে খুঁটে তোল্‌।' ভাঙা চুপড়িগুলো এবং ছেঁড়া চটটা বহুদিনসঞ্চিত ধুলো-সমেত নিজের হাতে টেনে ফেলে দিলুম— নীচে থেকে পাঁচ-ছটা আর্সলা সপরিবারে চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়লেন। তাঁরা আমারই সঙ্গে একান্নবর্তী হয়ে বাস করছিলেন— আমার গুড়, আমার পাঁউরুটি এবং আমারই বার্নিশ-করা নতুন জুতোর বার্নিশ তাঁদের উপজীবিকা ছিল। সাহেব লিখলেন, 'আমি এখনি যাচ্ছি, বড়ো বিপদে পড়েছি।' 'ওরে এল রে এল— চট্‌পট্‌ কর্‌।' তার পরে— ঐ এসেছে সাহেব। তাড়াতাড়ি চুল দাড়ি সমস্ত ঝেড়ে ফেলে ভদ্রলোক হয়ে, যেন কোনো কাজ ছিল না, যেন সমস্তদিন আরামে বসেছিলুম, এই রকম ভাবে হলের ঘরে বসে রইলুম। সাহেবের সঙ্গে ঈষৎ হেসে হাত নাড়ানাড়ি করে অত্যন্ত নিশ্চিন্ত ভাবে গল্প করতে লাগলুম। সাহেবের শোবার ঘরের কী হল— এই চিন্তা ক্রমাগত মনের মধ্যে ঠেলে ঠেলে উঠতে লাগল। গিয়ে দেখলুম এক রকম দাঁড়িয়ে গেছে। রাত্তিরটা ঘুমিয়ে কাটতেও পারে, যদি না সেই গৃহহীন আর্স্‌লাগুলো রাত্তিরে তার পায়ের

তেলোয় সুড়্‌সুড়ি দেয়। সাহেব বললে, 'কাল সকালেই শিকারে বেরোব।' আমি আর উচ্চবাচ্য করলুম না। সন্ধের সময় সাহেবের ভগ্ন পাইক এসে খবর দিলে ঝড়ে তাঁর তাঁবু ছিঁড়েখুঁড়ে ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেছে। তাঁর কাছারির তাঁবুও ভিজে যাচ্ছেতাই হয়ে গেছে— অতএব অন্য জন্ত শিকার স্থগিদ রেখে জমিদার বাবুর এখেনেই স্থায়ী হতে হবে।…

কলকাতা

২৮ জানুয়ারি ১৮৯০

৭

লণ্ডন

৩ অক্টোবর। ১৮৯০।

এ দেশে এসে আমাদের সেই হতভাগ্য বেচারা ভারতভূমিকে সত্যি সত্যি আমার মা বলে মনে হয়। এ দেশের মতো তার এত ক্ষমতা নেই, এত ঐশ্বর্য নেই, কিন্তু আমাদের ভালোবাসে। আমার আজন্মকালের যা কিছু ভালোবাসা, যা কিছু সুখ, সমস্তই তার কোলের উপর আছে। এখানকার আকর্ষণ চাকচিক্য আমাকে কখনোই ভোলাতে পারবে না— আমি তার কাছে যেতে পারলে বাঁচি। সমস্ত সভ্যসমাজের কাছে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত থেকে আমি যদি তারই এক কোণে বসে মৌমাছির মতো আপনার মৌচাকটি ভরে ভালোবাসা সঞ্চয় করতে পারি তা হলেই আর কিছু চাই নে।

লণ্ডন

১০ অক্টোবর ১৮৯০

মানুষ কি লোহার কল, যে, ঠিক নিয়ম-অনুসারে চলবে? মানুষের মনের এত বিচিত্র এবং বিস্তৃত কাণ্ড-কারখানা— তার এত দিকে গতি এবং এত রকমের অধিকার যে, এ দিকে - ও দিকে হেলতেই হবে। সেই তার জীবনের লক্ষণ, তার মনুষ্যত্বের চিহ্ন, তার জড়ত্বের প্রতিবাদ। এই দ্বিধা, এই দুর্বলতা যার নেই তার মন নিতান্ত সংকীর্ণ এবং কঠিন এবং জীবনবিহীন। যাকে আমরা প্রবৃত্তি বলি এবং যার প্রতি আমরা সর্বদাই কটুভাষা প্রয়োগ করি সেই আমাদের জীবনের গতিশক্তি— সেই আমাদের নানা সুখদুঃখ পাপপুণ্যের মধ্যে দিয়ে অনন্তের দিকে বিকশিত করে তুলছে। নদী যদি প্রতিপদে বলে 'কই সমুদ্র কোথায়, এ যে মরুভূমি, ঐ যে অরণ্য, ঐ যে বালির চড়া, আমাকে যে শক্তি ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে সে বুঝি আমাকে ভুলিয়ে অন্য জায়গায় নিয়ে যাচ্ছে'— তা হলে তার যে রকম ভ্রম হয়, প্রবৃত্তির উপরে একান্ত অবিশ্বাস করলে আমাদেরও কতকটা সেই রকম ভ্রম হয়। আমরাও প্রতিদিন বিচিত্র সংশয়ের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হয়ে যাচ্ছি, আমাদের শেষ আমরা দেখতে পাচ্ছি নে, কিন্তু যিনি আমাদের অনন্ত জীবনের মধ্যে প্রবৃত্তি-নামক প্রচণ্ড গতিশক্তি দিয়েছেন তিনিই জানেন তার দ্বারা আমাদের কী রকম করে চালনা করবেন। আমাদের সর্বদা এই একটা মস্ত ভুল হয় যে, আমাদের প্রবৃত্তি আমাদের যেখেনে নিয়ে এসেছে সেইখানেই বুঝি ছেড়ে দিয়ে চলে যাবে— আমরা তখন জানতে পারি নে সে আমাদের তার মধ্যে থেকে টেনে তুলবে। নদীকে যে শক্তি মরুভূমির মধ্যে নিয়ে আসে সেই শক্তিই সমুদ্রের মধ্যে নিয়ে যায়। ভ্রমের মধ্যে যে ফেলে ভ্রম থেকে সেই টেনে নিয়ে যায়। এই রকম করেই আমরা চলেছি। যার এই প্রবৃত্তি অর্থাৎ জীবনী শক্তির

অক্টোবর ১৮৯০

প্রাবল্য নেই, যার মনের রহস্যময় বিচিত্র বিকাশ নেই, সে সুখী হতে পারে, সাধু হতে পারে এবং তার সেই সংকীর্ণতাকে লোকে মনের জোর বলতে পারে, কিন্তু অনন্ত জীবনের পাথেয় তার বেশি নেই। আমি এই যে…

কলকাতা। ১৮৯০

৯

কালীগ্রাম

৫ মাঘ ১৮৯১

বেশ কুঁড়েমি করবার মতো বেলাটা। কেউ তাড়া দেবার লোক নেই, তা ছাড়া প্রজা এবং কাজের ভিড় এখনো চতুর্দিকে ছেঁকে ধরে নি। সব-সুদ্ধ খুব ঢিলে-ঢিলে একলা-একলা কী-এক রকম মনে হচ্ছে। যেন পৃথিবীতে অত্যাবশ্যক কাজ বলে একটা কিছুই নেই, এমন-কি, নাইলেও চলে না-নাইলেও চলে, এবং ঠিক-সময়-মত খাওয়াটা কলকাতার লোকের মধ্যে প্রচলিত একটা বহুদিনের কুসংস্কার বলে মনে হয়। এখানকার চতুর্দিকের ভাবগতিকও সেই রকম। একটা ছোট্ট নদী আছে বটে, কিন্তু তাতে কানাকড়ির স্রোত নেই। সে যেন আপন শৈবাল-দামের মধ্যে জড়ীভূত হয়ে অঙ্গ বিস্তার করে দিয়ে পড়ে পড়ে ভাবছে যে, যদি না চললেও চলে তবে আর চলবার দরকার কী? জলের মাঝে মাঝে যে লম্বা ঘাস এবং জলজ উদ্ভিদ জন্মেছে, জেলেরা জাল ফেলতে না এলে সেগুলো সমস্ত দিনের মধ্যে একটু নাড়া পায় না। পাঁচটা-ছটা বড়ো বড়ো নৌকো সারি সারি বাঁধা আছে, তার মধ্যে একটার ছাতের উপর একজন মাঝি আপাদমস্তক কাপড়ে মুড়ে রোদ্দুরে নিদ্রা দিচ্ছে— আর-একটার উপর একজন বসে বসে দড়ি পাকাচ্ছে এবং রোদ পোহাচ্ছে, দাঁড়ের কাছে একজন আধ-বৃদ্ধ লোক অনাবৃত গাত্রে বসে অকারণে আমাদের বোটের দিকে চেয়ে আছে। ডাঙার উপরে নানান রকমের নানান লোক অত্যন্ত মৃদুমন্দ অলস চালে কেন যে আসছে, কেন যে যাচ্ছে, কেন যে বুকের মধ্যে নিজের দুটো হাঁটুকে আলিঙ্গন করে ধরে উবু হয়ে বসে আছে, কেন যে অবাক হয়ে বিশেষ কোনো-কিছুর দিকে না তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, তার কোনো অর্থ পাওয়া যায় না। কেবল গোটাকতক পাতিহাঁসের ওরই মধ্যে একটু ব্যস্ত ভাব দেখা যাচ্ছে— তারা ভারী কলরব করছে এবং

জানুয়ারি ১৮৯১

ক্রমাগতই উৎসাহ-সহকারে জলের মধ্যে মাথা ডুবোচ্ছে এবং তৎক্ষণাৎ মাথা তুলে নিয়ে সবলে ঝাড়া দিচ্ছে। ঠিক মনে হচ্ছে যেন তারা জলের নিচেকার নিগূঢ় রহস্য আবিষ্কার করবার জন্যে প্রতিক্ষণেই গলা বাড়িয়ে দিচ্ছে এবং তার পরে সবেগে মাথা নেড়ে বলছে 'কিচ্ছুই না— কিচ্ছুই না!' এখানকার দিনগুলো এই রকম বারো ঘণ্টা পড়ে পড়ে কেবল রোদ পোহায়, এবং অবশিষ্ট বারো ঘণ্টা খুব গভীর অন্ধকার মুড়ি দিয়ে নিঃশব্দে নিদ্রা দেয়। এখেনে সমস্ত ক্ষণ বাইরের দিকে চেয়ে চেয়ে কেবল নিজের মনের ভাবগুলোকে বসে বসে দোলা দিতে ইচ্ছে করে, তার সঙ্গে সঙ্গে একটু একটু গুন্ গুন্ করে গান গাওয়া যায়, মাঝে মাঝে বা ঘুমে চোখ একটু অলস হয়ে আসে। মা যেমন করে শীতকালের সারাবেলা রোদ্দুরে পিঠ দিয়ে ছেলে কোলে করে গুন্ গুন্ স্বরে দোলা দেয়, সেই রকম।···

কলকাতা। ১৮৯১

Patisahr Katchari
via Atrai
৬ মাঘ, রবিবার

আমার বোট কাছারির কাছ থেকে অনেক দূরে এনে একটি নিরিবিলি জায়গায় বেঁধেছি। এ দেশে গোলমাল কোথাও নেই, ইচ্ছে করলে পাওয়া যায় না, কেবল হয়তো অন্যান্য বিবিধ জিনিসের সঙ্গে হাটে পাওয়া যেতে পারে। আমি এখন যেখানে এসেছি এ জায়গায় অধিকন্তু মানুষের মুখ দেখা যায় না। চারি দিকে কেবল মাঠ ধূ ধূ করছে— মাঠের শস্য কেটে নিয়ে গেছে, কেবল কাটা ধানের অবশিষ্ট হলদে বিছিলিতে সমস্ত মাঠ আচ্ছন্ন। সমস্ত দিনের পর সূর্যাস্তের সময় এই মাঠে কাল একবার বেড়াতে বেরিয়েছিলুম।··· সূর্য ক্রমেই রক্তবর্ণ হয়ে একেবারে পৃথিবীর শেষ রেখার অন্তরালে অন্তর্হিত হয়ে গেল। চারি দিক কী যে সুন্দর হয়ে উঠল সে আর কী বলব! বহু দূরে একেবারে দিগন্তের শেষ প্রান্তে একটু গাছপালার ঘের দেওয়া ছিল, সেখানটা এমন মায়াময় হয়ে উঠল— নীলেতে লালেতে মিশে এমন আবছায়া হয়ে এল— মনে হল ঐখেনে যেন সন্ধ্যার বাড়ি, ঐখেনে গিয়ে সে আপনার রাঙা আঁচলটি শিথিল ভাবে এলিয়ে দেয়, আপনার সন্ধ্যাতারাটি যত্ন করে জ্বালিয়ে তোলে, আপন নিভৃত নির্জনতার মধ্যে সিঁদুর পরে বধূর মতো কার প্রতীক্ষায় বসে থাকে, এবং বসে বসে পা দুটি মেলে তারার মালা গাঁথে এবং গুন্‌ গুন্‌ স্বরে স্বপ্ন রচনা করে। সমস্ত অপার মাঠের উপর একটি ছায়া পড়েছে — একটি কোমল বিষাদ— ঠিক অশ্রুজল নয়— একটি নির্নিমেষ চোখের বড়ো বড়ো পল্লবের নীচে গভীর ছল্‌ছলে ভাবের মতো। এমন মনে করা যেতে পারে— মা পৃথিবী লোকালয়ের মধ্যে আপন ছেলেপিলে এবং কোলাহল এবং ঘরকর্নার কাজ নিয়ে থাকে— যেখানে একটু ফাঁকা, একটু নিস্তব্ধতা, একটু খোলা আকাশ, সেইখানেই তার

বিশাল হৃদয়ের অন্তর্নিহিত ঔদাস্য এবং বিষাদ ফুটে ওঠে; সেইখানেই তার গভীর দীর্ঘনিশ্বাস শোনা যায়। ভারতবর্ষের যেমন বাধাহীন পরিষ্কার আকাশ, বহুদূরবিস্তৃত সমতলভূমি আছে, এমন য়ুরোপের কোথাও আছে কি না সন্দেহ। এইজন্যে আমাদের জাতি যেন বৃহৎ পৃথিবীর সেই অসীম ঔদাস্য আবিষ্কার করতে পেরেছে। এইজন্যে আমাদের পুরবীতে কিম্বা টোড়িতে সমস্ত বিশাল জগতের অন্তরের হাহাধ্বনি যেন ব্যক্ত করছে, কারও ঘরের কথা নয়। পৃথিবীর একটা অংশ আছে যেটা কর্মপটু, স্নেহ-শীল, সীমাবদ্ধ, তার ভাবটা আমাদের মনে তেমন প্রভাব বিস্তার করবার অবসর পায় নি। পৃথিবীর যে ভাবটা নির্জন, বিরল, অসীম, সেই আমাদের উদাসীন করে দিয়েছে। তাই সেতারে যখন ভৈরবীর মিড় টানে আমাদের ভারতবর্ষীয় হৃদয়ে একটা টান পড়ে। কাল সন্ধের সময় নির্জন মাঠের মধ্যে পুরবী বাজছিল, পাঁচ ছ ক্রোশের মধ্যে কেবল আমি একটি প্রাণী বেড়াচ্ছিলুম, এবং আর একটি প্রাণী বোটের কাছে পাগড়ি বেঁধে লাঠি হাতে অত্যন্ত সংযত ভাবে দাঁড়িয়ে ছিল। আমার বাঁ পাশে ছোট্ট নদীটি দুই ধারের উঁচু পাড়ের মধ্যে এঁকে বেঁকে খুব অল্প দূরেই দৃষ্টিপথের বার হয়ে গেছে, জলে ঢেউয়ের রেখামাত্র ছিল না, কেবল সন্ধ্যার আভা অত্যন্ত মুমূর্ষু হাসির মতো খানিক ক্ষণের জন্যে লেগে ছিল। যেমন প্রকাণ্ড মাঠ তেমনি প্রকাণ্ড নিস্তব্ধতা। কেবল এক রকম পাখি আছে, তারা মাটিতে বাসা করে থাকে— সেই পাখি যত অন্ধকার হয়ে আসতে লাগল তত আমাকে তার নিরালা বাসার কাছে ক্রমিক আনাগোনা করতে দেখে ব্যাকুল সন্দেহের স্বরে টী টী করে ডাকতে লাগল। ক্রমে এখনকার কৃষ্ণপক্ষের চাঁদের আলো ঈষৎ ফুটে উঠল— বরাবর নদীর ধারে ধারে মাঠের প্রান্ত দিয়ে একটা সংকীর্ণ পথচিহ্ন চলে গেছে, সেইখানে নতশিরে চলতে চলতে ভাবছিলুম।

কলকাতা। ১৮৯১

Patisahr Katchari
via Atrai
৭ মাঘ, সোমবার

ছোটো নদীটি ঈষৎ বেঁকে এইখানে একটুখানি কোণের মতো, একটু কোলের মতো তৈরি করেছে— দুই ধারের উঁচু পাড়ের মধ্যে সেই কোলের কোণটুকুতে বেশ প্রচ্ছন্ন হয়ে থাকি, একটু দূর থেকে আমাদের আর দেখা যায় না – নৌকাওয়ালারা উত্তর দিক থেকে গুণ টেনে টেনে আসে, হঠাৎ একটা বাঁক ফিরেই এই জনহীন মাঠের ধারে অকারণে একটা মস্ত বোট বাঁধা দেখেআশ্চর্য হয়ে যায়।— 'হাঁ গা, কাদের বজরা গা?' 'জমিদার বাবুর।' 'এখানে কেন? কাছারির সামনে কেন বাঁধ নি?' 'হাওয়া খেতে এসেছেন।'— এসেছি হাওয়ার চেয়ে আরও ঢের বেশি কঠিন জিনিসের জন্যে। যা হোক, এ রকম প্রশ্নোত্তর প্রায় মাঝে মাঝে শুনতে পাওয়া যায়। এইমাত্র খাওয়া শেষ করে বসেছি— এখন বেলা দেড়টা। বোট খুলে দিয়েছে, আস্তে আস্তে কাছারির দিকে চলেছে। বেশ একটু বাতাস দিচ্ছে। তেমন ঠাণ্ডা নয়— দুপুরবেলার তাতে অল্প গরম হয়ে উঠেছে। মাঝে মাঝে ঘন শৈবালের মধ্যে দিয়ে যেতে খস্ খস্ শব্দ হচ্ছে। সেই শৈবালের উপরে অনেকগুলো ছোটো ছোটো কচ্ছপ আকাশের দিকে সমস্ত গলা বাড়িয়ে দিয়ে রোদ পোহাচ্ছে। অনেক দূরে দূরে একটা-একটা ছোটো-ছোটো গ্রাম আসছে। গুটিকতক খোড়ো ঘর, কতকগুলি চাল-শূন্য মাটির দেয়াল, দুটো-একটা খড়ের স্তূপ, কুলগাছ আমগাছ বটগাছ এবং বাঁশের ঝাড়, গোটা-তিনেক ছাগল চরছে, গোটা-কতক উলঙ্গ ছেলে মেয়ে—নদী পর্যন্ত একটি গড়ানে কাঁচা ঘাট, সেখানে কেউ কাপড় কাচছে, কেউ নাইছে, কেউ বাসন মাজছে; কোনো কোনো লজ্জাশীলা বধূ দুই আঙুলে ঘোমটা ঈষৎ ফাঁক করে

ধরে কলসী কাঁখে জমিদার বাবুকে সকৌতুকে নিরীক্ষণ করছে, তার হাঁটুর কাছে আঁচল ধরে একটি সদ্যস্নাত তৈলচিক্কণ বিবস্ত্র শিশুও একদৃষ্টে বর্তমান পত্রলেখক সম্বন্ধে কৌতূহল নিবৃত্তি করছে— তীরে কতকগুলো নৌকো বাঁধা এবং একটা পরিত্যক্ত প্রাচীন জেলেডিঙি অর্ধনিমগ্ন অবস্থায় পুনরুদ্ধারের প্রতীক্ষা করছে। তার পরে আবার অনেকটা দূর শস্যশূন্য মাঠ— মাঝে মাঝে কেবল দুই-একজন রাখাল-শিশুকে দেখতে পাওয়া যায়, এবং দুটো-একটা গোরু নদীর ঢালু তটের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত এসে সরস তৃণ অন্বেষণ করছে দেখা যায়। এখানকার দুপুরবেলার মতো এমন নির্জনতা নিস্তব্ধতা আর কোথাও নেই।

কলকাতা
১৮৯১

১২

কালীগ্রাম

। জানুয়ারি ১৮৯১ ।

আমি যখন তোকে চিঠি লিখতে শুরু করেছি তখন এখানকার একজন আমলা তার দারিদ্র্যদুঃখ বেতনবৃদ্ধি এবং দারপরিগ্রহের আবশ্যকতা নিয়ে ভারী বক্ বক্ করছিল— সে বকে যাচ্ছিল আর আমি লিখে যাচ্ছিলুম, শেষে এক জায়গায় থেমে তাকে সংক্ষেপে এইটুকু বুঝিয়ে দিলুম যে, বুদ্ধিমান লোক যখন কোনো-একটা প্রার্থনা পূরণ করে তখন সেটা সংগত ব'লেই করে, একবারের জায়গায় পাঁচবার বলা হল ব'লে করে না। ভাবলুম এমন একটা সুন্দর জ্ঞানগর্ভ কথার পর সে লোকটা একেবারে নিরুত্তর হয়ে থাকবে, কিন্তু দেখলুম ফলে তার বিপরীত হয়ে দাঁড়ালো। উল্টে সে আমাকে প্রশ্ন করলে, বাপমায়ের কাছে ছেলে যদি সকল কথা না বলবে তবে কার কাছে গিয়ে বলবে? আমি উপস্থিতমত তার কোনো সদুত্তর দিতে পারলুম না। পুনশ্চ সেও বকে যেতে লাগল, আমিও লিখে যেতে লাগলুম। কোথাও কিছু নেই, খামকা বাপ-মা হয়ে বসার বিষম ল্যাঠা।— কাল যখন কাছারি করছি, গুটি পাঁচ ছেলে হঠাৎ অত্যন্ত সংযতভাবে আমার সামনে এসে দাঁড়ালে— কোনো প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে না করতে একেবারে বিশুদ্ধ বঙ্গভাষায় আরম্ভ করে দিলে, 'পিতঃ, অভাগ্য সন্তানগণের সৌভাগ্যবশতঃ জগদীশ্বরের কৃপায় হুজুরের পুনর্বার এতদ্দেশে শুভাগমন হইয়াছে।' এমনি করে আধ-ঘণ্টা-কাল বক্তৃতা করে গেল; মাঝে মাঝে মুখস্থ বক্তৃতা ভুলে যাচ্ছিল, আবার আকাশের দিকে চেয়ে সংশোধন করে নিচ্ছিল। বিষয়টা হচ্ছে তাদের স্কুলে টুল এবং বেঞ্চির অপ্রতুল হয়েছে— সেই কাষ্ঠাসন-অভাবে 'আমরাই বা কোথায় উপবেশন করি, আমাদের পূজনীয় শিক্ষক মহাশয়ই বা কোথায় উপবেশন করেন, এবং পরিদর্শক মহাশয় উপস্থিত হইলে তাঁহাকেই বা কোথায় আসন দান করা যায়!' ছোট্ট ছেলের মুখে

হঠাৎ এই অনর্গল বক্তৃতা শুনে আমার এমনি হাসি পাচ্ছিল! বিশেষতঃ এই জমিদারি কাছারিতে,,যেখানে অশিক্ষিত চাষারা নিতান্ত গ্রাম্যভাষায় আপনাদের যথার্থ দারিদ্র্যদুঃখ জানায়— যেখানে অতিবৃষ্টি দুর্ভিক্ষে গোরু বাছুর হাল লাঙল বিক্রি করেও উদরান্নের অনটনের কথা শোনা যাচ্ছে, যেখানে 'অহরহ' শব্দের পরিবর্তে 'রহরহ', 'অতিক্রমের' স্থলে 'অতিক্রয়' ব্যবহার, সেখানে টুল বেঞ্চির অভাবে সংস্কৃত বক্তৃতা কানে এমনি অদ্ভুত শোনায়। অন্যান্য আমলা এবং প্রজারা এই ছোকরার ভাষার প্রতি এতাদৃশ দখল দেখে অবাক হয়ে গিয়েছিল— তারা মনে মনে আক্ষেপ করছিল, 'বাপ-মা'রা আমাদের যত্ন করে লেখাপড়া শেখায় নি, নইলে আমরাও জমিদারের সামনে দাঁড়িয়ে এই রকম শুদ্ধ ভাষায় নিবেদন করতে পারতুম।' আমি শুনতে পেলুম একজন আর-একজনকে ঠেলে ঈষৎ বিদ্বেষের ভাবে বলছে, 'একে কে শিখিয়ে দিয়েছে।' আমি তার বক্তৃতা শেষ না হতেই তাকে থামিয়ে বললুম, 'আচ্ছা, তোমাদের টুল-বেঞ্চির বন্দোবস্ত করে দেব।' তাতেও সে ছোকরাটি দমল না। সে যেখানে বক্তৃতা ভঙ্গ করেছিল সেইখান থেকে আবার আরম্ভ করলে— যদিও আর আবশ্যক ছিল না, কিন্তু শেষ কথাটি পর্যন্ত চুকিয়ে প্রণাম করে বাড়ি ফিরে গেল। বেচারা অনেক কষ্টে মুখস্থ করে এসেছিল; আমি তার টুল বেঞ্চি না দিলে সে ক্ষুণ্ণ হত না, কিন্তু তার বক্তৃতা কেড়ে নিলে বোধ হয় অসহ্য হত। সেই জন্যে যদিও আমার অনেক গুরুতর কাজ ছিল, তবু খুব গম্ভীর ভাবে আদ্যোপান্ত শুনে গেলুম। সমজদার লোক যদি আর একটি কেউ উপস্থিত থাকত তা হলে বোধ হয় আমি ছুটে অন্য ঘরে গিয়ে হেসে আসতুম, কিন্তু জমিদারিটা আসলেই হাস্যরসপ্রিয়তা প্রকাশের জায়গাই নয়— এখানে কেবল গাম্ভীর্য এবং বিজ্ঞতা।

কলকাতা। ২২ জানুয়ারি ১৮৯১

১৩

কালীগ্রাম

। জানুয়ারি ১৮৯১ ।

…ঐ-যে মস্ত পৃথিবীটা চুপ করে পড়ে রয়েছে ওটাকে এমন ভালোবাসি — ওর এই গাছপালা নদী মাঠ কোলাহল নিস্তব্ধতা প্রভাত সন্ধ্যা সমস্তটা -সুদ্ধ দু হাতে আঁকড়ে ধরতে ইচ্ছে করে। মনে হয় পৃথিবীর কাছ থেকে আমরা যে-সব পৃথিবীর ধন পেয়েছি এমন কি কোনো স্বর্গ থেকে পেতুম ? স্বর্গ আর কী দিত জানি নে, কিন্তু এমন কোমলতা দুর্বলতা -ময়, এমন সকরুণ আশঙ্কা -ভরা, অপরিণত এই মানুষগুলির মতো এমন আদরের ধন কোথা থেকে দিত ! আমাদের এই মাটির মা, আমাদের এই আপনাদের পৃথিবী, এর সোনার শস্যক্ষেত্রে এর স্নেহ-শালিনী নদীগুলির ধারে, এর সুখদুঃখময় ভালোবাসার লোকালয়ের মধ্যে এই সমস্ত দরিদ্র মর্ত হৃদয়ের অশ্রুর ধনগুলিকে কোলে করে এনে দিয়েছে। আমরা হতভাগ্যরা তাদের রাখতে পারি নে, বাঁচাতে পারি নে, নানা অদৃশ্য প্রবল শক্তি এসে বুকের কাছ থেকে তাদের ছিঁড়ে ছিঁড়ে নিয়ে যায়, কিন্তু বেচারা পৃথিবীর যতদূর সাধ্য তা সে করেছে। আমি এই পৃথিবীকে ভারী ভালোবাসি। এর মুখে ভারী একটি সুদূরব্যাপী বিষাদ লেগে আছে— যেন এর মনে মনে আছে, আমি দেবতার মেয়ে, কিন্তু দেবতার ক্ষমতা আমার নেই। আমি ভালোবাসি, কিন্তু রক্ষা করতে পারি নে। আরম্ভ করি, সম্পূর্ণ করতে পারি নে। জন্ম দিই, মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচাতে পারি নে। এই জন্যে স্বর্গের উপর আড়ি করে আমি আমার দরিদ্র মায়ের ঘর আরো বেশি ভালোবাসি— এত অসহায়, অসমর্থ, অসম্পূর্ণ, ভালোবাসার সহস্র আশঙ্কায় সর্বদা চিন্তা-কাতর ব'লেই।…

কলকাতা

২৪ জানুয়ারি ১৮৯১

১৪

সাজাদপুরের অনতিদূরে

১২ মাঘ। শনিবার

এখনো পথে আছি। ভোর থেকে আরম্ভ করে সন্ধে সাত-আটটা পর্যন্ত ক্রমাগতই ভেসে চলেছি। কেবলমাত্র গতির কেমন একটা আকর্ষণ আছে— দু ধারের তটভূমি অবিশ্রাম চোখের উপর দিয়ে সরে সরে যাচ্ছে, সমস্ত দিন তাই চেয়ে আছি, কিছুতে তার থেকে চোখ ফেরাতে পারছি নে— পড়তে মন যায় না, লিখতে মন যায় না, কোনো-কিছু কাজ নেই, কেবল চুপ করে চেয়ে বসে আছি। কেবল যে দৃশ্যের বৈচিত্র্যের জন্যে তা নয়— হয়তো দু ধারে কিছুই নেই, কেবল তরুহীন তটের রেখামাত্র চলে গেছে— কিন্তু ক্রমাগতই চলছে এই হচ্ছে তার প্রধান আকর্ষণ। আমার নিজের কোনো চেষ্টা নেই, পরিশ্রম নেই, অথচ বাইরের একটা অশ্রান্ত গতি মনটাকে বেশ মৃদু প্রশান্ত ভাবে ব্যাপৃত করে রাখে। মনের পরিশ্রমও নেই, বিশ্রামও নেই, এই রকমের একটা ভাব। চৌকিতে বসে বসে অলস অন্যমনস্ক ভাবে পা-দোলানো যে রকম এও সেই রকম; শরীরটা মোটের উপর বিশ্রাম করছে, অথচ শরীরের যে অতিরিক্ত উদ্যমটুকু কোনো কালে স্থির থাকতে চায় না তাকেও একটা একঘেয়ে রকম কাজ দিয়ে ভুলিয়ে রাখা হয়েছে।… আমাদের কালীগ্রামের সেই মুমূর্ষুর নাড়ীর মতো অতিক্ষীণস্রোত নদী কাল কোন্ কালে ছাড়িয়ে এসেছি। আমি মনে করতুম সে নদীর একেবারে স্রোত নেই, কিন্তু সেখানকার বিশ্বস্তসূত্রে শুনেছি, অত্যন্ত মৃদু একটুখানি স্রোত আছে— আজন্মকাল যারা তীরে বাস করে আসছে কেবল তারাই জানতে পারে। সেই নদী থেকে ক্রমে একটা স্রোতস্বিনী নদীতে এসে পড়া গেল। সেটা বেয়ে ক্রমে এমন এক জায়গায় এসে পড়লুম যেখানে ডাঙায় জলে একাকার হয়ে গেছে। নদী এবং তীর উভয়ের আকার প্রকারের ভেদ ক্রমশই ঘুচে গেছে, দুটি

অল্প বয়সের ভাই বোনের মতো। তীর এবং জল মাথায় মাথায় সমান — একটুও পাড় নেই। ক্রমে নদীর সেই ছিপ্‌ছিপে আকারটুকু আর থাকে না— নানা দিকে নানা রকমে ভাগ হয়ে ক্রমে চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ল। এই খানিকটা সবুজ ঘাস এই খানিকটা স্বচ্ছ জল, চতুর্দিকে যত দূর চেয়ে দেখি খানিকটা জল খানিকটা ডাঙা। দেখে পৃথিবীর শিশুকাল মনে পড়ে— অসীম জলরাশির মধ্যে যখন স্থল সবে একটু-খানি মাথা তুলেছে— জলস্থলের অধিকার নির্দিষ্ট হয়ে যায় নি। চার দিকে জেলেদের বাঁশ পোঁতা— জেলেদের জাল থেকে মাছ ছোঁ মেরে .নবার জন্যে চিল উড়ছে, পাঁকের উপরে নিরীহ বক দাঁড়িয়ে আছে— নানা রকমের জলচর পাখি— জলে শেওলা ভাসছে এবং তার এক রকম গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে— মাঝে মাঝে পাঁকের ক্ষেতের মধ্যে অযত্নসম্ভূত ধানের গাছ, স্থির জলের উপর ঝাঁকে ঝাঁকে মশা উড়ছে।··· ভোরের বেলা বোট ছেড়ে দিয়ে কাঁচিকাঠায় গিয়ে পড়া গেল। কাঁচিকাঠা ব্যাপারটা হচ্ছে একটি বারো-তেরো হাত সংকীর্ণ খালের মতো, ক্রমাগত এঁকে বেঁকে গেছে— সমস্ত বিলের জল তারই ভিতর দিয়ে প্রবল বেগে নিষ্ক্রান্ত হচ্ছে— এর মধ্যে আমাদের এই প্রকাণ্ড বোট নিয়ে বিষম বিপদ— জলের স্রোত বিদ্যুতের মতো বোটটাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে, দাঁড়িরা লগি হাতে করে সামলাবার চেষ্টা করছে, পাছে ডাঙার উপর বোটটাকে আছড়ে ভেঙে ফেলে। এ দিকে হুহু করে বাদলার বাতাস দিচ্ছে— ঘন মেঘ করে রয়েছে, মাঝে মাঝে বৃষ্টি হচ্ছে, শীতে সবাই কাঁপছে— এক-একবার প্রাণপণ চেষ্টা সত্ত্বেও বোটটা ডেঙায় ঠেকে মড়্‌মড়্‌ শব্দে একেবারে কাত হবার উপক্রম করছে— এমনিতর 'গেল গেল' শব্দ করতে করতে খোলা নদীতে এসে পড়লুম। শীতকালে মেঘাচ্ছন্ন ভিজে দিন ভারী বিশ্রী লাগে। সকালবেলাটা তাই নিতান্ত নির্জীবের মতো ছিলুম। বেলা দুটোর সময় রোদ উঠল। তার পর

থেকে চমৎকার। খুব উঁচু পাড়— বরাবর দুই ধারে গাছপালা লোকালয়— এমন শান্তিময়, এমন সুন্দর, এমন নিভৃত— দুই ধারে স্নেহ সৌন্দর্য বিতরণ করে নদীটি বেঁকে বেঁকে চলে গেছে— আমাদের বাংলাদেশের একটি অপরিচিত অন্তঃপুরচারিণী নদী। কেবল স্নেহ এবং কোমলতা এবং মাধুর্যে পরিপূর্ণ। চাঞ্চল্য নেই, অথচ অবসরও নেই। গ্রামের যে মেয়েরা ঘাটে জল নিতে আসে, এবং জলের ধারে ব'সে ব'সে অতি যত্নে গামছা দিয়ে আপনার শরীরখানি মেজে তুলতে চায়— তাদের সঙ্গে এর যেন প্রতিদিন মনের কথা এবং ঘরকন্নার গল্প চলে।···

আজ সন্ধেবেলায় নদীর বাঁকের মুখে ভারী একটি নিরালা জায়গায় বোট লাগিয়েছে। পূর্ণিমার চাঁদ উঠেছে, জলে একটিও নৌকো নেই— জ্যোৎস্না জলের উপর ঝিক্ ঝিক্ করছে— পরিষ্কার রাত্রি— নির্জন তীর— বহুদূরে ঘনবৃক্ষবেষ্টিত গ্রামটি সুষুপ্ত— কেবল ঝিঁঝিঁ ডাকছে— আর কোনো শব্দ নেই।

কলকাতা
১৮৯১

১৫

সাজাদপুর

রবিবার, ২০ মাঘ। ১২৯৭।

সকালে উঠে অনেক ক্ষণ ধ'রে ব'সে ব'সে বিস্তর গড়িমসি করতে করতে সেই ডায়ারিটা লিখছিলুম— ঘণ্টা দুয়েক হল দেড়পাতা-খানেক লিখেছিলুম— এমৎকালে বেলা দশটার সময় হঠাৎ রাজকার্য উপস্থিত হল— প্রধানমন্ত্রী এসে মৃদুস্বরে বললেন, একবার রাজসভায় আসতে হচ্ছে। কী করা যায়— লক্ষ্মীর তলব শুনে সরস্বতীকে ছেড়ে তাড়াতাড়ি উঠতে হল। সেখানে ঘণ্টাখানেক দুরূহ রাজকার্য সম্পন্ন করে এইমাত্র আসছি। আমার মনে মনে হাসি পায়— আমার নিজের অপার গাম্ভীর্য এবং অতলস্পর্শ বুদ্ধিমানের চেহারা কল্পনা করে সমস্তটা একটা প্রহসন বলে মনে হয়। প্রজারা যখন সসম্ভ্রম কাতরভাবে দরবার করে, এবং আমলারা বিনীত করযোড়ে দাঁড়িয়ে থাকে, তখন আমার মনে হয় এদের চেয়ে এমনি আমি কী মস্ত লোক যে আমি একটু ইঙ্গিত করলেই এদের জীবনরক্ষা এবং আমি একটু বিমুখ হলেই এদের সর্বনাশ হয়ে যেতে পারে। আমি যে এই চৌকিটার উপরে বসে বসে ভাণ করছি যেন এই-সমস্ত মানুষের থেকে আমি একটা স্বতন্ত্র সৃষ্টি, আমি এদের হর্তাকর্তাবিধাতা, এর চেয়ে অদ্ভুত আর কী হতে পারে! অন্তরের মধ্যে আমিও যে এদেরই মতো দরিদ্র সুখদুঃখকাতর মানুষ, পৃথিবীতে আমারও কত ছোটো ছোটো বিষয়ে দরবার, কত সামান্য কারণে মর্মান্তিক কান্না, কত লোকের প্রসন্নতার উপরে জীবনের নির্ভর! এই-সমস্ত ছেলেপিলে-গোরুলাঙল-ঘরকন্না-ওয়ালা সরলহৃদয় চাষাভুষোরা আমাকে কী ভুলই জানে! আমাকে এদের সমজাতি মানুষ বলেই জানে না। সেই ভুলটি রক্ষে করবার জন্যে কত সরঞ্জাম রাখতে এবং কত আড়ম্বর করতে হয়। বোট থেকে কাছারি পর্যন্ত আমি হেঁটে আসবার প্রস্তাব করেছিলুম, নায়েব বিজ্ঞভাবে বললেন— কাজ নেই! কী জানি যদি ঐ ভুলে আঘাত

লাগে ! prestige মানে হচ্ছে মানুষ সম্বন্ধে মানুষের ভুল বিশ্বাস ! আমাকে এখানকার প্রজারা যদি ঠিক জানত, তা হলে আপনাদের একজন বলে চিনতে পারত, সেই ভয়ে সর্বদা মুখোষ পরে থাকতে হয়। সাধারণ ইতর মানুষের মতো পদযুগল চালনা করে এই ইতর পৃথিবীর উপর দিয়ে চলি নে, বন্দুক ঘাড়ে বরকন্দাজ হুহুঙ্কারে সম্মুখ থেকে সকলকে হাঁকিয়ে দিয়ে চলেছে— যেন আমার চেয়ে অগ্রবর্তী হওয়া লোকের পক্ষে একটা বেআদবি। কিন্তু ছদ্মবেশ করলেও মন থেকে বিশ্বাস দূর হয় না যে, আমাকে আমারই মতো দেখাচ্ছে— এবং আমি যেমন অভিনয় করছি ওরা তেমনি অভিনয়মাত্র করছে। ওরা বলছে, 'আঃ কাজ কী গোলমালে ! নাহয় রাজাই সাজালে !' কেবল আমিই আমার আপনাকে বলছি, 'আছে তোমার বিদ্যেসাধ্যি জানা !'—

কলকাতা
৩ ফেব্রুয়ারি ১৮৯১

১৬

সাজাদপুর

। ফেব্রুয়ারি ১৮৯১ ।

আমার সামনে নানা রকম গ্রাম্য দৃশ্য দেখতে পাই, সেগুলো আমার দেখতে বেশ লাগে। ঠিক আমার জানলার সমুখে, খালের ও পারে, একদল বেদে বাখারির উপর খানকতক দর্মা এবং কাপড় টাঙিয়ে দিয়ে তারই মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করেছে। গুটিতিনেক খুব ছোট্ট ছোট্ট ছাউনি মাত্র— তার মধ্যে মানুষের দাঁড়াবার জো নেই। ঘরের বাইরেই তাদের সমস্ত গৃহকর্ম চলে— কেবল রাত্তিরে সকলে মিলে কোনোপ্রকারে জড়-পুঁটুলি হয়ে সেই ঘরের মধ্যে ঘুমোতে যায়। বেদে জাতটাই এই রকম। কতকটা gipsyদের মতো। কোথাও বাড়ি ঘর নেই, কোনো জমিদারকে খাজনা দেয় না। একদল শুয়োর, গোটা দুয়েক কুকুর এবং কতকগুলো ছেলেমেয়ে নিয়ে যেখানে-সেখানে ঘুরে বেড়ায়। পুলিস সর্বদা এদের উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখে। আমাদের এখানে যারা আছে, আমি জানলায় দাঁড়িয়ে প্রায় তাদের কাজকর্ম দেখি। এদের দেখতে মন্দ নয়, হিন্দুস্থানি ধরণের। কালো বটে, কিন্তু বেশ শ্রী আছে; বেশ জোরালো সুডোল শরীর। মেয়েদেরও বেশ দেখতে। বেশ ছিপ্‌ছিপে লম্বা— আঁটসাঁট, অনেকটা ইংরেজ মেয়েদের মতো শরীরের স্বাধীন ভঙ্গী। অর্থাৎ, বেশ অসংকোচ চাল-চলন, নড়াচড়ার মধ্যে সহজ সরল দ্রুত তাল আছে— আমার তো ঠিক মনে হয় কালো ইংরেজের মেয়ে। পুরুষটা রান্না চড়িয়ে দিয়ে বসে বসে বাঁশ চিরে চিরে ধামা চাঙারি কুলো প্রভৃতি তৈরি করছে— মেয়েটা কোলের উপর একটি ছোট্ট আয়না নিয়ে অত্যন্ত সাবধানে যত্নে সিঁথেটি কেটে চুল আঁচড়াচ্ছে। কেশবিন্যাস সমাধা হলে পরে একটি গামছা ভিজিয়ে মুখটি বিশেষ যত্নের সঙ্গে দু-তিনবার করে মোছা হল, তার পরে আঁচল-টাঁচলগুলো একটু ইতস্তত টেনেটুনে সেরেসুরে নিয়ে বেশ ফিট্‌ফাট হয়ে পুরুষটার কাছে গিয়ে উবু হয়ে

বসল; তার পরে একটু-আধটু কাজে হাত দিতে লাগল। দেখে আমার বেশ মজা মনে হয়। এই এরা, যারা নিতান্তই মাটির সন্তান, যারা নিতান্তই পৃথিবীর গায়ের সঙ্গে লেগে আছে, এদের মধ্যেও সৌন্দর্যের আকর্ষণ এবং পরস্পরের মনোরঞ্জনের চেষ্টা আছে। যেখানে-সেখানে জন্মাচ্ছে, পথে পথেই বেড়ে উঠছে, এবং যেখানে-সেখানে মরছে— এদের ঠিক অবস্থাটা, ঠিক মনের ভাবটা ভারী জানতে ইচ্ছে করে। দিনরাত খোলা আকাশে, খোলা বাতাসে, অনাবৃত মৃত্তিকার উপরে এ এক-রকম নতুন রকমের জীবন; অথচ এরই মধ্যে কাজকর্ম ভালোবাসা ছেলেপিলে ঘরকর্না সমস্তই আছে। কেউ যে এক দণ্ড কুঁড়ে হয়ে বসে আছে তা দেখলুম না— একটা-না-একটা কাজে আছেই। যখন হাতের কাজ ফুরলো তখন খপ্ করে একজন মেয়ে আর একজন মেয়ের পিঠের কাছে বসে তার ঝুঁটি খুলে দিয়ে মনোযোগের সঙ্গে উকুন বাছতে আরম্ভ করে দিলে এবং বোধ করি সেই সঙ্গে ঐ ছোটো তিনটে দর্মা-ছাউনির ঘরকন্না সম্বন্ধে বক্ বক্ করে গল্প জুড়ে দিলে, সেটা আমি এত দূর থেকে ঠিক নিশ্চিত বলতে পারি নে, তবে অনেকটা অনুমান করা যেতে পারে। আজ সকালবেলায় এই নিশ্চিন্ত বেদের পরিবারের মধ্যে একটা বিষম অশান্তি এসে জুটেছিল। তখন বেলা সাড়ে-আটটা নটা হবে — রাত্রে শোবার কাঁথা এবং ছেঁড়া নেকড়া-গুলো বের করে এনে দর্মার চালের উপর রোদ্দুরে মেলে দিয়েছে। শুয়োরগুলো বাচ্ছাকাচ্ছা-সমেত সকলে গায়ে গায়ে লাগাও হয়ে একটা গর্ত'র মতো করে তার মধ্যে মস্ত এক তাল কাদার মতো পড়ে ছিল— সমস্ত রাত শীতের পর সকাল বেলাকার রোদ্দুরে বেশ একটু আরাম বোধ করছিল— তাদেরই এক পরিবারভুক্ত কুকুর দুটো এসে ঘাড়ের উপর পড়ে ঘেউ ঘেউ করে তাদের উঠিয়ে দিলে। বিরক্তির স্বর প্রকাশ করে তারা প্রাতঃকালের ছোটা-হাজরি-অন্বেষণে চতুর্দিকে চলে গেল।

আমি আমার ডায়ারি লিখছি এবং মাঝে মাঝে সম্মুখের পথের দিকে অন্যমনস্ক হয়ে চেয়ে দেখছি— এমন সময় বিষম একটা হাঁক-ডাক শোনা গেল। আমি উঠে জানলার কাছে গিয়ে দেখলুম— বেদে-আশ্রমের সম্মুখে লোক জড়ো হয়েছে এবং ওরই মধ্যে একটু ভদ্রগোছের একজন লাঠি আস্ফালন করে বিষম গালমন্দ দিচ্ছে— কর্তা বেদে দাঁড়িয়ে নিতান্ত ভীত কম্পিত ভাবে কৈফিয়ত দেবার চেষ্টা করছে। বুঝতে পারলুম কী-একটা সন্দেহের কারণ হয়েছে, তাই পুলিসের দারোগা এসে উপদ্রব বাধিয়ে দিয়েছে। মেয়েটা বসে বসে আপন-মনে বাঁখারি ছুলে যাচ্ছে, যেন সে একলা বসে আছে— এবং কোথাও কিছু গোলমাল নেই। হঠাৎ সে উঠে দাঁড়িয়ে পরমনির্ভীক চিত্তে দারোগার মুখের সামনে বারবার বাহু আন্দোলন করে উচ্চৈঃস্বরে বক্তৃতা দিতে আরম্ভ করলে। দেখতে দেখতে দারোগার তেজ প্রায় বারো আনা পরিমাণ কমে গেল— অত্যন্ত মৃদুভাবে দুটো একটা কথা বলবার চেষ্টা করলে, কিন্তু একটুও অবসর পেলে না। যে ভাবে এসেছিল সে ভাব অনেকটা পরিবর্তন করে ধীরে ধীরে চলে যেতে হল— অনেকটা দূরে গিয়ে চেঁচিয়ে বললে, 'আমি এই বলে গেলাম, তোমাদের এখান হৎকে যাবার লাগবে।' আমি ভাবলুম আমার বেদে-প্রতিবেশীরা এখনি বুঝি খুঁটি দর্মা তুলে পুঁটুলি বেঁধে ছানাপোনা নিয়ে শুয়োর তাড়িয়ে এখান থেকে প্রস্থান করবে। কিন্তু তার কোনো লক্ষণ নেই— এখনো তারা নিশ্চিন্ত ভাবে বসে বসে বাঁখারি চিরছে, রাঁধছে-বাড়ছে, উকুন বাচছে।

আমার দরবারেও দেখেছি যখন কোনো মেয়ের নালিশ থাকে, সে ঘোমটায় আচ্ছন্ন হয়ে আসে বটে, কিন্তু তারই ভিতর থেকে কাঁশির মতো যে গলাটি বের করে তার মধ্যে ভয় সংকোচ কিম্বা কাকুতি-মিনতির ভাব লেশমাত্র নেই। একেবারে পুরো আবদার এবং পরিষ্কার তর্ক। পষ্ট করে বলে, 'নায়েবমশায় আমার সুবিচার করে না!' তাকে

১৭

সাজাদপুর

এখানকার পোস্ট্‌মাস্টার এক-একদিন সন্ধের সময় এসে আমার সঙ্গে এই রকম ডাকের চিঠি -যাতায়াত সম্বন্ধে নানা গল্প জুড়ে দেয়। আমাদের এই কুঠিবাড়ির এক তলাতেই পোস্ট্‌ আপিস— বেশ সুবিধে, চিঠি আসবামাত্রই পাওয়া যায়। পোস্ট্‌মাস্টারের গল্প শুনতে আমার বেশ লাগে। বিস্তর অসম্ভব কথা বেশ গম্ভীর ভাবে বলে যায়। কাল বলছিল, এ দেশের লোকের গঙ্গার উপর এমনি ভক্তি যে, এদের কোনো আত্মীয় মরে গেলে তার হাড় গুঁড়ো করে রেখে দেয়, কোনো কালে গঙ্গার জল খেয়েছে এমন লোকের যদি সাক্ষাৎ পায় তা হলে তাকে পানের সঙ্গে সেই হাড় গুঁড়ো খাইয়ে দেয় আর মনে করে তার আত্মীয়ের একটা অংশের গঙ্গা লাভ হল। আমি হাসতে হাসতে বললুম, 'এটা বোধ হয় গল্প?' সে খুব গম্ভীর ভাবে চিন্তা করে স্বীকার করলে, 'হুজুর, তা হতে পারে।'

কলকাতা

১০ ফেব্রুয়ারি ১৮৯১

১৮

শিলাইদহ

। ফেব্রুয়ারি ১৮৯১ ।

মৌলবী এবং আমলাগুলো গিয়ে, কাছারির পরপারের নির্জন চরে বোট লাগিয়ে বেশ আরাম বোধ হচ্ছে। দিনটা এবং চারিদিকটা এমনি সুন্দর ঠেকছে তোকে সে আর কী বলব। অনেক দিন পরে আবার এই বড়ো পৃথিবীটার সঙ্গে যেন দেখা-সাক্ষাৎ হল। সেও বললে, 'এই-যে!' আমিও বললুম, 'এই-যে!' তার পরে দুজনে পাশাপাশি বসে আছি— আর কোনো কথাবার্তা নেই, জল ছল্ ছল্ করছে এবং তার উপরে রোদ্দুর চিক্‌চিক্ করছে, বালির চর ধূ ধূ করছে, তার উপরে ছোটো ছোটো বনঝাউ উঠেছে। জলের শব্দ, দুপুর বেলাকার নিস্তব্ধতার ঝাঁ-ঝাঁ, এবং ঝাউঝোপ থেকে দুটো-একটা পাখির চিক্ চিক্ শব্দ, সবসুদ্ধ মিলে খুব একটা স্বপ্নময় ভাব।··· খুব লিখে যেতে ইচ্ছে করছে— কিন্তু আর কিছু নয়, এই জলের শব্দ, এই রোদ্দুরের দিন, এই বালির চর। মনে হচ্ছে তোকে রোজই ঘুরে ফিরে এই কথাই লিখতে হবে— কেননা, আমার যখন নেশার মতন হয় তখন আমি বারবার এক কথা নিয়েই বকি।··· বড়ো বড়ো নদী কাটিয়ে আমাদের বোটটা একটা ছোটো নদীর মুখে প্রবেশ করেছে। দুই ধারে মেয়েরা স্নান করছে, কাপড় কাচছে, এবং ভিজে কাপড়ে এক-মাথা ঘোমটা দিয়ে জলের কলসী নিয়ে বাঁ হাত দুলিয়ে ঘরে চলেছে— ছেলেরা কাদা মেখে জল ছুঁড়ে মাতামাতি করছে, এবং একটা ছেলে বিনা সুরে গান গাচ্ছে 'একবার দাদা বলে ডাক্ রে লক্ষ্মণ!' উঁচু পাড়ের উপর দিয়ে অদূরবর্তী গ্রামের খড়ের চাল এবং বাঁশবনের ডগা দেখা যাচ্ছে। আজ মেঘ কেটে গিয়ে রোদ্দুর দেখা দিয়েছে। যে মেঘগুলো আকাশের প্রান্তভাগে অবশিষ্ট আছে সেগুলো সাদা তুলোর রাশের মতো দেখাচ্ছে। বাতাস ঈষৎ গরম হয়ে ব'চ্ছে। ছোটো নদীতে বড়ো

বেশি নৌকো নেই— ছুটো একটা ছোটো ডিঙি, শুকনো গাছের ডাল এবং কাঠকুটো বোঝাই নিয়ে শ্রান্তভাবে ছপ্ ছপ্ দাঁড় ফেলে চলেছে— ডাঙায় বাঁশের উপর জেলেদের জাল শুকোচ্ছে— পৃথিবীর সকাল-বেলাকার কাজকর্ম খানিক ক্ষণের জন্যে বন্ধ হয়ে আছে—

কলকাতা

১২ ফেব্রুয়ারি ১৮৯১

১৯

চুহালি। জলপথে

১৬ জুন ১৮৯১

এখন পাল তুলে দিয়ে যমুনার মধ্যে দিয়ে চলেছি। আমার বাঁ ধারে মাঠে গোরু চরছে, দক্ষিণ ধারে একেবারে কূল দেখা যাচ্ছে না। নদীর তীব্র স্রোতে তীর থেকে ক্রমাগতই ঝুপ্ ঝুপ্ করে মাটি খসে পড়ছে। আশ্চর্য এই, এত বড়ো প্রকাণ্ড এই নদীটার মধ্যে আমাদের বোট ছাড়া আর দ্বিতীয় একটি নৌকো দেখা যাচ্ছে না— চারি দিকে জলরাশি ক্রমাগতই ছল্ ছল্ খল্ খল্ শব্দ করছে, আর বাতাসের হূহু শব্দ শোনা যাচ্ছে।··· কাল সন্ধের সময় একটা চরের উপর বোট লাগিয়েছিলুম— নদীটি ছোট্ট, যমুনার একটি শাখা, এক পারে বহু দূর পর্যন্ত সাদা বালি ধূ ধূ করছে, জনমানবের সম্পর্ক নেই— আর এক পারে সবুজ শস্যক্ষেত্র এবং বহু দূরে একটি গ্রাম। তোকে আর কতবার বলব— এই নদীর উপরে, মাঠের উপরে, গ্রামের উপরে সন্ধেটা কী চমৎকার, কী প্রকাণ্ড, কী প্রশান্ত, কী অগাধ সে কেবল স্তব্ধ হয়ে অনুভব করা যায়, কিন্তু ব্যক্ত করতে গেলেই চঞ্চল হয়ে উঠতে হয়। ক্রমে যখন অন্ধকারে সমস্ত অস্পষ্ট হয়ে এল, কেবল জলের রেখা এবং তটের রেখায় একটা প্রভেদ দেখা যাচ্ছিল, এবং গাছপালা কুটির সমস্ত একাকার হয়ে একটা ঝাপসা জগৎ চোখের সামনে বিস্তৃত পড়ে ছিল তখন ঠিক মনে হচ্ছিল এ-সমস্ত যেন ছেলেবেলাকার রূপকথার জগৎ— যখন এই বৈজ্ঞানিক জগৎ সম্পূর্ণ গঠিত হয়ে ওঠে নি, অল্পদিন হল সৃষ্টি আরম্ভ হয়েছে, প্রদোষের অন্ধকারে এবং একটি ভীতিবিস্ময়পূর্ণ ছম্-ছম্-নিস্তব্ধতায় সমস্ত বিশ্ব আচ্ছন্ন— যখন সাত সমুদ্র তেরো নদীর পারে মায়াপুরে পরমাসুন্দরী রাজকন্যা চিরনিদ্রায় নিদ্রিত, যখন রাজপুত্র এবং পাত্তরের পুত্র তেপান্তরের মাঠে একটা অসম্ভব উদ্দেশ্য নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে— এ যেন তখনকার সেই অতি সুদূরবর্তী অর্ধ-অচেতনায় মোহাচ্ছন্ন

মায়ামিশ্রিত বিস্মৃত জগতের একটি নিস্তব্ধ নদীতীর— এবং মনে করা যেতেও পারে আমি সেই রাজপুত্র একটা অসম্ভবের প্রত্যাশায় সন্ধ্যারাজ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছি— এই ছোটো নদীটি সেই তেরো নদীর মধ্যে একটা নদী, এখনো সাত সমুদ্র বাকি আছে— এখনো অনেক দূর, অনেক ঘটনা, অনেক অন্বেষণ বাকি— এখনো কত অজ্ঞাত নদীতীরে কত অপরিচিত সমুদ্রসীমায় কত ক্ষীণ চন্দ্রালোকিত অনাগত রাত্রি অপেক্ষা করে আছে— তার পরে হয়তো অনেক ভ্রমণ, অনেক রোদন, অনেক বেদনের পর হঠাৎ একদিন আমার কথাটি ফুরোলো, নটে শাকটি মুড়োলো— হঠাৎ মনে হবে এতক্ষণ একটা গল্প চলছিল, সেই রূপকথার সুখ দুঃখ নিয়ে কখনো হাসছিলুম কখনো কাঁদছিলুম, এখন গল্প ফুরিয়েছে, এখন অনেক রাত্রি, এখন ছোটো ছেলের ঘুমোবার সময়।

কলকাতা

১৮৯১

২০

চুহালি

১৯ জুন ১৮৯১

কাল পনেরো মিনিট বাইরে বসতে না বসতে পশ্চিমে ভয়ানক মেঘ করে এল— খুব কালো গাঢ় আলুথালু রকমের মেঘ, তারই মাঝে মাঝে চোরা আলো পড়ে রাঙা হয়ে উঠেছে— এক-একটা ঝড়ের ছবিতে যেমন দেখা যায় ঠিক সেই রকমের। দুটো একটা নৌকো তাড়াতাড়ি যমুনা থেকে এই ছোটো নদীর মধ্যে প্রবেশ করে দড়িদড়া নোঙর দিয়ে মাটি আঁকড়ে নিশ্চিন্ত হয়ে বসল— যারা মাঠে শস্য কাটতে এসেছিল তারা মাথায় এক-এক বোঝা শস্য নিয়ে বাড়ির দিকে ছুটে চলেছে— গোরুও ছুটেছে, তার পিছনে পিছনে বাছুর লেজ নেড়ে নেড়ে সঙ্গে সঙ্গে দৌড়োবার চেষ্টা করছে। খানিক বাদে একটা আক্রোশের গর্জন শোনা গেল— কতকগুলো ছিন্নভিন্ন মেঘ ভগ্নদূতের মতো সুদূর পশ্চিম থেকে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে এল— তার পরে বিদ্যুৎবজ্র ঝড়বৃষ্টি সমস্ত এক সঙ্গে এসে পড়ে খুব একটা তুর্কিনাচন নাচতে আরম্ভ করে দিলে। বাঁশগাছগুলো হাউ হাউ শব্দে একবার পূর্বে একবার পশ্চিমে লুটিয়ে লুটিয়ে পড়তে লাগল, ঝড় যেন সোঁ সোঁ করে সাপুড়েদের মতো বাঁশি বাজাতে লাগল। আর জলের ঢেউগুলো তিন লক্ষ সাপের মতো ফণা তুলে তালে তালে নৃত্য আরম্ভ করে দিলে। কালকের সে যে কাণ্ড সে আর কী বলব। বজ্রের যে শব্দ সে আর থামে না— আকাশের কোন্‌খানে যেন একটা আস্ত জগৎ ভেঙে চুরমার হয়ে যাচ্ছে। বোটের খোলা জানলার উপর মুখ রেখে প্রকৃতির সেই রুদ্রতালে আমিও বসে বসে মনটাকে দোলা দিচ্ছিলুম। সমস্ত ভিতরটা যেন ছুটি-পাওয়া স্কুলের ছেলের মতো ঝাঁপিয়ে উঠেছিল। শেষকালে বৃষ্টির ছাঁটে যখন বেশ একটু আর্দ্র হয়ে ওঠা গেল তখন জানলা এবং কবিত্ব বন্ধ করে খাঁচার পাখির মতো অন্ধকারে চুপচাপ বসে রইলুম।

কলকাতা

জলপথে। সাজাদপুর

২০ জুন ১৮৯১

কাল তোদের টেলিগ্রামের উত্তর পেয়ে আমাদের সমস্ত কাজ সেরে সন্ধের সময় নৌকো ছেড়ে দিলুম। আকাশে মেঘ ছিল না, চাঁদ উঠেছিল, অল্প অল্প হাওয়া দিচ্ছিল— ঝুপ্ ঝুপ্ দাঁড় ফেলে স্রোতের মুখে ছোটো নদীটির মধ্যে ভেসে যাওয়া যাচ্ছিল। চারি দিক পরীস্থান বলে মনে হচ্ছিল। সে সময়ে অন্যান্য সমস্ত নৌকো ডাঙায় কাছি বেঁধে পাল গুটিয়ে চন্দ্রালোকে স্তব্ধ হয়ে নিদ্রা দিচ্ছিল। অবশেষে ছোটো নদীটা যেখানে যমুনার মধ্যে গিয়ে পড়েছে তারই কাছে একটা খুব নিরাপদ স্থানে গিয়ে নৌকো বাঁধলে। কিন্তু নিরাপদ স্থানের অনেক দোষ— হাওয়া পাওয়া যায় না, ঝুপ্সির ভিতরে, অন্যান্য নৌকোর কাছে, জঙ্গলের গন্ধ ইত্যাদি। আমি মাঝিকে বললুম, 'এ পারে হাওয়া পাওয়া যাবে না, ও পারে চল্।' ও পারে উঁচু পাড় নেই— জলে স্থলে সমান, এমন-কি ধানের ক্ষেতের উপর এক-হাঁটু জল উঠেছে। রাজাজ্ঞায় মাঝি সেইখানেই নৌকো নিয়ে বাঁধলে। তখন আমাদের পিছন দিকের আকাশে একটু বিদ্যুৎ চিক্মিক্ করতে আরম্ভ করেছে। আমি বিছানায় ঢুকে জানলার কাছে মুখ রেখে ক্ষেতের দিকে চেয়ে আছি, এমন সময় রব উঠল— ঝড় আসছে। 'কাছি ফেল্' 'নোঙর ফেল্' 'এ কর্' 'সে কর্' করতে করতে এক প্রলয় ঝড় ছুটে এল। মাঝি থেকে থেকে বলতে লাগল, 'ভয় কোরো না ভাই, আল্লার নাম করো— আল্লা মালেক।' থেকে থেকে সকলে 'আল্লা' 'আল্লা' করতে লাগল। আমাদের বোটের দুই পাশের পর্দা বাতাসে আছাড় খেয়ে খেয়ে শব্দ করতে লাগল, আমাদের বোটটা যেন একটা শিকলি-বাঁধা পাখির মতো পাখা ঝাপটে ঝট্পট্ ঝট্পট্ করছিল— ঝড়টা থেকে থেকে চাঁহি চাঁহি শব্দ করে একটা বিপর্যয় চিলের মতো হঠাৎ এসে

পড়ে বোটের ঝুঁটি ধরে ছোঁ মেরে ছিঁড়ে নিয়ে যেতে চায়, বোটটা অমনি সশব্দে ধড়্‌ফড়্‌ করে ওঠে। অনেক ক্ষণ বাদে বৃষ্টি আরম্ভ হয়ে ঝড় থেমে গেল। আমি হাওয়া খেতে চেয়েছিলুম— হাওয়াটা কিছু বেশি খাইয়ে দিলে, একেবারে আশাতিরিক্ত। যেন কে ঠাট্টা করে বলে যাচ্ছিল, 'এইবার পেট ভরে হাওয়া খেয়ে নাও, তার পরে সাধ মিটলে কিঞ্চিৎ জল খাওয়াব— তাতে এমনি পেট ভরবে যে ভবিষ্যতে আর কিছু খেতে হবে না।' আমরা কিনা প্রকৃতির নাতি-সম্পর্ক, তাই তিনি মধ্যে মধ্যে এই রকম একটু-আধটু তামাসা করে থাকেন। আমি তো পূর্বেই বলেছি জীবনটা একটা গম্ভীর বিদ্রূপ, এর মজাটা বোঝা একটু শক্ত— কারণ, যাকে নিয়ে মজা করা হয়, মজার রসটা সে তেমন গ্রহণ করতে পারে না। এই মনে কর্, দুপুর রাত্রে খাটে শুয়ে আছি, হঠাৎ পৃথিবীটা ধরে এমনি নাড়া দিলে যে কে কোথায় পালাবে পথ পায় না। মংলবটা খুব নতুন রকমের এবং মজার তার আর সন্দেহ নেই— খুব একটা বড়ো-গোছ পয়লা এপ্রেলের রহস্যের উপযোগী। বড়ো বড়ো সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোকদের অর্ধেক রাত্রে ঊর্ধ্বশ্বাসে অসম্বৃত অবস্থায় বিছানার বাইরে দৌড় করানো কি কম মজা! এবং দুটো-একটা সদ্যোনিদ্রোত্থিত হতবুদ্ধি নিরীহ লোকের মাথার উপরে বাড়ির আস্ত ছাদটা ভেঙে আনা কি কম ঠাট্টা! হতভাগা লোকটা যেদিন ব্যাঙ্কে চেক লিখে রাজমিস্ত্রির বিল শোধ করছিল, রহস্যপ্রিয়া প্রকৃতি সেই দিন বসে বসে কত হেসেছিল!

কলকাতা

১৮৯১

২১

সাজাদপুর

২২ জুন ১৮৯১

আজকাল আমার এখানে এমন চমৎকার জ্যোৎস্নারাত্রি হয় সে আর কী বলব। অবিশ্যি, তোদের ওখানেও যে জ্যোৎস্নারাত্রি হয় না তা বলা আমার অভিপ্রায় নয়— স্বীকার করতেই হবে তোদের সেখানে সেই ময়দানের উপর, সেই গির্জের চূড়ার উপর, সম্মুখের নিস্তব্ধ গাছ-পালার উপর, ধীরে ধীরে জ্যোৎস্না আপনার নীরব অধিকার বিস্তার করে। কিন্তু তোদের জ্যোৎস্না ছাড়াও অন্য পাঁচটা বস্তু আছে— তোদের হার্মনি এবং ডিস্‌কর্ড্ আছে, টেনিস আছে, মার্বলের টেবিল আছে, ড্রয়িংরুমে গান-বাজনার আড্ডা আছে— কিন্তু আমার এই নিস্তব্ধ রাত্রি ছাড়া আর কিছুই নেই। একলা বসে বসে আমি যে এর ভিতরে কী অনন্ত শান্তি এবং সৌন্দর্য দেখতে পাই সে আর ব্যক্ত করতে পারি নে। এক দল আছে তারা ছট্‌ফট্ করে 'জগতের সকল কথা জানতে পারছি নে কেন', আর এক দল ছট্‌ফটিয়ে মরে 'মনের সকল ভাব প্রকাশ করতে পারছি নে কেন'— মাঝের থেকে জগতের কথা জগতেই থেকে যায় এবং অন্তরের কথা অন্তরেই থাকে।··· মাথাটা জানলার উপর রেখে দিই— বাতাস প্রকৃতির স্নেহহস্তের মতো আস্তে আস্তে আমার চুলের মধ্যে আঙুল বুলিয়ে দেয়, জল ছল্ ছল্ শব্দ করে বয়ে যায়, জ্যোৎস্না ঝিক্ ঝিক্ করতে থাকে এবং অনেক সময় 'জলে নয়ন আপনি ভেসে যায়'। অনেক সময় মনের আন্তরিক অভিমান, একটু স্নেহের স্বর শুনলেই অমনি অশ্রুজলে ফেটে পড়ে। এই অপরিতৃপ্ত জীবনের জন্যে প্রকৃতির উপর আমাদের যে আজন্মকালের অভিমান আছে, যখনি প্রকৃতি স্নেহমধুর হয়ে ওঠে তখনি সেই অভিমান অশ্রুজল হয়ে নিঃশব্দে ঝরে পড়তে থাকে। তখন প্রকৃতি আরো বেশি করে

আদর করে এবং তার বুকের মধ্যে অধিকতর আবেগের সহিত মুখ লুকোই, এক প্রকার 'বিরাগ-ভরা বিবেকের' বিষণ্ণ শান্তি লাভ করা যায়। এই তো আমার সন্ধে।

কলকাতা
১৮৯১

২৩

সাজাদপুর

২৩ জুন ১৮৯১

আজকাল দুপুর বেলাটা বেশ লাগে বব্। রৌদ্রে চারি দিক বেশ নিঃঝুম হয়ে থাকে— মনটা ভারী উড়ু-উড়ু করে, বই হাতে নিয়ে আর পড়তে ইচ্ছে করে না। তীরে যেখানে নৌকো বাঁধা আছে সেইখান থেকে এক রকম ঘাসের গন্ধ এবং থেকে থেকে পৃথিবীর একটা গরম ভাপ গায়ের উপরে এসে লাগতে থাকে— মনে হয় এই জীবন্ত উত্তপ্ত ধরণী আমার খুব নিকটে থেকে নিশ্বাস ফেলছে, বোধ করি আমারও নিশ্বাস তার গায়ে গিয়ে লাগছে। ছোটো ছোটো ধানের গাছগুলো বাতাসে ক্রমাগত কাঁপছে— পাতিহাঁস জলের মধ্যে নেবে ক্রমাগত মাথা ডুবোচ্ছে এবং চঞ্চু দিয়ে পিঠের পালক সাফ করছে। আর কোনো শব্দ নেই, কেবল জলের বেগে বোটটা যখন ধীরে ধীরে বেঁকতে থাকে তখন কাছিটা এবং বোটের সিঁড়িটা এক রকম সকরুণ মৃদু শব্দ করতে থাকে। অনতিদূরে একটা খেয়াঘাট আছে। বটগাছের তলায় নানাবিধ লোক জড়ো হয়ে নৌকোর জন্যে অপেক্ষা করছে, নৌকো আসবামাত্রই তাড়াতাড়ি উঠে পড়ছে— অনেক ক্ষণ ধরে এই নৌকো-পারাপার দেখতে বেশ লাগে। ও পারে হাট, তাই খেয়ানৌকোয় এত ভিড়। কেউ বা ঘাসের বোঝা, কেউ বা একটা চুপড়ি, কেউ বা একটা বস্তা কাঁধে করে হাটে যাচ্ছে এবং হাট থেকে ফিরে আসছে, ছোটো নদীটি এবং দুই পারের দুই ছোটো গ্রামের মধ্যে নিস্তব্ধ দুপুর বেলায় এই একটুখানি কাজকর্ম, মনুষ্যজীবনের এই একটুখানি স্রোত অতি ধীরে ধীরে চলছে। আমি বসে বসে ভাবছিলুম, আমাদের দেশের মাঠ ঘাট আকাশ রোদ্দুরের মধ্যে এমন একটা সুগভীর বিষাদের ভাব কেন লেগে আছে? তার কারণ এই মনে হল, আমাদের দেশে প্রকৃতিটা সব চেয়ে বেশি চোখে পড়ে— আকাশ মেঘমুক্ত, মাঠের সীমা নেই, রৌদ্র ঝাঁ ঝাঁ

করছে, এর মধ্যে মানুষকে অতি সামান্য মনে হয়— মানুষ আসছে এবং যাচ্ছে, এই খেয়া নৌকোর মতো পারাপার হচ্ছে, তাদের অল্প অল্প কলরব শোনা যাচ্ছে, এই সংসারের হাটে ছোটোখাটো সুখ দুঃখের চেষ্টায় একটুখানি আনাগোনা দেখা যায়— কিন্তু এই অনন্তপ্রসারিত প্রকাণ্ড উদাসীন প্রকৃতির মধ্যে সেই মৃদুগুঞ্জন, সেই একটু-আধটু গীতধ্বনি, সেই নিশিদিন কাজকর্ম কী সামান্য, কী ক্ষণস্থায়ী, কী নিষ্ফল কাতরতা -পূর্ণ মনে হয়। এই নিশ্চেষ্ট, নিস্তব্ধ, নিশ্চিন্ত, নিরুদ্দেশ প্রকৃতির মধ্যে এমন একটি বৃহৎসৌন্দর্যপূর্ণ নির্বিকার উদার শান্তি দেখতে পাওয়া যায় এবং তারই তুলনায় আপনার মধ্যে এমন একটা সততসচেষ্ট পীড়িত জর্জরিত ক্ষুদ্র নিত্যনৈমিত্তিক অশান্তি দেখতে পাওয়া যায় যে, ঐ অতিদূর নদীতীরের ছায়াময় নীল বনরেখার দিকে চেয়ে নিতান্ত উন্মনা হয়ে যেতে হয়। 'ছায়াতে বসিয়া সারা দিনমান তরুমর্মর পবনে' ইত্যাদি। যেখানে মেঘে কুয়াশায় বরফে অন্ধকারে প্রকৃতি আচ্ছন্ন, সংকুচিত, সেখানে মানুষের খুব কর্তৃত্ব— মানুষ সেখানে আপনার সকল ইচ্ছা সকল চেষ্টাকে চিরস্থায়ী মনে করে, আপনার সকল কাজকে চিহ্নিত করে রেখে দেয়— পস্টারিটির দিকে তাকায়, কীর্তিস্তম্ভ তৈরি করে, জীবনচরিত লেখে, এবং মৃতদেহের উপরেও পাষাণের চিরস্মরণগৃহ নির্মাণ করে— তার পরে অনেক চিহ্ন ভেঙে যায় এবং অনেক নাম বিস্মৃত হয়, কিন্তু সময়াভাবে সেটা কারও খেয়ালে আসে না।—

কলকাতা

১৮৯১

২৪

সাজাদপুর

। জুন ১৮৯১।

বিকেল বেলায় আমি এখানকার গ্রামের ঘাটের উপরে বোট লাগাই। অনেকগুলো ছেলেয় মিলে খেলা করে, বসে বসে দেখি। কিন্তু আমার সঙ্গে সঙ্গে নিশিদিন যে পদাতিক সৈন্য লেগে থাকে তাদের জ্বালায় আর আমার মনে সুখ নেই। ছেলেদের খেলা তারা বেয়াদবি মনে করে; মাঝিরা যদি আপনাদের মধ্যে মন খুলে হাসি গল্প করে সেটা তারা রাজার প্রতি অসম্মান জ্ঞান করে; চাষারা যদি ঘাটে গোরুকে জল খাওয়াতে নিয়ে আসে তারা তৎক্ষণাৎ লাঠি হাতে করে রাজমর্যাদা রক্ষা করতে ধাবিত হয়। অর্থাৎ, রাজার চতুর্দিকটা হাসিহীন খেলাহীন শব্দহীন জনহীন ভীষণ মরুভূমি করতে পারলে তাদের মনের মতো রাজসম্ভ্রম রক্ষে হয়— ইদিকে হতভাগ্য রাজার প্রাণ ত্রাহি ত্রাহি করতে থাকে। কালও তারা ছেলেদের তাড়া করতে উদ্যত হয়েছিল, আমি আমার রাজমর্যাদা জলাঞ্জলি দিয়ে তাদের নিবারণ করলুম। ঘটনাটা হচ্ছে এই --

ডাঙার উপর একটা মস্ত নৌকোর মাস্তুল পড়ে ছিল— গোটা-কতক বিবস্ত্র ক্ষুদে ছেলে মিলে অনেক বিবেচনার পর ঠাওরালে যে, যদি যথোচিত কলরব-সহকারে সেইটেকে ঠেলে ঠেলে গড়ানো যেতে পারে তা হলে খুব একটা নতুন এবং আমোদজনক খেলার সৃষ্টি হয়। যেমন মনে আসা অমনি কার্যারম্ভ। 'সাবাস জোয়ান হেঁইয়ো! মারো ঠেলা হেঁইয়ো!' সব কটায় মিলে চীৎকার এবং ঠেলা। মাস্তুল যেমনি এক পাক ঘুরছে অমনি সকলের আনন্দের উচ্চহাস্য। কিন্তু এই ছেলেদের মধ্যে যে দুটি-একটি মেয়ে আছে, তাদের ভাব আর-এক রকম। সঙ্গী-অভাবে ছেলেদের সঙ্গে মিশতে বাধ্য হয়েছে, কিন্তু এই-সকল শ্রমসাধ্য উৎকট খেলায় তাদের মনের যোগ নেই। একটি ছোটো

মেয়ে বিনাবাক্যব্যয়ে গম্ভীর প্রশান্ত ভাবে সেই মাস্তুলটার উপর গিয়ে চেপে বসল। ছেলেদের এমন সাধের খেলা মাটি। দু-একজন ভাবলে এমন স্থলে হার মানাই ভালো। তফাতে গিয়ে ম্লানমুখে দাঁড়িয়ে সেই মেয়েটির অটল গাম্ভীর্য নিরীক্ষণ করতে লাগল। ওদের মধ্যে একজন এসে পরীক্ষাচ্ছলে মেয়েটাকে একটু একটু ঠেলতে লাগল। কিন্তু সে নীরবে নিশ্চিন্তমনে বিশ্রাম করতে লাগল। সর্বজ্যেষ্ঠ ছেলেটি এসে তাকে বিশ্রামের জন্যে অন্যস্থান নির্দেশ করে দিলে, সে তাতে সতেজে মাথা নেড়ে কোলের উপর দুটি হাত জড়ো করে নড়ে চড়ে আবার বেশ গুছিয়ে বসল। তখন সেই ছেলেটা শারীরিক যুক্তি প্রয়োগ করতে আরম্ভ করলে এবং অবিলম্বে কৃতকার্য হল। আবার অভ্রভেদী আনন্দধ্বনি উঠল, পুনর্বার মাস্তুল গড়াতে লাগলো— এমন-কি খানিক-ক্ষণ বাদে মেয়েটাও তার নারীগৌরব এবং সুমহৎ নিশ্চেষ্ট স্বাতন্ত্র্য ত্যাগ করে কৃত্রিম উৎসাহের সঙ্গে ছেলেদের এই অর্থহীন চপলতায় যোগ দিলে। কিন্তু বেশ বোঝা যাচ্ছিল সে মনে মনে বলছিল, ছেলেরা খেলা করতে জানে না, কেবল যত রাজ্যের ছেলেমানুষি। হাতের কাছে যদি একটা খোঁপাওয়ালা হলদে রঙের মাটির বেলে পুতুল থাকত তা হলে কি সে আর এই অপরিণতবুদ্ধি নিতান্ত শিশুদের সঙ্গে মাস্তুল ঠেলার মতো এমন একটা বাজে খেলায় যোগ দিত! এমন সময় আর-এক রকমের খেলা তাদের মনে এল, সেটাও খুব মজার। দুজন ছেলেতে মিলে একটা ছেলের হাত পা ধরে ঝুলিয়ে তাকে দোলা দেবে। এর ভিতরে খুব একটা রহস্য আছে সন্দেহ নেই; কারণ, ছেলেরা বেজায় উৎফুল্ল হয়ে উঠল। কিন্তু মেয়েটার পক্ষে অসহ্য হয়ে উঠল। সে অবজ্ঞাভরে ক্রীড়াক্ষেত্র ত্যাগ করে ঘরে চলে গেল। কিন্তু একটা দুর্ঘটনা ঘটল। যাকে দোলাচ্ছিল সে পড়ে গেল। সেই অভিমানে সে সঙ্গীদের ত্যাগ করে বহুদূরে গিয়ে হাতের উপর মাথা রেখে তৃণশয্যায়

শুয়ে পড়ল। এই রকম ভাব জানালে— এই পাষাণহৃদয় জগৎ-সংসারের সঙ্গে সে আর কোনো সম্পর্ক রাখবে না, কেবল একলা চীৎ হয়ে শুয়ে আকাশের তারা গণনা করবে, মেঘের খেলা দেখে হাতে মাথা রেখে জীবন কাটিয়ে দেবে এবং 'যাবত জীবন রবে কারো সঙ্গে খেলিব না'। তার এই রকম অকালে পরম বৈরাগ্য দেখে বড়ো ছেলেটা তাড়াতাড়ি ছুটে গিয়ে, কোলের উপর তার মাথাটা নিয়ে, সানুনয় স্বরে অনুতাপ প্রকাশ করে বলতে লাগল— 'আয়-না ভাই, ওঠ্-না ভাই! লেগেছে ভাই!' অনতিকাল পরেই দুই কুকুরশাবকের মতো দুজনের হাত-কাড়াকাড়ি খেলা বেধে গেল এবং দু মিনিট না যেতে যেতে দেখি সেই ছেলে ফের দুলতে আরম্ভ করেছে! এমনি মানুষের প্রতিজ্ঞা! এমনি তার মনের বল! এমনি তার বুদ্ধির স্থিরতা! খেলা ছেড়ে একবার দূরে গিয়ে চীৎ হয়ে শোয়, আবার ধরা দিয়ে হেসে হেসে মোহদোলায় দুলতে থাকে! এ মানুষের মুক্তি কী করে হবে! এমন কজন ছেলে আছে যে খেলাঘর ছেড়ে মাথায় হাত দিয়ে কেবল চীৎ হয়ে পড়ে থাকে— সেই সব ভালো ছেলেদের জন্যে গোলকধামে বাসা তৈরি হচ্ছে।

কলকাতা

২৬ জুন ১৮৯১

২৫

সাজাদপুর

। জুন ১৮৯১ ।

কাল রাত্তিরে ভারী একটা অদ্ভুত স্বপ্ন দেখেছিলুম। সমস্ত কলকাতা শহরটা যেন মহা একটা ভীষণ অথচ আশ্চর্য ভাবের দ্বারা আচ্ছন্ন হয়ে আছে— বাড়ি ঘর সমস্তই একটা অন্ধকার কালো কুয়াশার ভিতর থেকে দেখা যাচ্ছে— এবং তার ভিতর তুমুল কী একটা কাণ্ড চলছে। আমি যকটা ভাড়াটে গাড়ি করে পার্ক্‌ স্ট্রীটের ভিতর দিয়ে যাচ্ছি— যেতে যেতে দেখলুম সেণ্ট্‌জেভিয়ার কলেজটা দেখতে দেখতে হু হু করে বেড়ে উঠছে— সেই অন্ধকার কুয়াশার মধ্যে অসম্ভব উঁচু হয়ে উঠছে। তার পরে ক্রমে জানতে পারলুম এক দল অদ্ভুত লোক এসেছে, তারা টাকা পেলে কী এক কৌশলে এই রকম অপূর্ব ব্যাপার করতে পারে। জোড়াসাঁকোর বাড়ি এসে দেখি সেখেনেও তারা এসেছে— বদ দেখতে, কতকটা মোঙ্গোলিয়ান ধাঁচের চেহারা— সরু গোঁপ, গোটা দশ বারো দাড়ি মুখের এ দিকে ও দিকে খোঁচা খোঁচা রকম বেরিয়েছে। তারা মানুষকেও বড়ো করে দিতে পারে। তাই আমাদের দেউড়িতে আমাদের বাড়ির সব মেয়েরা লম্বা হবার জন্যে উমেদার হয়েছেন— তারা এঁদের মাথায় কী একটা গুঁড়ো দিচ্ছে আর এঁরা হুশ করে লম্বা হয়ে উঠছেন। আমি কেবলই বলছি, কী আশ্চর্যি, এ যেন ঠিক স্বপ্নের মতো মনে হচ্ছে। তার পরে, কে একজন প্রস্তাব করলে আমাদের বাড়িটা উঁচু করে দিতে। তারা রাজি হয়ে কতকটা ভাঙতে আরম্ভ করলে। খানিকটা ভেঙে চুরে বললে, এইবার এত টাকা চাই, নইলে বাড়িতে হাত দেব না। কুঞ্জ সরকার বললে, সে কি হয়, কাজ না হলে কী করে টাকা দেওয়া যায়! বলতেই তারা চটে উঠল— বাড়িটা সমস্তই এক রকম বেঁকে

চুরে বিশ্রী হয়ে গেল এবং মাঝে মাঝে দেখা গেল, আধখানা মানুষ দেয়ালের মধ্যে গাঁথা রয়েছে, আধখানা বেরিয়ে। সমস্ত দেখে শুনে মনে হল এ সব শয়তানী কাণ্ড। বড়োদাদাকে বললুম, 'বড়দা, দেখছেন ব্যাপারটা! আসুন একবার উপাসনা করা যাক।' দালানে গিয়ে খুব একাগ্রমনে উপাসনা করা গেল। বেরিয়ে এসে মনে করলুম ঈশ্বরের নাম করে তাদের ভর্ৎসনা করব— কিন্তু বুক ফেটে যেতে লাগল, কিন্তু তবু গলা দিয়ে কথা বেরোল না। তার পর কখন জেগে উঠলুম ঠিক মনে পড়ছে না। ভারী অদ্ভুত স্বপ্ন, না? সমস্ত কলকাতা শহরে শয়তানের প্রাদুর্ভাব— সবাই তার সাহায্যে বেড়ে ওঠবার চেষ্টা করছে, একটা অন্ধকার নারকী কুজ্ঝটিকার মধ্যে সমস্ত শহরের ভয়ঙ্কর শ্রীবৃদ্ধি হচ্ছে। কিন্তু ওর মধ্যে একটু পরিহাসও ছিল— এত দেশ থাকতে জেস্যুয়িটদের ইস্কুলটার উপরেই শয়তানের এত অনুগ্রহ কেন?…

তার পরে এখানকার সাজাদপুরের ইংরিজি স্কুলের মাস্টারেরা হুজুরের দর্শনাভিলাষী হয়ে এসে উপস্থিত। তারা কিছুতেই উঠতে চায় না, অথচ আমার আবার তেমন কথা জোগায় না— পাঁচ মিনিট অন্তর দুই-এক কথা জিজ্ঞাসা করি, তার এক-আধটা উত্তর পাই, তার পরে বোকার মতো বসে থাকি, কলম নাড়ি, মাথা চুলকোই— জিজ্ঞাসা করি এবার এখানে শস্য কিরকম হয়েছে। স্কুল-মাস্টাররা শস্য সম্বন্ধে কিছুই জানে না— ছাত্র সম্বন্ধে যা কিছু জ্ঞাতব্য বিষয় তা আরম্ভেই হয়ে গেছে। ফের আবার গোড়ার কথা পাড়লুম; জিজ্ঞাসা করলুম, 'আপনাদের স্কুলে কজন ছাত্র?' এক জন বললে আশি জন। আর এক জন বললে, না, এক শো পঁচাত্তর জন। মনে করলুম দুজনের মধ্যে খুব একটা তর্ক বেধে যাবে। কিন্তু দেখলুম, তৎক্ষণাৎ

মতের ঐক্য হয়ে গেল। তার পরে, দেড় ঘণ্টা পরে কেন যে তাদের মনে পড়ল 'আজ তবে আসি' তা ঠিক বোঝা শক্ত। আর এক ঘণ্টা পূর্বেও মনে হতে পারত, আর বারো ঘণ্টা পরেও মনে হতে পারত, দেখা যাচ্ছে এর ভিতরে কোনো একটা নিয়ম নেই— অন্ধ দৈবঘটনা মাত্র।

কলকাতা
৩০ জুন ১৮৯১

২৬

সাজাদপুর

শনিবার, ৪ জুলাই ১৮৯১

আমাদের ঘাটে একটি নৌকো লেগে আছে, এবং এখানকার অনেক-গুলি 'জনপদবধূ' তার সম্মুখে ভিড় করে দাঁড়িয়েছে। ··· বোধ হয় একজন কে কোথায় যাচ্ছে এবং তাকে বিদায় দিতে সবাই এসেছে। অনেকগুলি কচি ছেলে, অনেকগুলি ঘোমটা এবং অনেকগুলি পাকাচুল একত্র হয়েছে। কিন্তু ওদের মধ্যে একটি মেয়ে আছে, তার প্রতিই আমার মনোযোগটা সর্বাপেক্ষা আকৃষ্ট হচ্ছে। বোধ হয় বয়েস বারো-তেরো হবে, কিন্তু একটু হৃষ্টপুষ্ট হওয়াতে চোদ্দ-পনেরো দেখাচ্ছে। মুখখানি বেড়ে। বেশ কালো অথচ বেশ দেখতে। ছেলেদের মতো চুল ছাঁটা, তাতে মুখটি বেশ দেখাচ্ছে। এমন বুদ্ধিমান এবং সপ্রতিভ এবং পরিষ্কার সরল ভাব। একটা ছেলে কোলে করে এমন নিঃসংকোচ কৌতূহলের সঙ্গে আমাকে চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগল।··· বাস্তবিক, তার মুখখানি এবং সমস্ত শরীর দেখতে বেশ, কিছু যেন নির্বুদ্ধিতা কিম্বা অসরলতা কিম্বা অসম্পূর্ণতা নেই। বিশেষতঃ আধা ছেলে আধা মেয়ের মতো হয়ে আরও একটু বিশেষ মনোযোগ আকর্ষণ করে। ছেলেদের মতো আত্ম সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অচেতন ভাব এবং তার সঙ্গে মাধুরী মিশে ভারী নতুন রকমের একটি মেয়ে তৈরি হয়েছে। বাংলা দেশে যে এ রকম ছাঁদের 'জনপদবধূ' দেখা যাবে এমন প্রত্যাশা করি নি। দেখছি এদের বংশটাই তেমন বেশি লাজুক নয়। একজন মেয়ে ডাঙায় দাঁড়িয়ে রৌদ্রে চুল এলিয়ে দশাঙ্গুলি-দ্বারা জটা ছাড়াচ্ছে এবং নৌকোর আর-একটি রমণীর সঙ্গে উচ্চৈঃস্বরে ঘরকর্নার আলাপ হচ্ছে। শোনা গেল তার একটিমাত্র 'মায়্যা', অন্য 'ছাওয়াল নাই'— কিন্তু সে মেয়েটির বুদ্ধিসুদ্ধি নেই— 'কারে কী কয় কারে কী হয় আপন পর জ্ঞান নেই'··· আরও অবগত হওয়া গেল গোপাল সা'র

জামাইটি তেমন ভালো হয় নি, মেয়ে তার কাছে যেতে চায় না। অবশেষে যখন যাত্রার সময় হল তখন দেখলুম আমার সেই চুল-ছাঁটা, গোলগাল হাতে-বালা-পরা উজ্জ্বল-সরল-মুখশ্রী মেয়েটিকে নৌকোয় তোলবার অনেক চেষ্টা হচ্ছে, কিন্তু সে কিছুতেই যেতে চাচ্ছে না— অবশেষে বহুকষ্টে তাকে টেনেটুনে নৌকোয় তুললে। বুঝলুম, বেচারা বোধ হয় বাপের বাড়ি থেকে স্বামীর বাড়ি যাচ্ছে— নৌকো যখন ছেড়ে দিলে মেয়েরা ডাঙায় দাঁড়িয়ে চেয়ে রইল, দুই একজন আঁচল দিয়ে ধীরে ধীরে নাক চোখ মুছতে লাগল। একটি ছোটো মেয়ে, খুব এঁটে চুল বাঁধা, একটি বর্ষীয়সীর কোলে চ'ড়ে তার গলা জড়িয়ে তার কাঁধের উপর মাথাটি রেখে নিঃশব্দে কাঁদতে লাগল। যে গেল সে বোধ হয় এ বেচারির দিদিমণি, এর পুঁতুল খেলায় বোধ হয় মাঝে মাঝে যোগ দিত, বোধ হয় দুষ্টুমি করলে মাঝে মাঝে টিপিয়েও দিত। সকাল বেলাকার রৌদ্র এবং নদীতীর এবং সমস্ত এমন গভীর বিষাদে পূর্ণ বোধ হতে লাগল। সকাল বেলাকার একটা অত্যন্ত হতাশ্বাস করুণ রাগিণীর মতো মনে হল সমস্ত পৃথিবীটা এমন সুন্দর অথচ এমন বেদনায় পরিপূর্ণ!··· এই অজ্ঞাত ছোটো মেয়েটির ইতিহাস আমার যেন অনেকটা পরিচিত হয়ে গেল। বিদায়কালে এই নৌকো করে নদীর স্রোতে ভেসে যাওয়ার মধ্যে যেন আরও একটু বেশি করুণা আছে। অনেকটা যেন মৃত্যুর মতো— তীর থেকে প্রবাহে ভেসে যাওয়া— যারা দাঁড়িয়ে থাকে তারা আবার চোখ মুছে ফিরে যায়, যে ভেসে গেল সে অদৃশ্য হয়ে গেল। জানি, এই গভীর বেদনাটুকু, যারা রইল এবং যে গেল উভয়েই ভুলে যাবে, হয়তো এতক্ষণে অনেকটা লুপ্ত হয়ে গিয়েছে। বেদনাটুকু ক্ষণিক এবং বিস্মৃতিই চিরস্থায়ী। কিন্তু ভেবে দেখতে গেলে — এই বেদনাটুকুই বাস্তবিক সত্যি, বিস্মৃতি সত্যি নয়। এক-একটা বিচ্ছেদ এবং এক-একটা মৃত্যুর সময় মানুষ

সহসা জানতে পারে এই ব্যথাটা কী ভয়ংকর সত্যি। জানতে পারে যে, মানুষ কেবল ভ্রমক্রমেই নিশ্চিন্ত থাকে, আশঙ্কা এবং শোকই জগতের ভিতরকার সত্য। কেউ থাকে না, কিছুই থাকে না, সেটা এমনি সত্য যে স্মরণও থাকে না, শোকও থাকে না— এবং সেইটে মনে করলে মানুষ আরও ব্যাকুল হয়ে ওঠে যে, কেবল যে থাকব না তা নয়, কারও মনেও থাকব না। একেবারে জগতের অন্তর বাহির থেকে লোপ। বাস্তবিক, আমাদের দেশের করুণ রাগিণী ছাড়া সমস্ত মানুষের পক্ষে, চিরকালের মানুষের পক্ষে, আর কোনো গান সম্ভবে না।

কলকাতা
৭ জুলাই ১৮৯১

২৭

কটকাভিমুখ জলপথে

। অগস্ট ১৮৯১ ।

পরিধেয় বস্ত্র প্রতিদিন মলিন এবং অসহ্য হয়ে আসছে অথচ কাপড়ের ব্যাগটি নেই, এ কথা চিত্তের মধ্যে অহর্নিশি জাগরূক থাকলে ভদ্রলোকের আত্মসম্ভ্রম দূর হয়ে যায়। সেই ব্যাগটি থাকলে যে রকম উন্নত মস্তকে সতেজে জনসমাজে বিচরণ করতে পারতুম, এখন আর তা পারছি নে। কোনোমতে নিজেকে প্রচ্ছন্ন এবং সাধারণের দৃষ্টির অন্তরালে রাখতে ইচ্ছে করছে। এই কাপড় প'রেই রাত্রে শয়ন করছি, এবং প্রাতঃকালে প্রকাশিত হচ্ছি। স্টীমারে আবার সর্বত্রই কয়লার গুঁড়ো এবং মলিনতা, এবং মধ্যাহ্নের অসহ্য উত্তাপে সর্বশরীর বাষ্পাকুল হয়ে উঠছে। এই-সমস্ত অবস্থা এবং আমার একান্ত নিরীহ স্বভাব স্মরণ করে তোরা কথঞ্চিৎ হাস্য সম্বরণ করবার চেষ্টা করিস। তা ছাড়া স্টীমারে যে সুখে আছি সে কথা তোদের লিখে আর কী করব! কত রকমের যে সঙ্গী জুটেছে তার আর সংখ্যা নেই। অঘোর বাবু বলে একটি কে এসেছে, সে পৃথিবীর সমস্ত জড় এবং চেতন পদার্থকে মামাশ্বশুরের ভাগনে বলে উল্লেখ করছে। আর একটি সংগীতকুশল লোক আর্ধেক রাত্রে ভৈঁরো আলাপ করতে লাগল। বিবিধ কারণে সেটা নিতান্ত অসাময়িক বলে বোধ হতে লাগল। একটা সুঁড়ি খালের মধ্যে জাহাজ আটকে কাল বিকেল থেকে আজ নটা পর্যন্ত যাপন করা গেছে। সমস্ত যাত্রীর ভিড়ের মধ্যে ডেকের এক ধারে নির্জীব এবং বিমর্ষভাবে শুয়ে ছিলুম। খানসামাজি'কে বলেছিলুম রাত্রে লুচি তৈরি করতে— সে কতকগুলি আকারপ্রকারহীন ভাজা ময়দা তৈরি করে এনেছিল, তার সঙ্গে ছোকা কিম্বা ভাজাভুজির উপলক্ষ্য মাত্র ছিল না। দেখে আমি কিঞ্চিৎ বিস্ময় এবং আক্ষেপ প্রকাশ করলুম। সে ব্যক্তি তটস্থ হয়ে বললে, 'হম আবি বনা দেতা।' রাত্রের আধিক্য দেখে আমি

তাতে অসম্মত হয়ে যথাসাধ্য শুষ্ক লুচি খেয়ে পেণ্টলুন প'রে আলো এবং লোকজনের মধ্যে শুয়ে পড়লুম-- শূন্যে মশা এবং চতুষ্পার্শ্বে আর্সোলা সঞ্চরণ করছে— ঠিক পায়ের কাছেই আর-এক ব্যক্তি শয়ন করেছে, তার গায়ে মাঝে মাঝে আমার পা ঠেকছে, চারটে-পাঁচটা নাক অবিশ্রাম ডাকছে, মশকদষ্ট বীতনিদ্র হতভাগ্যগণ তামাক টানছে এবং এরই মধ্যে ভৈঁরো রাগিণী। রাত যখন সাড়ে তিনটে তখন কতকগুলি ব্যস্তবাগীশ লোক পরস্পরকে জাগ্রত এবং প্রাতঃকৃত্যে প্রবৃত্ত হতে উৎসাহিত করতে লাগল। আমি নিতান্ত কাতরভাবে শয্যা ত্যাগ করে আমার চৌকিটাতে ঠেস দিয়ে প্রভাতের প্রতীক্ষায় বসে রইলুম। একটা বিচিত্র অভিশাপের মতো রাতটা কেটে গেল। একজন খালাসীর কাছে সংবাদ পেলুম, স্টীমার এমনি আটকে গেছে আজ সমস্ত দিন নড়বে না। একজন কর্মচারীকে জিজ্ঞাসা করলুম, কলকাতামুখী কি কোনো জাহাজ ইতিমধ্যে পাওয়া যাবে। সে হেসে বললে, এই জাহাজই গম্য স্থানে পৌঁছে পুনশ্চ কলকাতায় ফিরবে, অতএব ইচ্ছে করলে এই জাহাজে ক'রেই ফিরতে পারি। সৌভাগ্যক্রমে অনেক টানাটানির পর প্রায় দশটার কাছাকাছি জাহাজ চলতে আরম্ভ করলে।

কলকাতা

৩১ অগস্ট ১৮৯১

২৮

চাঁদনি চক। কটক

৩ সেপ্টেম্বর ১৮৯১

আমাদের উকিল হরিবল্লভবাবু খুব মোটাসোটা বর্ধিষ্ণু চেহারার লোক— তাঁর ভাবখানা খুব একজন লম্বাচৌড়া কৃষ্ণবিষ্ণুর মতো। বয়স যথেষ্ট হয়েছে। একখানি কোঁচানো চাদর কাঁধে, ফিটফাট সাজ, গায়ে এসেন্সের গন্ধ, দু-থাক চিবুক, প্রমাণসই গোঁফ, কপাল গড়ানে, বড়ো বড়ো ড্যাবা চোখ আত্মম্ভরিতায় অর্ধনিমীলিত, কথা কবার সময় চোখের তারা আকাশের দিকে ওঠে— জলদগম্ভীর স্বরে অতি মৃদুমন্দ সুস্থ সহাস্যভাবে কথা কয়— সময় যেন অনুগত ভৃত্যের মতো তাঁর অবসর-অপেক্ষায় এক পাশে স্তব্ধভাবে দাঁড়িয়ে আছে – কোনো বিষয়ে তিলমাত্র তাড়া নেই। চোখ দুটো উল্টে আমাকে একবার জিজ্ঞাসা করলে, 'জ্যোতি এখন কোথায় আছে ?' প্রশ্নকর্তার অবিচলিত গাম্ভীর্যে আমার অন্তঃকরণ সসম্ভ্রমে শশব্যস্ত হয়ে উঠল— আমি মৃদু বিনীতভাবে আমার দাদার রাজধানীতে অবস্থান জ্ঞাপন করলুম। তিনি বললেন 'বীরেন্দ্রের সঙ্গে আমি একসঙ্গে পড়েছি।' শুনে আমার চিত্ত আরও অভিভূত হয়ে পড়ল। এর উপরে যখন তিনি— কারও পরামর্শের অপেক্ষা না রেখে অকস্মাৎ অসময়ে এখানে আসা সম্বন্ধে আমার বালকোচিত অবিবেচনার উল্লেখ করলেন তখন আমি কী রকম ম্লান অপ্রতিভ হয়ে গেলুম তুই কতকটা অনুমান করতে পারবি। আমি কেবলই নতমুখে বারবার করে বলতে লাগলুম— আমি প্রকৃত অবস্থা কিছুই জানতুম না, আর কখনো আসি নি, এই প্রথম আসছি। তার থেকে তর্ক উঠল 'জ্যোতি কখন এসেছিল'। সময় নির্ণয় সম্বন্ধে বরদার সঙ্গে তাঁর ঘোর অনৈক্য হল। তিনি 74/75 বলেন, বরদা বলে তার পূর্বে। এর থেকে বুঝতে পারবি ইতিহাস লেখা কত শক্ত। তাই মনে করছি এইবার থেকে আমার চিঠিতে তারিখ দিতে হবে।

কলকাতা। ৬ সেপ্টেম্বর ১৮৯১

২৯

তিরন

৭ সেপ্টেম্বর ১৮৯১

বালিয়ার ঘাটটি বেশ দেখতে। দুই ধারে বেশ বড়ো বড়ো গাছ— সব-সুদ্ধ খালটা দেখে সেই পুনার ছোটো নদীটি মনে পড়ে।··· আমি ভালো করে ভেবে দেখলুম এই খালটাকে যদি নদী বলে জানতুম তা হলে ঢের বেশি ভালো লাগত। দুই তীরে বড়ো বড়ো নারকোলগাছ, আমগাছ এবং নানাজাতীয় ছায়াতরু, ঢালু পরিষ্কার তট সুন্দর সবুজ ঘাস এবং অসংখ্য নীল পুষ্পিত লজ্জাবতীলতায় আচ্ছন্ন ; কোথাও বা কেয়াবন ; যেখানে গাছগুলি একটু বিরল সেইখান থেকে দেখা যায় খালের উঁচু পাড়ের নীচে একটা অপার মাঠ ধু ধু করছে, বর্ষাকালে শস্যক্ষেত্র এমনি গাঢ় সবুজ হয়েছে যে, দুটি চোখ যেন একেবারে ডুবে যায় ; মাঝে মাঝে খেজুর এবং নারকেল গাছের মণ্ডলীর মধ্যে ছোটো ছোটো গ্রাম ; এবং এই-সমস্ত দৃশ্য বর্ষাকালের স্নিগ্ধ মেঘাচ্ছন্ন আনত আকাশের নীচে শ্যামচ্ছায়াময় হয়ে আছে। খালটি তার দুই পরিষ্কার সবুজ শস্পতটের মাঝখান দিয়ে সুন্দর ভঙ্গীতে বেঁকে বেঁকে চলে গেছে। মৃদু মৃদু স্রোত ; যেখানে খুব সংকীর্ণ হয়ে এসেছে সেখানে জলের কিনারার কাছে কাছে কুমুদবন এবং বড়ো বড়ো ঘাস দেখা দিয়েছে। সবসুদ্ধ ··· একটা ইংরিজি streamএর মতো। কিন্তু তবু মনের মধ্যে একটা আক্ষেপ থেকে যায় এটা একটা কাটা খাল বৈ নয়— এর জলকলধ্বনির মধ্যে অনাদি প্রাচীনত্ব নেই, এ কোনো দূর দুর্গম জনহীন পর্বতগুহার রহস্য জানে না— কোনো-একটি প্রাচীন স্ত্রীনাম ধারণ করে অতি অজ্ঞাতকাল থেকে দুই তীরের গ্রামগুলিকে স্তন্য দান করে আসে নি— এ কখনো কুলুকুলু করে বলতে পারে না—

মেন মে কাম অ্যান্‌ড্ মেন মে গো
বাট আই গো অন ফর এভার।

প্রাচীনকালের বড়ো বড়ো দিগ্বিও এর চেয়ে ঢের বেশি গৌরব লাভ করেছে। এর থেকেই বেশ বোঝা যায় একটা প্রাচীন বড়ো বংশ অনেক বিষয়ে হীন হলেও কেন এত সমাদর লাভ করে। তাদের উপরে যেন বহুকালের একটা সম্পদ্‌শ্রীর আভা থাকে। একজন সোনার ব্যাপারী হঠাৎ বড়ো মানুষ হয়ে উঠলে অনেক সোনা পায়, কিন্তু সেই সোনার লাবণ্যটুকু শীঘ্র পায় না। যা হোক, আর একশো বৎসর পরে যখন এই তীরের গাছগুলো আরও অনেক বড়ো হয়ে উঠবে, তক্‌তোকে শাদা মাইলস্টোন্‌গুলো অনেকটা ক্ষয়ে গিয়ে শৈবালাচ্ছন্ন ম্লান হয়ে আসবে, লকের উপরে ক্ষোদিত 1871 তারিখ যখন অনেক দূরবর্তী বলে মনে হবে, তখন যদি আমি আমার প্রপৌত্র-জন্ম লাভ করে এই খালের মধ্যে বোট নিয়ে আমাদের পাণ্ডুয়া জমিদারি তদন্ত করতে যেতে পারি তখন আমার মনের মধ্যে অনেকটা ভিন্ন রকম ভাবোদয় হতে পারে সন্দেহ নেই। কিন্তু, হায় আমার প্রপৌত্র! তার ভাগ্যে কী আছে কে জানে! হয়তো একটা অজ্ঞাত অখ্যাত কেরানিগিরি। ঠাকুরবংশের একটা ছিন্ন টুকরো, বহুদূরে প্রক্ষিপ্ত হয়ে একটা মৃত উল্কাখণ্ডের মতো হয়তো জ্যোতির্হীন নির্বাপিত। কিন্তু আমার উপস্থিত দুর্দশা এত আছে যে আমার প্রপৌত্রের জন্যে বিলাপ করবার কোনো আবশ্যক নেই। ·· চারটের সময়ে তারপুরে পৌঁছনো গেল। এইখানে আমাদের পাল্কিযাত্রা আরম্ভ হল। মনে করলুম ছ ক্রোশ পথ, সন্ধে আটটার মধ্যেই আমাদের কুঠিতে পৌঁছতে পারব। মাঠের পর মাঠ, গ্রামের পর গ্রাম, মাইলের পর মাইল কেটে যাচ্ছে— ছ ক্রোশ পথ আর ফুরোয় না। সন্ধে সাড়ে সাতটার সময় বেহারাদের জিজ্ঞাসা করলুম আর কতদূর, তারা বললে— আর বেশি নেই, তিন ক্রোশের কিছু উপর বাকি আছে। শুনে পাল্কির মধ্যে একটু নড়েচড়ে বসলুম। পাল্কিতে আমার আধখানা বৈ ধরে না— কোমর টন্‌ টন্‌ করছে, পা ঝিন্‌

ঝিন্ করছে, মাথা ঠক্ ঠক্ করছে— যদি নিজেকে তিন চার ভাঁজ করে মুড়ে রাখবার কোনো উপায় থাকত তা হলেই এই পাল্কিতে কিছু সুবিধে হতে পারত। রাস্তা অতি ভয়ানক। সর্বত্রই এক-হাঁটু কাদা— এক এক জায়গায় পিছলের ভয়ে বেহারারা অতি সাবধানে এক-এক পা করে পা ফেলছে। তিন-চার বার তাদের পা হড়কে গিয়েছিল, তাড়াতাড়ি সামলে নিলে। মাঝে মাঝে রাস্তা নেই— ধানের ক্ষেতে অনেকখানি করে জল দাঁড়িয়েছে— তারই উপর দিয়ে ছপ্ ছপ্ শব্দ করে এগোচ্ছি। মেঘে রাত খুব অন্ধকার হয়ে এসেছে, টিপ্ টিপ্ করে বৃষ্টি পড়ছে, তৈলাভাবে মশালটা মাঝে মাঝে নিভে যাচ্ছে— আবার অনেক ফুঁ দিয়ে দিয়ে জ্বালাতে হচ্ছে, বেহারারা সেই আলোকের অভাব নিয়ে ভারী বকাবকি বাধিয়ে দিয়েছে। এমনি করে খানিক দূরে এলে পর বরকন্দাজ জোড় হস্তে নিবেদন করলে— একটা নদী এসেছে, এইখানে পাল্কি নৌকো করে পার করতে হবে, কিন্তু এখনো নৌকো এসে পৌঁছোয় নি, অবিলম্বে এল ব'লে— অতএব খানিক ক্ষণ এইখানে পাল্কি রাখতে হবে। পাল্কি তো রাখলে। তার পরে নৌকো আর কিছুতে এসে পৌঁছয় না। আস্তে আস্তে মশালটা নিভে গেল। সেই অন্ধকার নদীতীরে বরকন্দাজগুলো ভাঙা গলায় ঊর্ধ্বশ্বাসে নৌকোওয়ালাকে ডাকতে লাগল— নদীর পরপার থেকে তার প্রতিধ্বনি ফিরে আসতে লাগল, কিন্তু কোনো নৌকোওয়ালা সাড়া দিলে না। 'মুকুন্দো-ও-ও-ও'! 'বালকৃষ্ণ-অ-অ-অ-অ!' 'নীলকণ্ঠ-অ-অ-অ-অ'! অমন কাতরস্বরে আহ্বান করলে গোলোকধাম থেকে মুকুন্দ এবং কৈলাসশিখর থেকে নীলকণ্ঠ নেমে আসতেন— কিন্তু আমাদের কর্ণধার কর্ণ রোধ করে অবিচলিত ভাবে নিজ নিকেতনে বিশ্রাম করতে লাগল। নির্জন নদীতীরে একটি কুঁড়েঘর মাত্রও নেই, কেবল পথপার্শ্বে চালক এবং বাহন-হীন একটি শূন্য গোরুর গাড়ি পড়ে রয়েছে— আমাদের বেহারাগুলো তারই উপর

চেপে বসে বিজাতীয় ভাষায় কলরব করতে লাগল। মক্ মক্ শব্দে ব্যাঙ ডাকছে এবং ঝিঁঝিঁর ডাকে সমস্ত রাত্রি পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে। আমি মনে করলুম এইখানেই পাল্কির মধ্যে বেঁকেচুরে তুমড়ে আজ রাতটা কাটাতে হবে— মুকুন্দ এবং নীলকণ্ঠ বোধ হয় কাল প্রভাতে এসে উপস্থিত হতেও পারে। মনে মনে গাইতে লাগলুম—

ওগো, যদি নিশিশেষে আসে হেসে হেসে
মোর হাসি আর রবে কি!
এই জাগরণে ক্ষীণ বদনমলিন
আমারে হেরিয়া কবে কী!

যাই হোক-না কেন উড়ে ভাষায় কবে, আমি কিছুই বুঝতে পারব না। কিন্তু মুখে যে আমার হাসি থাকবে না সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। অনেক ক্ষণ এই ভাবে কেটে গেল। এমন সময় হুঁই-হাঁই হুঁই-হাঁই শব্দে বরদার পাল্কি এসে উপস্থিত হল। বরদা নৌকো আসার কোনো সম্ভাবনা না দেখে হুকুম দিলেন, পাল্কি মাথায় করে নদী পার করতে হবে। শুনে বেহারারা অনেক ইতস্ততঃ করতে লাগল এবং আমার মনেও দয়া এবং কিঞ্চিৎ দ্বিধা উপস্থিত হতে লাগল। যা হোক, অনেক বাক্-বিতণ্ডার পর তারা হরিনাম উচ্চারণ করতে করতে পাল্কি মাথায় করে নদীর মধ্যে নাবলে। বহু কষ্টে নদী পার হল। তখন রাত সাড়ে দশটা। আমি কোনো রকম গুটিসুটি মেরে শুয়ে পড়লুম। বেশ খানিকটা নিদ্রাকর্ষণ হয়েছে এমন সময়ে হঠাৎ একটা বেহারার পা পিছলে গিয়ে পাল্কিটা খুব একটা নাড়া পেলে— অকস্মাৎ ঘুম ভেঙে গিয়ে বুকের ভিতর ভারী ধড়াস্ ধড়াস্ করতে লাগল। তার পর থেকে অর্ধ-ঘুম অর্ধ-জাগরণে রাত্তির দুপুরের সময় আমাদের পাণ্ডুয়ার কুঠিতে এসে উত্তীর্ণ হলুম।

কলকাতা
১১ সেপ্টেম্বর ১৮৯১

শিলাইদহ

৯ সেপ্টেম্বর ১৮৯১

অনেক দিন পরে কাল মেঘবৃষ্টি কেটে গিয়ে শরতের সোনার রোদ্দুর উঠেছিল। পৃথিবীতে যে রোদ্দুর আছে সে কথা যেন একেবারে ভুলে গিয়েছিলুম; হঠাৎ যখন কাল দশটা এগারোটার পর রোদ্দুর ভেঙে পড়ল তখন যেন একটা নতুন জিনিস দেখে মনে অপূর্ব বিস্ময়ের উদয় হল। দিনটি বড়ো চমৎকার হয়েছিল। আমি দুপুর বেলায় স্নানাহারের পর বারান্দার সামনে একটি আরাম-কেদারার উপরে পা ছড়িয়ে দিয়ে অর্ধশয়ান অবস্থায় জাগ্রত স্বপ্নে নিযুক্ত ছিলুম। আমার চোখের সামনে আমাদের বাড়ির কম্‌পাউন্‌ডের কতকগুলি নারকোল গাছ— তার উদিকে যতদূর দৃষ্টি যায় কেবলই শস্যক্ষেত্র, শস্যক্ষেত্রের একেবারে প্রান্তভাগে গাছপালার একটুখানি ঝাপসা নীল আভাস মাত্র। ঘুঘু ডাকছে এবং মাঝে মাঝে গোরুর গলার নূপুর শোনা যাচ্ছে। কাঠবিড়ালি একবার ল্যাজের উপর ভর দিয়ে বসে মাথা তুলে চকিতের মধ্যে এ দিক ও দিক নিরীক্ষণ করে আবার চট্‌ করে পিঠের উপর ল্যাজ তুলে দিয়ে গাছের গুঁড়ি বেয়ে ডালপালার মধ্যে অদৃশ্য হচ্ছে। খুব একটা নিঃঝুম নিস্তব্ধ নিরালা ভাব। বাতাস অবাধে হু হু করে বয়ে আসছে— নারকোল গাছের পাতা ঝরঝর শব্দ করে কাঁপছে। দু-চার জন চাষা মাঠের এক জায়গায় জটলা করে ধানের ছোটো ছোটো চারা উপড়ে নিয়ে আঁটি করে বাঁধছে। কাজকর্মের মধ্যে এইটুকু কেবল দেখা যাচ্ছে।

কলকাতা

১৩ সেপ্টেম্বর ১৮৯১

৩১

শিলাইদহ

১ অক্টোবর ১৮৯১

বেলায় উঠে দেখলুম চমৎকার রোদ্দুর উঠেছে এবং শরতের পরিপূর্ণ নদীর জল তল্‌-তল্‌ থৈ-থৈ করছে। নদীর জল এবং তীর প্রায় সমতল— ধানের ক্ষেত সুন্দর সবুজ এবং গ্রামের গাছপালাগুলি বর্ষার স্নানে সতেজ এবং নিবিড় হয়ে উঠেছে। এমন সুন্দর লাগল সে আর কী বলব। দুপুর বেলা খুব এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেল। তার পরে বিকেলে পদ্মার ধারে আমাদের নারকোল-বনের মধ্যে সূর্যাস্ত হল। আমি নদীর ধারে উঠে আস্তে আস্তে বেড়াচ্ছিলুম। আমার সামনের দিকে দূরে আম-বাগানে সন্ধের ছায়া পড়ে আসছে এবং আমার ফেরবার মুখে নারকোল গাছগুলির পিছনে আকাশ সোনায় সোনালি হয়ে উঠেছে। পৃথিবী যে কী আশ্চর্য সুন্দরী এবং কী প্রশস্ত প্রাণ এবং গভীর ভাবে পরিপূর্ণ তা এইখানে না এলে মনে পড়ে না। যখন সন্ধেবেলা বোটের উপর চুপ করে বসে থাকি, জল স্তব্ধ থাকে, তীর আবছায়া হয়ে আসে, এবং আকাশের প্রান্তে সূর্যাস্তের দীপ্তি ক্রমে ক্রমে ম্লান হয়ে যায়, তখন আমার সর্বাঙ্গে এবং সমস্ত মনের উপর নিস্তব্ধ নতনেত্র প্রকৃতির কী-একটা বৃহৎ উদার বাক্যহীন স্পর্শ অনুভব করি! কী শান্তি, কী স্নেহ, কী মহত্ত্ব, কী অসীম করুণাপূর্ণ বিষাদ! এই লোকনিলয় শস্যক্ষেত্র থেকে ঐ নির্জন নক্ষত্রলোক পর্যন্ত একটা স্তম্ভিত হৃদয়রাশিতে আকাশ কানায় কানায় পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে, আমি তার মধ্যে অবগাহন করে অসীম মানসলোকে একলা বসে থাকি— কেবল মৌলবিটা পাশে দাঁড়িয়ে অবিশ্রাম বক্‌ বক্‌ করে আমাকে ব্যথিত করে তোলে।

কলকাতা

২ অক্টোবর ১৮৯১

শিলাইদহ

মঙ্গলবার, ২০ আশ্বিন। ১২৯৮।

আজ দিনটি বেশ হয়েছে বব্। ঘাটে দুটি একটি করে নৌকো লাগছে— বিদেশ থেকে প্রবাসীরা পুজোর ছুটিতে পোঁটলা পুঁটলি বাক্স ধামা বোঝাই ক'রে নানা উপহার সামগ্রী নিয়ে সম্বৎসর পরে বাড়ি ফিরে আসছে। দেখলুম একটি বাবু ঘাটের কাছাকাছি নৌকো আসতেই পুরোনো কাপড় বদলে একটি নতুন কোঁচানো ধুতি পরলে, জামার উপর শাদা রেশমের একখানি চায়না কোট গায়ে দিলে, আর একখানি পাকানো চাদর বহু যত্নে কাঁধের উপর ঝুলিয়ে ছাতা ঘাড়ে ক'রে গ্রামের অভিমুখে চলল। ধানের ক্ষেত মর্ মর্ করে কাঁপছে— আকাশে শাদা শাদা মেঘের স্তূপ— তারই উপর আম এবং নারকোল গাছের মাথা উঠেছে— নারকোলের পাতা বাতাসে ঝুর্ ঝুর্ করছে— চরের উপর দুটো একটা করে কাশ ফুটে ওঠবার উপক্রম করেছে— সব-সুদ্ধ বেশ একটা সুখের দৃশ্য। বিদেশ থেকে যে লোকটি এইমাত্র গ্রামে ফিরে এল তার মনের ভাব, তার ঘরের লোকদের মিলনের আগ্রহ, এবং শরৎকালের এই আকাশ, এই পৃথিবী, সকাল বেলাকার এই ঝিরুঝিরে বাতাস এবং গাছপালা তৃণগুল্ম নদীর তরঙ্গ সকলের ভিতরকার একটি অবিশ্রাম সঘন কম্পন, সমস্ত মিশিয়ে বাতায়নবর্তী এই একক যুবকটিকে সুখে দুঃখে এক রকম অভিভূত করে ফেলছিল। পৃথিবীতে জানলার ধারে একলা বসে চোখ মেলে দেখলেই মনে নতুন নতুন সাধ জন্মায়— নতুন সাধ ঠিক নয়— পুরোনো সাধ নানা নতুন মূর্তি ধারণ করতে আরম্ভ করে। পরশুদিন অমনি বোটের জানলার কাছে চুপ করে বসে আছি, একটা জেলেডিঙিতে একজন মাঝি গান গাইতে গাইতে চলে গেল— খুব যে সুস্বর তা নয়— হঠাৎ মনে পড়ে গেল বহুকাল হল ছেলেবেলায় বাবামশায়ের সঙ্গে বোটে করে পদ্মায় আসছিলুম— একদিন রাত্তির

প্রায় দুটোর সময় ঘুম ভেঙে যেতেই বোটের জানলাটা তুলে ধরে মুখ বাড়িয়ে দেখলুম নিস্তরঙ্গ নদীর উপরে ফুট্‌ফুটে জ্যোৎস্না হয়েছে, একটি ছোট্ট ডিঙিতে একজন ছোকরা একলা দাঁড় বেয়ে চলেছে, এমনি মিষ্টি গলায় গান ধরেছে— গান তার পূর্বে তেমন মিষ্টি কখনো শুনি নি। হঠাৎ মনে হল, আবার যদি জীবনটা ঠিক সেইদিন থেকে ফিরে পাই! আর একবার পরীক্ষা করে দেখা যায়— এবার তাকে আর তৃষিত শুষ্ক অপরিতৃপ্ত করে ফেলে রেখে দিই নে— কবির গান গলায় নিয়ে একটি ছিপ্‌ছিপে ডিঙিতে জোয়ারের বেলায় পৃথিবীতে ভেসে পড়ি, গান গাই এবং বশ করি এবং দেখে আসি পৃথিবীতে কোথায় কী আছে; আপনাকেও একবার জানান দিই, অন্যকেও একবার জানি; জীবনে যৌবনে উচ্ছ্বসিত হয়ে বাতাসের মতো একবার হু হু করে বেড়িয়ে আসি, তার পরে ঘরে ফিরে এসে পরিপূর্ণ প্রফুল্ল বার্ধক্য কবির মতো কাটাই। খুব যে একটা উঁচু আইডিয়াল তা নয়। জগতের হিত করা এবং যিশুখৃস্টের মতো মরা এর চেয়ে ঢের বেশি বড়ো আইডিয়াল হতে পারে— কিন্তু আমি সব-সুদ্ধ যে রকম লোক আমার ওটা মনেও উদয় হয় না, এবং ও রকম করে শুকিয়ে মরতে ইচ্ছেও করে না।··· উপবাস ক'রে, আকাশের দিকে তাকিয়ে, অনিদ্র থেকে, সর্বদা মনে মনে বিতর্ক ক'রে, পৃথিবীকে এবং মনুষ্যত্বকে কথায় কথায় বঞ্চিত ক'রে, স্বেচ্ছারচিত দুর্ভিক্ষে এই দুর্লভ জীবন ত্যাগ করতে চাই নে। পৃথিবী যে সৃষ্টি-কর্তার একটা ফাঁকি এবং শয়তানের একটা ফাঁদ তা না মনে ক'রে একে বিশ্বাস ক'রে, ভালোবেসে এবং যদি অদৃষ্টে থাকে তো ভালোবাসা পেয়ে, মানুষের মতো বেঁচে এবং মানুষের মতো মরে গেলেই যথেষ্ট— দেবতার মতো হাওয়া হয়ে যাবার চেষ্টা করা আমার কাজ নয়।

মানিকগঞ্জ
৮ অক্টোবর ১৮৯১

শিলাইদহ

২৯ আশ্বিন। ১২৯৮।

কাল সন্ধের সময় নদীর ধারে একবার পশ্চিম দিকের সোনার সূর্যাস্ত এবং একবার পুব দিকের রুপোর চন্দ্রোদয়ের দিকে ফিরে গোঁফে তা দিতে দিতে পায়চারি করে বেড়াচ্ছিলুম— রুগ্ন ছেলের দিকে মা যেমন করে তাকায় প্রকৃতি সেই রকম সুগভীর স্তব্ধ এবং স্নিগ্ধ বিষাদের সঙ্গে আমার মুখের দিকে চেয়ে ছিল— নদীর জল আকাশের মতো স্থির, এবং আমাদের দুটি বাঁধা নৌকো জলচর পাখির মতো মুখের উপর পাখা ঝেঁপে স্থির ভাবে ঘুমিয়ে আছে। এমন সময় মৌলবি এসে আমাকে ভীতকণ্ঠে চুপিচুপি খবর দিলে 'কলকাতার ভজিয়া আয়ছে'।··· এক মুহূর্তের মধ্যে কত রকম অসম্ভব আশঙ্কা যে মনে উদয় হল তা আর বলতে পারি নে।··· যা হোক, মনের চাঞ্চল্য দমন করে গম্ভীর স্থির ভাবে আমার রাজচৌকিতে এসে ব'সে ভজিয়াকে ডেকে পাঠালুম— ভজিয়া যখন ঘরে প্রবেশ করেই কাঁদুনির সুর ধরে আমার পা জড়িয়ে ধরলে তখনি বুঝলুম দুর্ঘটনা যদি কারও হয়ে থাকে তো সে ভজিয়ার। তার পরে তার সেই বাঁকা বাংলার সঙ্গে নাকের সুর এবং চোখের জল মিশিয়ে বিস্তর অসংলগ্ন ঘটনা বলে যেতে লাগল। বহু কষ্টে তার যা সার সংগ্রহ করা গেল সেটি হচ্ছে এই— ভজিয়া এবং ভজিয়ার মায়ে প্রায়ই ঝগড়া বেধে থাকে— কিছুই আশ্চর্য নয়— কারণ, দুজনেই আমাদের পশ্চিম আর্যাবর্তের বীরাঙ্গনা, কেউ হৃদয়ের কোমলতার জন্যে প্রসিদ্ধ নয়। এর মধ্যে একদিন সন্ধেবেলায় মায়ে-ঝিয়ে মুখোমুখি থেকে হাতাহাতি বেধে গিয়েছিল— স্নেহালাপ থেকে যে আলিঙ্গন তা নয়, গালাগালি থেকে মারামারি। সেই বাহুযুদ্ধে তার মায়েরই পতন হয়— এবং সে কিছু গুরুতর আহতও হয়েছিল। ভজিয়া বলে, তার মা তাকে একটা কাঁসার বাটি নিয়ে মস্তক লক্ষ্য করে তাড়া করে, সে

আত্মরক্ষার চেষ্টা করাতে দৈবাৎ তার বালাটা তার মায়ের মাথায় না কোথায় লেগে রক্তপাত হয়। যা হোক, এই-সব ব্যাপারে ছোটোবউ সেই মুহূর্তেই তাকে তেতালা থেকে নিম্নলোকে নির্বাসিত করে দেন। তার পরে কিছুতেই আর ক্ষমা করছেন না। দেখ্ দেখি বব্, এখানকার সিকস্তি পয়স্তি খোদ্‌কস্ত পাইকস্ত ওজরি বেওজরির মধ্যে কলকাতার তেতালা থেকে এক নাকী সুরের গৃহবিপ্লব এসে উপস্থিত। ব্যাপারটা তিন-চার দিন হয়েছে, কিন্তু আমি কোনো খবরই পাই নি— মাথার উপরে একেবারে হঠাৎ বিনা নোটিশে ভজ্রিয়াঘাত।

মানিকগঞ্জ
১৮ অক্টোবর ১৮৯১

শিলাইদহ

২ কার্তিক। ১২৯৮।

আমার বোধ হয় কলকাতা ছেড়ে বেরিয়ে এলেই মানুষের নিজের স্থায়িত্ব এবং মহত্ত্বের উপর বিশ্বাস অনেকটা হ্রাস হয়ে আসে। এখানে মানুষ কম এবং পৃথিবীটাই বেশি— চারি দিকে এমন সব জিনিস দেখা যায় যা আজ তৈরি করে কাল মেরামত করে পরশু দিন বিক্রি করে ফেলবার নয়, যা মানুষের জন্মমৃত্যু ক্রিয়াকলাপের মধ্যে চিরদিন অটলভাবে দাঁড়িয়ে আছে— প্রতিদিন সমানভাবে যাতায়াত করছে এবং চিরকাল অবিশ্রান্ত ভাবে প্রবাহিত হচ্ছে। পাড়াগাঁয়ে এলে আমি মানুষকে স্বতন্ত্রমানুষ-ভাবে দেখি নে— যেমন নানা দেশ দিয়ে নদী চলেছে, মানুষের স্রোতও তেমনি কলরব-সহকারে গাছপালা গ্রাম নগরের মধ্যে দিয়ে এঁকে বেঁকে চিরকাল ধরে চলেছে— এ আর ফুরোয় না। মেন মে কাম অ্যান্‌ড্‌ মেন মে গো বাট আই গো অন ফর এভার —কথাটা ঠিক সংগত নয়। মানুষও নানা শাখা প্রশাখা নিয়ে নদীর মতোই চলেছে— তার এক প্রান্ত জন্মশিখরে আর-এক প্রান্ত মরণসাগরে, দুই দিকে দুই অন্ধকার রহস্য, মাঝখানে বিচিত্র লীলা এবং কর্ম এবং কলধ্বনি— কোনোকালে এর আর শেষ নেই। ওই শোন্‌ মাঠে চাষা গান গাচ্ছে, জেলেডিঙি ভেসে চলেছে, বেলা যাচ্ছে, রৌদ্র ক্রমেই বেড়ে উঠছে— ঘাটে কেউ স্নান করছে কেউ জল নিয়ে যাচ্ছে— এমনি করে এই শান্তিময়ী নদীর দুই তীরে গ্রামের মধ্যে গাছের ছায়ায় শত শত বৎসর গুন্‌ গুন্‌ শব্দ করতে করতে ছুটে চলেছে— এবং সকলের মধ্যে থেকে একটা করুণ ধ্বনি জেগে উঠছে, আই গো অন ফর এভার! দুপুর বেলার নিস্তব্ধতার মধ্যে যখন কোনো রাখাল দূর থেকে ঊর্ধ্বকণ্ঠে তার সঙ্গীকে ডাক দেয়, এবং একটা নৌকো ছপ্‌ ছপ্‌ শব্দ করে ঘরের দিকে ফিরে যায়, এবং

মেয়েরা ঘড়া দিয়ে জল ঠেলে দেয় তারই ছল্‌ছল্‌ শব্দ ওঠে, তার সঙ্গে মধ্যাহ্নপ্রকৃতির নানা রকম অনির্দিষ্ট ধ্বনি— দুই-একটা পাখির ডাক, মৌমাছির গুন্‌ গুন্‌, বাতাসে বোটটা আস্তে আস্তে বেঁকে যেতে থাকে তারই এক রকম কাতর সুর— সব-সুদ্ধ এমন একটা করুণ ঘুমপাড়ানি গান— যেন মা সমস্ত বেলা বসে বসে তার ব্যথিত ছেলেকে ঘুম পাড়িয়ে ভুলিয়ে রাখতে চেষ্টা করছে— বলছে, আর ভাবিস নে, আর কাঁদিস নে, আর কাড়াকাড়ি মারামারি করিস নে, আর তর্ক বিতর্ক রাখ্‌— একটুখানি ভুলে থাক্‌, একটুখানি ঘুমো! ব'লে তপ্ত কপালে আস্তে আস্তে করাঘাত করছে।

মানিকগঞ্জ
২০ অক্টোবর ১৮৯১

৩৫

শিলাইদহ

সোমবার, ৩ কার্তিক। ১২৯৮।

কোজাগর পূর্ণিমার দিন··· নদীর ধারে ধারে আস্তে আস্তে বেড়াচ্ছিলুম —আর মনের মধ্যে স্বগত কথোপকথন চলছিল— ঠিক 'কথোপকথন' বলা যায় না— বোধ হয় আমি একলাই বকে যাচ্ছিলুম আর আমার সেই কাল্পনিক সঙ্গীটি অগত্যা চুপ্‌চাপ করে শুনে যাচ্ছিল; নিজের হয়ে একটা জবাব দেওয়াও সে বেচারার জো ছিল না— আমি তার মুখে যদি একটা নিতান্ত অসংগত কথাও বসিয়ে দিতুম তা হলেও তার কোনো উপায় ছিল না। কিন্তু কী চমৎকার হয়েছিল! কী আর বলব! কতবার বলেছি, কিন্তু সম্পূর্ণ কিছুতেই বলা যায় না। নদীতে একটি রেখামাত্র ছিল না— ও—ই সেই চরের পরপারে যেখানে পদ্মার জলের শেষ প্রান্ত দেখা যাচ্ছে সেখান থেকে আর এ পর্যন্ত একটি প্রশস্ত জ্যোৎস্নারেখা ঝিক্ ঝিক্ করছে— একটি লোক নেই, একটি নৌকো নেই— ও পারের নতুন চরে একটি গাছ নেই, একটি তৃণ নেই— মনে হয় যেন একটি উজাড় পৃথিবীর উপরে একটি উদাসীন চাঁদের উদয় হচ্ছে— জনশূন্য জগতের মাঝখান দিয়ে একটি লক্ষ্যহীন নদী বহে চলেছে, মস্ত একটা পুরাতন গল্প এই পরিত্যক্ত পৃথিবীর উপরে শেষ হয়ে গেছে, আজ সেই-সব রাজা রাজকন্যা পাত্র মিত্র স্বর্ণপুরী কিছুই নেই, কেবল সেই গল্পের 'তেপান্তরের মাঠ' এবং 'সাত সমুদ্র তেরো নদী' ম্লান জ্যোৎস্নায় ধূ ধূ করছে। ··· আমি যেন এই মুমূর্ষু পৃথিবীর একটিমাত্র নাড়ীর মতো আস্তে আস্তে চলছিলুম। আর তোরা ছিলি আর-এক পারে, জীবনের পারে— সেখানে এই বৃটিশ গবর্মেণ্ট্ এবং ঊনবিংশ শতাব্দী এবং চা এবং চুরোট। সেখান থেকে একটি ছোটো নৌকো করে কাউকে যদি তাতে তুলে নিয়ে এই বসতি-হীন জ্যোৎস্নালোকে উপস্থিত করতে পারতুম, এই উঁচু পাড়ের উপর

দাঁড়িয়ে এই প্রান্তহীন জল এবং বালুকারাশির দিকে চেয়ে দেখতুম এবং চারি দিকে অগাধ রাত্রি ঝাঁ ঝাঁ করত! কতদিন থেকে কত লোক আমার মতো এই রকম একলা দাঁড়িয়ে অনুভব করেছে এবং কত কবি প্রকাশ করতে চেষ্টা করেছে, কিন্তু হে অনির্বচনীয়, এ কী, এ কিসের জন্যে, এ কিসের উদ্‌বেগ, এই নিরুদ্দেশ নিরাকুলতার নাম কী, অর্থ কী— হৃদয়ের ঠিক মাঝখানটা বিদীর্ণ করে কবে সেই সুর বেরোবে যার দ্বারা এর সংগীত ঠিক ব্যক্ত হবে!

মানিকগঞ্জ
২১ অক্টোবর ১৮৯১

৩৬

শিলাইদহ

শনিবার, ৬ অগ্রহায়ণ। ১২৯৮।

সল্লির একখানা চিঠি পেয়েছি। সে আমার ভগ্নহৃদয় এবং রুদ্রচণ্ড সমালোচনা করে লিখেছে। পূর্বে ভগ্নহৃদয়ের পক্ষ অবলম্বন করে সে আমার সঙ্গে অনেক তর্ক করত— এবার আমার সঙ্গে তার মতের ঐক্য হয়েছে। অর্থাৎ ভগ্নহৃদয়ের অনেক নিন্দে করেছে। বলেছে ওর কবি মুরলা চপলা প্রভৃতিরা একটা কল্পনাকাননের লোক…

কলকাতা

২২ নভেম্বর ১৮৯১

শিলাইদহ

রবিবার, ৪ জানুয়ারি। ১৮৯২।

কিছু আগেই পাবনা থেকে এঞ্জিনিয়ার তার মেম এবং কচিকাচা নিয়ে এসে উপস্থিত। জানিস তো, বব্, আতিথ্য করাটা আমার তেমন সহজে আসে না— মাথা একেবারে ঘুলিয়ে যায়— তা ছাড়া গোটা দুয়েক বাচ্ছা সঙ্গে করে নিয়ে আসবে তা আমি জানতুম না। এবারে আমি একলা থাকব বলে খাদ্যদ্রব্যও বিশেষ কিছু সঙ্গে নেই। যা হোক, চোখ কান বুজে যেমন-তেমন করে চালাবার চেষ্টায় আছি। মেম আবার চা খায়, আমার চা নেই— মেম ছেলেবেলা থেকে ডাল দুচক্ষে দেখতে পারে না, আমি অন্য খাদ্যের অভাবে ডাল তৈরি করতে দিয়েছি, মেম ইয়ার্‌স্ এন্‌ড্ টু ইয়ার্‌স্ এন্‌ড্ মাছ ছোঁয় না, আমি মাগুর মাছের ঝোল রাঁধিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে আছি। কী ভাগ্যি কান্‌ট্রি সুইট্‌স্ ভালোবাসে, তাই একটা বহুকালের শক্ত শুকনো সন্দেশ বহুকষ্টে কাঁটা দিয়ে ভেঙে খেলে। এক বাক্স বিস্কুট গতবারের রসদের অবশেষ-স্বরূপে ছিল, সেটা কাজে লাগবে। আমি আবার একটা মস্ত গলদ করেছি— আমি সাহেবকে বলেছি, তোমার মেম চা খায়, কিন্তু দুর্ভাগ্য-ক্রমে আমার চা নেই, কোকো আছে। সে বললে, 'আমার মেম চায়ের চেয়ে কোকো বেশি ভালোবাসে।' আমি আলমারি ঘেঁটে দেখি কোকো নেই— সবগুলোই কলকাতায় ফিরে গেছে। আবার তাকে বলতে হবে, চা'ও নেই কোকোও নেই, পদ্মার জল আর চায়ের কাৎলি আছে— দেখি কিরকম মুখের ভাব হয়। সাহেবের ছেলে দুটো এমন দুরন্ত এবং দুষ্টু দেখতে সে আর কী বলব? মেমটাকে যত বদ দেখতে এবং ছাঁটা-চুল মনে করেছিলুম ততটা নয়— মাঝারি রকম চেহারা। মাঝে মাঝে সাহেবে মেমেতে খুব গুরুতর ঝগড়া হয়ে যাচ্ছে আমি এ বোট থেকে শুনতে পাচ্ছি। ছেলেদের কান্না,

চাকর-বাকরদের চেঁচামেচি, এবং দম্পতির তর্ক বিতর্কের জ্বালায় অস্থির হয়ে আছি। আজ আর কোনো কাজকর্ম লেখাপড়ার সুবিধে দেখছি নে। (মেমটা তার ছেলেকে ধমকাচ্ছে : What a little শুয়ার you are !) দেখ্ তো আমার ঘাড়ে এসব উপদ্রব কেন ? মেমটা আবার আজ বিকেলে উপরে উঠে বেড়াতে যাবে, আমাকে সঙ্গে যেতে বলছে— এমনি ঝালাফালা হয়ে বসে আছি, আমাকে দেখলে তুই বোধ হয় হেসে অস্থির হয়ে যেতিস— আমি নিজেই এক-একবার আপনার কথা ভেবে বড়ো দুঃখের হাসি হাসছি। একটা মেম বগলে ক'রে জমিদারিতে বেড়ানো কখনো কল্পনা করি নি। প্রজারা খুব আশ্চর্য হয়ে যাবে সন্দেহ নেই। কাল সকালে এদের কোনোমতে বিদায় করতে পারলে বাঁচা যায়, যদি বলে আর একটা দিন থেকে যাব তা হলে মরে যাব বব্।

কলকাতা
৫ জানুয়ারি ১৮৯২

শিলাইদহ

সোমবার, ৬ জানুয়ারি। ১৮৯২।

সন্ধে হয়ে গেছে। গরমের সময় যখন বোটে ছিলুম, এই সময়টা বোটের জানলার কাছে বসে আলো নিবিয়ে দিয়ে চুপচাপ পড়ে থাকতুম; নদীর শব্দে, সন্ধ্যার বাতাসে, নক্ষত্র-ভরা আকাশের নিস্তব্ধতায় মনের সমস্ত কল্পনা মধুর আকার ধরে আমাকে ঘিরে বসত; অনেক রাত পর্যন্ত এক প্রকার নিবিড় নির্জন দুঃখ এবং আনন্দে কেটে যেত। শীতকালের সন্ধেবেলায় সমস্ত প্রকৃতিকে বাইরে ফেলে জানলা দরজা বন্ধ করে বোটের এই ক্ষুদ্র কাষ্ঠময় গহ্বরের মধ্যে একটি বাতি জ্বেলে মনটাকে তেমন দৌড় দিতে পারি নে— যেন নিজের সঙ্গে নিজেকে বড়ো বেশি ঘেঁষাঘেঁষি ঠাসাঠাসি করে থাকতে হয়। এ রকম অবস্থায় আপনার মনটিকে নিয়ে থাকা বড়ো শক্ত। ··· সাহিত্যের মধ্যে দুটি মাত্র গল্পের বই এনেছিলুম, কিন্তু এমনি আমার পোড়া কপাল, আজ বিদায় নেবার সময় এঞ্জিনিয়ার সাহেবের মেম সেই দুটি বই ধার নিয়ে গেছেন, কবে শোধ করবেন তার কোনো ঠিকানা নেই। বই দুটো হাতে তুলে নিয়ে সলজ্জ কাকুতির ভাবে তিনি বলতে আরম্ভ করলেন 'মিস্টার টাগোর বুড্ ইয়ু'— কথাটা শেষ করতে না করতে আমি খুব সজোরে ঘাড় নেড়ে বললুম 'সার্টেন্‌লি'। এতে কতটা দূর কী বোঝায় ঠিক বলতে পারি নে। আসলে, তাঁরা তখন বিদায় নিচ্ছিলেন, সেই উৎসাহে আমি আমার আর্ধেক রাজত্ব দিয়ে ফেলতে পারতুম (যে পেত তার যে খুব বেশি লাভ হত তা নয়।) যা হোক, তারা আজ গেছে বব্, আমার এই দুটো দিন একেবারে ঘুলিয়ে দিয়ে গেছে— আবার থিতিয়ে নিতে দুদিন যাবে— মেজাজটা এমনি খারাপ হয়ে আছে যে ভয়ে ভয়ে আছি পাছে কাউকে অন্যায় অকারণে তাড়না করে উঠি— এত বেশি সাবধানে আছি যে সহজ অবস্থায় যখন একজনকে ধমক দিতুম এখন

তাকে খুব নরম নরম করে বলছি— মেজাজ বিগড়ে গেলে অনেক সময় আমার এই রকম উল্টো রকম ব্যাপার হয় যে, সে সময়ে ছেলেরা কাছে থাকলে ভয় হয়··· পাছে তাদের লঘু দোষে গুরু দণ্ড দিই এই জন্য তাদের দণ্ডই দিই নে, খুব দৃঢ় করে সহিষ্ণুতা অবলম্বন করে থাকি।

কলকাতা
৭ জানুয়ারি ১৮৯২

শিলাইদহ কুঠিবাড়ি

অতখানি আত্মপ্রকাশ কি ভালো হয়েছিল, তাই হৃদয় আবার একটু একটু করে বন্ধ করছে। বাস্তবিক, বিদেশে বিজন অবস্থায় প্রকৃতি বড়ো কাছাকাছির জিনিস— আমি সত্যি সত্যি দু-তিন দিন ধরে মাঝে মাঝে ভেবেছি, পূর্ণিমার পরদিন থেকে আমি আর এ জ্যোৎস্না পাব না —আমি যেন বিদেশ থেকে আরো একটু বিদেশে চলে যাব, কাজকর্মের পরে প্রতিদিন সন্ধেবেলায় যে-একটি শান্তিময় পরিচিত সৌন্দর্য আমার জন্যে নদীর তীরে অপেক্ষা করে থাকত সে আর থাকবে না— অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে বোটে ফিরে আসতে হবে। ··· কিন্তু আজ পূর্ণিমা, এ বৎসরকার বসন্তের এই প্রথম পূর্ণিমা, এর কথাটা লিখে রেখে দিলুম— হয়তো অনেক দিন পরে এই নিস্তব্ধ রাত্রিটি মনে পড়বে —ঐ টিটি পাখির ডাক -সুদ্ধ এবং ও পারের ঐ বাঁধা নৌকোয় যে আলোটি জ্বলছে সেটি-সুদ্ধ— এই একটুখানি উজ্জ্বল নদীর রেখা, ঐ একটুখানি অন্ধকার বনের একটা পোঁচ— এবং ঐ নির্লিপ্ত উদাসীন পাণ্ডুবর্ণ আকাশ—

কলকাতা

১২ জানুয়ারি ১৮৯২

শিলাইদহ

বুধবার, ১২ ফেব্রুয়ারি। ১৮৯২।

সেদিন একটা কাগজে কালিদাসের একটা শ্লোক তুলে দিয়েছে, পড়ে একটু আশ্চর্য বোধ হল—

রম্যাণি বীক্ষ্য মধুরাংশ্চ নিশম্য শব্দান্
পর্য্যুৎসুকীভবতি যৎ সুখিতোঽপি জন্তুঃ।
তচ্চেতসা স্মরতি ন নূনমবোধপূর্বং
ভাবস্থিরাণি জননান্তরসৌহৃদানি॥

অস্যার্থ। রম্য বস্তু দেখে এবং মধুর শব্দ শুনে সুখী লোকের প্রাণও এমন পর্য্যুৎসুক হয় কেন? নিশ্চয়ই মনের অজ্ঞাতসারে পূর্বজন্মের কোনো বন্ধুর কথা মনে পড়ে॥ কালিদাসের মনটা যে মাঝে মাঝে অকারণে বিকল হয়ে উঠত তা বেশ বোঝা যায়। মেঘদূতেও কবি বলেছেন 'মেঘালোকে ভবতি সুখিনোঽপ্যন্যথাবৃত্তি চেতঃ'— মেঘ দেখলে সুখী লোকেরাও কেমন আনমনা হয়ে যায়। সৌন্দর্য যে মনের মধ্যে একটা নিগূঢ় রহস্যময় অসীম আকাঙ্ক্ষার উদ্রেক করে, যা মনকে জন্ম থেকে জন্মান্তর পর্যন্ত আকর্ষণ করে নিয়ে যায়, কালিদাসের কবিতার মধ্যে এই ভাবটা পড়ে আমার ভারী আনন্দ হল।...

কলকাতা
১৩ ফেব্রুয়ারি ১৮৯২

শিলাইদহ

শুক্রবার, ৭ এপ্রিল। ১৮৯২।

সকাল থেকে সুন্দর বাতাস দিচ্ছে। কোনো কাজ করতে ইচ্ছে করছে না। বোধ হয় এগারোটা কিম্বা সাড়ে এগারোটা বেজে গেছে। কিন্তু এ পর্যন্ত লেখাপড়া কিম্বা কোনো কাজে হাত দিই নি। সকাল থেকে একটি চৌকিতে স্থির হয়ে বসে আছি। মাথার মধ্যে কত টুকরো টুকরো লাইন এবং কত অসমাপ্ত ভাব যাতায়াত করছে, কিন্তু সেগুলোকে একত্র করে বাঁধি কিম্বা পরিস্ফুট করে তুলি এমন শক্তি অনুভব করছি নে। তোর সেই গানটা মনে পড়ছে পায়েরিয়া বাজে ঝনক ঝনক ঝন ঝন-নন নন নন— সুন্দর সকাল বেলায় মধুর বাতাসে নদীর মাঝখানে মাথার মধ্যে সেই রকম ঝননন নূপুর বাজছে, কিন্তু সে কেবল এ দিক ও দিক থেকে, অন্তরালে— কেউ ধরা দিচ্ছে না, দেখা দিচ্ছে না। তাই চুপচাপ করে বসে আছি। কিরকম জায়গায় আছি জানিস? নদীর জল অনেকটা শুকিয়ে এসেছে, কোথাও এক কোমরের বেশি জল আর প্রায় নেই, তাই বোটটাকে নদীর প্রায় মাঝখানে বেঁধে রাখা কিছুই শক্ত হয় নি। আমার ডান দিকের পারে চরের উপর চাষারা চাষ করছে এবং মাঝে মাঝে গোরুকে জল খাইয়ে নিয়ে যাচ্ছে। আমার বাম পারে শিলাইদহের নারকেল এবং আম -বাগান, ঘাটে মেয়েরা কাপড় কাচছে, জল তুলছে, স্নান করছে, এবং উচ্চৈঃস্বরে বাঙাল ভাষায় হাস্যালাপ করছে— যারা অল্পবয়সী মেয়ে তাদের জলক্রীড়া আর শেষ হয় না— একবার স্নান সেরে উপরে উঠছে আবার ঝুপ্ করে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ছে— তাদের নিশ্চিন্ত উচ্চহাস্য শুনতে বেশ লাগে। পুরুষরা গম্ভীর ভাবে এসে গোটাকতক ডুব মেরে তাদের নিত্যকর্ম সমাপ্ত করে চলে যায়— কিন্তু মেয়েদের যেন জলের সঙ্গে বেশি ভাব। পরস্পরের যেন একটা সাদৃশ্য এবং সখিত্ব আছে— জল এবং মেয়ে

উভয়েই বেশ সহজে ছল্‌ছল্‌ জ্বল্‌জ্বল্‌ করতে থাকে, একটা বেশ সহজ গতি ছন্দ তরঙ্গ এবং সংগীত আছে— সকল পাত্রেই আপনাকে স্থাপন করতে পারে— দুঃখতাপে অল্পে অল্পে শুকিয়ে যেতে পারে কিন্তু আঘাতে একেবারে জন্মের মতো দুখানা হয়ে ভেঙে যায় না। সমস্ত কঠিন পৃথিবীকে সে বাহুবন্ধনে আলিঙ্গন করে আছে, পৃথিবী তার অন্তরের গভীর রহস্য বুঝতে পারে না; সে নিজে শস্য উৎপাদন করে না, কিন্তু ভিতরে ভিতরে সে না থাকলে পৃথিবীতে একটি ঘাসও গজাতে পারত না। মেয়েকে পুরুষের সঙ্গে তুলনা করে টেনিসন বলেছেন: water unto wine। আমার আজকের মনে হচ্ছে: জল unto স্থল। তাই জন্যে মেয়েতে জলেতে বেশ মিশ খায়— অন্য অনেক রকম ভার বহন মেয়েকে শোভা পায় না, কিন্তু উৎস থেকে, কুয়ো থেকে, ঘাট থেকে জল তুলে নিয়ে যাওয়া কোনো কালেই মেয়েদের পক্ষে অসংগত মনে হয় না। গা ধোওয়া, স্নান করা, পুকুরের ঘাটে এক-কোমর জলে বসে পরস্পর গল্প করা, এ সমস্ত মেয়েদের পক্ষে কেমন শোভনীয়। আমি দেখেছি মেয়েরা জল ভালোবাসে, কেননা উভয়ে স্বজাত। অবিশ্রাম সহজ প্রবাহ এবং কলধ্বনি জল এবং মেয়ে ছাড়া আর কারও নেই। ইচ্ছে করলে আরও অনেক সাদৃশ্য দেখানো যেতে পারত, কিন্তু বেলাও বোধ করি অনেক হয়েছে, এবং একটা কথাকে নিয়ে বেশি নেংড়ানো কিছু নয়।

কলকাতা
৮ এপ্রিল ১৮৯২

৪২

শিলাইদহ

শনিবার, ৮ এপ্রিল। ১৮৯২।

এখানে এসে আমি এত এলিমেন্‌ট্‌স্‌ অফ পলিটিক্স্‌ এবং প্রব্লেম্‌স্‌ অফ দি ফ্যুচার পড়ছি শুনে বোধ হয় তোর খুব আশ্চর্য ঠেকতে পারে। আসল কথা, ঠিক এখানকার উপযুক্ত কোনো কাব্য নভেল খুঁজে পাই নে। যেটা খুলে দেখি সেই ইংরিজি নাম, ইংরিজি সমাজ, লন্‌ডনের রাস্তা এবং ড্রয়িংরুম, এবং যতরকম হিজিবিজি হাঙ্গাম। বেশ শাদাসিদে সহজ সুন্দর উন্মুক্ত দরাজ এবং অশ্রুবিন্দুর মতো উজ্জ্বল কোমল সুগোল করুণ কিছুই খুঁজে পাই নে। কেবল প্যাঁচের উপর প্যাঁচ, অ্যানালিসিসের উপর অ্যানালিসিস— কেবল মানবচরিত্রকে মুচড়ে নিংড়ে কুঁচকে-মুচকে তাকে সজোরে পাক দিয়ে দিয়ে তার থেকে নতুন নতুন থিয়োরি এবং নীতিজ্ঞান বের করবার চেষ্টা। সেগুলো পড়তে গেলে আমার এখানকার এই গ্রীষ্মশীর্ণ ছোটো নদীর শান্ত স্রোত, উদাস বাতাসের প্রবাহ, আকাশের অখণ্ড প্রসারতা, দুই কূলের অবিরল শান্তি, এবং চারি দিকের নিস্তব্ধতাকে একেবারে ঘুলিয়ে দেবে। এখানে পড়বার উপযোগী রচনা আমি প্রায় খুঁজে পাই নে, এক বৈষ্ণব কবিদের ছোটো ছোটো পদ ছাড়া। বাংলার যদি কতকগুলি ভালো ভালো মেয়েলি রূপকথা জানতুম এবং সরল ছন্দে সুন্দর করে ছেলেবেলাকার ঘোরো স্মৃতি দিয়ে সরস করে লিখতে পারতুম তা হলে ঠিক এখানকার উপযুক্ত হত। বেশ ছোটো নদীর কলরবের মতো, ঘাটের মেয়েদের উচ্চহাসি মিষ্টকণ্ঠস্বর এবং ছোটোখাটো কথাবার্তার মতো, বেশ নারকেল-পাতার ঝুর্‌ঝুর্‌ কাঁপুনি আম-বাগানের ঘন ছায়া এবং প্রস্ফুটিত শর্ষে-ক্ষেতের গন্ধের মতো— বেশ শাদাসিধে অথচ সুন্দর এবং শান্তিময়— অনেকখানি আকাশ আলো নিস্তব্ধতা এবং সকরুণতায় পরিপূর্ণ! মারামারি হানাহানি যোঝাযুঝি কান্নাকাটি সে-সমস্ত এই ছায়াময়

নদীস্নেহবেষ্টিত প্রচ্ছন্ন বাংলাদেশের নয়। যাই হোক, এলিমেন্‌ট্‌স্ অফ পলিটিক্স্ জলের উপরে তেলের মতো এখানকার নিস্তব্ধ শান্তির উপর দিয়ে অবাধে ভেসে চলে যায়, একে কোনো রকমে নাড়া দিয়ে ভেঙে দেয় না।··· নদীর মাঝখানে বসে আছি, দিনরাত্রি হু হু করে বাতাস দিচ্ছে, দুই দিকের দুই পার পৃথিবীর দুটি আরম্ভ-রেখার মতো বোধ হচ্ছে, ওখানে জীবনের কেবল আভাস মাত্র দেখা দিয়েছে, জীবন সুতীব্র ভাবে পরিস্ফুট হয়ে ওঠে নি— যারা জল তুলছে, স্নান করছে, নৌকো বাচ্ছে, গোরু চরাচ্ছে, মেঠো পথ দিয়ে আসছে যাচ্ছে, তারা যেন যথেষ্ট জীবন্ত সত্য নয়। অন্য জায়গায় মানুষরা ভিড় করে, তারা সামনে উপস্থিত হলে চিন্তার ব্যাঘাত করে, তাদের অস্তিত্বই যেন কুনুই দিয়ে ঠেলা দেয়, তারা প্রত্যেকে এক-একটি পজিটিভ মানুষ ; এখানকার এরা সম্মুখে আনাগোনা চলাবলা কাজকর্ম করছে— কিন্তু মনকে ঠেলা দিয়ে যাচ্ছে না। কৌতূহলে সামনে দাঁড়িয়ে দেখছে, কিন্তু সেই সরল কৌতূহল ভিড় করে গায়ের উপর এসে পড়ছে না। যা হোক, বেশ লাগছে।

কলকাতা

৯ এপ্রিল ১৮৯২

৪৩

বোলপুর

শনিবার, ২ জ্যৈষ্ঠ। ১২৯৯।

জগৎসংসারে অনেকগুলো প্যারাডক্স্‌ আছে, তার মধ্যে এও একটি যে, যেখানে বৃহৎ দৃশ্য, অসীম আকাশ, নিবিড় মেঘ, গভীর ভাব, অর্থাৎ যেখানে অনন্তের আবির্ভাব সেখানে তার উপযুক্ত সঙ্গী এক জন মানুষ —অনেকগুলো মানুষ ভারী ক্ষুদ্র এবং খিজিবিজি। অসীমতা এবং একটি মানুষ উভয়ে পরস্পরের সমকক্ষ— আপন আপন সিংহাসনে পরস্পর মুখোমুখি বসে থাকবার যোগ্য। আর, কতকগুলো মানুষে একত্রে থাকলে তারা পরস্পরকে ছেঁটে ছুঁটে অত্যন্ত খাটো করে রেখে দেয়— একজন মানুষ যদি আপনার সমস্ত অন্তরাত্মাকে বিস্তৃত করতে চায় তা হলে এত বেশি জায়গার আবশ্যক করে যে কাছাকাছি পাঁচ ছ জনের স্থান থাকে না। আমার বিবেচনায়, যদি বেশ ভালো করে ধরাতে চাও, তা হলে বিশ্বসংসারে খুব অন্তরঙ্গ দুটি মাত্রকে ধরে— তার বেশি জায়গা নেই— তার অধিক লোক জোটাতে গেলেই পরস্পরের অনুরোধে আপনাকে সংক্ষেপ করতে হয়— যেখানে যতটুকু ফাঁক সেইখানে ততটুকু মাথা গলাতে হয়। মাঝের থেকে, দুই বাহু প্রসারিত করে দুই অঞ্জলি পূর্ণ করে প্রকৃতির এই অগাধ অনন্ত বিস্তীর্ণতাকে গ্রহণ করতে পারছি নে।

কলকাতা

১৬ মে ১৮৯২

বোলপুর

১৫ মে ১৮৯২

বেলি স্পষ্টই বলছে সে বিলেতের নীচেই বোলপুর ভালোবাসে, খোকাও সেই মতে ডিটো দিয়ে যাচ্ছে— রেণুকা কোনোপ্রকার ব্যক্ত শব্দে আপন মনের ভাব প্রকাশ করতে পারছে না। দিবানিশি নানা প্রকার অব্যক্ত ধ্বনি উচ্চারণ করছে, এবং তাকে সামলে রাখা দায় হয়েছে।— সে কেবল চতুর্দিকেই অঙ্গুলিনির্দেশ করছে এবং অঙ্গুলির অনুগামী হবার চেষ্টা করছে— আমার সঙ্গে যে এক রেজিমেন্ট্ ভৃত্য এসেছে সকলেই প্রায় সেই ক্ষুদ্র মহাপ্রভুকে নিয়েই নিযুক্ত আছে— এই ভৃত্যদের কর্তৃক তার দুরন্ত বেগবান ইচ্ছাসকল ক্রমাগত প্রতিহত হয়ে প্রতি মুহূর্তেই তীব্র আর্তনাদে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠছে।— আমার পুত্রসন্তানটি নিস্তব্ধ নীরব স্থিরভাবে নির্নিমেষে তাকিয়ে আছে— কী ভাবছে তা কারও বোঝবার জো নাই।...

কলকাতা

১৬ মে ১৮৯২

৪৫

বোলপুর

মঙ্গলবার, ৫ জ্যৈষ্ঠ। ১২৯৯।

'জগতে কেহ নাই, সবাই প্রাণে মোর'— ও একটা বয়সের একটা বিশেষ অবস্থা। যখন হৃদয়টা সব-প্রথম জাগ্রত হয়ে তুই বাহু বাড়িয়ে দেয় তখন মনে করে সে যেন সমস্ত জগৎটাকে চায়। যেমন নবদন্তোদ্গতা রেণুকা মনে করছেন সমস্ত বিশ্বসংসার তিনি গালে দিতে পারেন— ক্রমে ক্রমে বুঝতে পারা যায় মনটা যথার্থ কী চায় এবং কী চায় না। তখন সেই পরিব্যাপ্ত হৃদয়বাষ্প সংকীর্ণ সীমা অবলম্বন করে, জ্বলতে এবং জ্বালাতে আরম্ভ করে। একেবারে সমস্ত জগৎটা দাবি করে বসলে কিছুই পাওয়া যায় না— অবশেষে একটা কোনো-কিছুর ভিতরে সমস্ত প্রাণ মন দিয়ে নিবিষ্ট হতে পারলে তবেই অসীমের মধ্যে প্রবেশ লাভ করা যায়। প্রভাতসংগীতে আমার অন্তর্প্রকৃতির প্রথম বহির্মুখী উচ্ছ্বাস, সেই জন্যে ওটাতে আর কিছুমাত্র বাচবিচার বাধাব্যবধান নেই। এখনো আমি সমস্ত পৃথিবীকে এক রকম ভালোবাসি— কিন্তু সে এ রকম উদ্দামভাবে নয়— আমার ভালোবাসার জ্যোতিষ্কলোক থেকে একটা দীপ্তি প্রতিফলিত হয়ে সমস্ত মানবের উপর পড়ে— সেই দীপ্তিতে এক-এক সময় পৃথিবীটা ভারী সুন্দর এবং ভারী আপনার বোধ হয়। যাদের খুব ভালোবাসা যায় তারা সীমাবদ্ধভাবে আমাদের মনের গতিরোধ করে না, তাদের মধ্যে আমাদের হৃদয় চিরকাল সঞ্চরণ করতে পারে —যাদের আমরা ততটা ভালোবাসি নে, তারা আমাদের কাছে অসীম নয়। তাদের আমরা আংশিকভাবে দেখি, তারা যতটুকু প্রতীয়মান কেবল ততটুকু, এই জন্যে তারা ঘেঁষাঘেঁষি করে থাকলে অস্বচ্ছ দেয়ালের মতো আমাদের চার দিক থেকে রুদ্ধ করে রাখে, মনকে কোনো-একটা চিন্তার প্রসারতার মধ্যে ব্যাপ্ত করতে গেলে পদে পদে তাদের উপরে গিয়ে ঠেকে যায়, এবং আপনার মধ্যে সে

বিরক্তভাবে ফিরে আসে। এই জন্যে সকল সময়ে সাধারণের সঙ্গ ভালো লাগে না। যখন ঘরে আছি তখন দেয়াল বেশ লাগে, এমন-কি, তখন দেয়াল না হলে চলে না। যখন বাইরে গেছি তখন সঙ্গে সঙ্গে দেয়াল চললে আদবে ভালো লাগে না। অতএব লোকারণ্যের উপর বিরক্তি প্রকাশ করছি বলে মনে করিস নে আমি একেবারে মিস্যানৃথ্রোপ্ হয়ে গেছি— আমি কেবল এইটুকু বলতে চাই, এক-একটা সময় আসে যখন এতগুলো লোক না থাকলে বেশ চলে যায়।··· আমার যে কিছুমাত্র ধৈর্য নেই বব্। সেটা বোধ হয় পুরুষ-মানুষের একটা লক্ষণ— তারা একেবারে হুড়মুড় করে সমস্তটা নিকেশ করে ফেলতে চায়, বেশ ধীরে নিঃশব্দে সুচারু সুনিপুণ সুন্দররূপে কিছু করে উঠতে পারে না— পৃথিবীতে চিরকাল মজুরের কাজ করে করে তাদের এই দশা হয়েছে। মেয়েরা আজকাল পুরুষদের এই-সকল মজুরি কার্যভার লাঘব করবার চেষ্টায় আছে, তা হলে আমাদের পরুষ নীরস স্বজাতীয়ের পক্ষে মন্দ হয় না— একটুখানি চারুতা চর্চা করবার অবকাশ পাওয়া যায়— কিন্তু এই প্রকাণ্ডকায় হতভাগারা সে দিকে যে বেশি মন দেবে তা মনে হয় না— বোধ হয় অধিক সময় পেলে অজগরের মতো আহার করবে এবং অজগরের মতো নিদ্রা দেবে। অদূর ভবিষ্যতে পুরুষ-জাতির ভারী একটা লাঞ্ছনার সময় আসছে বলে মনে হয়। সভ্যতা ক্রমেই এমন সুকুমার সূক্ষ্মতার দিকে যাচ্ছে যে, এই মোটা জন্তুগুলো ভারী ফাঁপরে পড়বে। পৃথিবীর আদিম অবস্থাতেই ম্যামথ্ ম্যাস্টডন প্রভৃতি বিপুলকায় প্রাণীর প্রাদুর্ভাব ছিল— তাদের জোরই বা কত— চামড়াই বা কী শক্ত— তারা তো সব উচ্ছন্ন গেল। এখন কচি-চামড়া সাড়েতিন-হাত মনুষ্য পৃথিবীর রাজা। কিন্তু আমাদের সময় প্রায় হয়ে এসেছে— এখন আরও কচির আবশ্যক।···

কলকাতা

১৮ মে ১৮৯২

৪৬

বোলপুর
বুধবার, ৬ জ্যৈষ্ঠ ১২৯৯

সেদিন সন্ধেবেলায় খোকাতে বেলাতে একটা বিষয় নিয়ে তর্ক হয়ে গেছে, সেটা উদ্‌ধৃত করবার যোগ্য। খোকা বললে— 'বেলা, আমার জল ক্ষিধে পেয়েছে।' বেলা বললেন— 'দূর ফোক্‌লা, জল ক্ষিধে বুঝি বলে,! জল তেষ্টা।' খোকা অত্যন্ত দৃঢ়স্বরে— 'না, জল ক্ষিধে।' বেলা— 'অ্যাঁ খোকা! আমি তোর চেয়ে তিন বছরের বড়ো, তুই আমার চেয়ে দু বছরের ছোটো, তা জানিস! আমি তোর চেয়ে কত বেশি জানি!' খোকা সন্দিগ্ধভাবে— 'তুমি এত বড়ো!' বেলা— 'আচ্ছা, বাবাকে জিজ্ঞাসা কর্।' খোকা অকস্মাৎ উৎসাহিত হয়ে উঠে— 'তেমনি আমি যে দুধ খাই, তুমি যে দুধ খাও না।' বেলা অবজ্ঞাভরে— 'তাতে কী! মা তো দুধ খায় না, তাই বলে কি মা তোর চেয়ে বড় নয়!' খোকা সম্পূর্ণ নিরুত্তর, এবং বালিশে মাথা রেখে চিন্তান্বিত। তখন বেলা বকতে আরম্ভ করলে, 'O father, একজনের সঙ্গে আমার ভয়ানক ভয়ানক friendship। সে পাগলি, সে এমন মিষ্টি! Oh I can eat her up!' ব'লে ছুটে রেণুকে গিয়ে এক পত্তন চট্‌কে চুমো খেয়ে কাঁদিয়ে দিয়ে এল।

কালকের বেলা বড়ো ব্যথিত হয়ে এসেছিল। ঘটনাটা হচ্ছে, কাল স্বয়ম্প্রভারা ছোটো বাংলাতে মাছের তরকারি রাঁধতে গিয়েছিল। সেখানে একটা পাগল কতকগুলো আম নিয়ে আশ্রয় নিয়েছিল— ছোটোবউ স্বয়ম্প্রভারা ভয় পেয়ে তাকে বিদায় করে দেয়। আমি দোতালার ঘরে চুপ্‌চাপ্ শুয়েছিলুম। বেলা ছোটো বাংলা থেকে ফিরে এসে আমাকে কাতরভাবে বলতে লাগল, 'বাবা, একজন ভারী গরিব লোক, বেচারার ক্ষিধে পেয়েছে, তাই আম নিয়ে নীচের বাংলায় বসেছিল, তাকে লাঠি নিয়ে তাড়িয়ে দিলে।' বারবার করে বলতে

লাগল, 'বেচারা ভারী গরিব, তার কিচ্ছু নেই, এতটুকু একটু কাপড় পরা, বোধ হয় শীতকালে কিচ্ছু পরতে পায় না, তার শীত করে। সে তো কিচ্ছু দোষ করে নি। তার নাম জিজ্ঞাসা করলে, সে নাম বললে। বললে সে স্বর্গে থাকে। তাকে তাড়িয়ে দিলে, সে বেচারা কিচ্ছু বললে না। অমনি চলে গেল।'— আমার এমনি মিষ্টি লাগল! বেলিটার বাস্তবিক ভারী দয়া। কাল সে এমন সত্যিকার কাতরতার সঙ্গে বললে— এই অনর্থক নিষ্ঠুরতা তার কাছে এমনি অকারণ বোধ হয়েছিল! শুনে আমার মনটা ভারী আর্দ্র হয়েছিল। বেলিটা বড়ো হলে খুব স্নেহময়ী সরলস্বভাব লক্ষ্মী মেয়ে হবে। খোকাটারও ভারী স্নেহশীল ভাব। রেণুকে সে এমনি ভালোবাসে। এমনি মিষ্টি মিষ্টি করে আদর করে, তার সমস্ত উপদ্রব এমন সহিষ্ণুভাবে সহ্য করে যায় যে, অনেক মাও এমন পারে না।

কলকাতা
১২ মে ১৮৯২

৪৭

বোলপুর

শুক্রবার, ৮ জ্যৈষ্ঠ। ১২৯৯।

রসিকতা জিনিসটা বড়ো বিপদের জিনিস— ও যদি প্রসন্ন সহাস্য মুখে আপনি ধরা দিলে তো অতি উত্তম, আর ওকে নিয়ে যদি টানাটানি করা যায় তবে বড়োই 'ব্যাভ্রম' হবার সম্ভাবনা। হাস্যরস প্রাচীন কালের ব্রহ্মাস্ত্রের মতো, যে ওর প্রয়োগ জানে সে ওকে নিয়ে একেবারে কুরুক্ষেত্র বাধিয়ে দিতে পারে— আর যে হতভাগ্য ছুঁড়তে জানে না অথচ নাড়তে যায়, তার বেলায় 'বিমুখ ব্রহ্মাস্ত্র আসি অস্ত্রীকেই বধে', হাস্যরস তাকেই হাস্যজনক করে তোলে।··· মেয়েরা রসিকতা করতে গিয়ে যদি মুখরা হয়ে পড়ে তবে সেটা ভারী অশোভন দেখতে হয়। আমার তো মনে হয় 'কমিক' হতে চেষ্টা করে সফল হলেও মেয়েদের সাজে না— নিষ্ফল হলেও মেয়েদের সাজে না। কারণ 'কমিক' জিনিসটা ভারী গাবৃদা এবং প্রকাণ্ড। 'সাব্লিমিটি'র সঙ্গে 'কমিক্যালিটি'র একটা আত্মীয়তার সম্পর্ক আছে— সেই জন্যে হাতি কমিক, উট কমিক, জিরাফ কমিক, স্থূলতা কমিক। সৌন্দর্যের সঙ্গে বরঞ্চ প্রখরতা শোভা পায়, যেমন ফুলের সঙ্গে কাঁটা— তেমনি শাণিত কথা মেয়েদের মুখে বড্ড বাজে বটে তেমনি সাজেও বটে। কিন্তু যে-সকল বিদ্রূপে কোনো রকম স্থূলত্বের আভাসমাত্র দেয় তার দিক দিয়েও মেয়েদের যাওয়া উচিত হয় না; সে হচ্ছে আমাদের সাব্লাইম (চন্দ্রনাথ বাবুর ভাষায়— 'বিরাট') স্বজাতীয়ের জন্যে। পুরুষ ফল্স্টাফ আমাদের হাসিয়ে নাড়ী ছিঁড়ে দিতে পারে, কিন্তু মেয়ে ফল্স্টাফ আমাদের গা জ্বালিয়ে দিত।

কলকাতা

২১ মে ১৮৯২

৪৮

বোলপুর

শনিবার, ৭ জ্যৈষ্ঠ। ১২৯৯।

কাল যে ঝড় সে আর কী বলব। আমার সাধনার নিত্যনৈমিত্তিক লেখা সেরে চা খাবার জন্যে উপরে যাচ্ছি, এমন সময়ে প্রচণ্ড ঝড় এসে উপস্থিত। ধুলোয় আকাশ আচ্ছন্ন হয়ে গেল এবং বাগানের যত শুকনো পাতা একত্র হয়ে লাটিমের মতো বাগান-ময় ঘুরে ঘুরে নেচে নেচে বেড়াতে লাগল— যেন অরণ্যের যত প্রেতাত্মাগুলো হঠাৎ জেগে উঠে ভুতুড়ে নাচন নাচতে আরম্ভ করে দিলে। বাগানের সমস্ত গাছ-পালা পায়ে-শিকলি-বাঁধা প্রকাণ্ড জটায়ু পাখির মতো ডানা আছড়ে ঝট্‌পট্‌ ঝট্‌পট্‌ করতে লাগল। সে কী গর্জন, কী মাতামাতি, কী একটা হুটোপুটি ব্যাপার! ঝড়টা দেখে আমার মনে পড়ছিল, অ্যামেরিকার ranch সম্বন্ধে মাঝে মাঝে যে রকম বর্ণনা পড়া যায়— হঠাৎ কোনো-একটা বেড়া ভেঙে ফেলে ছ-সাত শো বুনো ঘোড়া ধুলো উড়িয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে পালাচ্ছে, আর তার পিছনে পিছনে তাদের তাড়িয়ে ফিরিয়ে আনবার জন্যে বড়ো বড়ো ফাঁস হাতে অনেকগুলো অশ্বারোহী ছুটেছে— মাঝে মাঝে যেখানে যাকে পাচ্ছে সাঁই সাঁই শব্দে দিচ্ছে চাব্‌কে — বোলপুরের অবারিত আকাশ এবং মাঠের মধ্যে যেন সেই রকমের একটা উচ্ছৃঙ্খল পলায়ন এবং পশ্চাদ্ধাবন চলছে— দৌড় দৌড়, ধর্ ধর্, পালা পালা, হুড়্‌হুড়্ দুড়্‌দাড়্ ব্যাপার। এখানকার যত চাকর-বাকর সব মন্দির সামলাতে ব্যস্ত— পাছে সেই রঙিন কাঁচের বুদ্‌বুদটি ভেঙেচুরে ফেটে যায়। তাকে খুব মজবুত কাপড়ের বড়ো বড়ো পর্দা দিয়ে ঢেকে রাখা হয়েছে— কিন্তু ঝড়ের চোটে পর্দা কুটিকুটি হয়, দড়ি টুকরো টুকরো হয়ে ছিঁড়ে যায়, পর্দার কাষ্ঠদণ্ডগুলো ভেঙে খান্‌খান্ হয় এবং সেইগুলো আছড়ে আছড়ে মন্দিরের কাঁচ চুর্‌মার হয়ে যায়। ইতিপূর্বে একটা ঝড়ের সময় সেই

পর্দার লাঠি খেয়ে মন্দিররক্ষকের মাথা ফেটে গিয়েছিল। উপরে গিয়ে দেখি এই ঘোরতর বিপ্লবের সময়ে আমার পুত্রটি উত্তরের বারান্দায় দাঁড়িয়ে রেলিঙের মধ্যে তাঁর ক্ষুদ্র অপরিণত নাসিকাটি প্রবেশ করিয়ে দিয়ে নিস্তব্ধভাবে এই ঝড়ের আঘ্রাণ এবং আস্বাদ গ্রহণে নিযুক্ত আছেন। বেগে বৃষ্টি পড়তে লাগল, আমি খোকাকে বললুম, 'খোকা, তোর গায়ে জলের ছাঁট লাগবে, এইখানে এসে চৌকিতে বোস্'-- খোকা তার মাকে ডেকে বললে, 'মা, তুমি চৌকিতে বোসো, আমি তোমার কোলে বসি।' ব'লে মায়ের কোল অধিকার করে নীরবে বর্ষাদৃশ্য সম্ভোগ করতে লাগল। খোকা যে চুপচাপ করে বসে বসে কী ভাবে এবং আপন মনে হাসে এবং মুখভঙ্গী করে এক-এক সময় তার আভাস পাওয়া যায়— বোঝা যায় সেও তার এই অতি ক্ষুদ্র জীবনের যৎসামান্য গুটিকতক পূর্বস্মৃতি নিয়ে নাড়াচাড়া করে। দেখেছি এক-এক সময়ে কোনো কথা নেই বার্তা নেই হঠাৎ জিজ্ঞাসা করে বসে, 'বাবা, শিলাইদয়ে নদী ছিল— না?' অনেক চিন্তার অবসানে হঠাৎ মাকে বলে, 'মা, শিলাইদয়ে আমরা বেশ ছিলুম।' সেদিন ছোটোবউকে জিজ্ঞাসা করছিল, 'আজ কী বার?' ছোটো-বউ বললেন রবিবার। খোকা বললে, 'আজ তা হলে শিলাইদয়ে স্টীমার চলছে না।' সব চেয়ে, খোকাতে রেণুতে যে রকম কাণ্ড চলে দেখতে বেশ লাগে। রেণু যদি দেখলে খোকা কোথাও চুপচাপ করে শুয়ে আছে অমনি তার ঘাড়ের উপর পড়ে তার মুখের উপর মুখ রেখে তাকে চুমো খেয়ে তার চুল ধরে টেনে তাকে মেরে তার প্রতি ভয়ানক সোহাগের উৎপীড়ন আরম্ভ করে দেয়— খোকাটা এমনি স্নেহময় মিষ্টি করে তাকে 'রানী' 'রানী' ব'লে আদর করে এবং সমস্ত সহ্য করে! খোকাটাকে ঘুমোতে দেখলেই রেণুটা তাকে মারপিট টানাটানি ঠেলাঠেলি করতে থাকে— খোকা তাকে অনুনয় করে বলে, 'রানী,

আমাকে একটু ঘুমোতে দে।' কিন্তু যখন দেখে রেণু কিছুতেই তাকে ছাড়ে না তখন উঠে বসে তার সঙ্গে খেলা করতে আরম্ভ করে, কিছুমাত্র বিরক্তি প্রকাশ করে না। কিন্তু বেলির সঙ্গে ওদের দুজনের তেমন বিশেষ ভাব নেই— রেণু তো প্রায় সর্বদাই অত্যন্ত সুস্পষ্ট ভাবে বেলির প্রতি আপনার রাজকীয় অসন্তোষ প্রকাশ করে থাকে। মনে হয় বেলির সঙ্গে যেন ওদের স্বভাবের মিল নেই— বেলিটা ওদের দল ছাড়া।

কলকাতা
২২ মে ১৮৯২

বোলপুর

রবিবার, ১০ জ্যৈষ্ঠ। ১২৯৯।

কাল বিকেলে ভয়ানক বৃষ্টি বাদল দুর্যোগ গেছে, সেটা আক্ষেপের বিষয় নয়। বরঞ্চ ভালোই; গাছপালাগুলো এবং পৃথিবীর তৃণ-আবরণ বেশ একটু সবুজ চিক্‌চিকে টস্‌টসে হয়ে উঠুক। দেখে চোখ জুড়োক। আকাশের এক প্রান্ত থেকে আর-এক প্রান্ত স্নিগ্ধ সজল মেঘে আচ্ছন্ন হয়ে যাক— বনভূমি গাঢ় ছায়ায় অন্ধকার হয়ে আসুক, অবিরল বৃষ্টিধারা দিক্‌বধূদের অবগুণ্ঠন রচনা করে দিক, ঘন পল্লবের উপর ঝর্‌ঝর্‌ বৃষ্টিপতনের শব্দে অরণ্য মুখরিত হয়ে উঠুক, ছোটো বড়ো ক্ষণজীবন জলস্রোত বিচিত্র লীলা ও কলরবে নিশ্চল বিস্তীর্ণ ভূমিকে চারি দিক থেকে শৈশবচাঞ্চল্যে সজীব করে তুলুক। হয়েওছে সেই রকম। আজ সকালে সমস্ত আকাশ জলভারাক্রান্ত মেঘে যেন নত হয়ে পড়ছে, এবং দিগ্‌বিদিক্‌ বর্ষার ছায়ায় সুস্নিগ্ধ হয়ে রয়েছে। ... ... খোকাটা ভালো করে কথা কইতে পারে না ব'লে ওর মনের যা কিছু মনেই থেকে যায়, এবং সমস্ত উদ্যম মনের ভিতরে ক্রমিক কাজ করে, এইজন্যে ওর মনে চিন্তার রেখাগুলো খুব গভীর হয়ে পড়ে। বেলা ক্রমিক কথা কয়ে কয়ে ভালো করে কিছু ভাববার এবং ধারণা করবার অবসর পায় না— ওর সমস্ত মানসিক শক্তি অবিরল বাক্য রচনা করতেই নিঃশেষিত হয়ে যায়। কিন্তু ওর মনটি ভারী দয়ার্দ্র— খোকা সেদিন একটা পিঁপড়ে মারতে যাচ্ছিল দেখে ও নিষেধ করবার কত চেষ্টা করলে। দেখে আমার ভারী আশ্চর্য বোধ হল— আমার ছেলেবেলায় ঠিক ঐ রকম ভাব ছিল, কীটপতঙ্গকেও কষ্ট দেওয়া আমি সহ্য করতে পারতুম না। কিন্তু বড়ো হয়ে তার চেয়ে কত কঠিন হয়ে গেছি। মনে আছে তখন পরদুঃখে বড়ো মর্মান্তিক ক্লেশ পেতুম। এখন

আর কৈ তেমন হয়? বেলা বড় হয়ে এলেও কি এই রকম ক্রমশঃ কঠিন হয়ে আসবে? তা না হতেও পারে— ও কিনা মেয়ে। এক তো ওকে নিজের হাতে কোনো নিষ্ঠুরতার কাজ করতে হবে না, তা ছাড়া মেয়েদের মনে চিরকালই একটা ইল্যাস্‌টিসিটি থাকে, একেবারে পেকে শক্ত হয়ে যায় না। আমি ছেলেবেলায় জীবের কষ্ট সম্বন্ধে যে রকম অতিসচেতন ছিলুম সে রকম ভাব এখনও থাকলে পৃথিবীতে পদক্ষেপ করা দায় হয়ে উঠত; বোধ হয় পিয়ের লটির মতো কেবলই বেদনা ও মৃত্যুর দ্বারা আহত হয়ে পদে পদে কেবল ঐ নিয়েই বিলাপ পরিতাপ করতুম। সে বড়ো উৎপাত! তা ছাড়া, যে-সকল বিষয়ে সাধারণতঃ লোকে কোনো ব্যথা অনুভব করে না সে সম্বন্ধে নিজের বেদনা প্রকাশ করলে অন্য লোকে অত্যন্ত চটে ওঠে; তারা মনে করে, এ লোকটা আমাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠতা প্রকাশ করবার চেষ্টা করছে। মনে আছে, আমার বড়োরা যখন দয়ার পাত্রকে দয়া করতেন না তখন আমার একটা কিছু যথাসাধ্য বলতে কিম্বা করতে ইচ্ছে করত, কিন্তু ঐ লজ্জায় করতে পারতুম না— পাছে তাঁরা মনে করতেন, 'ইস্, ইনি যে ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির হয়ে আমাদের সকলের উপরে টেক্কা দিতে এসেচেন!' মানসিক অনুভবশক্তি সম্বন্ধে নিজের চতুর্দিকের চেয়ে অধিক চেতনাসম্পন্ন হওয়া ভারী আপদের। প্রথমে সেটাকে গোপন করা এবং অবশেষে সেটাকে কমিয়ে আনাই হচ্ছে সুযুক্তিসংগত। মনে আছে, ছেলেবেলায় একদিন জ্যোতিদাদার সঙ্গে গাড়িতে যাচ্ছি, পথিমধ্যে একজন ব্রাহ্মণ পথিক আমাদের গাড়ি থামিয়ে বললে, 'আপনারা আমাকে গাড়িতে একটু স্থান দিতে পারেন? আমি পথের মধ্যে নেবে যাব।' জ্যোতিদাদা ভারী রাগ করে তাকে তাড়িয়ে দিলেন। আমি সেই ঘটনায় ভয়ানক মর্মাহত হয়েছিলুম— একে তো বেচারা শ্রান্ত পথিক, তাতে সে অপমানিত লজ্জিত ও নিরাশ হয়ে চলে গেল। কিন্তু জ্যোতিদাদা

যেখানে দয়া অনুভব করলেন না সেখানে দয়া প্রকাশ করতে আমার ভারী লজ্জা করল— আমি অত্যন্ত কষ্টেও কিছু বলতে পারলুম না, কিন্তু আমার ভ্রাতৃভক্তিতে খুব আঘাত লেগেছিল।

কলকাতা

২৩ মে ১৮৯২

বোলপুর

মঙ্গলবার, ১২ জ্যৈষ্ঠ। ১২৯৯।

তোকে পূর্বেই লিখেছি, অপরাহ্ণে আমি আপন মনে একাকী ছাতের উপর বেড়াই ; কাল সন্ধেবেলায় আমার দুই বন্ধুকে দুই পার্শ্বে নিয়ে অঘোরকে আমার পথপ্রদর্শক করে তাঁদের এখানকার প্রাকৃতিক শোভা সন্দর্শন করানো আমার কর্তব্যকর্ম মনে করে বেরিয়ে পড়া গেল। তখন সূর্য অস্ত গেছে কিন্তু অন্ধকার হয় নি। একেবারে দিগন্তের প্রান্তে যেখানে গাছের সার নীলবর্ণ হয়ে দেখা যাচ্ছে, তারই উপরেই ঠিক একটি রেখামাত্র খুব গাঢ় নীল মেঘ উঠে খুব চমৎকার দেখতে হয়েছে— আমি ওরই মধ্যে একটুখানি কবিত্ব করে বললুম, ঠিক যেন নীল চোখের পাতার উপরে নীল সুর্মা লাগিয়েছে। সঙ্গীরা কেউ কেউ শুনতে পেলে না, কেউ কেউ বুঝতে পারলে না— কেউ কেউ সংক্ষেপে বললে, 'হাঁ, দিব্যি দেখতে হয়েছে।' তার পর থেকে দ্বিতীয়বার আর কবিত্ব করতে আমার উৎসাহ হল না। প্রায় মাইলখানেক গিয়ে একটা বাঁধের ধারে এক সার তালবন, এবং তালবনের কাছে একটি মেঠো ঝর্নার মতো আছে, সেইটে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছি এমন সময়ে দেখি উত্তরে সেই নীল মেঘ অত্যন্ত প্রগাঢ় এবং স্ফীত হয়ে চলে আসছে এবং মধ্যে মধ্যে বিদ্যুদ্দন্ত বিকাশ করছে। আমাদের সকলেরই মত হল এ রকম প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ঘরের মধ্যে বসে দেখাই সর্বাপেক্ষা নিরাপদ। বাড়িমুখে যেমন ফিরেছি অমনি প্রকাণ্ড মাঠের উপর দীর্ঘ পদক্ষেপ করতে করতে সরোষ গর্জনে একটা ঝড় আমাদের ঘাড়ের উপর এসে পড়ল। আমরা যখন প্রকৃতিসুন্দরীর চোখের সুর্মার বাহার নিয়ে তারিফ করছিলুম তখন তিলমাত্র আশঙ্কা করি নি যে তিনি রোষাবিষ্টা গৃহিণীর মতো এত বড়ো একটা প্রকাণ্ড চপেটাঘাত নিয়ে আমাদের উপর ছুটে আসবেন। ধুলোয় এমনি অন্ধকার হয়ে এল যে

পাঁচ হাত দূরে কিছু দেখা যায় না। বাতাসের বেগ ক্রমেই বাড়তে লাগল— কাঁকরগুলো বায়ুতাড়িত হয়ে ছিটেগুলির মতো আমাদের বিঁধতে লাগল— মনে হল বাতাস পিছন থেকে ঘাড় ধরে আমাদের ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে— ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টিও পিট্ পিট্ করে মুখের উপর সবেগে আঘাত করতে লাগল। দৌড় দৌড়। মাঠ সমান নয়। এক-এক জায়গায় আবার খোয়াইয়ের ভিতর নাবতে হয়, সেখানে সহজ অবস্থাতেই চলা শক্ত, এই ঝড়ের বেগে চলা আরও মুশকিল। পথের মধ্যে আবার পায়ে কাঁটা-সুদ্ধ একটা শুকনো ডাল বিঁধে গেল— সেটা ছাড়াতে গিয়ে বাতাস আবার পিছন থেকে ঠেলা দিয়ে মুখ থুবড়ে ফেলবার চেষ্টা করে। বাড়ির যখন প্রায় কাছাকাছি এসেছি তখন দেখি, তিন-চারটে চাকর-বাকর মহা সোরগোল করে দ্বিতীয় আর-একটা ঝড়ের মতো আমাদের উপরে এসে পড়ল! কেউ হাত ধরে, কেউ আহা-উহু বলে, কেউ পথ দেখাতে চায়, কেউ আবার মনে করে বাবু বাতাসে উড়ে যাবেন— ব'লে পিঠের দিক থেকে জড়িয়ে ধরে। এই-সমস্ত অনুচরদের দৌরাত্ম্য কাটিয়ে-কুটিয়ে এলোথেলো চুলে, ধূলিমলিন দেহে, সিক্তবস্ত্রে, হাঁপিয়ে বাড়িতে এসে তো পড়লুম। যা হোক, একটা খুব শিক্ষা লাভ করেছি— হয়তো কোন্ দিন কোন্ কাব্যে কিম্বা উপন্যাসে বর্ণনা করতে বসতুম একজন নায়ক মাঠের মধ্যে দিয়ে ভীষণ ঝড়বৃষ্টি ভেঙে নায়িকার মধুর মুখচ্ছবি স্মরণ করে অকাতরে চলে যাচ্ছে— কিন্তু এখন আর এ রকম মিথ্যে কথা লিখতে পারব না। ঝড়ের সময় কারও মধুর মুখ মনে রাখা অসম্ভব, কী করলে চোখে কাঁকর ঢুকবে না সেই চিন্তাই সর্বাপেক্ষা প্রবল হয়ে ওঠে। আমার আবার চোখে eye glasses ছিল। সেটা বাতাসে উড়িয়ে নিয়ে ফেলে, কিছুতেই রাখতে পারি নে। এক হাতে চশমা ধরে আর-এক হাতে ধুতির কোঁচা সামলে পথের কাঁটাগাছ এবং গর্ত বাঁচিয়ে চলছি। মনে

কর্, যদি এখানকার কোপাই নদীর ধারে আমার কোনো প্রণয়িনীর বাড়ি থাকত, আমার চশমা এবং কোঁচা সামলাতুম, না, তার স্মৃতি সামলাতুম! বাড়িতে ফিরে এসে কাল অনেক ক্ষণ ভাবলুম— বৈষ্ণব কবিরা গভীর রাত্রে ঝড়ের সময় রাধিকার অকাতর অভিসার সম্বন্ধে অনেক ভালো ভালো মিষ্টি কবিতা লিখেছেন, কিন্তু একটা কথা ভাবেন নি এ রকম ঝড়ে কৃষ্ণের কাছে তিনি কী মূর্তি নিয়ে উপস্থিত হতেন। চুলগুলোর অবস্থা যে কী রকম হত সে তো তোরা বেশ বুঝতে পারবি। বেশবিন্যাসেরই বা কিরকম দশা! ধুলোতে লিপ্ত হয়ে, তার উপর বৃষ্টির জলে কাদা জমিয়ে কুঞ্জবনে কিরকম অপরূপ মূর্তি করে গিয়েই দাঁড়াতেন! এসব কথা কিন্তু বৈষ্ণব কবিদের লেখা পড়বার সময় মনে হয় না— কেবল মানস চক্ষে ছবির মতো দেখতে পাওয়া যায় একজন সুন্দরী রমণী শ্রাবণের অন্ধকার রাত্রে বিকশিত কদম্ববনের ছায়া দিয়ে যমুনার তীরপথে প্রেমের আকর্ষণে ঝড়বৃষ্টির মাঝে আত্মবিহ্বল হয়ে স্বপ্নগতার মতো চলেছেন; পাছে শোনা যায় ব'লে পায়ের নূপুর বেঁধে রেখেছেন, পাছে দেখা যায় বলে নীলাম্বরী কাপড় পরেছেন, কিন্তু পাছে ভিজে যান বলে ছাতা নেন নি, পাছে পড়ে যান বলে বাতি আনা আবশ্যক বোধ করেন নি। হায়, আবশ্যকীয় জিনিসগুলো আবশ্যকের সময় এত বেশি দরকার, অথচ কবিত্বের বেলায় এত উপেক্ষিত। আবশ্যকের শতলক্ষ দাসত্ব-বন্ধন থেকে আমাদের মুক্তি দেবার জন্যে কবিতা মিথ্যে ভাণ করছে। ছাতা জুতো জামাজোড়া চিরকাল থাকবে। বরঞ্চ শোনা যায় সভ্যতার উন্নতি-সহকারে কাব্য ক্রমে লোপ পাবে, কিন্তু ছাতা জুতোর নতুন নতুন পেটেণ্ট্‌ বেরোতে থাকবে।

কলকাতা
২৫ মে ১৮৯২

বোলপুর

শনিবার, ১৬ জ্যৈষ্ঠ। ১২৯৯।

কাল বিকেলে যে এক-পাত্র চা খেয়েছিলুম সেটা কিছু কড়া-গোছ হয়েছিল— তার উপরে কাল রাত্রে তোকে যে চিঠিটা লিখেছিলুম তারও বিষয়টা বেশি মানসিক উত্তাপ লেগে খুব টক্‌টকে কড়া গোছের হয়ে মস্তিষ্কের মধ্যে অনেক ক্ষণ খুব ঝাঁ ঝাঁ করেছিল— তাই বিছানায় শুয়ে কাল আর্ধেক রাত্রের বেশি একেবারে বিশুদ্ধ অনিদ্রায় যাপন করেছিলুম। এখানে রাত্রে কোনো গির্জের ঘড়িতে ঘণ্টা বাজে না— এবং কাছাকাছি কোনো লোকালয় না থাকাতে পাখিরা গান বন্ধ করবামাত্রই সন্ধের পর থেকে একেবারে পরিপূর্ণ নিস্তব্ধতা আরম্ভ হয়— প্রথম রাত্রি এবং অর্ধ রাত্রে বিশেষ কোনো প্রভেদ নেই। কলকাতায় অনিদ্রার রাত্রি মস্ত একটা অন্ধকার নদীর মতো, খুব ধীরে ধীরে চলতে থাকে ; বিছানায় চক্ষু মেলে চিৎ হয়ে পড়ে তার গতিশব্দ মনে মনে গণনা করা যেতে পারে— এখানকার রাত্রিটা যেন একটা প্রকাণ্ড নিস্তরঙ্গ হ্রদের মতো আগাগোড়া সমান থম্ থম্ করছে —কোথাও কিছু গতি নেই। যতই এপাশ ফিরি এবং যতই ওপাশ ফিরি একটা মস্ত যেন অনিদ্রার গুমোট করে ছিল, তার মধ্যে প্রবাহের লেশমাত্র পাওয়া যায় না। আজ সকালে কিছু বিলম্বে শয্যাত্যাগ করে আমার নিচেকার ঘরের তাকিয়া ঠেসান দিয়ে বুকের উপর স্লেট রেখে পায়ের উপর পা তুলে দিয়ে সকালের বাতাস এবং পাখির ডাকের মধ্যে একটি কবিতা লিখতে প্রবৃত্ত হয়েছিলুম। বেশ জমে এসেছিল— মুখ সহাস্য, চক্ষু ঈষৎ মুদ্রিত, মাথা ঘন ঘন আন্দোলিত এবং গুন্ গুন্ আবৃত্তি উত্তরোত্তর পরিস্ফুট হয়ে উঠছিল— এমন সময় তোর একখানি চিঠি, একখানি সাধনা, একখানি সাধনার প্রুফ এবং একখানি Monist কাগজ পাওয়া গেল। তোর চিঠিখানি

পড়লুম এবং সাধনার পাতাগুলোর মধ্যে চোখ দুটোকে একবার সবেগে ঘোড়দৌড় করিয়ে নিয়ে এলুম। তার পরে পুনশ্চ শিরশ্চালন করে অস্ফুট গুঞ্জনস্বরে কবিত্বে প্রবৃত্ত হলুম। শেষ করে ফেলে তবে অন্য কথা। একটি কবিতা লিখে ফেললে যেমন আনন্দ হয় হাজার গদ্য লিখলেও তেমন হয় না কেন তাই ভাবছি। কবিতায় মনের ভাব বেশ একটি সম্পূর্ণতা লাভ করে, বেশ যেন হাতে করে তুলে নেবার মতো। আর, গদ্য যেন এক বস্তা আলগা জিনিস— একটি জায়গায় ধরলে সমস্তটি অমনি স্বচ্ছন্দে উঠে আসে না— একেবারে একটা বোঝা-বিশেষ। রোজ রোজ যদি একটি করে কবিতা লিখে শেষ করতে পারি তা হলে জীবনটা বেশ এক রকম আনন্দে কেটে যায়। কিন্তু এতদিন ধরে সাধনা করে আসছি, ও জিনিসটা এখনো তেমন পোষ মানে নি, প্রতিদিন লাগাম পরাতে দেবে তেমন পক্ষীরাজ ঘোড়াটি নয়। আর্টের একটা প্রধান আনন্দ হচ্ছে স্বাধীনতার আনন্দ —বেশ আপনাকে অনেক দূরে নিয়ে যাওয়া যায়, তার পরে আবার এই ভবকারাগারের মধ্যে ফিরে এসেও অনেক ক্ষণ কানের মধ্যে একটা ঝংকার, মনের মধ্যে একটা স্ফূর্তি লেগে থাকে। এই ছোটো ছোটো কবিতাগুলো আপনা-আপনি এসে পড়ছে ব'লে আর নাটকে হাত দিতে পারছি নে। নইলে দুটো-তিনটে ভাবী নাটকের উমেদার মাঝে মাঝে দরজা ঠেলাঠেলি করছে। শীতকাল ছাড়া বোধ হয় সেগুলোতে হাত দেওয়া হয়ে উঠবে না। চিত্রাঙ্গদা ছাড়া আমার আর-সব নাটকই শীতকালে লেখা। সে সময়ে গীতিকাব্যের আবেগ অনেকটা ঠাণ্ডা হয়ে আসে— অনেকটা ধীরে সুস্থে নাটক লেখা যায়।

কলকাতা

৩০ মে ১৮৯২

৫২

বোলপুর

৩১ মে। ১৮৯২।

এখনো পাঁচটা বাজে নি— কিন্তু আলো হয়েছে, বেশ বাতাস দিচ্ছে এবং বাগানের সমস্ত পাখিগুলো জেগে উঠে গান জুড়ে দিয়েছে। কোকিলটা তো সারা হয়ে গেল— সে কেন যে এত অবিশ্রাম ডাকে এ পর্যন্ত বোঝা গেল না— অবশ্য, আমাদের শ্রুতি-বিনোদনের জন্যে নয়, বিরহিণীকে পীড়ন করবার অভিপ্রায়েও নয়— তার নিজের একটা পার্সোনাল উদ্দেশ্য নিশ্চয়ই আছে— কিন্তু হতভাগার সে উদ্দেশ্য কি কিছুতেই সিদ্ধ হচ্ছে না! ছাড়েও না তো— কুউ কুউ চলছেই— আবার এক-একবার যেন দ্বিগুণ অস্থির হয়ে দ্রুতবেগে কুহুধ্বনি করছে। এর মানে কী? আবার আর খানিকটা দূরে আর-একটা কী পাখি নিতান্ত মৃদুস্বরে কেবলই কুক্ কুক্ করছে— তাতে কিছুমাত্র উৎসাহ-আগ্রহের ঝাঁজ নেই— লোকটা যেন নেহাৎ মন-মরা হয়ে গেছে, সমস্ত আশা ভরসা ছেড়ে দিয়েছে, কিন্তু তবু ছায়ায় বসে সমস্ত দিন ওই একটুখানি কুক্-কুক্ কুক্-কুক্ ওটুকু ছাড়তে পারছে না। বাস্তবিক ঐ ডানাওয়ালা ছোটো ছোটো নিরীহ জীবগুলি, অতি কোমল গ্রীবাটুকু বুকটুকু এবং পাঁচমিশালি রঙ নিয়ে গাছের ছায়ায় বসে আপন-আপন ঘরকন্না করছে— ওদের আসল বৃত্তান্ত কিছুই জানি নে। বাস্তবিক, বুঝতে পারি নে ওদের এত ডাকবার কী আবশ্যক। কোনো কোনো প্রাণীতত্ত্ববিৎ বলেন প্রণয়িনীকে আহ্বান করবার জন্যে। ওদের প্রণয়িনীরাও মানুষের চেয়ে কম নয় দেখছি— ভদ্রলোকটাকে এই ভোরের বেলাতেও একেবারে ক্ষেপিয়ে তুলেছে— কোকিল-মহিলাটির যদি আসবার ইচ্ছে থাকে তা হলে দুই ডাকে এলেই হয়— অনুরক্ত ভক্তটিকে এমন উর্ধ্বশ্বাসে ডাক ছাড়াচ্ছে কেন?

কলকাতা। ৩১ মে ১৮৯২

৫৩

শিলাইদহ

রবিবার, ১২ জুন। ১৮৯২।

কালকের চিঠিতে জীবনের কর্তব্য সম্বন্ধে যা লিখেছিস তা ঠিক কথা। আমরা যে যেখানে এসে পড়েছি আমাদের যথাসাধ্যমত সেই জায়গাটুকু সুখে শান্তিতে উজ্জ্বল করে তোলাই আমাদের প্রধান কর্তব্য। তোদের প্রসন্ন প্রফুল্ল সুন্দর মুখে, নিঃস্বার্থ সেবা স্নেহ ভালবাসায় তোরা তাই করিস— তার চেয়ে আর-কিছু করবার নেই। আমরা সবাই তা পারি নে। আমরা অভিশপ্ত জীব, এমন একটা দুর্দান্ত অশান্তি সাথের সাথি নিয়ে জন্মগ্রহণ করি যে, সহজভাবে সুন্দরভাবে পৃথিবীকে সুখী করা, স্নিগ্ধ করা আমাদের দ্বারা হয়ে ওঠে না; আমরা কেবল ধড়্‌ফড়্‌ করে যে জায়গাটাতে থাকি তার চতুর্দিক ঘুলিয়ে তুলি— জগৎকে মধুর করতে জানি নে— ঠিক তার বিপরীত। পুরুষ জাতটাকে আমি শতসহস্র ধিক্কার দিই, পৃথিবীতে এমন জঞ্জাল আর নেই।

কলকাতা

১৩ জুন ১৮৯২

৫৪

শিলাইদহ

সোমবার [৩২] জ্যৈষ্ঠ। ১২৯৯।

এ-সব শিষ্টাচার আর ভালো লাগে না— আজকাল প্রায় বসে বসে আওড়াই— 'ইহার চেয়ে হতেম যদি আরব বেদুইন!' বেশ একটা সুস্থ সবল উন্মুক্ত অসভ্যতা! দিনরাত্রি বিচার আচার বিবেক বুদ্ধি নিয়ে কতকগুলো বহুকেলে জীর্ণতার মধ্যে শরীর মনকে অকালে জরাগ্রস্ত না ক'রে একটা দ্বিধাহীন চিন্তাহীন প্রাণ নিয়ে খুব একটা প্রবল জীবনের আনন্দ লাভ করি। মনের সমস্ত বাসনা ভাবনা, ভালোই হোক মন্দই হোক, বেশ অসংশয় অসংকোচ এবং প্রশস্ত— প্রথার সঙ্গে বুদ্ধির, বুদ্ধির সঙ্গে ইচ্ছার, ইচ্ছার সঙ্গে কাজের কোনোরকম অহর্নিশি খিটিমিটি নেই। একবার যদি এই রুদ্ধ জীবনকে খুব উদ্দাম উচ্ছৃঙ্খল ভাবে ছাড়া দিতে পারতুম, একেবারে দিগ্‌বিদিকে ঢেউ খেলিয়ে ঝড় বাধিয়ে দিতুম, একটা বলিষ্ঠ বুনো ঘোড়ার মতো কেবল আপনার লঘুত্বের আনন্দ-আবেগে ছুটে যেতুম!

কিন্তু আমি বেদুইন নই, বাঙালি। আমি কোণে ব'সে ব'সে খুঁৎখুঁৎ করব, বিচার করব, তর্ক করব, মনটাকে নিয়ে একবার ওল্টাব একবার পাল্টাব— যেমন করে মাছ ভাজে— ফুটন্ত তেলে একবার এপিঠ চিড়্‌বিড়্ করে উঠবে, একবার ওপিঠ চিড়্‌বিড়্ করবে। যাক গে! যখন রীতিমত অসভ্য হওয়া অসাধ্য তখন রীতিমত সভ্য হবার চেষ্টা করাই সংগত। সভ্যতা এবং বর্বরতার মধ্যে লড়াই বাধাবার দরকার নেই।…

এমনি আমি স্বভাবতঃ অসভ্য— মানুষের ঘনিষ্ঠতা আমার পক্ষে নিতান্ত দুঃসহ। অনেকখানি ফাঁকা চতুর্দিকে না পেলে আমি আমার মনটিকে সম্পূর্ণ unpack করে বেশ হাত পা ছড়িয়ে গুছিয়ে নিতে পারি নে। আশীর্বাদ করি মনুষ্যজাতির কল্যাণ হোক, কিন্তু আমাকে

তাঁরা ঠেসে না ধরুন। ··· বোধ হয় আমাকে সম্পূর্ণ বাদ দিলেও মনুষ্যসাধারণ ভালো ভালো সদ্‌বন্ধু খুঁজে পেতে পারবেন। তাঁদের সান্ত্বনার অভাব হবে না।

কলকাতা

১৪ জুন ১৮৯২

শিলাইদহ

বুধবার, ২ আষাঢ়। ১২৯৯।

কাল আষাঢ়স্য প্রথম দিবসে বর্ষার নব রাজ্যাভিষেক বেশ রীতিমত আড়ম্বরের সঙ্গে সম্পন্ন হয়ে গেছে। দিনের বেলাটা খুব গরম হয়ে বিকেলের দিকে ভারী ঘনঘটা মেঘ করে এল।··· কাল ভাবলুম, বর্ষার প্রথম দিনটা, আজ বরঞ্চ ভেজাও ভালো তবু অন্ধকূপের মধ্যে দিনযাপন করব না— জীবনে '৯৯ সাল আর দ্বিতীয়বার আসবে না— ভেবে দেখতে গেলে পরমায়ুর মধ্যে আষাঢ়ের প্রথম দিন আর কবারই বা আসবে— সবগুলো কুড়িয়ে যদি ত্রিশটা দিন হয় তা হলেও খুব দীর্ঘ জীবন বলতে হবে। মেঘদূত লেখার পর থেকে আষাঢ়ের প্রথম দিনটা একটা বিশেষ চিহ্নিত দিন হয়ে গেছে— নিদেন আমার পক্ষে। আমি প্রায়ই এক-এক সময়ে ভাবি, এই-যে আমার জীবনে প্রত্যহ একটি একটি করে দিন আসছে, কোনোটি সূর্যোদয় সূর্যাস্তে রাঙা, কোনোটি ঘনঘোর মেঘে স্নিগ্ধ নীল, কোনোটি পূর্ণিমার জ্যোৎস্নায় শাদা ফুলের মতো প্রফুল্ল, এগুলি কি আমার কম সৌভাগ্য! এবং এরা কি কম মূল্যবান! হাজার বৎসর পূর্বে কালিদাস সেই-যে আষাঢ়ের প্রথম দিনকে অভ্যর্থনা করেছিলেন এবং প্রকৃতির সেই রাজসভায় বসে অমর ছন্দে মানবের বিরহসংগীত গেয়েছিলেন, আমার জীবনেও প্রতি বৎসরে সেই আষাঢ়ের প্রথম দিন তার সমস্ত আকাশ-জোড়া ঐশ্বর্য নিয়ে উদয় হয়— সেই প্রাচীন উজ্জয়িনীর প্রাচীন কবির, সেই বহু-বহু-কালের শত শত সুখ দুঃখ বিরহ মিলন -ময় নরনারীদের আষাঢ়স্য প্রথম দিবস! সেই অতি পুরাতন আষাঢ়ের প্রথম মহাদিন আমার জীবনে প্রতি বৎসর একটি একটি করে কমে যাচ্ছে, অবশেষে এক সময় আসবে, যখন এই কালিদাসের দিন, এই মেঘদূতের দিন, এই ভারতবর্ষের বর্ষার চিরকালীন প্রথম দিন, আমার অদৃষ্টে আর একটিও অবশিষ্ট থাকবে না।

এ কথা ভালো করে ভাবলে পৃথিবীর দিকে আবার ভালো করে চেয়ে দেখতে ইচ্ছে করে— ইচ্ছে করে জীবনের প্রত্যেক সূর্যোদয়কে সজ্ঞানভাবে অভিবাদন করি এবং প্রত্যেক সূর্যাস্তকে পরিচিত বন্ধুর মতো বিদায় দিই। আমি যদি সাধু প্রকৃতির লোক হতুম তা হলে হয়তো মনে করতুম জীবন নশ্বর, অতএব প্রতিদিন বৃথা ব্যয় না করে সৎকার্যে এবং হরিনামে যাপন করি। আমার সে প্রকৃতি নয়— তাই আমার মাঝে মাঝে মনে হয় এমন সুন্দর দিনরাত্রিগুলি আমার জীবন থেকে প্রতিদিন চলে যাচ্ছে— এর সমস্তটা গ্রহণ করতে পারছি নে! এই সমস্ত রঙ, এই আলো এবং ছায়া, এই আকাশব্যাপী নিঃশব্দ সমারোহ, এই দ্যুলোক ভূলোকের মাঝখানে সমস্ত-শূন্য-পরিপূর্ণ-করা শান্তি এবং সৌন্দর্য, এর জন্যে কি কম আয়োজনটা চলছে! কত বড়ো উৎসবের ক্ষেত্রটা! এত বড়ো আশ্চর্য কাণ্ডটা প্রতিদিন আমাদের বাইরে হয়ে যাচ্ছে, আর আমাদের ভিতরে ভালো করে তার সাড়া পাওয়াই যায় না! জগৎ থেকে এতই তফাতে আমরা বাস করি! লক্ষ লক্ষ যোজন দূর থেকে লক্ষ লক্ষ বৎসর ধরে অনন্ত অন্ধকারের পথে যাত্রা করে একটি তারার আলো এই পৃথিবীতে এসে পৌঁছয় আর আমাদের অন্তরে এসে প্রবেশ করতে পারে না, সে যেন আরও লক্ষযোজন দূরে! রঙিন সকাল এবং রঙিন সন্ধ্যাগুলি দিগ্‌বধূদের ছিন্ন কণ্ঠহার থেকে এক-একটি মানিকের মতো সমুদ্রের জলে খসে খসে পড়ে যাচ্ছে। আমাদের মনের মধ্যে একটাও এসে পড়ে না! সেই বিলেত যাবার পথে লোহিতসমুদ্রের স্থির জলের উপরে যে-একটি অলৌকিক সূর্যাস্ত দেখেছিলুম, সে কোথায় গেছে! কিন্তু ভাগ্যিস্ আমি দেখেছিলুম, আমার জীবনে ভাগ্যিস্ সেই একটি সন্ধ্যা উপেক্ষিত হয়ে ব্যর্থ হয়ে যায় নি— অনন্ত দিনরাত্রির মধ্যে সেই একটি অত্যাশ্চর্য সূর্যাস্ত আমি ছাড়া পৃথিবীর আর কোনো কবি দেখে নি। আমার

জীবনে তার রঙ রয়ে গেছে। অমন এক-একটি দিন এক-একটি সম্পত্তির মতো। আমার সেই পেনেটির বাগানের গুটিকতক দিন, তেতালার ছাতের গুটিকতক রাত্রি, পশ্চিম ও দক্ষিণের বারান্দার গুটিকতক বর্ষা, চন্দননগরের গঙ্গার গুটিকতক সন্ধ্যা, দার্জিলিঙে সিঞ্চল শিখরের একটি সূর্যাস্ত ও চন্দ্রোদয়— এই রকম কতকগুলি উজ্জ্বল সুন্দর ক্ষণখণ্ড আমার যেন ফাইল করা রয়েছে। সৌন্দর্য আমার পক্ষে সত্যিকার নেশা! আমাকে সত্যি সত্যি ক্ষেপিয়ে তোলে। ছেলেবেলায় বসন্তের জ্যোৎস্নারাত্রে যখন ছাদে পড়ে থাকতুম তখন জ্যোৎস্না যেন মদের শুভ্র ফেনার মতো একেবারে উপচে পড়ে নেশায় আমাকে ডুবিয়ে দিত।··· যে পৃথিবীতে এসে পড়েছি এখানকার মানুষগুলো সব অদ্ভুত জীব— এরা কেবলই দিন-রাত্রি নিয়ম এবং দেয়াল গাঁথছে, পাছে দুটো চোখে কিছু দেখতে পায় এই জন্যে বহু যত্নে পর্দা টাঙিয়ে দিচ্ছে— বাস্তবিক পৃথিবীর জীবগুলো ভারী অদ্ভুত! এরা যে ফুলের গাছে এক-একটি ঘ্যাটাটোপ পরিয়ে রাখে নি, চাঁদের নীচে চাঁদোয়া খাটায় নি, সেই আশ্চর্য। এই স্বেচ্ছা-অন্ধগুলো বন্ধ পাল্কির মধ্যে চড়ে পৃথিবীর ভিতর দিয়ে কী দেখে চলে যাচ্ছে! যদি বাসনা এবং সাধনা -অনুরূপ পরকাল থাকে তা হলে এবার আমি এই ওয়াড়-পরানো পৃথিবী থেকে বেরিয়ে গিয়ে যেন এক উদার উন্মুক্ত সৌন্দর্যের আনন্দলোকে গিয়ে জন্মগ্রহণ করতে পারি। যারা সৌন্দর্যের মধ্যে সত্যি সত্যি নিমগ্ন হতে অক্ষম তারাই সৌন্দর্যকে কেবলমাত্র ইন্দ্রিয়ের ধন বলে অবজ্ঞা করে— কিন্তু এর মধ্যে যে অনির্বচনীয় গভীরতা আছে, তার আস্বাদ যারা পেয়েছে তারা জানে— সৌন্দর্য ইন্দ্রিয়ের চূড়ান্ত শক্তিরও অতীত; কেবল চক্ষু কর্ণ দূরে থাক্, সমস্ত হৃদয় নিয়ে প্রবেশ করলেও ব্যাকুলতার শেষ পাওয়া যায় না। কী আমি ভদ্রলোক সেজে শহরের বড়ো রাস্তায় আনাগোনা

করছি! পরিপাটি ভদ্রলোকদের সঙ্গে ভদ্রভাবে কথাবার্তা কয়ে জীবন মিথ্যে কাটিয়ে দিচ্ছি! আমি আন্তরিক অসভ্য, অভদ্র— আমার জন্যে কোথাও কি একটা ভারী সুন্দর অরাজকতা নেই! কতকগুলো ক্ষ্যাপা লোকের আনন্দমেলা নেই! কিন্তু আমি কী এ-সমস্ত কবিত্ব করছি— কাব্যের নায়কেরা এই রকম সব কথা বলে— কনভেন্‌শনালিটির উপরে তিন-চার-পাত-জোড়া স্বগত উক্তি প্রয়োগ করে, আপনাকে সমস্ত মানবসমাজের চেয়ে বড়ো মনে করে। বাস্তবিক, এসব কথা বলতে লজ্জা করে। এর মধ্যে যে সত্যটা আছে সে বহুকাল থেকে ক্রমাগত কথা চাপা পড়ে আসছে। পৃথিবীতে সবাই ভারী কথা কয়— তার মধ্যে আমি একজন অগ্রগণ্য— হঠাৎ এতক্ষণে সে বিষয়ে চেতনা হল।···

পুঃ— আসল যে কথাটা বলতে গিয়েছিলুম সেটা বলে নিই— ভয় পাস নে, আবার চার পাতা জুড়ব না— কথাটা হচ্ছে, পয়লা আষাঢ়ের দিন বিকেলে খুব মুষলধারে বৃষ্টি হয়ে গেছে। বাস্।

কলকাতা
১৬ জুন?
১৮৯২

শিলাইদহ

[বৃহস্পতিবার] ১৬ জুন। ১৮৯২।

যতই একলা আপন মনে নদীর উপরে কিম্বা পাড়াগাঁয়ে কোনো খোলা জায়গায় থাকা যায় ততই প্রতিদিন পরিষ্কার বুঝতে পারা যায়, সহজ ভাবে আপনার জীবনের প্রাত্যহিক কাজ করে যাওয়ার চেয়ে সুন্দর এবং মহৎ আর কিছু হতে পারে না! মাঠের তৃণ থেকে আকাশের তারা পর্যন্ত তাই করছে; কেউ গায়ের জোরে আপনার সীমাকে অত্যন্ত বেশি অতিক্রম করবার জন্যে চেষ্টা করছে না ব'লেই প্রকৃতির মধ্যে এমন গভীর শান্তি এবং অপার সৌন্দর্য— অথচ প্রত্যেকে যেটুকু করছে সেটুকু বড়ো সামান্য নয়— ঘাস আপনার চূড়ান্ত শক্তি প্রয়োগ করে তবে ঘাস-রূপে টি‍ঁকে থাকতে পারে, তার শিকড়ের শেষ প্রান্তটুকু পর্যন্ত দিয়ে তাকে রসাকর্ষণ করতে হয়। সে যে নিজের শক্তি লঙ্ঘন করে নিজের কাজ অবহেলা করে বটগাছ হবার নিষ্ফল চেষ্টা করছে না, এই জন্যেই পৃথিবী এমন সুন্দর শ্যামল হয়ে রয়েছে। বাস্তবিক, বড়ো বড়ো উদ্যোগ এবং লম্বাচৌড়া কথার দ্বারা নয়, কিন্তু প্রাত্যহিক ছোটো ছোটো কর্তব্য-সমাধা-দ্বারাই মানুষের সমাজে যথাসম্ভব শোভা এবং শান্তি আছে। কবিত্বই বলো, বীরত্বই বলো, কোনোটাই আপনাতে আপনি সম্পূর্ণ নয়। কিন্তু একটি অতি ক্ষুদ্র কর্তব্যের মধ্যেও তৃপ্তি এবং সম্পূর্ণতা আছে। ব'সে ব'সে হাঁস্‌ফাঁস্ করা, কল্পনা করা, কোনো অবস্থাকেই আপনার যোগ্য মনে না করা, এবং ইতিমধ্যে সম্মুখ দিয়ে সময়কে চলে যেতে দেওয়া, ছোটো বড়ো সমস্ত কর্তব্যকে প্রতিদিন অলক্ষিতভাবে বয়ে যেতে দেওয়া, এর চেয়ে হেয় আর-কিছু হতে পারে না। যখন মনে মনে প্রতিজ্ঞা করা যায় আপনার চারিদিককার সুখ এবং মঙ্গলের উদ্দেশে সুখদুঃখের ভিতর দিয়ে নিজের সাধ্যায়ত্ত সমস্ত কর্তব্য সত্যের সঙ্গে, বলের সঙ্গে, হৃদয়ের সঙ্গে পালন করে যাব এবং

যখন বিশ্বাস হয় তা করতে পারব, তখন সমস্ত জীবন আনন্দে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে, ছোটোখাটো দুঃখ বেদনা একেবারে দূর হয়ে যায়। অবশ্য, আমার জীবনের প্রতিদিন এবং প্রত্যেক মুহূর্ত আমার সম্মুখে এখন প্রত্যক্ষভাবে উপস্থিত নেই, তাই হয়তো দূর থেকে হঠাৎ একটা কাল্পনিক আশার উচ্ছ্বাসে স্ফীত হয়ে উঠছি, সমস্ত খুঁটিনাটি খিটিমিটি সংকট এবং সংঘর্ষ বাদ দিয়ে ভাবী জীবনের একটা মোটামুটি চিত্র অঙ্কিত ক'রে এতটা ভরসা পাচ্ছি, কিন্তু তা ঠিক নয়।···

কলকাতা

১৭ জুন ১৮৯২

৫৭

শিলাইদহ

শুক্রবার, ৪ আষাঢ়। ১২৯৯।

আজকাল আমি বিকেলে সন্ধের দিকে ডাঙায় উঠে অনেক ক্ষণ বেড়াতে থাকি— পূর্ব দিকে যখন ফিরি এক রকম দৃশ্য দেখতে পাই, পশ্চিমে যখন ফিরি আর-এক রকম দেখতে পাই— আকাশ থেকে আমার মাথার উপরে যেন সান্ত্বনা বৃষ্টি হতে থাকে, আমার দুই মুগ্ধ চোখের ভিতর দিয়ে যেন একটি স্বর্ণময় মঙ্গলের ধারা আমার অন্তরের মধ্যে প্রবেশ করতে থাকে। এই বাতাসে আকাশে এবং আলোকে প্রতিক্ষণে আমার মন ছেয়ে যেন নতুন পাতা গজিয়ে উঠছে · আমি নতুন প্রাণ এবং বলে পরিপূর্ণ হয়ে উঠছি। সংসারের সমস্ত কাজ করা এবং লোকের সঙ্গে ব্যবহার করা আমার পক্ষে ভারী সহজ হয়ে পড়েছে। আসলে সবই সোজা— একটিমাত্র সিধে রাস্তা আছে, চোখ চেয়ে সেই রাস্তা ধরে গেলেই হল ; নানা রকম বুদ্ধিপূর্বক short cut খোঁজবার দরকার দেখি নে— সুখ দুঃখ সকল রাস্তাতেই আছে, কোনো রাস্তা দিয়েই তাদের এড়িয়ে যাবার জো নেই— কিন্তু শান্তি কেবল এই বড়ো রাস্তাতেই আছে।

কলকাতা

১৮ জুন ১৮৯২

৫৮

গোয়ালন্দের পথে

২১ জুন ১৮৯২

আজ সমস্ত দিন নদীর উপরে ভেসে চলেছি। আশ্চর্য এই বোধ হচ্ছে যে, কতবার এই রাস্তা দিয়ে গেছি, এই বোটে চ'ড়ে জলে জলে বেড়িয়েছি— এবং নদীর দুই তীরের মাঝখান দিয়ে ভেসে যাবার যে একটা বিশেষ আনন্দ আছে সে উপভোগ করেছি— কিন্তু দিন দুই ডাঙায় বসে থাকলে সেটা ঠিকটা আর মনে থাকে না। এই-যে একলাটি চুপ করে বসে চেয়ে থাকা— দুই ধারে গ্রাম ঘাট শস্যক্ষেত্র চর বিচিত্র ছবি দেখা দিচ্ছে এবং চলে যাচ্ছে, আকাশে মেঘ ভাসছে এবং সন্ধের সময় নানা রকম রঙ ফুটছে— নৌকো চলেছে, জেলেরা মাছ ধরছে, অহর্নিশি জলের এক প্রকার আদরপরিপূর্ণ তরল শব্দ শোনা যাচ্ছে— সন্ধেবেলায় বিস্তৃত জলরাশি শ্রান্ত নিদ্রিত শিশুর মতো একেবারে স্থির হয়ে যাচ্ছে এবং উন্মুক্ত আকাশের সমস্ত তারা মাথার উপরে জেগে চেয়ে আছে— গভীর রাত্রে যেদিন ঘুম নেই সেদিন উঠে বসে দেখি অন্ধকারাচ্ছন্ন দুই কূল নিদ্রিত— মাঝে মাঝে কেবল গ্রামের বনে শৃগাল ডাকছে এবং পদ্মার নীরব খরস্রোতে ঝুপ্‌ঝাপ্ করে পাড় খসে খসে পড়ছে— এই-সমস্ত পরিবর্তমান ছবি যেমন যেমন চোখে পড়তে থাকে অমনি মনের ভিতরে একটা কল্পনার স্রোত বইতে থাকে এবং তার দুই পারে সুদূর তটদৃশ্যের মতো নব নব আকাঙ্ক্ষার চিত্র দেখা দিতে থাকে। হয়তো সম্মুখের দৃশ্যটা খুব একটা চমৎকার কিছু নয়— একটা হলদে রকমের তৃণতরুশূন্য বালির চর ধূ ধূ করছে, তারই গায়ে একটা জনশূন্য নৌকো বাঁধা রয়েছে এবং আকাশের ছায়ায় ফিকে-নীলবর্ণ নদী বয়ে চলে যাচ্ছে— দেখে মনের ভিতরে কী রকম করে বলতে পারি নে— বোধ হয় সেই ছেলেবেলায় যখন আরব্য-উপন্যাস পড়তুম, সিন্ধ্‌বাদ নানা নূতন দেশে বাণিজ্য করতে বাহির হত, ভৃত্য-

শাসিত আমি তোষাখানার মধ্যে রুদ্ধ হয়ে বসে বসে দুপুর বেলায় সিন্ধ্‌বাদের সঙ্গে ঘুরে বেড়াতুম, তখন যে আকাঙ্ক্ষাটা মনের মধ্যে জন্মেছিল সেটা যেন এখনো বেঁচে আছে— এই বালিচরে নৌকো বাঁধা দেখলে সেই যেন চঞ্চল হয়ে ওঠে। ছেলেবেলায় যদি আরব্য-উপন্যাস রবিন্‌সন্‌ক্রুসো না পড়তুম, রূপকথা না শুনতুম, তা হলে নিশ্চয় বলতে পারি ঐ নদীতীর এবং মাঠের প্রান্তের দূর দৃশ্য দেখে ঠিক এমন ভাব মনে উদয় হত না— সমস্ত পৃথিবীর চেহারা আমার পক্ষে আর-এক রকম হয়ে যেত। এইটুকু মানুষের মনের ভিতরে বাস্তবিকে কাল্পনিকে জড়িয়ে-জড়িয়ে কী-যে একটা জাল পাকিয়ে আছে! কিসের সঙ্গে যে কী গেঁথে গেছে— কত গল্পের সঙ্গে, ছবির সঙ্গে, ঘটনার সঙ্গে, সামান্যের সঙ্গে, বড়োর সঙ্গে, জড়িয়ে গিঁট পড়ে আছে— প্রতিদিন অজ্ঞাতে জড়িয়ে যাচ্ছে— একটা মানুষের একটা বৃহৎ জীবনের জাল খুলতে পারলে কত ছোটো এবং কত বড়োর মিশোল আলাদা করা যায়— কী-একটা হেটেরোজিনিয়াস স্তূপ হয়!

কলকাতা

২২ জুন ১৮৯২

শিলাইদহ

সোমবার, ২২ জুন। ১৮৯২।

আজ খুব ভোরে বিছানায় শুয়ে শুয়ে শুনছিলুম ঘাটে মেয়েরা উলু দিচ্ছে— শুনে মনটা কেমন ঈষৎ বিকল হয়ে গেল, অথচ তার কারণ ভেবে পাওয়া শক্ত। বোধ হয় এই রকমের একটা আনন্দধ্বনিতে হঠাৎ অনুভব করা যায় পৃথিবীতে একটা বৃহৎ কর্মপ্রবাহ চলছে যার অধিকাংশের সঙ্গে আমার যোগ নেই— পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষ আমার কেউ নয়, অথচ তাদের কত কাজকর্ম সুখদুঃখ উৎসব-আনন্দ চলছে— কী বৃহৎ পৃথিবী! কী বিপুল মানবসংসার! কত সুদূর থেকে জীবনের ধ্বনি প্রবাহিত হয়ে আসে— সম্পূর্ণ অপরিচিত ঘরের একটুখানি বার্তা পাওয়া যায়। মানুষ যখন বুঝতে পারে 'আমার কাছে আমি যত বড়োই হই আমাকে দিয়ে সমস্ত বিশ্ব পরিপূর্ণ করতে পারি নে— অধিকাংশ জগৎই আমার অজ্ঞাত, অজ্ঞেয়, অনাত্মীয়, আমা-হীন'— তখন এই প্রকাণ্ড ঢিলে জগতের মধ্যে আপনাকে অত্যন্ত খাটো এবং এক রকম পরিত্যক্ত এবং প্রান্তবর্তী বলে মনে হয়— তখনি মনের মধ্যে এই রকমের একটা ব্যাপ্ত বিষাদের উদয় হয়। তা ছাড়া এই উলুধ্বনিতে নিজের অতীত ভবিষ্যৎ সমস্ত জীবনটা একটি অতি সুদীর্ঘ পথের মতো চোখের সম্মুখে উদয় হল এবং তারই এক-একটি সুদূর ছায়াময় প্রান্ত থেকে এই উলুধ্বনি কানে এসে পৌঁছতে লাগল। এই রকম ভাবে তো আজ দিনটা আরম্ভ করেছি। এখনি সদর-নায়েব আমলাবর্গ এবং প্রজারা উপস্থিত হলে এই উলুধ্বনির প্রতিধ্বনিটুকু পাড়া ছেড়ে পালাবে, অতি ক্ষীণ ভূত ভবিষ্যৎকে দুই কনুই দিয়ে ঠেলে ফেলে জোয়ান বর্তমান নিজমূর্তি ধরে সেলাম ঠুকে এসে দাঁড়াবে— খাজনা আদায়ে মন দিতে হবে। ... ...

জুন ১৮৯২

কাল আমার নাটকটাকে শেষ পোঁচ দেওয়া সমাপ্ত করেছি। একটু-আধটু বদল-সদল হয়েছে— নাটকে আবার খুব বেশি হাত ছেড়ে দেওয়া যায় না— কাজটা অনেকটা চৌঘুড়ি হাঁকানোর মতো— অনেক-গুলো ঘোড়াকে এক গাড়িতে জুতে, এক রাস্তা দিয়ে, এক উদ্দেশ্যের দিকে নিয়ে যাওয়া। সুতরাং ওর মধ্যে কোনো-একটা ঘোড়াকে বেশি লাগাম ছেড়ে দেওয়া যায় না, সব কটাকে সমান গতিতে ছোটানো চাই।··· বিদেশী বন্ধুর সঙ্গে চিঠিতে বন্ধুত্ব জাগিয়ে রাখা সম্বন্ধে তোর সঙ্গে আমার মতের অনৈক্য নেই— দূর থেকে মাঝে মাঝে কেবল পত্রব্যজন করে বন্ধুত্ববহ্নিকে ভস্মগ্রাস থেকে রক্ষা করা বিষম বিরক্তির কাজ এবং প্রায় অসাধ্য বললেই হয়। পৃথিবীতে ছোটোখাটো আত্মীয়তা প্রতিদিন আসছে এবং যাচ্ছে— আমার সঙ্গে তাদের জীবনের প্রধান বন্ধন কিছুই নেই— তাদের যেখানে সংসারের কেন্দ্র, তাদের গুরুতর সুখ দুঃখ যার চার দিকে আবর্তিত হচ্ছে, আমার পক্ষে সে এক রকম সম্পূর্ণ অপরিচিত। এমন স্থলে সকল রকম বাধা অতিক্রম করে পরস্পরকে টানাটানি করে রাখবার কী এমন অত্যাবশ্যক পড়েছে!

কলকাতা
২৩ জুন ১৮৯২

৬০

সাজাদপুর

সোমবার, ২৭ জুন। ১৮৯২।

কাল বিকেলের দিকে এমনি করে এল, আমার ভয় হল। এমনতর রাগী চেহারার মেঘ আমি কখনো দেখেছি বলে মনে হয় না— গাঢ় নীল মেঘ দিগন্তের কাছে একেবারে থাকে থাকে ফুলে উঠেছে, একটা প্রকাণ্ড হিংস্র দৈত্যের রোষস্ফীত গোঁফ-জোড়াটার মতো। এই ঘন নীলের ঠিক পাশেই দিগন্তের সব শেষে ছিন্ন মেঘের ভিতর থেকে একটা টক্‌টকে রক্তবর্ণ আভা বেরোচ্ছে— একটা আকাশব্যাপী প্রকাণ্ড অলৌকিক 'বাইসন' মোষ যেন ক্ষেপে উঠে রাঙা চোখ দুটো পাকিয়ে ঘাড়ের নীল কেশরগুলো ফুলিয়ে বক্রভাবে মাথাটা নিচু করে দাঁড়িয়েছে, এখনি পৃথিবীকে শৃঙ্গাঘাত করতে আরম্ভ করে দেবে এবং এই আসন্ন সংকটের সময় পৃথিবীর সমস্ত শস্যক্ষেত এবং গাছের পাতা হী হী করছে, জলের উপরিভাগ শিউরে শিউরে উঠছে, কাকগুলো অশান্তভাবে উড়ে উড়ে কা কা করে ডাকছে।

কলকাতা

২৯ জুন ১৮৯২

৬১

সাজাদপুর

২৮ জুন। ১৮৯২।

তোর আজকের চিঠির মধ্যে এক জায়গায় অভির গানের একটু-খানি উল্লেখ আছে— পড়ে মনটা কেমন হঠাৎ হুহু করে উঠল— জীবনের অনেকগুলি ছোটো ছোটো উপেক্ষিত সুখ, যারা শহরের গোলমালের মধ্যে কোনো আমল পায় না, বিদেশে এলে তারা সময় বুঝে হৃদয়ের কাছে আপন আপন দরখাস্ত পাঠিয়ে দেয়। আমি গান বাজনা এত ভালোবাসি, এবং শহরেও এত কণ্ঠ এবং বাদ্য আছে, কিন্তু দিনের পর দিন চলে যায় একদিনও প্রায় গান বাজনায় কর্ণপাত করি নে। যদিও সব সময়ে বুঝতে পারি নে কিন্তু মনের ভিতরটা কি তৃষিত হয়ে থাকে না! তোর চিঠি পড়বামাত্রই অভির মিষ্টি গান শোনবার জন্যে আমার এমনি ইচ্ছে করে উঠল যে তখনি বুঝতে পারলুম, আমার প্রকৃতির অনেকগুলি ক্রন্দনের মধ্যে এও একটা ক্রন্দন ভিতরে ভিতরে চাপা ছিল। বড়ো বড়ো দুরাশার মোহে জীবনের ছোটো ছোটো আনন্দগুলিকে উপেক্ষা করে আমাদের জীবনকে কী উপবাসী করেই রাখি! যখন বিলেতে যাচ্ছিলুম আমার একটা কল্পনার সুখের ছবি এই ছিল যে, তোরা কেউ পিয়ানো বাজাচ্ছিস, খোলা দরজা-জানলার ভিতর দিয়ে আলো এবং বাতাস আসছে এবং খানিকটা সুদূর আকাশ ও গাছপালা দেখা যাচ্ছে— আমি একটা খোলা জানলার কাছে কৌচের উপর পড়ে বাইরে চোখ রেখে শুনছি। এটা যে খুবই একটা দুর্লভ দুরাশা তা বলতে পারি নে, কিন্তু তিনশো পঁয়ষট্টি দিনের মধ্যে কদিন অদৃষ্টে এ সুখ পাওয়া যায়! এই-সমস্ত সুলভ আনন্দের অপরিতৃপ্তি জীবনের হিসাবে প্রতিদিন বেড়ে উঠছে, এর পরে এমন একটা দিন আসতেও পারে যখন মনে হবে যদি আবার জীবনটা সমস্তটা

ফিরে পাই তা হলে আর কিছু অসাধ্য সাধন করতে চাই নে, কেবল জীবনের এই প্রতিদিনের অযাচিত ছোটো ছোটো আনন্দগুলি প্রতিদিন উপভোগ করে নিই। যা হোক, মোদ্দা কথাটা হচ্ছে, এবারে যখন কলকাতায় ফিরব তখন মাঝে মাঝে অভির গান শুনব এবং তোরা যখন বাজনা বাজাতে ইচ্ছে করবি আমাকে শ্রোতার মধ্যে গণ্য করে নিস। এবারে কলকাতায় গিয়ে কত কী যে করব তার ঠিক নেই— কাজ করব, গান করব, হাসব, গল্প করব, ভালো বাসব, রাত্তিরে গভীর নিদ্রা দেব এবং সকালে উঠে নব নব সূর্যোদয়কে আনন্দে অভ্যর্থনা করে প্রতিদিনের কাজের মধ্যে প্রবেশ করব— বিক্ষিপ্ত জীবনকে সংহত করে এনে বেশ একটি ছায়াময় শান্তিময় সংগীতময় ছোটো স্রোতের মধ্যে প্রবাহিত করে দেব। লেখার চেয়ে করা কিঞ্চিৎ শক্ত হবে, কিন্তু সেই কঠিন হবে ব'লেই সুখ আছে।

কলকাতা
১০ জুন ?
১৮৯২

সাজাদপুর

২৯ জুন। ১৮৯২।

তোকে চিঠিতে লিখেছিলেম কাল 7 p. m.'এর সময় কবি কালিদাসের সঙ্গে একটা এন্‌গেজমেন্ট্‌ করা যাবে। বাতিটি জ্বালিয়ে টেবিলের কাছে কেদারাটি টেনে যখন বেশ প্রস্তুত হয়ে বসেছি, হেনকালে কবি কালিদাসের পরিবর্তে এখানকার পোস্ট্‌মাস্টার এসে উপস্থিত। মৃত কবির চেয়ে একজন জীবিত পোস্ট্‌মাস্টারের দাবি ঢের বেশি— আমি তাকে বলতে পারলুম না 'আপনি এখন যান, কালিদাসের সঙ্গে আমার একটু বিশেষ আবশ্যক আছে'— বললেও সে লোকটা ভালো বুঝতে পারত না। অতএব পোস্ট্‌মাস্টারকে চৌকিটি ছেড়ে দিয়ে কালিদাসকে আস্তে আস্তে বিদায় নিতে হল। এই লোকটির সঙ্গে আমার একটু বিশেষ যোগ আছে। যখন আমাদের এই কুঠিবাড়ির একতলাতেই পোস্ট্‌ আফিস ছিল এবং আমি এঁকে প্রতিদিন দেখতে পেতুম, তখনি আমি একদিন দুপুর বেলায় এই দোতলায় বসে সেই পোস্ট্‌মাস্টারের গল্পটি লিখেছিলুম, এবং সে গল্পটি যখন হিতবাদীতে বেরোল তখন আমাদের পোস্ট্‌মাস্টারবাবু তার উল্লেখ করে বিস্তর লজ্জামিশ্রিত হাস্য বিস্তার করেছিলেন। যাই হোক, এই লোকটিকে আমার বেশ লাগে। বেশ নানারকম গল্প করে যায়, আমি চুপ করে বসে শুনি। ওর মধ্যে আবার বেশ একটুখানি হাস্যরসও আছে। তাই জন্যে খুব শীঘ্র জমিয়ে তুলতে পারে। সমস্ত দিন চুপচাপ একলা বসে থেকে মাঝে মাঝে এইরকম জীবন্ত মানুষের সংঘাতে আবার যেন সমস্ত জীবনটা তরঙ্গিত হয়ে ওঠে।... তিনি আমাদের মুন্সেফ বাবুর গল্প করছিলেন। ব্যাপারটা শুনে এবং তাঁর বলবার ভঙ্গী দেখে আমি হেসে হেসে শ্রান্ত হয়ে পড়েছিলুম। কথাটা হচ্ছে এই, মুন্সেফ বাবু হঠাৎ একটা গাছের

গুঁড়ির মধ্যে শিব দেখতে পেয়েছেন। প্রথম দিন দেখলেন শিব, তার পরদিন দেখলেন কালী, তার পরদিন রাধাকৃষ্ণ ইত্যাদি— সমস্ত বৈকুণ্ঠপুরী আমাদের সাজাদপুরের বটতলায় হঠাৎ নেবে এসেছে। তিনি সকলকেই ধরে ধরে বলছেন— 'ঐ দেখুন, ঐ দেখুন, দেখতে পাচ্ছেন না! ঐ চোখ! ঐ জিব!' যারা তাঁর আমলা এবং অনুগত লোক তারা কাজে-কাজেই দেখতে পাচ্ছে, আর যাদের তাঁর প্রতি কিছু নির্ভর নেই তারা কিছুতেই দেখতে পাচ্ছে না। আমাদের পোস্ট্‌মাস্টার সেই শ্রেণীর লোক। যেদিন ক্ষীর এবং কাঁঠাল দিয়ে ঠাকরুনের ভোগ হয় সেই দিন তিনি দেখতে পান— কিন্তু ক্ষীরটুকু নিঃশেষ হয়ে গেলেই তিনি মুন্সেফকে জিজ্ঞাসা করেন, 'আপনি কোন্‌টাকে চোখ বলছিলেন মশায়?' মুন্সেফ বলেন, 'দেখতে পাচ্ছেন না? ঐ যে ঐ উপরে!' পোস্ট্‌মাস্টার গম্ভীরভাবে বলেন, 'বটে! আমি ঠিক ঐটেকেই মাথা মনে করেছিলুম।' কোনোদিন বা মুন্সেফ তাঁকে বলেন, 'আচ্ছা মশায়, আপনি ওটা কি লক্ষ্য করে দেখছিলেন? আজ আরতির সময় কাঁসর ঘণ্টা বাজবামাত্র কী যেন একটা গাছের উপর এসে বসল আর উপর থেকে দু-চার ফোঁটা জল পড়ল!' পোস্ট্‌-মাস্টার ভালোমানুষের মতো মুখ করে উত্তর দেন, 'আজ্ঞে হাঁ— গাছটা নড়েছিল বটে।' সে গাছটার চার দিক বাঁধিয়ে ফেলা হয়েছে — মুন্সেফ সেখানে দু বেলা পুজো দিচ্ছেন, শাখ ঘণ্টা বাজছে, একজন সন্ন্যাসী সেখানে বসে গাঁজা টানছে এবং চোখ বুজে বলছে 'ঐ কালী মায়ীকে দেখতে পাচ্ছি'। এক-একটা লোক আবার সেখানে গিয়ে মূর্ছা যায়, এবং মূর্ছিত অবস্থায় দৈববাণী বলতে থাকে। বিবিধপ্রকার বুজরুকি হতে আরম্ভ হয়েছে। পোস্ট্‌মাস্টার বলছিলেন, 'আপনাদের জমিদারিতে ম্যাজিস্ট্রেট এলে আপনারা দেখা করতে যান, আর এতগুলো দেবতা বটতলায় এসে আশ্রয় নিলেন— আপনার

উচিত একবার ভিজিট পে করে আসা।' আমিও মনে করছি একবার মজাটা দেখে এলে হয়। যাই হোক, কিছুদিন এই হুজুকটা চললে সাজাদপুর একটা তীর্থস্থান হয়ে উঠতে পারে। তাতে আমাদের লাভ আছে। পোস্ট্‌মাস্টার চলে গেলে সেই রাত্রে আবার রঘুবংশ নিয়ে পড়লুম। ইন্দুমতীর স্বয়ম্বর পড়ছিলুম। সভায় সিংহাসনের উপর সারি সারি সুসজ্জিত সুন্দর-চেহারা রাজারা বসে গেছেন— এবং এক সময়ে শঙ্খ এবং তূরী -ধ্বনির মধ্যে বিবাহবেশ পরে সুনন্দার হাত ধরে ইন্দুমতী তাঁদের মাঝখানের সভাপথে এসে দাঁড়ালেন। ছবিটি মনে করতে এমনি সুন্দর লাগে! তার পরে সুনন্দা এক-এক জনের পরিচয় করিয়ে দিচ্ছে আর ইন্দুমতী অনুরাগহীন এক-একটি প্রণাম করে চলে যাচ্ছেন। এই প্রণাম করাটি কেমন সুন্দর! যাকে ত্যাগ করছেন তাকে যে নম্রভাবে সম্মান করে যাচ্ছেন এতে কতটা মানিয়ে যাচ্ছে! ইংরাজ গর্বিণীর ঔদ্ধত্যের চেয়ে এ ঢের ভালো। সকলেই রাজা এবং সকলেই তার চেয়ে বয়সে বড়ো, ইন্দুমতী একটি বালিকা, সে যে তাঁদের একে একে অতিক্রম করে যাচ্ছে এই অবশ্য রূঢ়তাটুকু যদি একটি একটি সুন্দর সবিনয় প্রণাম দিয়ে না মুছে দিয়ে যেত তা হলে এই দৃশ্যের সৌন্দর্য থাকত না। কিন্তু অজের গলায় মালা দেবার পূর্বেই অনেক রাত হওয়াতে শুতে যেতে হল— তাই কাল প্রিয়র বিয়ের সঙ্গে সঙ্গেই ইন্দুমতীর বিয়েটা সমাধা হয়ে উঠল না।

কলকাতা

১ জুলাই ১৮৯২

সাজাদপুর
৩০ জুন। ১৮৯২।

মেয়েদের নূতন জীবনে প্রবেশ করার যে কী ভাব তা পুরুষের পক্ষে বোঝা একটু শক্ত— বিশেষতঃ আমাদের মতো হাড়পাকা বুড়ো লোকের। বোধ হয় ওর মধ্যে খুব একটা নেশা আছে— ঈষৎ আশঙ্কা মিশ্রিত থাকাতে ওর তীব্রতা আরও অনেকটা বাড়িয়ে তোলে।··· সেই বন্ধনমুক্তির মধ্যে অনেকখানি উল্লাস এবং একটুখানি দুঃখও আছে বোধ হয়। আমার পক্ষে কল্পনা করা দুরূহ, একজন অপরিচিত পুরুষের সঙ্গে অপরিচিত স্থানে দিন রাত কেমন করে কাটে! মনে করলে অসহ্য শ্রান্তি বোধ হয়। তার কারণ আমি নিজে পুরুষমানুষ। মেয়েরা সৃষ্টিকাল পর্যন্ত ঐ কাজ করে আসছে। ওটা তাদের নিতান্ত স্বাভাবিক হয়ে গেছে। একটা নতুন স্বামীকে হাতে করে নিয়ে তার সুখ দুঃখ তার ইচ্ছা অনিচ্ছা বিচার করে একটা সুগম্ভীর পুঁতুলখেলা করতে বোধ হয় বেশ লাগে— বিশেষতঃ সেটাই যখন জীবনের একমাত্র কর্তব্য কার্য। আমরা বৃদ্ধবয়সে জীবনের অনেকগুলো বৈরাগ্যের মধ্যে রুদ্ধালোকে বসে বসে ফিলজফি করছি, আমরা কী করে ঠিক বুঝব একজন নবীনা তার সমস্ত প্রস্ফুটিত হৃদয় মন নিয়ে যখন একটা জীবন থেকে আর-একটা নূতন আশাপূর্ণ জীবনের উপরে গিয়ে পড়ে তখন সেই প্রথম মুহূর্তে তার সমস্ত অস্তিত্ব কিরকম একটা দীপ্তিতে উজ্জ্বল উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে! আর একজনের নবীন জীবনের নব আশার কথা আমার মতো লোকের কাছে একটা বহুদূরের দৃশ্যের মতো বোধ হয়— সে জায়গা থেকে আমরা যেন অনেক কাল হল চলে এসেছি। কিন্তু আমাদেরও একটা বৃহৎ নব-জীবন আছে— সম্মুখে এক-একবার খুব একটা প্রশস্ত আশার সংগীত শুনতে পাই, যেন দূরে আকাশব্যাপী একটা অর্গান থেকে

আসছে। আমাদের নবজীবন হচ্ছে যখন সুখ ছেড়ে সন্তোষের বৃহৎ-রাজ্যে প্রবেশ করি— বৃথা সন্ধান পরিত্যাগ করে সমস্ত কর্তব্যগুলিকে অকাতরে গ্রহণ করি। সেও একটা বৃহৎ স্বাতন্ত্র্য লাভ করা, আপনার সমস্ত বোঝা এবং পাথেয় স্কন্ধে করে রাজপথে বেরিয়ে পড়া। এখন আমাদের সামনের নহবৎখানা থেকে ঠিক সাহানা বাজছে না। কানাড়ার তান দিয়েছে— রাত্রি যতই গভীর হবে ততই সেটা মধুর শোনাবে। পিছন ফিরে পৃথিবীটাকে দেখতে এখন বেশ লাগে— তোরা সবাই এখনকার নতুন কালের মধ্যে থেকে বেরিয়ে এসে জীবনের নানা দিকে নানা ভাবে প্রবাহিত হতে যাচ্ছিস, সব-সুদ্ধ মিলে তার একটা ভারী মধুর সংগীত আছে— তোদের ঐ নবজীবনের বিচিত্র আনন্দধ্বনি আমি যেন বেশ স্নিগ্ধশীতল শান্ত হৃদয়ে শুনতে পারি এবং আমার জীবনদিগন্ত থেকে একটি সুন্দর স্নেহ-আনন্দের আভা তোদের নবীন সংসারের উপরে যেন শান্তিবচনের মতো পড়ে। মঙ্গল আমার হৃদয় থেকে প্রতিফলিত হয়ে তোদের ললাটে গিয়ে পড়ুক

কলকাতা
২ জুলাই ১৮৯২

সাজাদপুর

৩ জুলাই। ১৮৯২।

কাল রাত্তিরে আমি বেশ একটা নতুন রকমের স্বপ্ন দেখেছি। যেন কোথায় এক জায়গায় লেপ্টেনেন্ট্‌ গবর্নর এসেছে এবং তার অভ্যর্থনা-উপলক্ষ্যে উৎসব হচ্ছে। অন্যান্য নানারকম আমোদের মধ্যে একটা তাম্বুতে একজন বিখ্যাত বুড়ো গাইয়ে গান গাচ্ছে। আমি সে তাম্বুর ভিতরে বসে নেই, কিন্তু বাইরে থেকে সমস্ত শুনতে পাচ্ছি। গাইয়েটা একটা বড়োরকম ইমনকল্যাণ গান গাচ্ছিল। গাইতে গাইতে হঠাৎ এক জায়গায় সে ভুলে গেল। দুবার সেটা ফিরে ফিরে মনে করবার চেষ্টা করলে— তার পর তৃতীয় বারের বার নিরাশ হয়ে তার কথাগুলো ছেড়ে দিয়ে অমনি কেবল সুরটা ভেঁজে যেতে যেতে হঠাৎ তার সুরটা কেমন করে কান্নায় পরিবর্তিত হয়ে গেল— সবাই মনে করছিল সে গান গাচ্ছে, হঠাৎ দেখলে সে কান্না। তার কান্না শুনে বড়দাদা 'আহা আহা' করে উঠলেন, একজন প্রকৃত আর্টিস্টের মনে এরকম ঘটনায় কতখানি আঘাত লাগতে পারে তিনি যেন সেটা বেশ পরিষ্কার বুঝতে পারলেন— বাইরে থেকে তার সেই আন্তরিক শোকের স্বর শুনে আমারও ভারী কষ্ট হতে লাগল— পাছে শ্রোতাদের মধ্যে এমন ঢের লোক থাকে যারা এই গায়কের হঠাৎ এই শোকোচ্ছ্বাস ভারী অদ্ভুত বলে মনে করে, এর যথার্থ মর্মটুকু না বুঝতে পেরে লোকটার উপর আধা বিরক্তি আধা পরিহাস প্রকাশ করে, আমার ইচ্ছে করছিল কোনো রকমে তাকে আড়াল করে রাখতে। তার পরে নানারকম অসংলগ্ন হিজিবিজি কী হল এবং বাংলা মুল্লুকের লেপ্টে-নেন্ট্‌ গবর্নর যে কোথায় উড়ে গেল তার কিছুই মনে নেই। যা হোক, স্বপ্নের এই প্রথমাংশটুকু বেশ লাগল।

কলকাতা। ৫ জুলাই ১৮৯২

৬৫

সাজাদপুর
৪ জুলাই। ১৮৯২।

আজ সাজাদপুর স্কুলের ছাত্রসভায় আমাকে যেতে হয়েছিল।·· বেলা চারটের সময় সভাগৃহে গিয়ে উপস্থিত হলুম। আমাকে গিয়ে সভাপতির আসনে বসতে হল। যদিও আমার সভ্যেরা সমস্তই প্রায় অপ্রাপ্তবয়স্ক অজাতশ্মশ্রু পাড়াগেঁয়ে ছাত্র, তবু দাঁড়িয়ে উঠে বক্তৃতা করবার আসন্ন সম্ভাবনায় সমস্ত ক্ষণ আমার বুকে ব্যথা করতে লাগল— মনকে নানারকম ভরসা দিয়ে কিছুতেই সেটা নিবারণ করতে পারলুম না। প্রথম ছাত্রটি অতি অদ্ভুত ইংরিজিতে স্বাস্থ্যের উপকারিতা সম্বন্ধে বলতে লাগল; বললে: Used key is not dirty. Great men always take care of their health. Take for instance Pundit Vidyasagar & Keshab Chandra Sen. They took great care of their health. If you do not take care of your health you get ill and you cannot study or do anything। এই রকম সব জ্ঞানগর্ভ বাক্যাবলী ইংরাজিতে এবং বাংলাতে শোনা গেল। অবশেষে আমাকেও এক সময়ে উঠে দাঁড়াতে হল— আমি যথাসাধ্য সংক্ষেপে সেরে দিলুম। গম্ভীরস্বরে বললুম— ছাত্রগণ! আজ তোমরা যে প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করলে সেই জিনিসটা এবং মৌখিক আলোচনা করবার শক্তি উভয়েরই অভাব থাকাতে আমি আজ অধিক কিছু বলতে পারব না— তা ছাড়া বিষয়টা এমনি যে ও বিষয়ে নূতন কথা বলা ভারী শক্ত। কিন্তু শরীর অসুস্থ হলে কী কষ্ট এবং সুস্থ থাকলে কী সুখ, অনুমান করি, সে বিষয়ে তোমরা এমনি পরিষ্কার বুঝেছ যে আমি ও সম্বন্ধে কোনো নতুন কথা না বললেও তোমরা

স্বাস্থ্যরক্ষার জন্যে চেষ্টা করবে— ইত্যাদি ইত্যাদি। বলতে বলতে আরও দুটো-চারটে কথা বেরিয়ে পড়ল, এবং বক্তৃতাটা নিতান্ত সংক্ষিপ্ত হয় নি।

কলকাতা

৬ জুলাই ১৮৯২

সাজাদপুর

৫ জুলাই। ১৮৯২।

আজ আমাদের এখানে পুণ্যাহ। কাল রাত্তির থেকে বাজনা বাজছে। কাল সন্ধের সময় এখানে হঠাৎ কোথা থেকে একটা Brass Band এসে উপস্থিত— ইংরিজি ধাঁচের দিশি সুর বাজায় কতকটা থিয়েটারের কন্সর্টের মতো— ভ্যাঁপ্পো ভ্যাঁপ্পো করে এবং খুব প্রাণপণ জোরে ড্রাম পিটোয়, বেশিক্ষণ সহ্য হয় না। কিন্তু আজ সকালে একটা সানাইয়েতে ভৈরবী বাজাচ্ছিল, এমনি অতিরিক্ত মিষ্টি লাগছিল যে সে আর কী বলব— আমার চোখের সামনেকার শূন্য আকাশ এবং বাতাস পর্যন্ত একটা অন্তরনিরুদ্ধ ক্রন্দনের আবেগে যেন স্ফীত হয়ে উঠছিল— বড়ো কাতর কিন্তু বড়ো সুন্দর— সেই সুরটাই গলায় কেন যে তেমন করে আসে না বুঝতে পারি নে। মানুষের গলার চেয়ে কাঁসার নলের ভিতরে কেন এত বেশি ভাব প্রকাশ করে! এখন আবার তারা মূলতান বাজাচ্ছে— মনটা বড়োই উদাস করে দিয়েছে— পৃথিবীর এই সমস্ত সবুজ দৃশ্যের উপরে একটি অশ্রুবাষ্পের আবরণ টেনে দিয়েছে— একপর্দা মূলতান রাগিণীর ভিতর দিয়ে সমস্ত জগৎ দেখা যাচ্ছে। যদি সব সময়েই এইরকম এক-একটা রাগিণীর ভিতর দিয়ে জগৎ দেখা যেত তা হলে বেশ হত। আমার আজকাল ভারী গান শিখতে ইচ্ছে করে— বেশ অনেকগুলো ভূপালী ··· এবং করুণ বর্ষার সুর— অনেক বেশ ভালো ভালো হিন্দুস্থানী গান— গান প্রায় কিচ্ছুই জানি নে বললে হয়।

কলকাতা

৭ জুলাই ১৮৯২

শিলাইদহ

২০ জুলাই। ১৮৯২।

আজ এই মাত্র প্রাণটা যাবার জো হয়েছিল। কী করে যে বাঁচল ঠিক বুঝতে পারছি নে। যা হোক, বেঁচেছে সে জন্য দুঃখিত নই। পাব্‌টি থেকে আজ শিলাইদহে যাচ্ছিলুম— বেশ পাল পেয়েছিলুম, খুব হুহুঃ শব্দে চলে আসছিলুম— বর্ষার নদী চার দিকে থৈ থৈ করছে এবং হৈ হৈ শব্দে ঢেউ উঠছে— আমি মাঝে মাঝে তাকিয়ে দেখছি এবং মাঝে মাঝে লেখাপড়া করছি। বেলা সাড়ে দশটার সময় গড়ুই নদীর ব্রিজ দেখা গেল। বোটের মাস্তুল ব্রিজে বাধবে কি না তাই নিয়ে মাঝিদের মধ্যে তর্ক পড়ে গেল, ইতিমধ্যে বোট ব্রিজের অভিমুখে চলেছে। মাঝিদের আশা ছিল যে, আমরা স্রোতের বিপরীত মুখে যখন চলেছি তখন ভাবনা নেই, কারণ ব্রিজের কাছাকাছি এসেও যদি দেখা যায় যে মাস্তুল বাধবে তখনই পাল নাবিয়ে দিলে বোট স্রোতে পিছিয়ে যাবে। কিন্তু ব্রিজের কাছে এসে আবিষ্কার করা গেল মাস্তুল ব্রিজে ঠেকবে এবং সেখানে একটা আওড় (আবর্ত) আছে। সেই আওড় থাকাতে সেখানে স্রোতের গতি বিপরীত মুখে হয়েছে। তখন বোঝা গেল সামনে একটি সর্বনাশ উপস্থিত। কিন্তু বেশিক্ষণ চিন্তা করবার সময় ছিল না— দেখতে দেখতে বোটটা ব্রিজের উপর গিয়ে পড়ল। মাস্তুল মড়্ মড়্ করে ক্রমেই কাত হতে লাগল— আমি হতবুদ্ধি মাঝিদের ক্রমাগত বলছি, 'তোরা ওখান থেকে সর, মাস্তুল ভেঙে তোদের মাথার উপর পড়বে।'— এমন সময় আর-একটা নৌকো তাড়াতাড়ি দাঁড় বেয়ে এসে আমাকে তুলে নিলে এবং রশি নিয়ে আমাদের বোটটাকে টানতে লাগল। তপ্‌সি এবং আর-একজন মাঝি রশি দাঁতে কামড়ে ধরে সাঁৎরে ডাঙায় গিয়ে টানতে লাগল। ডাঙায় আরও অনেক লোক জমা হয়ে বোট টেনে তুললে। কিন্তু

কারও কোনো আশা ছিল না। মাস্তুল যত কাত হচ্ছিল বোটও তত কাত হয়ে পড়ছিল— যদি সময়মত নৌকো না আসত আর বেশিক্ষণ টিঁকত না। সকলে ডাঙায় ভিড় করে এসে বললে, 'আল্লা বাঁচিয়ে দিয়েছেন, নইলে বাঁচবার কোনো কথা ছিল না।' সমস্ত জড় পদার্থের কাণ্ড কিনা! আমরা হাজার কাতর হই, চেঁচাই, লোহাতে যখন কাঠ ঠেকল এবং নীচের থেকে জল যখন ঠেলতে লাগল তখন যা হবার তা হবেই— জলও এক মুহূর্ত থামল না, মাস্তুলও এক চুল মাথা নিচু করলে না, লোহার ব্রিজও যেমন তেমনি দাঁড়িয়ে রইল। আমি যখন অন্য নৌকোয় চড়ে ডাঙায় এসেছি তখনও বোটটা যায়-যায়— সৌভাগ্যক্রমে ডাঙার এতটা কাছাকাছি এসেছিল যে কারও ডোববার সম্ভাবনা ছিল না। কিন্তু বোটটা যেত এবং সেই সঙ্গে আমার খাতাগুলো এবং অন্যান্য লেখাগুলো যেত। মাঝিরা বলছে এ যাত্রাটাই ভালো নয়— তিনবার এই রকম হল। কুষ্টিয়ার ঘাটে মাস্তুল তোলবার সময় দড়ি ছিঁড়ে মাস্তুল পড়ে যায়, আর একটু হলেই ফুলচাঁদ মাঝি মারা পড়ত। তার পরে সেই পান্টির খালের মধ্যে বটগাছে মাস্তুল বেধে গিয়েছিল, সেও যে নিতান্ত কম বিপদ হয়েছিল তা নয়। সেখানে স্রোতের খুব তীব্র বেগ ছিল। তার পরে এই ব্রিজ-বিভ্রাট। আমার একটা এই তৃপ্তি বোধ হচ্ছে, খুব সংকটের সময়েও আমি কেবল মাল্লাদের সাবধান করে দিয়েছি, নিজের জন্যে কিছু-মাত্র হাঁউমাউ করি নি, বুদ্ধি স্থির ছিল। মাস্তুলটা যে কিরকম ভীষণ-ভাবে ভেঙে পড়বে তার জন্যে প্রতি মুহূর্তে প্রস্তুত ছিলুম— মাল্লাদের যা যা করতে প্রবৃত্ত করিয়েছিলুম তার কোনোটাই অসংগত হয় নি। উঃ! তোরা থাকলে এই বিপদে আমার প্রাণটা কিরকম হত!

কলকাতা
২১ জুলাই ?
১৮৯২

শিলাইদহ

২১ জুলাই। ১৮৯২।

কাল বিকেলে শিলাইদহে পৌঁচেছিলুম, আজ সকালে আবার পাবনায় চলেছি। আজকাল নদীর আর সে মূর্তি নেই— তোরা যখন এসেছিলি তখন নদীতে প্রায় একতলা-সমান উঁচু পাড় দেখেছিলি, এখন সে সমস্ত ভরে গিয়ে হাত-খানেক দেড়েক বাকি আছে মাত্র। নদীর যে রোখ! যেন লেজ-দোলানো কেশর-ফোলানো ঘাড়-বাঁকানো তাজা বুনো ঘোড়ার মতো। গতিগর্বে ঢেউ তুলে ফুলে ফুলে চলেছে— এই ক্ষ্যাপা নদীর উপরে চড়ে আমরা দুলতে দুলতে চলেছি। এর মধ্যে ভারী একটা উল্লাস আছে। এই ভরা নদীর যে কলরব সে আর কী বলব! ছল্‌ছল্‌ খল্‌খল্‌ করে কিছুতে যেন আর ক্ষান্ত হতে পারছে না— ভারী একটা যৌবনের মত্ততার ভাব। এ তবু গড়ুই নদী। এখান থেকে আবার পদ্মায় গিয়ে পড়তে হবে— তার বোধ হয় আর কূল-কিনারা দেখবার জো নেই। সে মেয়ে বোধ হয় একেবারে উন্মাদ ক্ষেপে নেচে বেরিয়ে চলেছে, সে আর কিছুর মধ্যেই থাকতে চায় না। তাকে মনে করলে আমার কালীর মূর্তি মনে হয়— নৃত্য করছে, ভাঙছে, এবং চুল এলিয়ে দিয়ে ছুটে চলেছে। মাঝিরা বলছিল, নতুন বর্ষায় পদ্মার খুব 'ধার' হয়েছে। ধার কথাটা কিন্তু ঠিক। তীব্র স্রোত যেন চক্‌চকে খড়্গের মতো, পাংলা ইস্পাতের মতো একেবারে কেটে চলে যায়। প্রাচীন ব্রিটনবাসীদের যুদ্ধরথের চাকায় যেমন কুঠার বাঁধা থাকত, পদ্মার দ্রুতগামী বিজয়রথের দুই চাকায় তেমনি তীব্র খরধার স্রোত শাণিত কুঠারের মতো বাঁধা— দুই ধারের তীর একেবারে অবহেলায় ছারখার করে দিয়ে চলেছে।··· এ সময় না হলে নদীর আনন্দ দেখা যায় না! আমরা প্রায়ই শীতের শেষে কিম্বা গ্রীষ্মের আরম্ভে আসি, তখন শীর্ণ

নদী নিস্তেজভাবে পোষ মেনে থাকে— দুরন্তপনা একেবারেই থাকে না। তাতেই তোর মা কত ভয় পেয়েছিলেন, এখনকার নদী দেখলে বোধ হয় ডাঙায় থাকতেও ভয় পেতেন। ভয়ের যে কোনো কারণ আছে তা নয়। কাল যে কাণ্ডটি হয়েছিল সে বরঞ্চ কিছু গুরুতর বটে। কাল যমরাজের সঙ্গে এক রকম হাউ-ড্যু-ডু করে আসা গিয়েছে। মৃত্যু যে ঠিক আমাদের নেক্‌স্‌ট্‌-ডোর নেবার এ রকম ঘটনা না হলে সহজে মনে হয় না। হয়েও বড়ো মনে পড়ে না। কাল চকিতের মধ্যে যাঁর আভাস পাওয়া গিয়েছিল আজ তাঁর মূর্তিখানা কিছুই স্মরণ হচ্ছে না। অপ্রিয় অনাবশ্যক বন্ধুর মতো একেবারে অনাহূত ঘাড়ে এসে না পড়লে তার বিষয়ে আমরা বড়ো একটা ভাবি নে! যদিও তিনি আড়াল থেকে আমাদের সর্বদাই খোঁজ খবর নিয়ে থাকেন। যা হোক, তাঁকে আমি বহুত বহুত সেলাম দিয়ে জানিয়ে রাখছি তাঁকে আমি এক কানাকড়ির কেয়ার করি নে— তা তিনি জলে ঢেউই তুলুন আর আকাশ থেকে ফুঁই দিন— আমি আমার পাল তুলে চললুম— তিনি যতদূর করতে পারেন তা পৃথিবীসুদ্ধ সকলেরই জানা আছে, তার বেশি আর কী করবেন! যেমনি হোক, হাঁউমাউ করব না।

কলকাতা
২২ জুলাই ১৮৯২

৬৯

শিলাইদহ

বৃহস্পতিবার

৩ ভাদ্র। ১২৯৯।

এমন সুন্দর শরতের সকাল বেলা! চোখের উপরে যে কী সুধা বর্ষণ করছে সে আর কী বলব। তেমনি সুন্দর বাতাস দিচ্ছে এবং পাখি ডাকছে। এই ভরা নদীর ধারে, বর্ষার জলে প্রফুল্ল নবীন পৃথিবীর উপর শরতের সোনালি আলো দেখে মনে হয় যেন আমাদের এই নবযৌবনা ধরণীসুন্দরীর সঙ্গে কোন্‌-এক জ্যোতির্ময় দেবতার ভালোবাসা-বাসি চলছে— তাই এই আলো এবং এই বাতাস, এই অর্ধ-উদাস অর্ধ-সুখের ভাব, গাছের পাতা এবং ধানের ক্ষেতের মধ্যে এই অবিশ্রাম স্পন্দন— জলের মধ্যে এমন অগাধ পরিপূর্ণতা, স্থলের মধ্যে এমন শ্যামশ্রী, আকাশে এমন নির্মল নীলিমা। স্বর্গে মর্তে একটা বৃহৎ গভীর অসীম প্রেমাভিনয়। প্রেমের যেমন একটা গুণ আছে তার কাছে জগতের মহা মহা ঘটনাকেও তুচ্ছ মনে হয়, এখানকার আকাশের মধ্যে তেমনি যে-একটি ভাব ব্যাপ্ত হয়ে আছে তার কাছে কলকাতার দৌড়ধাপ হাঁস্‌ফাঁস্‌ ধড়্‌ফড়ানি ঘড়্‌-ঘড়ানি ভারী ছোটো এবং অত্যন্ত সুদূর মনে হয়। চার দিক থেকে আকাশ আলো বাতাস এবং গান এক রকম মিলিত ভাবে এসে আমাকে অত্যন্ত লঘু করে আপনাদের সঙ্গে যেন মিশিয়ে ফেলছে— আমার সমস্ত মনটাকে কে যেন তূলিতে করে তুলে নিয়ে এই রঙিন শরৎ-প্রকৃতির উপর আর-এক পোঁচ রঙের মতো মাখিয়ে দিচ্ছে, তাতে করে এই সমস্ত নীল সবুজ এবং সোনার উপরে আর-একটা যেন নেশার রঙ লেগে গেছে। বেশ লাগছে। 'কী জানি পরান কী যে চায়' বলতে লজ্জা বোধ হয় এবং শহরে থাকলে বলতুম না— কিন্তু ওটা ষোলো আনা কবিত্ব হলেও এখানে বলতে দোষ নেই।

অগস্ট ১৮৯২

অনেক পুরোনো শুকনো কবিতা, কলকাতায় যাকে উপহাসানলে জ্বালিয়ে ফেলবার যোগ্য মনে হয় তারা এখানে আসবামাত্র দেখতে দেখতে মুকুলিত পল্লবিত হয়ে ওঠে।

কলকাতা

১৯ অগস্ট, ১৮৯২

শিলাইদহ

২০ অগস্ট্‌। ১৮৯২।

রোজ সকালে চোখ চেয়েই আমার বাঁ দিকে জল এবং ডান দিকে নদীতীর সূর্যকিরণে প্লাবিত দেখতে পাই। অনেক সময়ে ছবি দেখলে যে মনে হয়, আহা, এইখানে যদি থাকতুম— ঠিক সেই ইচ্ছেটা এখানে পরিতৃপ্ত হয়। মনে হয় একটি জাজ্জ্বল্যমান ছবির মধ্যে আমি বাস করছি, বাস্তব জগতের কোনো কঠিনতাই এখানে যেন নেই। ছেলেবেলায় রবিন্‌সন্‌ক্রুশো পৌলভর্জিনি প্রভৃতি বইয়ে গাছপালা সমুদ্রের ছবি দেখে মন ভারী উদাসীন হয়ে যেত— এখানকার রৌদ্রে আমার সেই ছবি দেখার বাল্যস্মৃতি ভারী জেগে ওঠে। এর যে কী মানে আমি ঠিক ধরতে পারি নে, এর সঙ্গে যে কী একটা আকাঙ্ক্ষা জড়িত আছে আমি ঠিক বুঝতে পারি নে— এ যেন এই বৃহৎ ধরণীর প্রতি একটা নাড়ীর টান— এক সময়ে যখন আমি এই পৃথিবীর সঙ্গে এক হয়ে ছিলুম, যখন আমার উপর সবুজ ঘাস উঠত, শরতের আলো পড়ত, সূর্যকিরণে আমার সুদূরবিস্তৃত শ্যামল অঙ্গের প্রত্যেক রোমকূপ থেকে যৌবনের সুগন্ধি উত্তাপ উত্থিত হতে থাকত, আমি কত দূর দূরান্তর কত দেশ দেশান্তরের জল স্থল পর্বত ব্যাপ্ত করে উজ্জ্বল আকাশের নীচে নিস্তব্ধভাবে শুয়ে পড়ে থাকতুম, তখন শরৎ-সূর্যালোকে আমার বৃহৎ সর্বাঙ্গে যে-একটি আনন্দরস একটি জীবনীশক্তি অত্যন্ত অব্যক্ত অর্ধচেতন এবং অত্যন্ত প্রকাণ্ড বৃহৎ ভাবে সঞ্চারিত হতে থাকত, তাই যেন খানিকটা মনে পড়ে— আমার এই-যে মনের ভাব এ যেন এই প্রতিনিয়ত অঙ্কুরিত মুকুলিত পুলকিত সূর্যসনাথা আদিম পৃথিবীর ভাব। যেন আমার এই চেতনার প্রবাহ পৃথিবীর প্রত্যেক ঘাসে এবং গাছের শিকড়ে শিকড়ে শিরায় শিরায় ধীরে ধীরে প্রবাহিত হচ্ছে, সমস্ত শস্যক্ষেত্র রোমাঞ্চিত হয়ে উঠছে

এবং নারকেল গাছের প্রত্যেক পাতা জীবনের আবেগে থর্‌থর্ করে কাঁপছে। এই পৃথিবীর উপর আমার যে-একটি আন্তরিক আত্মীয়-বৎসলতার ভাব আছে ইচ্ছে করে সেটা ভালো করে প্রকাশ করতে, কিন্তু ওটা বোধ হয় অনেকেই ঠিকটি বুঝতে পারবে না— কী-একটা কিম্ভূত রকমের মনে করবে। সেই জন্যে চেষ্টা করতে প্রবৃত্তি হয় না।

কলকাতা

২১ অগস্ট্ ১৮৯২

৭১

বোয়ালিয়া

১৮ নভেম্বর। ১৮৯২।

তুই কি এখন রেলগাড়িতে? সমস্ত রাত্তিরের কন্‌কনে শীত ভোগ করে তুই বোধ হয় এখন জেগে উঠে মুখ ধুয়ে এসে পায়ের উপর একখানি কম্বল চাপিয়ে বসেছিস। যদি জব্বলপুর লাইন দিয়ে যেতিস তা হলে আমি বেশ কল্পনা করতে পারতুম এতক্ষণ তোরা কিরকম দৃশ্যের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিস। এই সময়টা সকাল বেলায় নওয়াড়ির কাছে উঁচুনিচু প্রস্তরকঠিন তরুবিরল পৃথিবীর উপরে সূর্যোদয় হয়। তোদের নাগপুর লাইনেও বোধ হয় সেই রকম হওয়ার সম্ভব। বোধ হয় নবীন রৌদ্রে চারি দিক উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে, মাঝে মাঝে আকাশপটে নীল পর্বতের আভাস দেখা যাচ্ছে— শস্য-ক্ষেত্র বড়ো-একটা নেই— দৈবাৎ দুই-এক জায়গায় সেখানকার বুনো চাষারা মহিষ নিয়ে চাষ আরম্ভ করেছে— দুই ধারে বিদীর্ণ পৃথিবী, কালো কালো পাথর, শুকনো জলস্রোতের নুড়ি-ছড়ানো পথচিহ্ন, ছোটো ছোটো অসম্পূর্ণ শাল গাছ এবং টেলিগ্রাফের তারের উপর কালো-লেজ-ঝোলানো চঞ্চল ফিঙে পাখি। একটা যেন বৃহৎ বন্য-প্রকৃতি পোষ মেনে একটি জ্যোতির্ময় নবীন দেবশিশুর উজ্জ্বল কোমল করস্পর্শ সর্বাঙ্গে অনুভব করে শান্ত স্থির ভাবে শুয়ে পড়ে আছে। কিরকম ছবিটা আমার মনে আসে জানিস? কালিদাসের শকুন্তলায় পড়েছিস দুষ্মন্তের ছেলে শিশু ভরত একটা সিংহশাবক নিয়ে কি-রকম খেলা করত। সে যেন একদিন পশুবৎসলভাবে সিংহশাবকের বড়ো বড়ো রোঁওয়ার মধ্যে দিয়ে আস্তে আস্তে আপনার শুভ্রকোমল অঙ্গুলিগুলি চালনা করছে, আর বৃহৎ জন্তুটা স্থির হয়ে পড়ে আছে এবং মাঝে মাঝে সস্নেহে এবং একান্ত নির্ভরের ভাবে আপনার মানববন্ধুর প্রতি আড়চক্ষে চেয়ে দেখছে। আর ওই-যে শুকনো

স্রোতের নুড়ি-ছড়ানো পথের কথা বললুম ওতে আমার কী মনে পড়ে জানিস? বিলিতি রূপকথায় পড়া যায় বিমাতা যখন তার সতিনের মেয়েকে এবং ছেলেকে ঘর থেকে তাড়িয়ে ছল ক'রে একটা অচেনা অরণ্যের মধ্যে পাঠিয়ে দিলে তখন দুই ভাই বোনে বনের ভিতর চলতে চলতে বুদ্ধিপূর্বক একটা একটা ক'রে নুড়ি ফেলে আপনাদের পথ চিহ্নিত করে রেখেছিল। ছোটো ছোটো স্রোতগুলি যেন সেই রকম ছোটো ছোটো ছেলে মেয়ে, তারা খুব তরুণ শৈশবে এই অচেনা বৃহৎ পৃথিবীর মধ্যে বেরিয়ে পড়ে, তাই জন্যে চলতে চলতে আপনাদের পথের উপর ছোটো ছোটো নুড়ি ছড়িয়ে রেখে যায়— আবার যখন ফিরে আসবে আবার আপনার এই গৃহপথটি ফিরে পাবে। আজ সকালবেলায় উঠে অবধি আমি মনে মনে তোদের গাড়ির জানলার পাশে বসে তোদের সঙ্গে রেলের দুই পার্শ্বের রৌদ্রোজ্জ্বল চিত্রগুলি দেখে যাবার চেষ্টা করছি। আমার বহুদিনের রেলভ্রমণের নানা স্মৃতি নানা খণ্ড খণ্ড দৃশ্যগুলি আমার মনের দুই পাশে সাজাচ্ছি, বসাচ্ছি, তাদের উপরে হেমন্তের সকাল বেলাকার রোদ্দুর মেলিয়ে দিচ্ছি এবং মাঝে মাঝে তোর সঙ্গে তাই নিয়ে কথাবার্তা কচ্ছি।

সোলাপুর
২২ নভেম্বর ১৮৯২

৭২

নাটোর

১ ডিসেম্বর। ১৮৯২।

কাল তো লোকেনে আমাতে বেরিয়ে পড়া গেল। ঘোড়ার গাড়িতে দীর্ঘ পথ যেতে হয়। সম্মুখে আটাশ্ মাইল পথ এবং কেবল 'আমরা দুজনে যাত্রী'। লোকেন একটা সিগারেট এবং একখানা বই আরম্ভ করে দিলে— আমি গুন্ গুন্ স্বরে 'সুন্দরী রাধে আওয়ে বনি' গান ধরলুম— এইরকম করে যখন প্রায় মাইল দশেক অতিক্রম করেছি এবং সূর্য ক্ষীণজ্যোতি হয়ে অস্তাচলের খুব কাছে গিয়ে পৌঁচেছে এমন সময় লোকেন আমার ঐ গানটা উপলক্ষ্য করে বৈষ্ণব কবিদের বিরুদ্ধে তর্ক আরম্ভ করে দিল। সে তর্ক কোনো কালে শেষ হত কি না জানি নে, কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে আমাদের তর্কের মাঝখানে একটি কৃশকায়া নদী এসে একটি লম্বা দাঁড়ি টেনে দিলে। সেই নদীতীরে গাড়ি থেকে নেবে একটি নৌসেতু পদব্রজে পার হয়ে ও পারে যেতে হল— ও পারে গিয়ে হঠাৎ আবিষ্কার করা গেল, আকাশে আধখানি চাঁদ উঠেছে এবং সুন্দর জ্যোৎস্না। দুজনে পরামর্শ করা গেল, হেঁটে যতটা দূর পারা যায় যাওয়া যাক। তখন তর্ক বন্ধ করে সেই জ্যোৎস্না এবং গাছের ছায়ায় খচিত নিস্তব্ধ রাস্তা দিয়ে আমরা দুই পথিক নিঃশব্দে মন্দগমনে চলতে লাগলুম। কাল বুধবারে অদূরবর্তী গ্রামে একটা হাট ছিল, সেখানে হাট সেরে দুই-চারজন গ্রামবাসী এবং জনপদবধূ গল্প করতে করতে গৃহে ফিরে যাচ্ছিল। একখানি শূন্য-বোঝাই গোরুর গাড়িতে গাড়োয়ান র‍্যাপার মুড়ি দিয়ে নিদ্রামগ্ন এবং গোরু দুটি আপন মনে আস্তে আস্তে বিশ্রামশালার দিকে চলেছে। মাঝে মাঝে এক-একটা ঘন গাছপালায় আচ্ছন্ন গ্রামের কাছাকাছি আসছি— সেখানে গোয়ালঘর থেকে খড়-জ্বালানো ধোঁওয়া বায়ুহীন শীতরাত্রে উপরে উঠতে না পেরে হিমভারাক্রান্ত হয়ে স্তরে স্তরে

বাঁশঝাড়ের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে রয়েছে। এমন করে মাইল দুয়েক গিয়ে তার পরে আমরা আবার গাড়িতে উঠলুম। ··· ঘড়িতে প্রায় একটা বাজে। তার পরে অনেক কাকুতি মিনতি করে স্থির হল মহারাজ আমাদের একটা ড্রাইভ্ দিয়ে তার পরে বাড়ি পৌঁছে দেবেন। সকলেই বললে : Such a night was not meant for sleep। বাস্তবিক সুন্দর রাতটি হয়েছিল। রাস্তায় লোক ছিল না এবং রাজবাড়ির প্রশান্ত সরোবরগুলির উপর জ্যোৎস্না এবং তার ধারে ধারে ঘন গাছের ছায়া চমৎকার দেখাচ্ছিল। বোধ হয় রাত্তির দেড়টার সময় বাড়িতে এসে শুয়েছিলুম।

সোলাপুর
৫ ডিসেম্বর ১৮৯২

নাটোর

২ ডিসেম্বর। ১৮৯২।

কাল ব্রেক্‌ফাস্ট্‌ খেয়ে মহারাজার ওখানে গিয়েছিলুম, বিকেলে সকলে মিলে বেড়াতে গিয়েছিলুম। দুই ধারে মাঠের মাঝখান [দিয়ে] রাস্তাটা আমার বেশ লেগেছিল। বাংলা দেশের ধূ ধূ জনহীন মাঠ এবং তার প্রান্তবর্তী গাছপালার মধ্যে সূর্যাস্ত সে কী সুন্দর সে আমি কিছুতে [বলতে] পারি নে— কী একটি বিশাল শান্তি এবং কোমল করুণা— আমাদের এই আপনাদের পৃথিবীর সঙ্গে আর ঐ বহুদূরবর্তী আকাশের সঙ্গে কী-একটি [স্নেহভারবিনত] মৌন ম্লান মিলন! অনন্তের মধ্যে যে-একটি প্রকাণ্ড অখণ্ড চির-বিরহবিষাদ আছে সে এই সন্ধেবেলাকার পরিত্যক্ত পৃথিবীর উপরে কী-একটি [উদাস] আলোকে আপনাকে ঈষৎ প্রকাশ করে দেয়— সমস্ত জলে স্থলে আকাশে কী-একটি ভাষাপরিপূর্ণ নীরবতা— অনেকক্ষণ চুপ করে অনিমেষনেত্রে চেয়ে দেখতে [দেখতে] মনে হয় যদি এই চরাচরব্যাপ্ত পূর্ণনীরবতা আপনাকে আর ধারণ করতে না পারে, সহসা তার অনাদি ভাষা যদি বিদীর্ণ হয়ে প্রকাশ পায়, [তা হলে] কী-একটা গভীর গম্ভীর শান্ত সুন্দর সকরুণ সংগীত পৃথিবী থেকে নক্ষত্রলোক পর্যন্ত বেজে ওঠে! আসলে তাই হচ্ছে। কেননা, জগতের যে কম্পন আমাদের [চক্ষে] এসে আঘাত করছে তাই আলোক, আর যে কম্পন কানে এসে আঘাত করছে তাই শব্দ। আমরা একটু নিবিষ্টচিত্তে স্থির হয়ে চেষ্টা করলে জগতের সমস্ত [সম্মি] লিত আলোক এবং বর্ণের বৃহৎ হার্মনিকে মনে মনে একটি বিপুল সংগীতে খানিকটা তর্জমা করে নিতে পারি। এই জগৎব্যাপী দৃশ্যপ্রবাহের অবিশ্রাম [কম্পন] ধ্বনিকে কেবল একবার চোখ বুজে মনের কান দিয়ে শুনতে হয়। কিন্তু তোকে আমি এই সূর্যোদয়

ডিসেম্বর ১৮৯২

আর সূর্যাস্তের কথা কতবার লিখব! আমি নিত্য নূতন [ক'রে] অনুভব করি কিন্তু নিত্য নূতন করে কি প্রকাশ করতে পারি!

সোলাপুর

৬ ডিসেম্বর ১৮৯২

খাতার কাগজে ধার ছিন্ন হওয়ায় কোনো কোনো শব্দ অবলুপ্ত, অনুমানে বা পূর্বমুদ্রিত 'ছিন্নপত্র' মিলাইয়া যে পাঠ স্থির হয় তাহাই বন্ধনীমধ্যে দেওয়া হইয়াছে।

শিলাইদহ

৯ ডিসেম্বর। ১৮৯২।

এখন একলাটি আমার সেই বোটের জানলার কাছে অধিষ্ঠিত হয়ে বহুদিন পরে একটু মনের শান্তি পেয়েছি। স্রোতের অনুকূলে বোট চলছে, তার উপর পাল পেয়েছে— দুপুরবেলাকার রোদ্দুরে শীতের দিনটা ঈষৎ তেতে উঠেছে, পদ্মায় নৌকো নেই— শূন্য বালির [চর] হলদে রঙ, এক দিকে নদীর নীল আর এক দিকে আকাশের নীলের মাঝে একটি রেখার মতো আঁকা রয়েছে— জল কেবল উত্তুরে বাতাসে খুব অল্প অল্প চিক্ চিক্ করে কাঁপছে, ঢেউ নেই। আমি এই খোলা জানলার ধারে হেলান দিয়ে বসে আছি; আমার মাথায় অল্প অল্প বাতাস লাগছে, বেশ আরাম করছে। অনেক দিন তীব্র রোগভোগের পর শরীরটা শিথিল দুর্বল অবস্থায় আছে, এই রকম সময় প্রকৃতির এই ধীর স্নিগ্ধ শুশ্রূষা ভারী মধুর লাগছে— এই শীতশীর্ণ নদীর মতো আমার সমস্ত অস্তিত্ব যেন মৃদু রৌদ্রে পড়ে অলসভাবে ঝিক্ ঝিক্ করছে, এবং যেন আর্ধেক-আনমনে তোকে চিঠি লিখে যাচ্ছি। প্রতিবার এই পদ্মার উপর আসবার আগে ভয় হয় আমার পদ্মা বোধ হয় পুরোনো হয়ে গেছে। কিন্তু, যখনই বোট ভাসিয়ে দিই, চার দিকে জল কুল্‌কুল্ করে ওঠে— চারি দিকে একটা স্পন্দন কম্পন আলোক আকাশ মৃদুকলধ্বনি, একটা সুকোমল নীল বিস্তার, একটি সুনবীন শ্যামল রেখা, বর্ণ এবং নৃত্য এবং সংগীত এবং সৌন্দর্যের একটি নিত্য উৎসব উদ্‌ঘাটিত হয়ে যায়, তখন আবার নতুন করে আমার হৃদয় যেন অভিভূত হয়ে যায়। এই পৃথিবীটি আমার অনেক দিনকার এবং অনেক জন্মকার ভালোবাসার লোকের মতো আমার কাছে চিরকাল নতুন; আমাদের দুজনকার মধ্যে একটা খুব গভীর এবং সুদূরব্যাপী চেনাশোনা আছে। আমি বেশ মনে করতে পারি বহু যুগ পূর্বে যখন তরুণী পৃথিবী সমুদ্রস্নান থেকে সবে মাথা তুলে উঠে

তখনকার নবীন সূর্যকে বন্দনা করছেন, তখন আমি এই পৃথিবীর নূতন মাটিতে কোথা থেকে এক প্রথম জীবনোচ্ছ্বাসে গাছ হয়ে পল্লবিত হয়ে উঠেছিলুম। তখন পৃথিবীতে জীবজন্তু কিছুই ছিল না, বৃহৎ সমুদ্র দিনরাত্রি দুলছে, এবং অবোধ মাতার মতো আপনার নবজাত ক্ষুদ্র ভূমিকে মাঝে মাঝে উন্মত্ত আলিঙ্গনে একেবারে আবৃত করে ফেলছে। তখন আমি এই পৃথিবীতে আমার সমস্ত সর্বাঙ্গ দিয়ে প্রথম সূর্যালোক পান করেছিলুম, নবশিশুর মতো একটা অন্ধজীবনের পুলকে নীলাম্বরতলে আন্দোলিত হয়ে উঠেছিলুম, এই আমার মাটির মাতাকে আমার সমস্ত শিকড়গুলি দিয়ে জড়িয়ে এর স্তন্যরস পান করেছিলুম। একটা মূঢ় আনন্দে আমার ফুল ফুটত এবং নবপল্লব উদ্‌গত হত। যখন ঘনঘটা করে বর্ষার মেঘ উঠত তখন তার ঘনশ্যাম ছায়া আমার সমস্ত পল্লবকে একটি পরিচিত করতলের মতো স্পর্শ করত। তার পরেও নব নব যুগে এই পৃথিবীর মাটিতে আমি জন্মেছি। আমরা দুজনে একলা মুখোমুখি করে বসলেই আমাদের সেই বহুকালের পরিচয় যেন অল্পে অল্পে মনে পড়ে। আমার বসুন্ধরা এখন 'একখানি রৌদ্রপীত হিরণ্য-অঞ্চল' প'রে ঐ নদীতীরের শস্যক্ষেত্রে বসে আছেন, আমি তাঁর পায়ের কাছে কোলের কাছে গিয়ে লুটিয়ে পড়েছি— অনেক ছেলের মা যেমন অর্ধমনস্ক অথচ নিশ্চল সহিষ্ণুভাবে আপন শিশুদের আনাগোনার প্রতি তেমন দৃক্‌পাত করেন না— তেমনি আমার পৃথিবী এই দুপুর বেলায় ঐ আকাশপ্রান্তের দিকে চেয়ে বহু আদিমকালের কথা ভাবছেন, আমার দিকে তেমন লক্ষ করছেন না ; আর আমি কেবল অবিশ্রাম বকে যাচ্ছি। এই ভাবে এক রকম কেটে যাচ্ছে। প্রায় বিকেল হয়ে এল। এখন শীতের বেলা কিনা, দেখতে দেখতে রোদ্‌দুর পড়ে যায়।

সোলাপুর। ১৪ ডিসেম্বর ?
১৮৯২

৭৫

শিলাইদহ

১৮ ডিসেম্বর। ১৮৯২।

যেমন বজ্র পড়ে গেলে তবে তার আওয়াজ পাওয়া যায়, তেমনি পরস্পর দূরে থাকলে যথাসময়ে কোনো আওয়াজ পাবার যো নেই; ঘটনা নিঃশেষ হয়ে গেলে পর তখন চিঠিতে তার আলোচনা করতে হয়। আমার দাঁত-কানের ব্যথার খবর এত দিনে বুঝি তোদের কানে গিয়ে পৌঁছল? যখন সুকোমল তুলোর স্তর দিয়ে আচ্ছন্ন করে নিজের কপোলদেশ বহুযত্নে লালন পালন করছিলুম— পীড়িত শিশু-সন্তানকে যেমন ঢেকে-ঢুকে ঘিরে-ঘেরে রাখে নিজের এই মুখ-মণ্ডলটিকে তেমনি করে রেখেছিলুম তখন পৃথিবীর লোক আমাকে সুখী এবং সুস্থ-জ্ঞানে দিব্যি নিশ্চিন্ত ছিল। আর, এখন যখন তার স্মৃতিমাত্র এবং কষের দাঁতের ফুলোর ঈষৎ মাত্র অবশিষ্ট আছে তখন ভয় ভাবনা ভৎসনা নানারকম শোনা যাচ্ছে। এখন সেই হতভাগ্য কপোলে চপেটাঘাত করে বলতে ইচ্ছে করছে, 'তোর এমন দুর্লভ বেদনাটা যদুবাবুর উপর দিয়েই কাটালি! এমন একটা বৃহৎ উপসর্গ ন দেবায় ন ধর্মায় গেল!'··· ব্যামো করে আজকাল কোনো ফল নেই, তাই আজকাল শরীর ভালো রাখবার প্রতি একটু বিশেষ দৃষ্টি আছে। কিন্তু শরীরের রহস্য প্রায় মনের রহস্যেরই অনুরূপ। এই ত্রিশটা বৎসর ধরে পোড়া শরীরটার সঙ্গে এক প্রকারের পরিচয় হয়েছে— যা করলে যা হয়, না হয়, কতকটা বুঝে নিয়েছিলুম। এবং বহু অভিজ্ঞতার পর সেই ভাবে সবে চলতে আরম্ভ করেছি। এমন সময় একত্রিশ বৎসরের সময় দেখা গেল পূর্বে যা করলে যা না হত, এখন তা করলে তা হয়— আবার ফের নতুন শিক্ষা, নতুন পরিচয়। আবার ত্রিশটা-পঁয়ত্রিশটা বৎসর ঠেকে ঠেকে নতুন নতুন আবিষ্কার করে যখন সবে শিখেছি কখন ফ্ল্যানেল পরতে হবে, কখন দরজা

জানলা বন্ধ করতে হবে, কখন গরম জলে নাইতে হবে, কখন ভুষির তাপ কখন পুল্‌টিস্‌, কখন গলা ভাত কখন মৌরলা মাছের ঝোল—তখন সে বহুমূল্য বহুদিনলব্ধ অভিজ্ঞতা খাটাবার আর বড়ো বেশি দিন বাকি থাকবে না।··· জিজ্ঞাসা করি, এই দাঁতে ব্যথা, কানে ব্যথা, গলায় ব্যথা, এগুলো এতকাল ছিল কোথায়? পূর্বাহ্ণে যদি একটু নোটিশ পেতুম তা হলে পৃথিবীর মধ্যে এত দেশ থাকতে নাটোরে এ কুকীর্তি হবে কেন? মানুষের মনটা তো যথেষ্ট আন্‌রীজ্‌নেব্‌ল্‌, বিবেচনা করে দেখতে গেলে শরীরটা তার নীচেই। আচ্ছা, বব, রীজ্‌ন্‌-নামক পদার্থটা তা হলে আছে কোথায়? কেবল সালির সাইকলজির মধ্যে? আজ তোর চিঠি পড়ে আমার মাথায় এই রকমের অনেক-গুলো সুগভীর সমস্যার উদয় হচ্ছে।

সোলাপুর

২২ ডিসেম্বর ১৮৯২

৭৬

···আত্মপীড়নও আমরা সহ্য করতে প্রস্তুত আছি, কিন্তু তবু মনের জড়ত্ব চাই নে। এর থেকেই বোঝা যায় মানুষ সুখ চায় না, উন্নতি চায়— দুঃখ তার তেমন অপ্রিয় নয় যেমন অবনতি।

৭৭

কটক

। ফেব্রুয়ারি ১৮৯৩।

একে তো ভারতবর্ষীয় ইংরেজগুলোকে আমি দুচক্ষে দেখতে পারি নে। তারা স্বভাবতই আমাদের বড়ো অবজ্ঞার ভাবে দেখে, আমাদের উপর তাদের কানাকড়ির সিম্প্যাথি নেই, তার উপরে আবার তাদের কাছে নিজেকে exhibit করা আমার পক্ষে বড়োই কষ্টকর। এমন-কি, ওদের থিয়েটার প্রভৃতি আমোদের স্থলে এবং দোকানেও আমার পারৎপক্ষে ঢুকতে ইচ্ছে করে না— (কেবল থ্যাকারের দোকান ছাড়া)। ইংরেজের ঘরে যত বড়ো গোরুই জন্মাক-না কেন সে যে আমাদের দেশের সকল লোকের চেয়ে শ্রেষ্ঠত্ব অনুভব করে সেটা মনের ভিতর বড়ো আঘাত করে। আমাদের মধ্যে একটা কোনো পদার্থ আছে এটা যতক্ষণে ওরা স্বীকার না করবে ততক্ষণ ওদের কাছে যেতে গেলে হয় অবনতি স্বীকার করে যেতে হবে, নয় অপমান অনুভব করতে হবে। এক-এক সময় আমাদের দেশের লোকের উপর আমার এমন অসহ্য রাগ হয়! ইংরেজগুলোকে দেশ থেকে তাড়িয়ে দিচ্ছে না ব'লে নয়, কিন্তু কোনো বিষয়ে কিছু করছে না ব'লে— এমন একটা কিছুই নেই যাতে আপনার মর্যাদা দেখাতে পারছে। মনের মধ্যে সে লক্ষ্যমাত্র নেই— কেবল ইংরেজের কুড়োনো পেখম লেজে গুঁজে অদ্ভুত ভঙ্গীতে নেচে নেচে বেড়াতে একটুখানি লজ্জা কিম্বা হীনতা অনুভব করে না। এরা দেশের লোককে কিছু শেখাতে চায় না, দেশের ভাষাকে অবজ্ঞা করে, যে-কোনো বিষয়ে ইংরেজের চোখ পড়ে না সে-সকল বিষয়ে উদাসীন —এরা মনে করে কন্‌গ্রেস করে সকলে মিলে দুই হাত তুলে গবরন্‌মেণ্টের দোহাই পেড়ে এরা বড়োলোক হবে। আমি তো বলি যতদিন না আমরা একটা কিছু করে তুলতে পারব ততদিন আমাদের

অজ্ঞাতবাস ভালো। কেননা, আমরা যখন সত্যই অবমাননার যোগ্য তখন কিসের দোহাই দিয়ে পরের কাছে আত্মসম্মান রক্ষা করব? তাদের মতো অবিকল পেখম নাড়তে শিখলেই কি হবে? পৃথিবীর মধ্যে যখন আমাদের একটা কোনো প্রতিষ্ঠাভূমি হবে, পৃথিবীর কাজে যখন আমাদের একটা কোনো হাত থাকবে, তখন আমরা ওদের সঙ্গে হাসিমুখে কথা কইতে পারব। ততদিন লুকিয়ে থেকে চুপ মেরে আপনার কাজ করে যাওয়াই ভালো। দেশের লোকের ঠিক এর উল্টো ধারণা— যা-কিছু ভিতরকার কাজ, যা গোপনে থেকে করতে হবে, সে তারা তুচ্ছ জ্ঞান করে, যেটা নিতান্ত ক্ষণিক অস্থায়ী আস্ফালন এবং আড়ম্বর মাত্র, সেইটেতেই তাদের যত ঝোঁক। আমাদের এ বড়ো হতভাগা দেশ। এখানে মনের মধ্যে কাজ করবার বল রাখা বড়ো শক্ত। যথার্থ সাহায্য করবার লোক কেউ নেই। যার সঙ্গে দুটো কথা কয়ে একটুখানি প্রাণ সঞ্চয় করা যায় এমন মানুষ দশ-বিশ ক্রোশের মধ্যে একটি পাওয়া যায় না— কেউ চিন্তা করে না, অনুভব করে না, কাজ করে না; বৃহৎ কার্যের যথার্থ জীবনের কোনো অভিজ্ঞতা কারও নেই; বেশ একটি পরিণত মনুষ্যত্ব কোথাও পাওয়া যায় না। সমস্ত মানুষগুলো যেন উপছায়ার মত ঘুরে বেড়াচ্ছে। খাচ্ছে-দাচ্ছে, আপিস যাচ্ছে, ঘুমচ্ছে, তামাক টানছে, আর নিতান্ত নির্বোধের মত বক্ বক্ করে বকছে। যখন ভাবের কথা বলে তখন সেন্টিমেন্টাল হয়ে পড়ে, আর যখন যুক্তির কথা পাড়ে তখন ছেলেমানুষি করে। যথার্থ মানুষের একটা সংশ্রব পাবার জন্যে মানুষের মনে ভারী একটা তৃষ্ণা থাকে, ইচ্ছা করে মানুষের সঙ্গে ভাবের আদানপ্রদান দ্বন্দ্বপ্রতিদ্বন্দ্ব চলে। কিন্তু সত্যি-কার রক্তমাংসের শক্তসমর্থ মানুষ তো নেই— সমস্ত উপছায়া, পৃথিবীর সঙ্গে অসংলগ্নভাবে বাষ্পের মতো ভাসছে। আমাদের দেশে যার

ফেব্রুয়ারি ১৮৯৩

মাথায় দুটো-চারটে আইডিয়া আছে তার মতো সঙ্গীহীন একক প্রাণী দুনিয়ায় আর নেই বোধ হয়। কী কথা থেকে কী কথা উঠল তার ঠিক নেই— কিন্তু এ আমার অন্তরের আক্ষেপ। জীবনের অনেকটা অবসাদ এই মানুষের অভাবে।

সোলাপুর

ফেব্রুয়ারি ১৮৯৩

৭৮

বালিয়া

মঙ্গলবার। ৭ ফেব্রুয়ারি ১৮৯৩।

আমার কিন্তু আর ভ্রমণ করতে ইচ্ছে করছে না— ভারী ইচ্ছে করছে একটি কোণের মধ্যে আড্ডা করে একটু নিরিবিলি হয়ে বসি। ভারতবর্ষের দুটি অংশ আছে— এক অংশ গৃহস্থ, আর-এক অংশ সন্ন্যাসী ; কেউ বা ঘরের কোণ থেকে নড়ে না, কেউ বা একেবারে গৃহহীন। আমার মধ্যে ভারতবর্ষের সেই দুই ভাগই আছে। ঘরের কোণও আমাকে টানে, ঘরের বাহিরও আমাকে আহ্বান করে। খুব ভ্রমণ করে দেখে বেড়াব ইচ্ছে করে, আবার উদ্‌ভ্রান্ত শ্রান্ত মন একটি নীড়ের জন্যে লালায়িত হয়ে ওঠে। পাখির মতো ভাব আর-কি। থাকবার জন্যে যেমন ছোট্ট নীড়টি, ওড়বার জন্যে তেমনি মস্ত আকাশ। আমি যে কোণটি ভালোবাসি, সে কেবল মনকে শান্ত করবার জন্যে। আমার মনটা ভিতরে ভিতরে এমনি অশ্রান্ত ভাবে কাজ করতে চায়, লোকজনের ভিড়ের মধ্যে তার কর্মোদ্যম এমনি পদে পদে প্রতিহত হতে থাকে, যে, সে অস্থির হয়ে ওঠে— খাঁচার ভিতর থেকে আমাকে কেবলই যেন আঘাত করতে থাকে। একটু নিরালা পেলে সে বেশ সাধ মিটিয়ে ভাবতে পারে, চার দিকে চেয়ে দেখতে পারে, ভাবগুলিকে খুব মনের মতো ইনিয়ে-বিনিয়ে প্রকাশ করতে পারে। এতদূর পর্যন্ত তার বাড়াবাড়ি যে, ··· আমার সঙ্গে এসেছে তাও যেন সে সহ্য করতে পারছে না। দিবারাত্রি সে একেবারে অখণ্ড অবসর চায়। সমস্তদিন কারও সঙ্গে যদি আমার একটিমাত্র কথাও না হয় তা হলে সে সুখে থাকে। সৃষ্টিকর্তা আপনার সৃষ্টির মধ্যে যেমন একাকী সে আপনার ভাবরাজ্যের মধ্যখানে তেমনি একলা বিরাজ করতে চায়। নইলে যেন তার সমস্ত ক্ষমতা সমস্ত অস্তিত্ব ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে।··· একে কি মিস্যান্‌থ্রোপি বলে ?

তা ঠিক নয়। আমি লোক ভালোবাসি নে ব'লে যে আমি লোকের কাছ থেকে তফাত থাকতে চাই তা নয়, আমার মন নড়বার-চড়বার এবং কাজ করবার জন্যে অনেকখানি জায়গা চায়।

সোলাপুর
১৪ ফেব্রুয়ারি ১৮৯৩

কটক

১০ ফেব্রুয়ারি। ১৮৯৩।

ঘোড়ার পা খানায় পড়ে। আমি একে অ্যাংলো ইন্‌ডিয়ান্‌গুলোকে দেখতে পারি নে, তার উপরে আবার কাল ডিনার-টেবিলে তাদের রূঢ় স্বভাবের বিশেষ পরিচয় পাওয়া গেল। এখানকার কলেজের প্রিন্সিপাল একটা উৎকট ইংরেজ— প্রকাণ্ড নাক, ধূর্ত চোখ, দেড় হাত চিবুক, গোঁপ দাড়ি কামানো, মোটা গলা, র-অক্ষরবিহীন জ্যাব্‌ড়ানো উচ্চারণ— সবসুদ্ধ জড়িয়ে একটা পূর্ণপরিণত জন্‌বুষ। সে আমাদের দেশের লোকের উপর বড্ড লেগেছিল। জানিস বোধ হয় গবর্মেণ্ট্‌ আমাদের দেশের জুরি প্রথার উপর হস্তক্ষেপ করতে চেয়েছিল বলে চার দিকে ভারী একটা আপত্তি উঠেছে। লোকটা জোর করে সেই বিষয়ে কথা তুলে বো— বাবুর সঙ্গে তর্ক করতে লাগল। বললে এ দেশের moral standard low, এখানকার লোকের lifeএর sacredness সম্বন্ধে যথেষ্ট বিশ্বাস নেই, এরা জুরি হবার যোগ্য নয়। আমার যে কী রকম করছিল সে তোকে কী বলব! আমার বুকের মধ্যে রক্ত একেবারে ফুটছিল, কিন্তু কথা খুঁজে পাচ্ছিলুম না। বিছানায় শুয়ে শুয়ে কত কথাই মনে এল, কিন্তু তখন যেন একেবারে বোবা হয়ে গিয়েছিলুম। ভেবে দেখ্‌ দেখি [বব] একজন বাঙালির নিমন্ত্রণে এসে বাঙালির মধ্যে বসে যারা এ রকম করে বলতে কুণ্ঠিত হয় না তারা আমাদের কী চক্ষে দেখে! আর কেন! সিম্প্যাথি চুলোয় যাক্‌ গে, যারা আমাদের সঙ্গে ভদ্রতা করাও বাহুল্য বিবেচনা করে তাদের কাছে আমরা হেসে হেসে, ঘেঁষে ঘেঁষে, যেচে মান কেঁদে সোহাগ কেন নিতে যাই [বব]? ওদের একটুখানি অনুগ্রহের করস্পর্শ পেলেই অমনি কেন আমাদের সর্বাঙ্গ সর্বান্তঃকরণ একতাল jelly-পিণ্ডের মতো আহ্লাদে আগাগোড়া টল্‌-

টল্ থল্-থল্ করে তুলে ওঠে! উঃ, ওদের কী গর্ব, কী অবজ্ঞা! আর, আমাদের কী দৈন্য, কী হীনতা! অপমান চুপ করে সয়ে থাকাই যথেষ্ট হেয়, কিন্তু তার উপরে আবার ওদের কাছে গায়ে পড়ে আদব কাড়তে যাওয়া আমার বোধহয় অবনতির একশেষ। আমাদের এই দরিদ্র উপেক্ষিত অপমানিত ভারতবর্ষকে আমরা বুকের কাছে টেনে নিই, এর যত দোষ যত দুর্বলতা যত মালিন্য আছে সমস্ত অন্তরের সঙ্গে মার্জনা করতে এবং একান্ত যত্নে মার্জন করতে চেষ্টা করি— এর সমস্ত ভাব সমস্ত ব্যবহার আমাদের মনের সঙ্গে ঠিক মিলছে না ব'লে একে যেন হৃদয় থেকে দূর না করি! আমাদের স্বদেশ যদি কোনো ভ্রান্তসংস্কারবশতঃ আমাদের দূরে রাখতে চেষ্টা করে তা হলে অম্‌নি তখনি বিনা বাক্যব্যয়ে আমরা কেন সরে যাই, আর সাহেবরা প্রকাশ্যভাবে আমাদের সহস্রবার করে লাথি ঝাঁটা মারে তবু তো এই নাছোড়বান্দার দলকে কিছুতেই তাদের চরণতল তাদের দ্বারপ্রান্ত থেকে নির্‌মুক্ত করে ফেলতে পারে না। যেখানে জুতো প'রে যেতে দেয় না সেখানে জুতো খুলে যাই, যেখানে মাথা তুলে যেতে দেয় না সেখানে সেলাম করতে করতে ঢুকি, যেখানে আমাদের স্বজাতির প্রবেশ নিষেধ সেখানে সাহেবের ছদ্মবেশ প'রে হাজির হই। ওরা চায় না ওদের সভায় গিয়ে আমরা বসি, ওদের আমোদে গিয়ে আমরা যোগ দিই, ওদের কাজের মধ্যে আমরা হস্তক্ষেপ করি— কিন্তু তবু আমরা চেষ্টা ক'রে, ফিকির ক'রে, সুযোগ বুঝে, খোষামোদ ক'রে, আপনার লোককে দূরে রেখে, স্বজাতির নিন্দায় যোগ দিয়ে, স্বদেশের সমস্ত অবমাননা পরিপাক ক'রে, যে-কোনো প্রকারে হোক ওদের একটু সংস্রব পেলে বেঁচে যাই। আমি এক্‌সেপ্‌শন্ সাজতে চাই নে— যদি আমাদের জাতের প্রতি তোমাদের কোনো শ্রদ্ধা না থাকে, তা হলে আমি সভ্যমি করে তোমাদের পুষ্যি হতে যেতে চাই নে।

আমি আমার হৃদয়ের সমস্ত প্রীতির সঙ্গে আমার সেই স্বজাতির মধ্যে থেকে আমার যা কর্তব্য তা করব— সে তোমাদের চোখেও পড়বে না, তোমাদের কানেও উঠবে না। তোমাদের উচ্ছিষ্ট তোমাদের আদরের টুক্‌রোর জন্যে আমার তিলমাত্র প্রত্যাশা নেই, আমি তাতে পদাঘাত করি। মুসলমানের শূকর যেমন, তোমাদের আদর আমার পক্ষে তেমনি। তাতে আমার জাত যায়, সত্যি জাত যায়— যাতে আত্মাবমাননা করা হয় তাতেই যথার্থ জাত যায়, নিজের কৌলীন্য এক মুহূর্তে নষ্ট হয়ে যায়— তার পরে আর আমার কিসের গৌরব! যে আপনার অন্তরের যথার্থ সম্মান নষ্ট ক'রে বাইরের জাঁকজমক কেনে তাকে যেন আমরা কিছুমাত্র সম্মান না করি। আমাদের ভারতবর্ষের সব চেয়ে জীর্ণতম কুটীরের মলিনতম চাষীকে আমি আমাদের আপনার লোক মনে করতে কুণ্ঠিত হব না, আর যারা ফিট্‌ফাট্ কাপড় প'রে dogcart হাঁকায় আর আমাদের নিগার বলে, তারা যতই সভ্য যতই উন্নত হোক, আমি যদি কখনো তাদের সংশ্রবের জন্যে লালায়িত হই তবে যেন আমার মাথার উপরে জুতো পড়ে। কাল আমার বুকের ভিতরে মাথার ভিতরে এমনি কষ্ট হচ্ছিল যে কিছুতেই সমস্ত রাত ঘুমতে পারি নি— কেবল এপাশ ওপাশ ছট্‌ফট্ করেছি। যখন ড্রয়িংরুমের এক কোণে এসে বসলুম আমার চোখে সমস্ত ছায়ার মতো ঠেকছিল— আমি যেন আমার চোখের সামনে সমস্ত বৃহৎ ভারতবর্ষ বিস্তৃত দেখতে পাচ্ছিলুম, আমাদের এই গৌরবহীন বিষণ্ণ হতভাগ্য জন্মভূমির ঠিক শিয়রের কাছে আমি যেন বসে ছিলুম — এমন একটা বিপুল বিষাদ আমার সমস্ত হৃদয়কে আচ্ছন্ন করেছিল সে আর কী বলব। অথচ চোখের সামনে ইভ্‌নিং-ড্রেস-পরা মেম-সাহেব এবং কানের কাছে ইংরিজি হাস্যালাপের গুঞ্জনধ্বনি— সবসুদ্ধ এমনি অসংগত! আমাদের চিরকালের ভারতবর্ষ আমার কাছে কত-

খানি সত্যি আর এই ডিনার-টেবিলের বিলিতি মিষ্টিহাসি— ইংরিজি শিষ্টালাপ আমাদের পক্ষে কত ফাঁকা, কত ফাঁকি, কী সুগভীর মিথ্যে! মেমেরা যখন মৃদুমিষ্টি সাধা গলায় কথা কচ্ছিল তখন আমার ভারতবর্ষের ধন তোদের আমি মনে করছিলুম। তোরা তো এই ভারতবর্ষের।

সোলপুর
১৬ ফেব্রুয়ারি ১৮৯৩

পুরীর পথে ?

[১১] ফেব্রুয়ারি। ১৮৯৩।

তার পরে তাঁর অন্যান্য দুটো-চারটে কবিতাও পড়া গেল। ভদ্রতার মিথ্যা প্রশংসাবাক্য কিছুতেই আমার মুখ দিয়ে বেরোয় না, আবার বিনা নোটিশে ফস্ করে নিন্দার কণ্টকটুকু যথাসম্ভব মোচন করে গুছিয়ে কথা বলা ভারী শক্ত। ক্রমাগত মূঢ়ের মতো অ্যাঁ-ওঁ করতে হয়। আমাকে যখন জিজ্ঞাসা করলেন 'আমি কি তবে কবিতা লেখা চালাব', আমি বললুম, 'কেন চালাবেন না? কবিতা কি কেবল অন্য লোককে শোনাবার জন্যে? ওতে তো নিজের একটা খুব আনন্দ আছে। পরের প্রশংসা যদি না মেলে তো সেই নিজের আনন্দই তো আমার মনে হয় যথেষ্ট পুরস্কার।' আমার এই উৎসাহ -বাক্যে তিনি যে খুব বেশি উৎসাহিত হয়ে উঠলেন, এমনতর আমার বোধ হয় না। তাঁর কবিতাগুলো যে খুব খারাপ তা নয়, কেবল চলনসই মাত্র। কেউ কেউ যেমন প্রথম শ্রেণীতে পাস করে, কেউ কেউ তেমনি প্রথম শ্রেণীতে ফেল করে। কিন্তু যারা পাস করে তাদেরই ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণী নির্দিষ্ট হয়, যারা ফেল করে তাদের মধ্যে শ্রেণীনির্দেশ করা কেউ আবশ্যক মনে করে না— তারা সবাই এক দলের মধ্যে পড়ে যায়। আমি যদি এঁকে বলতুম, কবিতা লেখায় যে-সমস্ত অপ্রকাশিত অজ্ঞাতনামারা ফেল করেছেন আপনি তাঁদের মধ্যে প্রথম কিম্বা দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত, তাতে কি তিনি কিছুমাত্র সান্ত্বনা লাভ করতেন? সার্টিফিকেট্‌টি না দিয়ে চুপ করে থাকাই ভালো। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় যেমন অনেক ভালো ছেলে অঙ্কে ফেল করে, তেমনি কাব্যে যারা ফেল তাদের অধিকাংশই সংগীতে ফেল। তাদের ভাব আছে, কথা আছে, রকম-সকম আছে, আয়োজনের কোনো ত্রুটি নেই, কেবল সেই সংগীতটি নেই যাতে মুহূর্তের মধ্যে

সমস্তটি কবিতা হয়ে ওঠে। সেইটেই চোখে আঙুল দিয়ে দেখানো ভারী শক্ত। কাঠও আছে ফুঁও আছে— কেবল সেই আগুনের স্ফুলিঙ্গটুকু নেই যাতে সবটা ধরে উঠে আগুন হয়ে ওঠে। এর মধ্যে কাঠের বোঝাটা নানা স্থান থেকে পরিশ্রমপূর্বক সংগ্রহ করে আনা যায়, কিন্তু সেই অগ্নিকণাটুকু নিজের অন্তরের মধ্যে আছে— সেইটুকু না থাকলে পর্বতপ্রমাণ স্তূপ ব্যর্থ হয়ে যায়। কামিনী সেনের কবিতা সম্বন্ধেও আমি এই কথা বলেছিলুম। তাঁর লেখায় বড়ো ভাব এবং নতুন ভাব ঢের থাকতে পারে, কিন্তু তাতে আগুন ধরে ওঠে নি। যদি কেউ তর্ক করে, বলে যে 'না না, ওর মধ্যে ঢের কবিত্ব আছে', তা হলে কে তার প্রতিবাদ করতে পারে? এই জন্যে প্রশংসা করবার না থাকলে আমি কাব্যের সমালোচনা করতে চাই নে।— কিন্তু [বব], কালকের সেই ইংরেজটার স্পর্ধার কথাগুলো এখনো আমি ভুলি নি। অম্লান মুখে বললে কিনা sacredness of life সম্বন্ধে আমাদের ধারণা নেই! যারা অ্যামেরিকার Red Indianদের উচ্ছিন্ন করে দিলে, যারা নিঃসহায় দুর্বল অস্ট্রেলিয়ান্‌দের মেয়েদের পর্যন্ত জন্তু-শিকারের মতো বিনা দোষে বিনা কারণে গুলি করে করে মারত, যারা আমাদের দেশী লোককে খুন করলে স্বজাতীয় বিচারকের কাছে দণ্ডযোগ্য হয় না, তারা নিরীহ করুণপ্রকৃতি হিন্দুদের কাছে sacredness of life এবং high standard of morals preach করতে আসে? যা হোক, সে কথা নিয়ে আক্ষেপ করে আর কী হবে?

সোলাপুর
২০ ফেব্রুয়ারি ১৮৯৩

এ চিঠি সম্ভবতঃ ১৩ ফেব্রুয়ারি তারিখে, পুরী পৌঁছিয়া, ডাকে ফেলা হয়।

৮১

পুরী

১৪ ফেব্রুয়ারি। ১৮৯৩।

কারও কারও মন ফোটোগ্রাফের wet plate-এর মতো; যে ছবিটা ওঠে সেটাকে তখনি ফুটিয়ে কাগজে না ছাপিয়ে নিলে নষ্ট হয়ে যায়। আমার মন সেই জাতের। যখন যে-কোনো ছবি দেখি অমনি মনে করি, এটাকে চিঠিতে ভালো করে লিখতে হবে। তার পরে কখন তার উপরে নতুন নতুন ছাপ প'ড়ে সেটা মিলিয়ে যায় টের পাই নে। কটক থেকে পুরী পর্যন্ত এলুম, এই ভ্রমণের কত-কী বর্ণনা করবার আছে তার ঠিক নেই। যেদিন যা দেখছি সেইদিনই সেগুলো লেখবার যদি সময় পেতুম তা হলে ছবি বেশ ফুটে উঠতে পারত—কিন্তু মাঝে দুই-এক দিন গোলেমালে কেটে গেল, ইতিমধ্যে ছবির খুঁটিনাটি রেখাগুলি অনেকটা অস্পষ্ট হয়ে এসেছে। তার একটা প্রধান কারণ, পুরীতে এসে পৌঁছে সামনে অহর্নিশি সমুদ্র দেখছি, সেই আমার সমস্ত মন হরণ করে রেখেছে— আমাদের দীর্ঘ ভ্রমণ-পথের দিকে পশ্চাৎ ফিরে চাইবার আর অবসর পাওয়া যাচ্ছে না। কিন্তু সে ক'টা দিন তোর চিঠি থেকে একেবারে বাদ দিতে ইচ্ছে করছে না। আমার দৈনিক বিবরণের মাঝখানে হঠাৎ একটা বিচ্ছেদ না দিয়ে এ ক'দিনের সংক্ষেপ ইতিহাসটুকু লিখে দিই।

শনিবার মধ্যাহ্নে আহারাদি করে বলু আমি বিহারীবাবু একটি ভাড়াটে ফিট্‌ন্ গাড়িতে আমাদের কম্বল বিছানা পেতে তিনটি পিঠের কাছে তিন বালিশ রেখে কোচ্‌বাক্সে একটি চাপরাশি চড়িয়ে যাত্রা আরম্ভ করে দিলুম। ··· এখানকার নদীগুলি বর্ষা চলে গেলেই প্রায় শুষ্কপ্রায় হয়ে যায়, কটক সেই রকমের দুই নদীর ধারে অবস্থিত। একটার নাম মহানদী, আর-একটার নাম কাঠযুড়ি। কাঠযুড়ি পেরিয়ে আমাদের পথ। সেখানে গাড়ি থেকে নেবে আমাদের

পালকিতে উঠতে হল। ধূসর বালুকা ধূ ধূ করছে। ইংরিজিতে যে একে নদীর বিছানা বলে, বিছানাই বটে। সকালবেলাকার পরিত্যক্ত বিছানার মতো— নদীর স্রোত যেখানে যেমন পাশ ফিরেছিল, যেখানে যেমন ভার দিয়েছিল, তার বালুশয্যায় সেখানে তেমনি উঁচু-নিচু হয়ে আছে— সেই বিশৃঙ্খল শয়ন কেউ আর যত্ন করে হাত দিয়ে সমান করে বিছিয়ে রাখে নি, সমস্ত এলোমেলো বন্ধুর হয়ে আছে— এই বিস্তীর্ণ বালির ও পারে একটি প্রান্তে একটুখানি শীর্ণ স্ফটিকস্বচ্ছ জল ক্ষীণ স্রোতে বয়ে চলে যাচ্ছে। কালিদাসের মেঘদূতে বিরহিণীর বর্ণনায় আছে যে, যক্ষপত্নী বিরহশয়নের একটি প্রান্তে লীন হয়ে আছে, যেন পূর্বদিকের শেষ সীমায় কৃষ্ণপক্ষের কৃশতম চাঁদটুকুর মতো। বর্ষাশেষের এই নদীটুকু দেখে বিরহিণীর আর-একটি উপমা যেন দেখা যায়।···

কটক থেকে পুরী পর্যন্ত পথটি খুব ভালো। এমনি যত্ন করে রাখা হয়েছে যে কোথাও চাকার চিহ্ন পড়তে পায় না। পথটা উঁচু— তার দুই ধারে নিম্নক্ষেত্র। বড়ো বড়ো গাছে ছায়াময়। অধিকাংশ আম গাছ। এই সময়ে সমস্ত আম গাছে মুকুল ধরেছে, গন্ধে পথ আকুল হয়ে আছে। ঘন দীর্ঘ তরুশ্রেণীর মাঝখান দিয়ে গাঢ় গেরুয়া রঙের দিব্যি তক্‌তকে পরিষ্কার পথটি চলে গেছে— দু ধারে চষা মাঠ নেবে গেছে। আম অশ্বত্থ বট নারিকেল এবং খেজুর গাছ -ঘেরা এক-একটি গ্রাম দেখা যাচ্ছে। আমাদের বাংলাদেশের মতো জঙ্গল পানাপুকুর ডোবা এবং বাঁশঝাড় নেই— সমস্ত দেশটি যেন ব্রাহ্মণভোজনের জন্যে পরিষ্কার করে রাখা হয়েছে, সবসুদ্ধ বেশ একটি তীর্থের ভাব আছে। মাঝে সর্দাইপুর বলে একটা জায়গায় ডাকবাংলাতে আমাদের থামবার কথা আছে। সেখানে যেতে পথে আমাদের আবার দুটো নদী পার হতে হল। একটার নাম

বালুহস্তা, আর-একটার নাম ভার্গবী। তার মধ্যে নদীর অংশ বড়ো কিছু ছিল না— শুষ্ক বালির মাঝে-মাঝে এক-এক জায়গায় একটু-একটু স্বচ্ছ জল ঝিক্‌ঝিক্ করছে। তীরে বালির উপর অনেকগুলো ছাপরওয়ালা গোরুর গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে, গোলপাতার ছাউনির নীচে মেঠাইয়ের দোকান বসেছে— পথের ধারে গাছের তলায় এবং শ্রেণীবদ্ধ কুঁড়েঘরের মধ্যে যাত্রীরা খাওয়া-দাওয়া করছে, এবং ভিক্ষুকের দল নতুন যাত্রী ও গাড়ি পালকি দেখবামাত্র বিচিত্র কণ্ঠে ও ভাষায় আর্তনাদ করতে আরম্ভ করছে।

আমরা বিকেলে সর্দাইপুরের বাংলায় গিয়ে পৌঁছলুম। এখানকার বাংলাগুলি বেশ। ছোটোখাটো, পরিষ্কার, গাছপালার মধ্যে ঢাকা, নিরালা— ইচ্ছে করে এই-সব বিশ্রামশালায় দিনকতক করে থেকে সত্যি-সত্যি বিশ্রাম করে যাই। চা খেয়ে আমরা সবাই বেড়াতে বেরলুম। তখন সূর্য সবে অস্ত গেছে— গোধূলির আলোতে সমস্ত আকাশ, বৃহৎ মাঠ, দূরের পাহাড় এবং পাহাড়ের উপরকার একটি ভাঙা মন্দির শান্তিময় সুন্দর মহিমায় অভিষিক্ত হয়ে গেছে। সে আর তোকে বেশি করে কী বলব, এই রকম সন্ধ্যার দৃশ্য আমার যে কী সুনিবিড় সুগভীর -ভাবে ভালো লাগে সে তোর চিঠিতে আমি বারবার প্রকাশ করেছি। গাছের সারির মাঝখানকার সেই দীর্ঘ স্তব্ধ পথ এবং দুই পার্শ্বের বিস্তৃত নিম্নভূমির মধ্যে একটি জনপ্রাণী দেখা যাচ্ছে না; আমার ইচ্ছে করছিল আমরাও চুপ করে মাথাটি নিচু করে এই নিস্তব্ধতার মাঝখান দিয়ে আস্তে আস্তে যাই— কিন্তু কথাবার্তার বিরাম ছিল না।...

রবিবার সকালে উঠে দেখি খুব মেঘ করেছে। আমরা চা রুটি খেয়ে প্রাতঃস্নান করে গাড়িতে উঠলুম। ফিট্‌নের ঘোমটা খুলে দেওয়া গেল, মেঘে সূর্য ঢাকা ছিল। যত পুরীর নিকটবর্তী হচ্ছি

তত পথের মধ্যে যাত্রীর সংখ্যা বেশি দেখতে পাচ্ছি। ঢাকা গোরুর গাড়ি misfortuneএর ঝাঁকের মতো সারি সারি চলেছে। রাস্তার ধারে গাছের তলায় পুকুরের পাড়ে লোক শুয়ে আছে, রাঁধছে, জটলা করে রয়েছে। কিন্তু এর আগে সমস্ত পথে যাত্রী প্রায় দেখি নি। এক-এক সময় আসে যখন এই দীর্ঘ পথ লোকে একেবারে ভরে যায় এবং পূর্বকালে এই পথের দুই ধার মড়কে, উপবাসে, মৃত যাত্রীদের দেহে আচ্ছন্ন হয়ে থাকত। এখনও ভিড়ের সময় বিস্তর লোক রোগে পথকষ্টে উপবাসে মারা যায়।…

পুরীর যত কাছাকাছি হচ্ছি পথের দুই ধারের গাছপালা ততই কমে যাচ্ছে। মাঝে মাঝে মন্দির আসছে এবং পান্থশালা ও বড়ো বড়ো পুষ্করিণী খুব ঘন ঘন পাওয়া যাচ্ছে। সন্ন্যাসী ভিক্ষুক এবং যাত্রীও ঢের দেখা দিচ্ছে। এক-এক জন ভিক্ষুক প্রায় আধঘণ্টাকাল আমাদের গাড়ির পিছন-পিছন অবিশ্রাম দৌড়ে জগন্নাথজি আমাদের মঙ্গল-বিধান করবেন এই রকম আশ্বাস দিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে ভিক্ষে চেয়ে চলেছে। তারা প্রায় বেশ হৃষ্টপুষ্ট সুস্থ সবল ব্রাহ্মণ। পুরী সমুদ্রের ধারে ব'লে এর কাছাকাছি তেমন বেশি গাছপালা নেই। পথের ডান দিকে একটা খুব দীর্ঘ বিলের মতো আছে, তার ও পারে পশ্চিমে গাছের মাথার উপর জগন্নাথের মন্দির-চূড়া দেখা যাচ্ছে। পথের ধারে ধারে ক্রমেই খুব ঘন ঘন মন্দিরের সার এবং পথিকের ভিড় দেখে বুঝতে পারলুম পুরী খুব কাছে এসেছে। আমরা সার্কিট হৌসে থাকব, সেটা শহরের বাইরে। হঠাৎ এক জায়গায় গাছপালার মধ্যে থেকে বেরিয়ে পড়েই সুবিস্তীর্ণ বালির তীর এবং ঘন নীল সমুদ্রের রেখা দেখতে পাওয়া গেল। তীরে দুটি-চারটি বিচ্ছিন্ন শাদা শাদা বাড়ি, একটি chapel এবং কতকগুলি বাঁধানো পাতকুয়ো। বালির মধ্যে মধ্যে শান-বাঁধানো রাস্তা এবং এক-একটি করে বসবার

বেঞ্চি। পুরীর সমুদ্র যে আমার কত ভালো লাগছে সে আমি প্রকাশ করে বলতে পারব না—এই পর্যন্ত বললেই যথেষ্ট হবে আমার মতো দরিদ্র ব্যক্তি ধার করে এখানে সমুদ্রের ধারে একটি বাংলা তৈরি করবার উদ্যোগ করছে। উড়িষ্যার এই পথটা দেখে আমার ক্রমাগত কালিদাসের মেঘদূত মনে পড়ছিল। কেয়াগাছের-বেড়া-দেওয়া দশার্ণ গ্রামের কথা মেঘদূতে আছে, এখানেও অনেক গ্রাম কেয়ার বেড়া দেওয়া। বরাবর দিগন্তের ধারে ধারে নীলবর্ণ পাহাড় দেখা যাচ্ছে আর মেঘদূতে যাকে নগনদী ব'লে লেখা আছে, অর্থাৎ পাহাড়ে নদী, যে-সব নদীতে কেবল বর্ষাকালে পাহাড়ের জলস্রোত আসে, গ্রীষ্ম-কালে বালি এবং নুড়ি পড়ে থাকে, সেরকম নদী এখানে অনেক। তার উপরে আবার আমাদের এই পুরী-যাত্রার সমস্ত পথই প্রায় মেঘ করে ছিল, বড়ো বড়ো নারকোল-বন মন্দির এবং কৃষিক্ষেত্রের উপর মেঘের গাঢ় ছায়া পড়েছিল, দিগন্তের পাহাড়ের রেখা মেঘের রেখার সঙ্গে একাকার হয়ে গিয়েছিল। আমরা আবার আজ রাত্রে কনারকে সূর্যমন্দিরের ভগ্নাবশেষ দেখতে যাচ্ছি।

সোলাপুর
২১ ফেব্রুয়ারি ১৮৯৩

কটক

২৫ ফেব্রুয়ারি। ১৮৯৩।

দেখিস আমার লেখা আজ হু হু করে এগিয়ে যাবে— চৈত্র মাসের সাধনার জন্যে যে ডায়ারিটা লিখতে আরম্ভ করেছিলুম এবং যা ভাঙা রাস্তায় বহুভারগ্রস্ত গোরুর গাড়ির মতো কিছুতে এগোতে পারছিল না, আজ সেটা নিশ্চয় শেষ করে ফেলব। যখন মন একটু খারাপ থাকে তখনই সাধনাটা অত্যন্ত ভারের মতো বোধ হয়। মন ভালো থাকলে মনে হয়, সমস্ত ভার আমি একলা বহন করতে পারি। তখন মনে হয়, আমি দেশের কাজ করব এবং কৃতকার্য হব। তখন লোকের উৎসাহ এবং অবস্থার অনুকূলতা কিছুই আবশ্যক মনে হয় না, মনে হয় আমার নিজের কাজের পক্ষে আমি নিজেই যথেষ্ট। তখন এক-এক সময়ে আমি নিজেই খুব দূর ভবিষ্যতের যেন ছবি দেখতে পাই— আমি দেখতে পাই, আমি বৃদ্ধ পক্ককেশ হয়ে গেছি, একটি বৃহৎ বিশৃঙ্খল অরণ্যের প্রায় শেষ প্রান্তে গিয়ে পৌঁচেছি, অরণ্যের মাঝখান দিয়ে বরাবর সুদীর্ঘ একটি পথ কেটে দিয়ে গেছি এবং অরণ্যের অন্য প্রান্তে আমার পরবর্তী পথিকেরা সেই পথের মুখে কেউ কেউ প্রবেশ করতে আরম্ভ করেছে, গোধূলির আলোকে দুই-এক জনকে মাঝে মাঝে দেখা যাচ্ছে। আমি নিশ্চয় জানি 'আমার সাধনা কভু না নিষ্ফল হবে'। ক্রমে ক্রমে অল্পে অল্পে আমি দেশের মন হরণ করে আনব— নিদেন আমার দু-চারটি কথা তার অন্তরে গিয়ে সঞ্চিত হয়ে থাকবে। এই কথা যখন মনে আসে তখন আবার সাধনার প্রতি আকর্ষণ আমার বেড়ে ওঠে। তখন মনে হয় সাধনা আমার হাতের কুঠারের মতো, আমাদের দেশের বৃহৎ সামাজিক অরণ্য ছেদন করবার জন্যে এ'কে আমি ফেলে রেখে মরচে পড়তে দেব না— এ'কে আমি বরাবর হাতে

রেখে দেব। যদি আমি আরও আমার সহায়কারী পাই তো ভালোই, না পাই তো কাজেই আমাকে একলা খাটতে হবে।

পুনা
৩ মার্চ, ১৮৯৩

কটক

২৭ ফেব্রুয়ারি। ১৮৯৩।

কিন্তু ...... ব'লে যিনি বেদীতে বসেছিলেন তিনি এমন সুদীর্ঘ বক্তৃতা দিয়েছিলেন যে, শ্রোতাদের কিছুমাত্র ধৈর্য ছিল না। ওরকম ক্রমাগত কথা শুনতে শুনতে মন একেবারে যেন উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে যায়—উপাসনার ঠিক বিপরীত ফল হয়। এর চেয়ে ঘরে বসে তাস পাশা খেললে মন ভালো থাকে। ব্রাহ্মসমাজের সাপ্তাহিক উপাসনায় এই জন্যেই যেতে ইচ্ছে করে না। সব জিনিষেরই ভালোমন্দ অধিকার-অনধিকার আছে। যে-কেউ ধর্ম সম্বন্ধে যেমন তেমন করে বলুক তাই যে প্রতি সপ্তাহে ধৈর্যসহকারে শুনে যাওয়া একটা কর্তব্যের মধ্যে, তা কিছুতেই বলা যায় না। বরং তাতে মনের ভিতরে একটা অশান্তি এবং বিদ্রোহের ভাব উপস্থিত হয়। যে ভালো করে বলতে পারে সেই বলবে এবং তারই কথা শুনব —এই হচ্ছে নিয়ম। বিষয় যত উচ্চ বলবার লোকের ক্ষমতাও তত বেশি হওয়া চাই। কিন্তু হয়ে পড়েছে এমনি যে প্রায় ধর্মবক্তৃতাই অযোগ্য বক্তার হাতে। তার কারণ, লোকে মনে করে ধর্মের কথা কানে উঠলেই যেন একটা পুণ্য আছে, এইজন্যে একটা উচ্চ প্রস্তর-খণ্ডের উপরে চড়ে যে যেমন করে বলুক লোকে নীরবে শুনে কর্তব্য পালন করে যায়। এইজন্যে ধর্মবক্তা সম্বন্ধে আর যোগ্যতা-বিচার হয় না। আমার তো মনে হয়, এ নিতান্ত অন্যায়। যার যে বিষয়ে রসবোধ বেশি আছে সেই বিষয়ে সে গোঁজামিলন সইতে পারে না। যাদের ধর্মবোধ এবং সাহিত্যবোধ কিছু আছে তারা যে ভাবহীন রসহীন অনর্গল পুরোনো বাজে কথা কী রকম করে সহ্য করে আমি তো ভেবে পাই নে। যাদের সে বোধ নেই তাদের যে এরকম বক্তৃতায় বোধ জন্মাবে তারও সম্ভাবনা দেখি নে। আসল, George Eliot

যাকে otherworldliness বলেন ধর্ম সম্বন্ধে অনেকের অজ্ঞাতসারে সেই ভাবটা আছে— তারা মনে করে, যে সময়টা যে-কোনোরকম ধর্মসম্পর্কীয় ব্যাপারে ব্যয় করা গেল সেটা যেন একটা investmentএর মতো, কোনো-একটা খাতায় জমা হয়ে যেন তার সুদ বাড়তে চলল। কিন্তু আমার মনে হয়, ভালো প্রসঙ্গ যদি কেউ ভালো করে ব্যক্ত না করে তবে সেটা শোনা একটা মহৎ লোকশান। তাতে কেবল মানসিক স্বাদ খারাপ হয়ে যায়— অন্তরের একটি স্বাভাবিক সচেতন বোধশক্তি নষ্ট হয়ে যায়। নিয়মিত বেসুরো গান শোনা মানুষের পক্ষে যেমন অশিক্ষা, নিয়মিত অনুপযুক্ত ধর্মবক্তৃতা শোনা মানুষের পক্ষে তেমনি একটা ক্ষতিজনক কাজ। এইজন্যে আমি নিজেও বেদীতে উঠে বলতে চাই নে, জানি সে বিষয়ে আমার স্বাভাবিক ক্ষমতা নেই, মনের মধ্যে একটা অনিবার্য আহ্বান নেই— এবং প্রতি বুধবারে নিয়মিত ··· ··· ···র বক্তৃতা শুনে আসাও আমার কর্তব্য জ্ঞান করি নে — বড়দাদা যখন একটা কিছু বলেন তখন আমার সমস্ত চিত্ত আকৃষ্ট হয় এবং উপকার হয়। অক্ষম লোকে যখন বলতে আরম্ভ করে তখন মনের মধ্যে যে-একটা অসহ্য অধৈর্য এবং বিরক্তি উপস্থিত হয় তাতে কেবল অপকার হয়।

সোলাপুর
৫ মার্চ ১৮৯৩

কটক

মঙ্গলবার

। ২৮ ফেব্রুয়ারি ১৮৯৩ ।

তুই যা বলেছিস আমার সঙ্গে তার মতের কোনো অনৈক্য নেই। তোকে কী লিখেছিলুম কিচ্ছু মনে নেই, হয়তো মনের আক্ষেপে কিছু বেশি মাত্রায় বলে থাকব। কিন্তু আমার মত হচ্ছে এই যে, এখন বহুকাল আমাদের অজ্ঞাতবাস বিজনবাস আবশ্যক। এখন আমাদের প্রস্তুত হবার সময়, এই অসম্পূর্ণ অবস্থায় নিজেকে সকলের চোখের সামনে নাচিয়ে নিয়ে বেড়াবার কাল নয়। যে সময় গঠন হতে থাকে সেই সময়টা অত্যন্ত গোপনীয় সময়। নিতান্ত কিশোর বয়সের বালকবালিকাদের যেমন প্রাপ্তবয়স্ক লোকদের আমোদপ্রমোদ এবং কার্যসভায় সর্বদা আত্মপ্রকাশ করতে দিলে তাদের উন্নতির পথ রুদ্ধ হয়; দুটো-একটা ক্লেভার কথা ক'য়ে, বয়োজ্যেষ্ঠদের কৌতুকজনক অনুকরণ ক'রে, বাহবা এবং প্রশংসাহাস্য পেয়ে তারা মনে করে 'আমরা সম্পূর্ণতা লাভ করেছি, আমরা আমাদের জ্যেষ্ঠতাতদেরই সমকক্ষ'— তেমনি আমাদের জাতীয় কৈশোর বয়সে আমরাও যদি দুটো-একটা বাহ্য চাকচিক্য, দুটো-একটা ইংরিজি ধরণধারণ ভড়ং এবং চটুলতা দেখিয়ে ছোটোখাটো বাহবা এবং সভাপ্রান্তে একটু-আধটু স্থান লাভ করি তা হলে আমাদের ভ্রম হবে যে, আমাদের সব হয়ে গেছে। যে-সমস্ত আশু-পুরস্কার-হীন কঠিন কাজ, দুরূহ কর্তব্য, একান্ত প্রাণসমর্পণ -ব্যতীত জাতির চরিত্র গঠিত হয় না সেগুলোকে অনাবশ্যক এবং তুচ্ছতর মনে হবে। একটা উদাহরণ দেখ্-না, যে-সমস্ত পেট্রিয়ট ভালো ইংরিজি বক্তৃতা ক'রে একবার বাহবা পেয়েছে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে সে কত উপেক্ষা করে। তার ইংরিজি বক্তৃতায় যে ক্ষণিক উপকারটুকু হয় সেই উপেক্ষার তুলনায় তা কত

সামান্য। ইন্‌ডিয়া অথবা বেঙ্গল কৌন্সিলে আসন পাবার সম্মান যে একবার পেয়েছে সে তার তুলনায় সমাজের ভিতরকার কাজ করাকে কত তুচ্ছ জ্ঞান করে! ইংরেজ সেজে যে ইংরেজের টেবিলের ধারে একটুখানি বসতে পেয়েছে স্বজাতির হৃদয় পাবার জন্য তার ঔদাসীন্য কী সুগভীর! এটা অত্যন্ত স্বাভাবিক। কিন্তু স্বাভাবিক বলেই আমাদের বেশি সতর্ক হওয়া উচিত। আমি জানি, গবর্নর-সাহেব যদি দুদিন আমার তেতালায় গিয়ে আমার সেই বড়ো কেদারায় হেলান দিয়ে আমাকে 'মাই ডিয়ার' ব'লে আধখানা চুরোট ফুঁকে আসে তা হলে আমি-যে এই এহেন রবি আজ মধ্যাহ্নমার্তণ্ডের মতো অগ্নিচক্র হয়ে উঠেছি আমাকেও সেই ল্যান্স্‌ডাউনের ম্লেচ্ছাধরোৎক্ষিপ্ত একটিমাত্র ধূম্র-কুণ্ডলীতে পূর্ণগ্রাস করে দিতে পারে। তখন আমার মুখমণ্ডল ব্যাপ্ত করে কী-একটি পরিতৃপ্ত হাস্য এবং আমার সমস্ত ভাষার উপর মধুরতার দ্রবধারা চিটেগুড়ের মতো লিপ্ত হয়ে যায়! সেই তো প্রধান আশঙ্কা! সেইজন্যেই তো তেতালার ছাত বন্ধ করে রাখা আবশ্যক (পাছে আমাদের গবর্নর-সাহেব তাঁর পরমবন্ধু ট্যাগোরের টিনের ছাতের নীচে চুরোট খেতে আসেন!)! কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত হবার সময় পাণ্ডবরা এক বৎসর অজ্ঞাতবাস যাপন করেছিলেন — গুরুগোবিন্দ তাঁর গুরুপদ গ্রহণ করবার পূর্বে বহুকাল লোকচক্ষুর অন্তরালে নির্জনে প্রস্তুত হয়েছিলেন। আমাদের এখন সেই সময়। এখন যদি গা-ঢাকা দিয়ে নিজের কর্মশালার মধ্যে বসে গভীর গম্ভীর নিবিষ্ট ভাবে নিজের লোক ও নিজের সমাজের কাজ না করি— যদি একবার আপনার চিত্তকে বিক্ষিপ্ত হতে দিই, সম্পূর্ণতা লাভ করবার পূর্বেই ক্রমাগত নিজের অসমাপ্ত কাজ দেখিয়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাহবা নেবার ইচ্ছে করি— তা হলে কিছুই হবে না। গাছ যেমন রৌদ্রে পুষ্ট হয়, কিন্তু বীজ তাতে শুকিয়ে মৃতভাবে থাকে, সেই রকম কর্মের প্রথম আরম্ভ

বাহিরের নিন্দাপ্রশংসা ও আঘাতব্যাঘাতের যোগ্য নয়— খানিকটা পরিণত হলে তবে সে মাটির বাহিরে আসে, রৌদ্র বৃষ্টি গ্রহণ করে এবং সেই উপায়েই শক্ত হয়ে ওঠে। ইংরেজ আমাদের নিন্দা করুক, প্রশংসা করুক, যাই করুক— আমাদের প্রতি বিমুখ হোক বা প্রসন্ন হোক, সে দিকে দৃক্‌পাতমাত্র না করে আমাদের উপেক্ষিত দেশ, আমাদের উপেক্ষিত ভাষা, আমাদের অপমানিত লোকদের কাজে জীবন সমর্পণ করতে হবে। যেখানে কেবল অপমান উপেক্ষা এবং অখ্যাতি সেই অন্ধকার নিম্নদ্বারের মধ্যে প্রবেশ করা কি সহজ কথা! খ্যাতিসম্মানের বিলাসে একবার অভ্যস্ত হলে কি আর দৈন্যের মধ্যে টে কা যায়! তখন ক্রমাগত মনে হয় কিসে আমার বইটা ইংরেজে পড়বে। কিসে আমার পৃষ্ঠদেশে ইংরেজে চাপড় মারবে। কিসে আমার ঘৃণিত দেশের লোক আমাকে তার স্বাজাতীয় ব'লে সন্দেহ না করে, এবং কিসে ইংরেজ আমাকে আমাদের দেশের মহৎ এক্সেপ্‌শন্‌ ব'লে গ্রহণ করে। যারা ইংরেজ-সংসর্গ-সম্মানের স্বাদ একবার পেয়েছে তারা যে সেটাকে বহুমূল্য জ্ঞান করে সেজন্যে আমি তাদের দোষ দিই নে— এ আকর্ষণ এ প্রলোভন খুব গুরুতর সন্দেহ নেই। কিন্তু সেই জন্যেই আমি নিজের কোটরে লুকোতে চাই ··· ···রের রাজা যে স্বদেশে বসে রাজত্ব করার চেয়ে সিমলায় গিয়ে সাহেবের সঙ্গে টেনিস খেলতে এবং মেমের সঙ্গে নাচতে ভালোবাসে— সাহেব-মেমেরা তাকে দ্বারভাঙ্গার রাজার চেয়ে ঢের বেশি প্রশংসা করে, বলে যে একজন ইংরেজের সঙ্গে এর কোনো প্রভেদ নেই— এখন তার পক্ষে ···রে বসে রাজত্ব করা কি কম কঠিন! আমি হলেও হয়তো ঠিক ঐ রকম হতুম— আমিও বাঙালি, আমারও স্বাধীন তেজ নেই। সেই জন্যেই সেটা গোপনে সঞ্চয় এবং বহুযত্নে পালন করতে হবে— সেটা যতক্ষণে না সবল ও আত্মরক্ষণক্ষম হয়ে উঠবে ততদিন তাকে

অন্তরালে রেখে কাঠখড় যোগাতে হবে। তার পরে আর কাউকে ভয় করি নে, তার পরে আর নিজের জন্যে লজ্জা নেই— এখন নিজেকে বিশ্বাস নেই।

সোলাপুর

৬ মার্চ ১৮৯৩

বালিয়া

শুক্রবার

। ৩ মার্চ ১৮৯৩।

আমরা এখনো বোটেই আছি। ছোট্ট বোটখানি। একটি বড়ো জলিবোটের উপর ছাত তৈরি করে এই বোটটি হয়েছে— আমার মতো লম্বা লোকের দৈর্ঘ্যগর্ব খর্ব করাই এর মুখ্য উদ্দেশ্য দেখতে পাচ্ছি— ভ্রমক্রমে মাথা একটুখানি তুলতে গেলেই অমনি কাষ্ঠফলকের প্রচণ্ড চপেটাঘাত মাথার উপর এসে পড়ে, হঠাৎ একেবারে দমে যেতে হয়— সেই জন্যে কাল থেকে নতশিরে যাপন করছি। তোকে বলা বাহুল্য, মাথা ঠোকা, হুঁচট খাওয়া, হাত পা কাটা প্রভৃতি বেদনাজনক ব্যাপার খুব নিরাপদ স্থানেও আমার দ্বারা অত্যন্ত অবলীলাক্রমে সম্পন্ন হয়ে থাকে : সে অবস্থায় এই সাড়ে চার ফুট বোটের মধ্যে ছ ফুট অন্যমনস্ক লোকের অহরহ কিরকম দুর্গতি হচ্ছে তা কল্পনা করা শক্ত নয়। কপালে যত দুঃখ যত ব্যথা ছিল তার উপরে আবার প্রত্যেকবার দাঁড়াতে গিয়ে নতুন ব্যথা বাড়ছে। সেজন্যে আমি তত আপত্তি করি নে— কিন্তু কাল সমস্ত রাত্তির মশার জ্বালায় ঘুম হয় নি সেটা আমার ভারী অন্যায় মনে হচ্ছে। সকল রকম ঘা খাওয়া আমার অভ্যাস আছে, কিন্তু অনিদ্রাটা আমার তেমন সয়ে যায় নি। সেই জন্যে আজ সমস্ত শরীরগ্রন্থি যেন শিথিল হয়ে গেছে— বিছানার উপর কাত হয়ে পড়ে বাম কনুইয়ের উপর দেহভার রেখে একটা বালিশের উপর পোর্ট্‌ফোলিয়ো বিছিয়ে নিতান্ত অলসভাবে তোকে লিখে যাচ্ছি। এ দিকে আবার শীত কেটে গিয়ে গরম পড়ে এসেছে— রৌদ্র উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে এবং পাশের জানলা দিয়ে মন্দ মন্দ সজল শীতল বাতাস পিঠের উপর এসে লাগছে। আজ আর শীত কিম্বা সভ্যতার কোনো খাতির নেই—

বনাতের চাপকান এবং চোগা হুকের উপর উদ্‌বন্ধনে ঝুলছে— নাল-লোহিত-রেখাঙ্কিত জিনের রাত্রিবস্ত্র প'রে নিঃসংকোচে প্রভাতযাপন করছি, ঘণ্টাও বাজছে না, সসজ্জিত খানসামা এসেও সেলাম করছে না— অর্ধসভ্যতার অপরিচ্ছন্ন শৈথিল্য এবং আরাম উপভোগ করছি। পাখিগুলো ডাকছে এবং তীরে দুটো বড়ো বড়ো বট গাছের পাতা বাতাসে ঝর্‌ঝর্‌ করে শব্দ করছে, কম্পিত জলের উপরকার রৌদ্রালোক আমাদের বোটের ভিতরে এসে চিক্‌মিক্‌ করে উঠছে, বেলাটা এক রকম ঢিলে ভাবেই চলেছে। কটকে থাকতে ছেলেদের ইস্কুল এবং বিহারীবাবুর আদালতে যাবার তাড়া দেখে সময়ের দুর্মূল্যতা এবং সভ্য মানবসমাজের ব্যস্ততা খুব অনুভব করা যেত। এখানে সময়ের ছোটো ছোটো নির্দিষ্ট সীমা নেই--কেবল দিন এবং রাত্রি এই দুটি বড়ো বড়ো বিভাগ।

সোলাপুর
১১ মার্চ ১৮৯৩

তীরতল

শুক্রবার

। ৩ মার্চ ১৮৯৩।

এই মেঘবৃষ্টি পাকা কোঠার মধ্যে অতি ভালো, কিন্তু ছোট্ট বোটটির মধ্যে দুটি রুদ্ধ প্রাণীর পক্ষে মনোরম নয়। একে তো উঠতে বসতে মাথা ঠোকে, তার উপরে আবার যদি মাথায় জল পড়তে থাকে, তা হলে বেদনার কিঞ্চিৎ উপশম হতেও পারে, কিন্তু আমার 'দুর্দশার পেয়ালা' একেবারে পূর্ণ হয়ে ওঠে। মনে করেছিলুম বৃষ্টি বাদলা এক রকম ফুরোলো, এখন স্নাত পৃথিবীসুন্দরী কিছুদিন রৌদ্রে পিঠ দিয়ে আপনার ভিজে এলোচুল শুকোবে, আপনার সিক্ত সবুজ শাড়িখানি রৌদ্রে গাছের ডালে টাঙিয়ে দেবে, মাঠের মধ্যে মেলে দেবে— বসন্তী আঁচলখানি শুকিয়ে বেশ ফুর্‌ফুরে হয়ে বাতাসে উড়তে থাকবে। কিন্তু রকমটা এখনো সে ভাবের নয়— বাদলার পর বাদলা, এর আর বিরাম নেই। আমি তো দেখেশুনে এই ফাল্গুন মাসের শেষ ভাগে কটকের এক ব্যক্তির কাছ থেকে একখানি মেঘদূত ধার করে নিয়ে এসেছি— আমাদের পাণ্ডুয়ার কুঠির সম্মুখবর্তী অবারিত শস্যক্ষেত্রের উপরে আকাশ যেদিন আর্দ্র স্নিগ্ধ সুনীলবর্ণ হয়ে উঠবে, ভালোবাসার ছলছল মুগ্ধ দৃষ্টির মতো, সেদিন বারান্দায় বসে আবৃত্তি করা যাবে। দুর্ভাগ্যক্রমে আমার কিছুই মুখস্থ হয় না— কবিতা ঠিক উপযুক্ত সময়ে মুখস্থ আবৃত্তি করে যাওয়া একটা পরম সুখ, সেটা আমার অদৃষ্টে নেই। যখন আবশ্যক হয় তখন বই হাৎড়ে সন্ধান করে পড়তে গিয়ে আবশ্যক ফুরিয়ে যায়। মনে কর্ মনে ব্যথা লেগে ভারী কাঁদতে ইচ্ছে হয়েছে, তখন যদি দরোয়ান পাঠিয়ে বাথ্‌গেটের বাড়ি থেকে শিশি করে চোখের জল আনতে হত তা হলে কী মুশকিলই হত। ঐ জন্যে মফস্বলে যখন যাই

তখন অনেকগুলো বই সঙ্গে নিতে হয়— তার সবগুলোই যে প্রতিবার পড়ি তা নয়, কিন্তু কখন্ কোন্‌টা দরকার বোধ হবে আগে থাকতে জানবার জো নেই, তাই সমস্ত সরঞ্জাম হাতে রাখতে হয়। মানুষের মনের যদি নির্দিষ্ট ঋতুভেদ থাকত তা হলে অনেক সুবিধে হত— যেমন শীতের সময় কেবল শীতের কাপড় নিয়ে যাই এবং গরমের সময় আল্‌স্টার নেবার কোনো দরকার থাকে না, তেমনি যদি জানতুম মনে কখন শীত কখন বসন্ত আসবে তা হলে আগে থাকতে সেইরকম গদ্য কিম্বা পদ্যের জোগাড় করা যেতে পারত। কিন্তু মনের ঋতু আবার ছ'টা নয়, একেবারে বাহান্নটা— এক প্যাকেট তাসের মতো— কখন্ কোন্‌টা হাতে আসে তার কিচ্ছু ঠিক নেই— অন্তরে বসে বসে কোন্ খামখেয়ালি খেলোয়াড় যে এই তাস ডীল ক'রে এই খামখেয়ালি খেলা খেলে তার পরিচয় জানি নে। সেইজন্য মানুষের আয়োজনের শেষ নেই— তাকে যে কত রকমের কত-কী হাতে রাখতে হয় তার ঠিক নেই। সেই জন্যে আমার সঙ্গে 'নেপালীজ বুদ্ধিস্টিক লিটারেচর' থেকে আরম্ভ করে শেক্‌স্‌পীয়র পর্যন্ত কত রকমেরই যে বই আছে তার আর ঠিকানা নেই। এর মধ্যে অধিকাংশ বইই ছোঁব না, কিন্তু কখন্ কী আবশ্যক হবে বলা যায় না। অন্য বার বরাবর আমার বৈষ্ণবকবি এবং সংস্কৃত বই আনি ; এবার আনি নি, সেই জন্যে ঐ দুটোরই আবশ্যক বেশি অনুভব হচ্ছে। যখন পুরী খণ্ডগিরি প্রভৃতি ভ্রমণ করছিলুম তখন যদি মেঘদূতটা হাতে থাকত ভারী সুখী হতুম। কিন্তু মেঘদূত ছিল না, তার বদলে Caird's Philosophical Essays ছিল, একেই বলে 'হেরফের'।

সোলাপুর
১১ মার্চ ১৮৯৩

কটক

সোমবার। ৬ মার্চ্ ১৮৯৩।

পুরীর ম্যাজিস্ট্রেটের বাড়িতে প্রশংসালাভ করে আমি খুশি হয়েছি কি না তুই জিজ্ঞাসা করেছিস। তোকে সমস্ত কথা খুলে লিখি নি বলে তোর এই প্রশ্ন মনে উদয় হয়েছে। তবে বিস্তারিত বিবরণটা দেওয়া যাক। প্রথমে যখন বিহারীবাবুরা পুরীর ম্যাজিস্ট্রেটের উপর call করতে আমাকে অনুরোধ করলেন তখন আমি অনেক ইতস্তত করেছিলেম, কিন্তু তাঁরা আশ্বাস দেওয়াতে এবং ইচ্ছা প্রকাশ করাতে আমি অনিচ্ছাসত্ত্বেও রাজি হলুম। দুখানি কার্ডে আমার নাম লিখে বিহারীবাবুদের সঙ্গে বেরিয়ে পড়লুম। তাঁদের সঙ্গে কার্ড্ ছিল না— তাঁরা খবর পাঠিয়ে দিলেন এবং আমার কার্ড্ দুটোও সেই সঙ্গে পাঠালেন। মিনিট পাঁচেক পরে খবর এল— তার পরদিন সকালে এলে সাহেবের সঙ্গে মুলাকাৎ হবে। বিহারীবাবু মিসেস গুপ্ত অবাক হয়ে গেলেন। আমরা তো সুড়্ সুড়্ করে ম্যাজিস্ট্রেটের দরজা থেকে বেরিয়ে চলে গেলুম। বিহারীবাবুরা তো মহা বিরক্ত। হেনকালে সন্ধের সময় চিঠি এল যে মিসেস ওয়াল্‌স্ (ম্যাজিস্ট্রেটের নাম ওয়াল্‌স্) ভারী দুঃখিত। জজসাহেব এবং তাঁর মেমসাহেব যে খবর পাঠিয়েছিলেন তাঁর চাপরাশি সে কথা তাঁকে জানায় নি। আমিও তাই মনে করেছিলুম। কিন্তু এর ভিতরকার কথাটা হচ্ছে এই যে, ম্যাজিস্ট্রেট যদিও জজসাহেবকে অমান্য করতে চায় না— কিন্তু কোনো 'নেটিভ' ভদ্রলোক গেলে তাকে তার পরদিন সকালবেলা মুলাকাৎ করতে আসতে বলে। বোধ হয় মিসেস ম্যাজিস্ট্রেটকে কার্ড্ পাঠানো স্পর্দ্ধা মনে করে। অবিশ্যি বলতে পারে সেদিন তার সময় নেই, কিন্তু তাঁর নির্দিষ্ট-সময়-মত সময় ক'রে আমি যে সেলাম করতে আসব তিনি এমনি

কী নবাবের পুত্র! অবিশ্যি, আমাদেরই দেশের লোকের দোষ—তারা পেটের দায়ে মানের দায়ে উমেদারি করতে, সেলাম করতে যায়, সাহেবের আদিষ্ট সময়ে দ্বারদেশে অপেক্ষা করে থাকে—সুতরাং আমি বঙ্গনামধারী এক ব্যক্তি যে আস্ফালন করে ম্যাজিস্ট্রেট এবং মিসেস ম্যাজিস্ট্রেটের উপর সামাজিক কর্তব্যরক্ষাস্বরূপ 'কল' করতে যাব এ তাদের মনেও উদয় হয় নি। সুতরাং এ নিয়ে সাহেবের উপর অভিমান করতে বসা আমার পক্ষে নিতান্ত বাড়াবাড়ি হয়। কিন্তু এ কথা মনে স্বতই উদয় হয়, ওদের কাছে সোহাগ করে লৌকিকতা করতে যাওয়া ঝকমারির একশেষ। আমি যতই ভদ্রলোক এবং সম্ভ্রান্ত লোক হই-না কেন, ওদের কাছে তার কোনো মূল্য নেই। যতক্ষণ না আমাদের জাতীয় বিশেষত্ব ঘুচিয়ে ফেলে ওদের প্রদত্ত একটা কৃত্রিম সম্মান পরিধান করব ততক্ষণ ওদের কাছে আমার কোনো আমল নেই। এই দেখ্-না কেন, আমাদের দেশের ব্যারিস্টারেরা যতই ইংরেজ-সোহাগ-প্রিয় বিলিতি-মেজাজী হোক-না কেন তাঁরা তো এ দেশে এসে সাহেবদের সঙ্গে তেমন কুটুম্বিতে করে উঠতে পারেন না। তাঁরা তো বার-লাইব্রেরিরও মধ্যে পূর্ণচন্দ্রের কলঙ্ক-রেখার মতো একটি স্বতন্ত্র কৃষ্ণসীমার মধ্যে স্বভাবতই বিচ্ছিন্ন হয়ে বাস করেন। কাজ কী বাপু, আমাদের এমনি কী দায় পড়েছে! আমাদের নিজের ঘরে এতই কি অতিষ্ঠ হয়েছি! আমাদের কৃষ্ণ-কুটুম্বরা যতই কৃষ্ণ হোন-না কেন, তাঁরা তো আর আমাদের চেয়ে কৃষ্ণতর নন। যতক্ষণ ইংরেজ আমাকে আমাদের জাতি থেকে বিচ্ছিন্ন করে সম্মান করে ততক্ষণ সে সম্মান আমার পক্ষে অপমান এবং অগ্রাহ্য।—পুরীর ম্যাজিস্ট্রেট পরদিন আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করলে এবং আমাকে নিমন্ত্রণ করলে আমি কি তাতে ভারী খুশি হয়েছিলুম? তা মনেও করিস নে। নিমন্ত্রণ অগ্রাহ্য করলে বড়ো বেশি স্পষ্টরূপ অভিমান

প্রকাশ করা হয় এবং তাতে যথার্থ অভিমানের খর্বতা হয়— তা ছাড়া বিহারীবাবুদের বিশেষ ক্ষুণ্ণ করা হয়। তাই খেতে গেলুম, ম্যাজিস্ট্রেটের শ্যালীর পাণিগ্রহণ করে সহাস্যমুখে টেবিলে বসলুম— সমুদ্রতীর-দৃশ্যের সৌন্দর্য সম্বন্ধে পার্শ্ববর্তিনীর সঙ্গে একমত হলুম এবং পুরীতে সমুদ্রবায়ুপ্রবাহ-জন্য গ্রীষ্মের অনাধিক্যবশত আনন্দ প্রকাশ করলুম। তার পরে গান শুনলুম, গান শোনালুম, তালি দিলুম এবং তালি পেলুম। এই-যে বাহবাটুকু পাওয়া যায় একি যথার্থ হৃদয়ের মধ্যে প্রবেশ করে? একি কতকটা কৌতূহলপরিতৃপ্তি নয়? আমাদের থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র একটি জীবের মুখে আমাদের কোন্ খাবারটি একটু রুচিজনক মনে হয় তাই কি পরীক্ষা করে দেখা নয়? সত্যি কি আমার যা ভালো লাগে ওদের তাই ভালো লাগে? এবং ওদের যা ভালো লাগে না তাই বাস্তবিক ভালো নয়? তাই যদি না হয় তবে শুভ্র করতলের তালিতে আমার এতই কি সুখ হবে? ইংরেজের তালিকে যদি আমরা অতিরিক্ত মূল্য দিতে আরম্ভ করি তা হলে আমাদের দেশের অনেক ভালোকে ত্যাগ করতে এবং ওদের দেশের অনেক মন্দকে গ্রহণ করতে হয়। তা হলে পায়ের মোজাটি খুলে বেরতে আমাদের হয়তো লজ্জা হবে, কিন্তু ওদের নাচের কাপড় পরতে লজ্জা হবে না। আমাদের দেশের শিষ্টাচার সম্পূর্ণ লঙ্ঘন করতে কিছুই সংকোচ হবে না এবং ওদের দেশের কোনো প্রচলিত অশিষ্টাচারও অম্লানমুখে গ্রহণ করতে পারব। আমাদের দেশের আচ্কান্কে সম্পূর্ণ মনের মতো ভালো দেখতে নয় বলে ত্যাগ করব, কিন্তু ওদের দেশের টুপিকে বদ দেখতে হলেও শিরোধার্য করব। শুভ্র হস্তের করস্পন্দন ও করতালি আমাদের পক্ষে বড়ো ভয়ানক— ওতে আমরা অতি সামান্য বাহ্য সম্মান পাই, কিন্তু আমাদের যথার্থ আত্মসম্মান তলে তলে নষ্ট করে ফেলে। আমরা জ্ঞাত এবং

অজ্ঞাতসারে ঐ করতালির নির্দেশমত আপনার জীবনটা গঠিত করতে থাকি এবং তাকে অত্যন্ত ক্ষুদ্র করে ফেলি। আমি নিজেকে সম্বোধন করে বলি— 'হে মৃৎপাত্র, ঐ কাংস্যপাত্রের কাছ থেকে দূরে থেকো; ও যদি রাগ ক'রে তোমাকে আঘাত করে তাতেও তুমি চূর্ণ হয়ে যাবে আর ও যদি সোহাগ ক'রে তোমার পিঠে চাপড় মারে তাতেও তুমি ফুটো হয়ে অতলে মগ্ন হয়ে যাবে— অতএব বৃদ্ধ ঈশপের উপদেশ শোনো, তফাত থাকাই সার কথা। উনি থাকুন বড়ো ঘরে আর আমার সামান্য ঘরে সামান্য পাত্রের হয়তো ছোটোখাটো কাজ আছে, কিন্তু সে যদি আপনাকে ভেঙে ফেলে তবে তার বড়ো ঘরও নেই ছোটো ঘরও নেই— তবে সে মাটির সমান হয়ে যাবে। তখন হয়তো আমাদের বড়ো-ঘর-ওয়ালা ঐ খণ্ড জিনিষটিকে তাঁর ড্রয়িংরুমের ক্যাবিনেটের এক পার্শ্বে সাজিয়ে রাখতে পারেন, সে কিন্তু ক্যুরিয়সিটির স্বরূপে— তার চেয়ে ক্ষুদ্র গ্রামের কুলবধূর কক্ষে বিরাজ করেও গৌরব আছে।'

সোলাপুর

১৩ মার্চ ১৮৯৩

কটক

মঙ্গলবার। ৭ মার্চ, ১৮৯৩।

সুরি বেচারা এক্‌জামিন পাস করবার জন্যে সৃষ্ট হয় নি। ওর উচিত ছিল আমার মত পাশ-কাটানো 'লিটারেরি' হওয়া। কিন্তু তার পক্ষে একটা ব্যাঘাত হয়েছে এই যে, ও যেমন আপনার ইজিচেয়ারটির মধ্যে নিমগ্ন হয়ে দিব্যি আরামে আছে, ওর মনটিও তেমনি ওর অন্তঃ-কুহরটির মধ্যে দিব্যি গট্ হয়ে বসে আছে— তার অগাধ সন্তোষ কিছুতেই বিচলিত হয় না। আমরা কুনো অকর্মণ্য এবং সংসারের সকল বিষয়ে অকৃতকার্য বটে, কিন্তু আমাদের মনটা কুনো নয়, সে সর্বদাই উড়ু উড়ু করছে— তাকে এক মুহূর্ত বেঁধে রাখা দায়। ঐটেই হচ্ছে খ্যাপামির প্রধান লক্ষণ। সুরির কোনো খ্যাপামি নেই, ও ভারী স্নিগ্ধ। প্রকৃতির মুখশ্রীতে যেমন একটা গভীর নিশ্চিন্ত ত্বরা-হীনতার ভাব আছে, ওর সেই রকম। আমার মতো নিত্য অস্থির-স্বভাবের লোকের পক্ষে নির্জন প্রকৃতি এবং সুরির মতো অচল সুস্থিরতার সংসর্গ ভারী আবশ্যক। ও যখন ওর স্বাভাবিক শান্ত স্নিগ্ধভাবে আমাকে ওর বাহুর দ্বারা বেষ্টন ক'রে ধরে, আমার সমস্ত ছট্‌ফটানির চার দিকে যেন একটি বাঁধ তুলে দেয়। এক-একজন লোক আছে যারা কোনো কিছু না করলেও যেন আশাতীত ফল দান করে; সুরি সেই দলের লোক। ও যে খুব পাস করবে, প্রাইজ পাবে, লিখবে, বড়ো কাজ কিম্বা ভালো চাকরি করবে, তা যেন তেমন আবশ্যকই মনে হয় না— মনে হয় যেন কিছু না করলেও ওর মধ্যে একটা চরিতার্থতা আছে। অধিকাংশ লোককেই অকর্মণ্য হয়ে থাকা শোভা পায় না, তাতে তাদের অপদার্থতা পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। কিন্তু সুর কিচ্ছুই না করলেও ওকে কেউ অযোগ্য বলে ঘৃণা করতে পারবে না। কাজকর্মের ব্যস্ততা মানুষের পক্ষে একটা আচ্ছাদনের মতো।

সমস্ত কমন্‌প্লেস্‌ লোকের সেটা ভারী আবশ্যক, তাতে তাদের দৈন্য তাদের শীর্ণতা ঢাকা পড়ে। কিন্তু যারা স্বভাবতই পরিপূর্ণ প্রকৃতির লোক তারা সমস্ত কর্মাবরণমুক্ত হলেও একটি শোভা এবং সম্ভ্রম রক্ষা করতে পারে। সুরির মতন অমন ষোলো-আনা শৈথিল্য আর কোনো ছেলের দেখলে নিশ্চয় অসহ্য বোধ হত, কিন্তু সুরির কুঁড়েমিতে একটি মাধুর্য আছে। সে আমি ওকে ভালোবাসি বলে নয়— তার প্রধান কারণ হচ্ছে চুপচাপ বসে থেকেও ওর মনটি বেশ পরিণত হয়ে উঠছে এবং ওর আত্মীয়স্বজনদের প্রতি ওর কিছুমাত্র ঔদাসীন্য নেই। যে কুঁড়েমিতে মূঢ়তা এবং অন্যের প্রতি অবহেলা ক্রমাগত স্ফীত হয়ে গোলগাল তেল-চুক্‌চুকে হয়ে উঠতে থাকে সেইটেই যথার্থ ঘৃণ্য। সুরি-সাহেব একটি সহৃদয় এবং সুবুদ্ধি আলস্যের দ্বারা যেন মধুররস-সিক্ত হয়ে আছে। যে গাছে সুগন্ধ ফুল ফোটে সে গাছে আহার্য ফল না ধরলেও চলে। আমি প্রায়ই মাঝে মাঝে এ কথা ভাবি যে, আমার যদি কবিত্ব প্রভৃতি দুই-একটা স্বাভাবিক শক্তি না থাকত, তা হলে আমার মতো অসহ্য কণ্টকময় নিষ্ফলতা পৃথিবীতে অল্পই পাওয়া যেত। আমিও জন্ম-অকর্মণ্য, কিন্তু লেখবার শক্তি স্বাভাবিক থাকাতে আমি এ যাত্রা এক রকম ক'রে ত'রে গেলুম। নইলে তোরা আমাকে কেউ কিচ্ছু ভালোবাসতে পারতিস্‌ নে [বব]। সে আমি নিশ্চয় জানি। সুরিকে যে সকলে ভালবাসে সে ওর কোনো কাজের দরুন, ক্ষমতার দরুন, চেষ্টার দরুন নয়—ওর প্রকৃতির অন্তর্গত একটি সামঞ্জস্য ও সৌন্দর্যের দরুন। কিন্তু সংসার পুরুষমাত্রেরই কাছে স্বভাব-নির্বিচারে কাজ প্রত্যাশা করে—সেইজন্যে এক-একবার ইচ্ছে করে সুরি যদি কোনো-একটা নাড়া খেয়ে আর-একটু সচেতন সচেষ্ট হয়ে উঠতে পারে— আমাদের জন্যে নয়, বাইরের লোকের জন্যে। যখন বাইরের লোক জিজ্ঞাসা করবে 'আপনি কী করেন?' তখন সুরেন

কেন উত্তর দেবে 'কিচ্ছু করি নে'! তারা তো ওর মর্যাদা বুঝতে পারবে না। ওর মধ্যে একটি সহজ সরল মহত্ত্ব আছে, যে জন্যে ও ওর সমস্ত আত্মীয় এবং বন্ধুর কাছে ভালবাসা এবং শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে, যে জন্যে পরিচিতদের কাছে ও একটি দৃষ্টান্তস্বরূপে কাজ করে। কিন্তু পুরুষ মানুষ যতক্ষণ না সর্বসাধারণের মধ্যে আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করে ততক্ষণ তার সম্পূর্ণ সার্থকতা নেই। তা ব'লে কী করা যাবে? সকলের তো সব হবার শক্তি নেই। সুরি যা আছে তাতেই আমি সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট আছি। পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে তোদের যে আত্মীয়রূপে কাছে পেয়েছি এজন্যে আমি তোদের উপর যেন কৃতজ্ঞ আছি। তোরা যে আমার কত উপকার করেছিস তা আমিই জানি। যারা ভালো তাদের ভালোবাসার যে কত মূল্য তা তারা নিজে জানে না। তুই আর সুরি আমাকে যে ভালোবাসিস, এ আমি যদিও আশাও করি তবু আমার কাছে যেন ভারী আশ্চর্যের মতো মনে হয়। ভালো করে ভেবে দেখলে আপনাকে কোনো ভালো জিনিষেরই যোগ্য মনে হয় না, সবগুলিই বিশেষ অনুগ্রহ— এত অনায়াসে এত পাই যে তারা যে কী অপরিমেয় অপরিসীম তা বুঝতে পারি নে, তবু যদি একটু কিছু কম পড়ে তবে সেটাকে ভারী একটা অন্যায় বঞ্চনা মনে হয়! মানুষের অযোগ্যতার সেই একটা প্রধান লক্ষণ— অকৃতজ্ঞতা।

সোলাপুর

১৪ মার্চ ১৮৯৩

৮৯

কলকাতা

১৬ মার্চ্‌। ১৮৯৩।

অনেক দিন পরে আজ একটুখানি রোদ্দুর দেখা দিয়েছে— বাঁচা গেছে —এতদিন মেঘলা দিনগুলো যেন কালো ভিজে কম্বল মুড়ি দিয়ে পড়ে ছিল, আজ বেশ একখানি বসন্তী রঙের কাপড় প'রে প্রফুল্ল সুস্থ মুখে বেরিয়ে এসেছে। মনে কর্‌, চৈত্রমাস পড়েছে তবু এবার কিচ্ছু গরম পড়ে নি— দিনের বেলায় মোটা চাপকান জোব্বা প'রে থাকি এবং রাত্রিকালে শালকম্বল মুড়ি দিই— খোলা ছাতে নক্ষত্রালোকে দক্ষিনে বাতাসে সতরঞ্চ পেতে জটলা করা কল্পনাতেও উদয় হয় না। সকলেই বলছে, এরকম অভূতপূর্ব ব্যাপার এ দেশে কখনো ঘটে নি। বর্ষার সময় বর্ষা হল না, শীতের সময় যথেষ্ট শীত নেই, এমন শোনা গেছে— কিন্তু বাঙলাদেশের গর্মিকে ফাঁকি দেওয়া বড়ো আশ্চর্য কথা।

সু··· বেশ রীতিমত পাকা স্টাইলে আলাপ চালাচ্ছিল। কাছে ঘেঁষে ঝুঁকে প'ড়ে খুব সমনোযোগ অথচ সপ্রতিভ ভাবে ঈষৎ-হাস্য-মুখে বক্রগ্রীবায় ইংরাজি ভাষায় কথোপকথন, অ্যাল্‌বম খুলে ছবি দেখানো ইত্যাদি ঠিক-দস্তুর-মত চাল চালছিল। বাঙালি ঘরের ছেলে এরকম অবস্থায় যেরকম লজ্জাভিভূত সংকুচিত ভাব ধারণ করে এতে তার তিলার্ধ মাত্র প্রকাশ পেল না।

আমার দেখে ভারী কৌতুক এবং বিস্ময় বোধ হচ্ছিল। আমি বোধ হয় আমার এই প্রায় বত্রিশ বৎসর বয়সেও অমন নিতান্ত সহজ মধুর সুনিশ্চিতভাবে অবলাজাতির সঙ্গে বাক্যালাপ করতে পারি নে। চলতে গেলে হুঁচোট খাই, বলতে গেলে বেধে যায়, হাত দুটো কোথায় রাখি ভেবে পাই নে, লম্বা পা দুখানা সম্বন্ধে একটা কোনো ব্যবস্থা করা কর্তব্য বোধ করি অথচ কিছুই করে ওঠা হয় না—

তুটোকে গুটিয়ে রাখব কি ছড়িয়ে রাখব কি আগুপিছু করে রাখব তার মীমাংসা করতে করতে ঠিক কথার ঠিক জবাবটা দিয়ে ওঠা হয় না। ঘরে তিনটে গ্যাসের শিখা এবং এক-ঘর লোক থাকতে যে সট্ করে চুম্বকাকৃষ্ট লৌহখণ্ড-বৎ বিনা দ্বিধায় কোনো কিশোরীর পার্শ্ব-সংলগ্ন হয়ে অটল প্রতিষ্ঠা লাভ করা সে আমাদের মতো সংশয়াতুর ভীরু প্রাণীদের দ্বারা হওয়া অসম্ভব। ... ... আমাদের ছেলেগুলি কার্তিকের মতো চেহারা নিয়ে সসম্ভ্রমে নেপথ্যে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই কেবল লজ্জায় রাঙা টক্‌টকে হয়ে উঠছে— কনুই দিয়ে ভিড় ঠেলে যে বেশ একটি নরম জায়গা বেছে গরম হয়ে বসবে সে যোগ্যতা তাদের আর রইল না। এর চেয়ে ধিক্কারের বিষয় আর কী হতে পারে !

সোলাপুর
১৯ মার্চ ১৮৯৩

৯০

কলকাতা

৬ এপ্রিল। ১৮৯৩।

মো···র সঙ্গে আজকাল আমার মাঝে মাঝে নানা বিষয়ে কথাবার্তা হয়, আমার বড়ো ভালো লাগে। এই রকম আলোচনা করবার জন্যে আমার মন অনুক্ষণ তৃষিত হয়ে থাকে। এই হতভাগা জনশূন্য দেশে মনটা যেন নিশিদিন উপবাসী হয়ে আছে— কেবল ভিতর থেকে আপনাকে আপনি আহার করছে। কে বা জীবন ধারণ করে, কে বা ভাবে, কে বা কথা কয়— কেই বা প্রতিবাদ করে, কেই বা উৎসাহ দেয়, কেই বা তোমার কথা শোনে, কেই বা তোমার ভাব বোঝে— কেই বা অন্তরের মধ্যে তলিয়ে দেখতে চেষ্টা করে। কেউ বা আমোদ করছে, কেউ বা আলস্য করছে, কেউ বা আপিসে যাচ্ছে, মানুষের মন ব'লে যে একটি প্রাণী আছে সেটা যে শুকিয়ে শুকিয়ে আধমরা হয়ে যাচ্ছে তার জন্যে কারও কানাকড়ির মাথাব্যথা নেই। আমি আজ সকালে প্রি··· বাবুর ওখানে গিয়েছিলুম, অনেকটা যেন আহার পান করে আসা গেল।

বম্বে
৯ এপ্রিল ১৮৯৩

৯১

কলকাতা

১৬ এপ্রিল। ১৮৯৩।

তোদের ভ্রমণের গোলমালের মধ্যে হোটেলে বসে এটা পড়ে কিরকম লাগবে সন্দেহ আছে। কোথায় সেই পুরীর সমুদ্র আর কোথায় তোদের আগ্রার হোটেল! এই পৃথিবীর সঙ্গে, সমুদ্রের সঙ্গে, আমাদের যে-একটা বহুকালের গভীর আত্মীয়তা আছে, নির্জনে প্রকৃতির সঙ্গে মুখোমুখি করে অন্তরের মধ্যে অনুভব না করলে সে কি কিছুতেই বোঝানো যায়! পৃথিবীতে যখন মাটি ছিল না সমুদ্র একেবারে একলা ছিল, আমার আজকেকার এই চঞ্চল হৃদয় তখনকার সেই জনশূন্য জলরাশির মধ্যে অব্যক্তভাবে তরঙ্গিত হতে থাকত; সমুদ্রের দিকে চেয়ে তার একতান কলধ্বনি শুনলে তা যেন বোঝা যায়। আমার অন্তরসমুদ্রও আজ একলা বসে বসে সেইরকম তরঙ্গিত হচ্ছে, তার ভিতরে ভিতরে কী-একটা যেন সৃজিত হয়ে উঠছে — কত অনির্দিষ্ট আশা, অকারণ আশঙ্কা, কত রকমের সৃষ্টি, কত রকমের প্রলয়, কত স্বর্গ নরক, কত বিশ্বাস সন্দেহ, কত লোকাতীত প্রত্যক্ষাতীত প্রমাণাতীত অনুভব এবং অনুমান, সৌন্দর্যের অপার রহস্য, প্রেমের অতল অতৃপ্তি— মানবমনের জড়িত জটিল সহস্র রকমের অপূর্ব অপরিমেয় ব্যাপার। বৃহৎ সমুদ্রের তীরে কিম্বা মুক্ত আকাশের নীচে একলা না বসলে সেই আপনার অন্তরের গোপন মহারহস্য ঠিক অনুভব করা যায় না। কিন্তু তা নিয়ে আমার মাথা খুঁড়ে মরবার দরকার নেই— আমার যা মনে উদয় হয়েছে আমি তাই বলে খালাস— তার পরে সমুদ্র সমভাবে তরঙ্গিত হতে থাকুক আর মানুষ হাঁস্ ফাঁস্ করে ঘুরে ঘুরে বেড়াক।

আগ্রা

১৮ এপ্রিল ১৮৯৩

৯২

কলকাতা

৩০ এপ্রিল। ১৮৯৩।

কাল তাই রাত্তির দশটা পর্যন্ত ছাতে পড়ে থাকতে পেরেছিলুম। চতুর্দশীর চাঁদ উঠেছিল— চমৎকার হাওয়া দিচ্ছিল— ছাতে আর কেউ ছিল না। আমি একলা পড়ে পড়ে আমার সমস্ত জীবনের কথা ভাবছিলুম। এই তেতালার ছাত, এইরকম জ্যোৎস্না, এইরকম দক্ষিনের বাতাস জীবনের স্মৃতিতে কত রকমে মিশ্রিত হয়ে আছে। দক্ষিণের বাগানের শিমুগাছের পাতা ঝর্ ঝর্ শব্দ করছিল, আমি অর্ধেক চোখ বুজে আমার ছেলেবেলাকার মনের ভাবগুলিকে মনে আনবার চেষ্টা করছিলুম। পুরোনো স্মৃতিগুলো মদের মতো— যত বেশিদিন মনের মধ্যে সঞ্চিত হয়ে থাকে, ততই তার বর্ণ এবং স্বাদ এবং নেশা যেন মধুর হয়ে আসে। আমাদের এই স্মৃতির বোতলগুলি বুড়ো বয়সের জন্যে 'in deep-delved earth' ঠাণ্ডা করে রেখে দেওয়া যাচ্ছে— তখন বোধ হয় ছাতের উপর জ্যোৎস্না-রাতে এক-এক ফোঁটা করে আস্বাদ করতে বেশ লাগবে। অল্প বয়সে মানুষ কেবলমাত্র কল্পনা এবং স্মৃতিতে সন্তুষ্ট থাকে না; কেননা তখন তার রক্তের জোর, তার শরীরের তেজ, তাকে কিছু-একটা কাজে প্রবৃত্ত করতে চায়। কিন্তু বুড়ো বয়সে যখন স্বভাবতই আমরা কাজে অক্ষম, শরীরের যৌবনের অতিরিক্ত তেজ আমাদের কোনোরকম তাড়না করছে না, তখন স্মৃতি বোধ হয় আমাদের পক্ষে যথেষ্ট— তখন জ্যোৎস্নারাত্রের স্থির জলাশয়ের মতো আমাদের অচঞ্চল মনে পূর্বস্মৃতির ছায়া এমনি পরিষ্কার স্পষ্টভাবে পড়ে যে বর্তমান ব্যাপারের সঙ্গে তার প্রভেদ বোঝা শক্ত।

সিমলা

৩ মে ১৮৯৩

৯৩

শিলাইদহ

মঙ্গলবার। ২ মে ১৮৯৩।

এখন আমি বোটে। এই যেন আমার নিজের বাড়ি। এখানে আমিই একমাত্র কর্তা— এখানে আমার উপরে, আমার সময়ের উপরে, আর-কারও কোনো অধিকার নেই। এই বোটটি আমার পুরোনো ড্রেসিং গাউনের মতো— এর মধ্যে প্রবেশ করলে খুব একটি ঢিলে অবসরের মধ্যে প্রবেশ করা যায়— যেমন ইচ্ছা ভাবি, যেমন ইচ্ছা কল্পনা করি, যত খুশি পড়ি, যত খুশি লিখি, এবং যত খুশি নদীর দিকে চেয়ে টেবিলের উপর পা তুলে দিয়ে আপন-মনে এই আকাশপূর্ণ আলোকপূর্ণ আলস্যপূর্ণ দিনের মধ্যে নিমগ্ন হয়ে থাকি।...

এখন প্রথম দিনকতক আমার এই পূর্বপরিচিতের সঙ্গে পুনর্মিলনের নতুন বাধো-বাধো ভাবটা কাটাতেই যাবে। তার পরে নিয়মিত লিখতে পড়তে নদীর ধারে বেড়াতে বেড়াতে আমাদের পুরাতন সখ্য আবার বেশ সহজ হয়ে আসবে। বাস্তবিক, পদ্মাকে আমি বড়ো ভালোবাসি। ইন্দ্রের যেমন ঐরাবত আমার তেমনি পদ্মা— আমার যথার্থ বাহন— খুব বেশি পোষ-মানা নয়, কিছু বুনো-রকম— কিন্তু ওর পিঠে এবং কাঁধে হাত বুলিয়ে ওকে আমার আদর করতে ইচ্ছে করে। এখন পদ্মার জল অনেক কমে গেছে— বেশ স্বচ্ছ কৃশকায় হয়ে এসেছে— একটি পাণ্ডুবর্ণ ছিপ্‌ছিপে মেয়ের মতো, নরম শাড়িটি গায়ের সঙ্গে বেশ সংলগ্ন। সুন্দর ভঙ্গীতে চলে যাচ্ছে আর শাড়িটি বেশ গায়ের গতির সঙ্গে সঙ্গে বেঁকে যাচ্ছে। আমি যখন শিলাইদহে বোটে থাকি, তখন পদ্মা আমার পক্ষে সত্যিকার একটি স্বতন্ত্র মানুষের মতো। অতএব তার কথা যদি কিছু বাহুল্য করে লিখি তবে সে কথাগুলো চিঠিতে লেখবার অযোগ্য মনে করিস

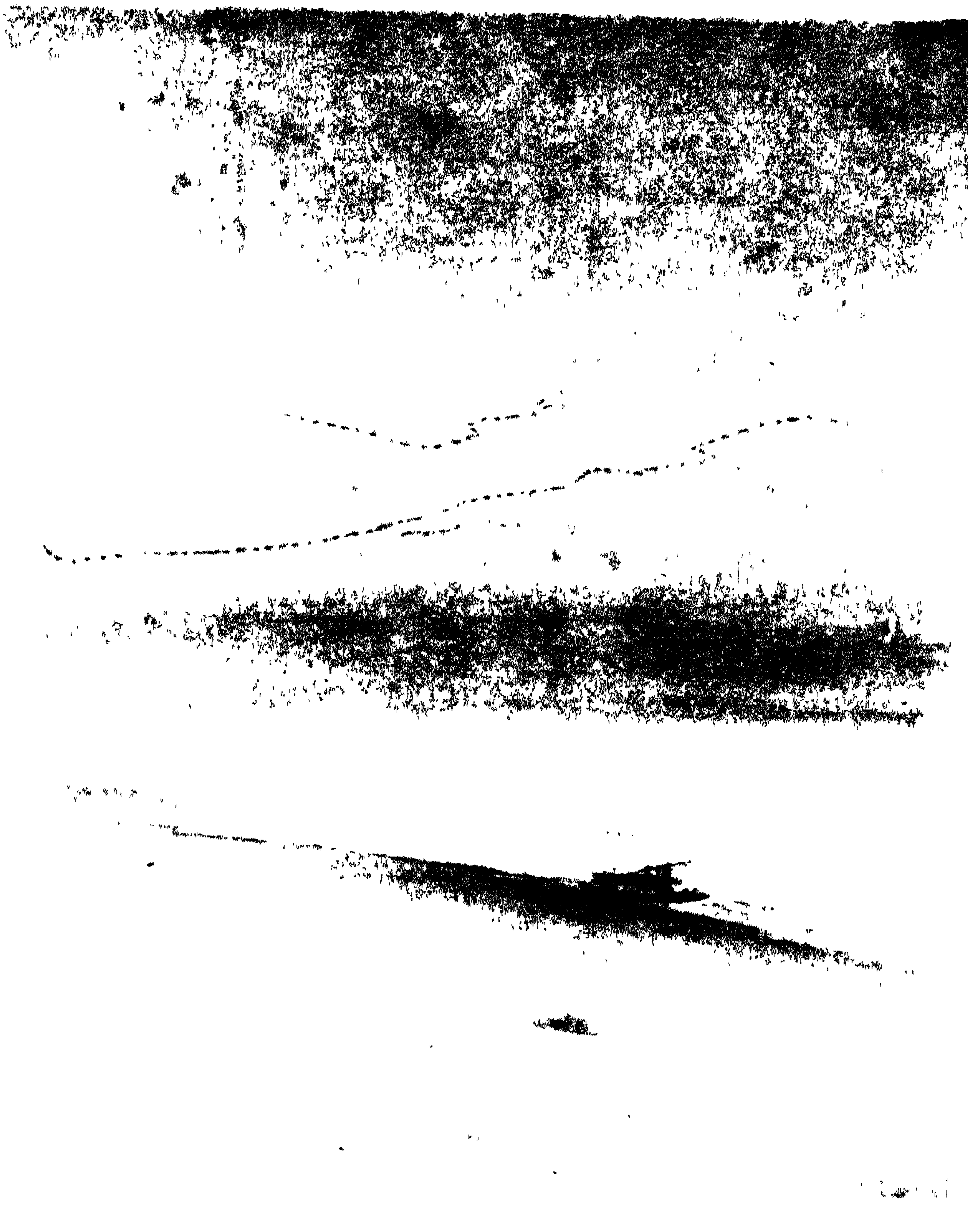

নে। সেগুলো হচ্ছে এখানকার পার্সোনাল খবরের মধ্যে।

এক দিনেই কলকাতার সঙ্গে ভাবের কত তফাত হয়ে যায়! কাল বিকেলে সেখানে ছাতে বসে ছিলুম সে এক-রকম, আর আজ এখানে দুপুর-বেলায় বোটে বসে আছি এ এক-রকম। কলকাতার পক্ষে যা সেন্টিমেণ্টাল, পোয়েটিকাল, এখানকার পক্ষে তা কতখানি সত্যিকার সত্যি! পাব্লিক-নামক গ্যাসালোক-জ্বালা স্টেজের উপর আর নাচতে ইচ্ছে করে না— এখানকার এই স্বচ্ছ দিবালোক এবং নিভৃত অবসরের মধ্যে গোপনে আপনার কাজ করে যেতে ইচ্ছে করে। নেপথ্যে এসে রঙচঙগুলো ধুয়ে মুছে না ফেললে মনের শ্রান্তি আর যায় না। সাধনা চালানো, সাধারণের উপকার করা এবং হাঁস্ ফাঁস্ করে মরাটা অনেকটা অনাবশ্যক বলে মনে হয়— তার ভিতরে অনেক জিনিষ থাকে যা খাঁটি সোনা নয়, যা খাদ— আর, এই প্রসারিত আকাশ আর সুবিস্তীর্ণ শান্তির মধ্যে যদি কারও প্রতি দৃক্‌পাত না করে আপনার গভীর আনন্দে আপনার কাজ করে যাই তা হলেই যথার্থ কাজ হয়।

সিমলা

৬ মে ১৮৯৩

৯৪

শিলাইদহ

৮ মে। ১৮৯৩।

কবিতা আমার বহুকালের প্রেয়সী। বোধ হয় যখন আমার রথীর মতো বয়স ছিল তখন থেকে আমার সঙ্গে বাক্‌দত্তা হয়েছিল— তখন থেকে আমাদের পুকুরের ধার, বটের তলা, বাড়ি-ভিতরের বাগান, বাড়ি-ভিতরের এক তলার অনাবিষ্কৃত ঘরগুলো, এবং সমস্ত বাইরের জগৎ এবং দাসীদের মুখের সমস্ত রূপকথা এবং ছড়াগুলো, আমার মনের মধ্যে ভারী একটা মায়াজগৎ তৈরি করছিল, তখনকার সেই আবছায়া অপূর্ব মনের ভাব প্রকাশ করা ভারী শক্ত— কিন্তু এই পর্যন্ত বেশ বলতে পারি কল্পনার সঙ্গে তখন থেকেই মালা-বদল হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু ও মেয়েটি পয়মন্ত নয় তা স্বীকার করতে হয়— আর যাই হোক, সৌভাগ্য নিয়ে আসেন না। সুখ দেন না বলতে পারি নে, কিন্তু স্বস্তির সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই। যাকে বরণ করেন তাকে নিবিড় আনন্দ দেন, কিন্তু এক-এক-সময় কঠিন আলিঙ্গনে হৃৎ-পিণ্ডটি নিংড়ে রক্ত বের করে নেন। যে লোককে তিনি নির্বাচন করেন, সংসারের মাঝখানে ভিত্তিস্থাপন করে গৃহস্থ হয়ে স্থির হয়ে আয়েস করে বসা সে লক্ষ্মীছাড়ার পক্ষে একেবারে অসম্ভব। কিন্তু আমার আসল জীবনটি তার কাছেই বন্ধক আছে। সাধনাই লিখি আর জমিদারিই দেখি, যেমনি কবিতা লিখতে আরম্ভ করি অমনি আমার চিরকালের যথার্থ আপনার মধ্যে প্রবেশ করি— আমি বেশ বুঝতে পারি এই আমার স্থান। জীবনে জ্ঞাত এবং অজ্ঞাতসারে অনেক মিথ্যাচরণ করা যায়, কিন্তু কবিতায় কখনও মিথ্যা কথা বলি নে— সেই আমার জীবনের সমস্ত গভীর সত্যের একমাত্র আশ্রয়-স্থান।...

রবিবর্মার ছবি দেখতে দেখতে সমস্ত সকালবেলাটা গেল। আমার

সত্যি বেশ লাগে। হাজারই হোক, আমাদের দিশি বিষয় এবং দিশি মূর্তি ও ভাব আমাদের কাছে যে কতখানি, এই ছবিগুলি দেখলে তা বেশ বোঝা যায়। অনেকগুলো ছবির হাত পা, দেহের পরিমাণ, খুব অসমান আছে, কিন্তু মোটের উপর সবসুদ্ধ জড়িয়ে খুব মনের ভিতরে প্রবেশ করে। তার প্রধান কারণ, আমাদের মনটা চিত্রকরের সহযোগিতা করতে থাকে। সে কী বলতে চাচ্ছে আমরা আগে থাকতে বুঝে নিই--- তার চেষ্টাটুকু দেখলেই বাকিটুকু পূরণ করে নিতে পারি। এর ভিতর থেকে খুঁত বের করা খুব সহজ, তার জন্যে বেশি ক্ষমতার দরকার করে না, কিন্তু যখন ভেবে দেখা যায় কোনো বিষয়ে একটা স্পষ্ট কল্পনা করা কতই শক্ত— মনে আমাদের যে ছবিটা উদয় হয় তা প্রায়ই আধা-আধি, মোটামুটি গোঁজামিলন-দেওয়া— কিন্তু ছবি আঁকতে গেলে একটি সামান্যতম রেখা পর্যন্ত ছাড়বার জো নেই, প্রধান অপ্রধান সমস্তই একেবারে যথাযথ করে ভেবে নিতে হবে, কল্পনার মতো অমন একটা নিয়তপরিবর্তমান জিনিষকে প্রত্যক্ষের কঠিন ছাঁচে ঢেলে দিতে হবে— সে কি সামান্য ব্যাপার!

সিমলা

১২ মে ১৮৯৩

শিলাইদহ
১০ মে। ১৮৯৩।

ইতিমধ্যে দেখছি খুব ফুলো ফুলো বড়ো বড়ো কতকগুলো মেঘ চতুর্দিক থেকে জমে এসেছে— আমার এই চারি দিকের দৃশ্যপট থেকে কাঁচা সোনালি রোদ্‌দুরটুকু যেন মোটা মোটা ব্লটিং প্যাড দিয়ে একেবারে চুপসে তুলে নিয়েছে। আবার যদি বৃষ্টি আরম্ভ হয় তা হলে ধিক্‌ ইন্দ্রদেবকে! মেঘগুলোর তেমন ফাঁকা দরিদ্র চেহারা দেখছি নে, ··· ·· বাবুদের মতো দিব্যি সজলশ্যামল টেবো-টোবো নধরনন্দন ভাব। এখনি বৃষ্টি আরম্ভ হল ব'লে— হাওয়াটাও সেই রকম কাঁদো-কাঁদো ভিজে-ভিজে ঠেকছে। এখানে এই মেঘরৌদ্রের যাওয়া-আসা ব্যাপারটা যে কতটা গুরুতর, আকাশের দিকে যে কত লোক হাঁ করে তাকিয়ে আছে, তোদের সেই অভ্রভেদী পর্বতশৃঙ্গে বসে তোরা তা ঠিকটি কল্পনা করতে পারবি নে। আমার এই দরিদ্র চাষী প্রজা-গুলোকে দেখলে আমার ভারী মায়া করে— এরা যেন বিধাতার শিশুসন্তানের মতো— নিরুপায়— তিনি এদের মুখে নিজের হাতে কিছু তুলে না দিলে এদের আর গতি নেই। পৃথিবীর স্তন যখন শুকিয়ে যায় তখন এরা কেবল কাঁদতে জানে; কোনোমতে একটুখানি খিদে ভাঙলেই আবার তখনি সমস্ত ভুলে যায়। সোসিয়ালিস্ট্‌রা যে সমস্ত পৃথিবীময় ধন বিভাগ করে দেয় সেটা সম্ভব কি অসম্ভব ঠিক জানি নে— যদি একেবারেই অসম্ভব হয় তা হলে বিধির বিধান বড়ো নিষ্ঠুর, মানুষ ভারী হতভাগ্য! কেননা, পৃথিবীতে যদি দুঃখ থাকে তো থাক্‌, কিন্তু তার মধ্যে এতটুকু একটু ছিদ্র একটু সম্ভাবনা রেখে দেওয়া উচিত যাতে সেই দুঃখমোচনের জন্যে মানুষের উন্নত অংশ অবিশ্রাম চেষ্টা করতে পারে, একটা আশা পোষণ করতে পারে। যারা বলে, কোনো কালে পৃথিবীর সকল মানুষকে জীবনধারণের

কতকগুলি মূল আবশ্যকীয় জিনিষও বণ্টন করে দেওয়া নিতান্ত অসম্ভব অমূলক কল্পনা মাত্র, কখনোই সকল মানুষ খেতে পরতে পাবে না, পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষ চিরকালই অর্ধাশনে কাটাবেই, এর কোনো পথ নেই— তারা ভারী কঠিন কথা বলে। কিন্তু এ-সমস্ত সামাজিক সমস্যা এমন কঠিন! বিধাতা আমাদের এমনি একটি ক্ষুদ্র জীর্ণ দীন বস্ত্রখণ্ড দিয়েছেন, পৃথিবীর এক দিক ঢাকতে গিয়ে আর-এক দিক বেরিয়ে পড়ে— দারিদ্র্য দূর করতে গেলে ধন চলে যায় এবং ধন গেলে সমাজের কত-যে শ্রী সৌন্দর্য উন্নতির কারণ চলে যায় তার আর সীমা নেই।

কিন্তু আবার এক-একবার রোদ্দুর উঠছে, পশ্চিমে মেঘও যথেষ্ট জমে আছে। পশ্চিমে মেঘ হলে বৃষ্টি হবেই এই তো প্রবাদে কয়।

সিমলা

১৪ মে ১৮৯৩

শিলাইদহ
১১ মে। ১৮৯৩।

কাল বিকেলের দিকে খুব ঘনঘটা করে মেঘ করে খানিকটা বৃষ্টি হয়ে আবার পরিষ্কার হয়ে গেছে। আজ খানকত দলভ্রষ্ট বিচ্ছিন্ন মেঘ সূর্যালোকে শুভ্র হয়ে খুব নিরীহ নিরপরাধী ভাবে আকাশের ধারে ধারে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে, দেখে তো মনে হয় এদের বর্ষণের অভিপ্রায় কিছুমাত্র নেই— কিন্তু চাণক্য তাঁর সুবিখ্যাত শ্লোকে যাদের যাদের বিশ্বাস করতে নিষেধ করেছেন তার মধ্যে দেব্‌তাকেও ধরা উচিত ছিল। কিন্তু আজ সকাল বেলাটি বড়ো সুন্দর হয়ে উঠেছে— আকাশ পরিষ্কার নীল, নদীর জলে রেখামাত্র নেই এবং ডাঙার কাছে গড়ানে জায়গায় যে ঘাসগুলি হয়েছে তাতে পূর্বদিনকার বৃষ্টির কণাগুলি লেগে আছে, সেগুলি ঝক্ ঝক্ করছে। এই-সমস্ত মিলে সূর্যালোকে আজকের প্রকৃতিকে ভারী একটি শুভ্রবসনা মহিমাময়ী মহেশ্বরীর মতো দেখাচ্ছে। সকাল বেলাটি এমনি নিস্তব্ধ হয়ে রয়েছে— কেন জানি নে নদীতে একটি নৌকো নেই, বোটের নিকটবর্তী ঘাটে কেউ জল নিতে স্নান করতে আসে নি; নায়েব সকাল-সকাল কাজ সেরে চলে গেছে— খানিকটা চুপ করে কান পেতে থাকলে কী-একটা ঝাঁ ঝাঁ শব্দ শোনা যায় এবং এই রৌদ্রালোক আর আকাশ আস্তে আস্তে প্রবেশ করে মাথার ভিতরটি একেবারে ভরে ওঠে, এবং সেখানকার সমুদয় ভাব এবং চিন্তাগুলিকে একটি নীল এবং সোনালি রঙে রাঙিয়ে দেয়। বোটের এক পাশে একটা বাঁকা কৌচ আনিয়ে রেখেছি; এই রকম সকাল বেলায় তার মধ্যে শরীরটা ছড়িয়ে দিয়ে সমস্ত কাজ ফেলে চুপচাপ করে পড়ে থাকতে ইচ্ছে করে; মনে হয়—

'নাই মোর পূর্বপর,
যেন আমি একদিনে উঠেছি ফুটিয়া
অরণ্যের পিতৃমাতৃহীন ফুল।'

যেন আমি এই আকাশের, এই নদীর, এই পুরাতন শ্যামল পৃথিবীর। বোটে আমার এই রকম করে কাটে। প'ড়ে প'ড়ে পরিচিত প্রকৃতির কত রকমের যে ভাবের পরিবর্তন দেখি তার ঠিক নেই। এখানে আমার আর-একটি সুখ আছে। এক-এক সময় এক-একটি সরল ভক্ত বৃদ্ধ প্রজা আসে, তাদের ভক্তি এমনি অকৃত্রিম, তারা সত্যি সত্যি আমাদের এত ভালোবাসে যে আমার চোখ ছল ছল করে আসে। এই মাত্র কালীগ্রাম থেকে একটি বুড়ো প্রজা তার ছেলেকে সঙ্গে করে আমার কাছে এসেছিল— সে যেন তার সমস্ত সরল আর্দ্র হৃদয়খানি দিয়ে আমার পা-দুটো মুছিয়ে দিয়ে গেল। ভাগবতে কৃষ্ণ বলেছেন 'আমার চেয়ে আমার ভক্ত বড়ো', সে কথার মানে খানিকটা বোঝা যায়। বাস্তবিক এর সুন্দর সরলতা এবং আন্তরিক ভক্তিতে এ লোকটি আমার চেয়ে কত বড়ো! আমিই যেন এ ভক্তির অযোগ্য, কিন্তু এ ভক্তিটি তো বড়ো সামান্য জিনিষ নয়। এদের চাষার ভাষা, এদের স্নেহের সম্বোধন এমন মিষ্টি লাগে! ছোটো ছেলেদের উপর যেরকম ভালোবাসা এই বৃদ্ধ ছেলেদের উপর অনেকটা সেইরকম— কিন্তু কিছু প্রভেদ আছে। এরা তাদের চেয়েও ছোটো! কেননা তারা বড়ো হবে, এরা আর কোনো কালেও বড়ো হবে না— এদের এই জীর্ণ শীর্ণ কুঞ্চিত বলিত বৃদ্ধ দেহখানির মধ্যে কী-একটি শুভ্র সরল কোমল মন রয়েছে! শিশুদের মনে কেবল সরলতা আছে মাত্র, কিন্তু এমন স্থিরবিশ্বাসপূর্ণ একাগ্র নিষ্ঠা নেই। আমি কি এই বৃদ্ধটির রাজা হবার যোগ্য! মানুষে মানুষে যদি সত্যি একটা আধ্যাত্মিক যোগ থাকে তা হলে আমার এই অন্তরের মঙ্গল-

ইচ্ছা ওর হয়তো কিছু কাজে লাগতে পারে— তা ছাড়া জমিদার হয়ে যা করতে পারি তা তো করবই। কিন্তু সব প্রজা এরকম নয়, সেরকম প্রত্যাশা করাও যায় না। সব চেয়ে যা ভালো সব চেয়ে তা দুর্লভ— কিন্তু বিধাতার পৃথিবীতে সেরকমটি হওয়া উচিত ছিল না।

সিমলা
১৫ মে ১৮৯৩

শিলাইদহ

শনিবার। ১৩ মে ১৮৯৩।

আজ তোর কাছ থেকে টেলিগ্রাম পেলুম যে: **Missing gown lying Post Office**। এর দুটো অর্থ হতে পারে। এক অর্থ হচ্ছে হারা গাত্রবস্ত্র ডাকঘরে শুয়ে আছেন। আর-এক অর্থ হচ্ছে —গাউনটা মিসিং এবং পোষ্ট অফিসটা লাইং। দুই অর্থই সম্ভব হতে পারে, কিন্তু যেপর্যন্ত প্রতিবাদ [না] শুনি সেপর্যন্ত প্রথম অর্থটাই গ্রহণ করা গেল। কিন্তু মজা হচ্ছে এই— সঙ্গে সঙ্গে যে চিঠিখানি এসেছে তাতে পরিষ্কার করে বলা আছে একটা গাউন যে পাওয়া যায় নি তাতে আর কোনো সন্দেহ নেই।···

বেচারা চিঠি! তার জিম্মায় যে-ক'টি কথা লেফাফায় পূরে দেওয়া হয়েছে সেই ক'টি কথা কাঁধে করে নিয়ে দীর্ঘ পথ ঢিকোতে ঢিকোতে চলে আসছে— ইতিমধ্যে যে পৃথিবীতে কত-কী হয়ে যাচ্ছে তা সে জানে না, এবং তার ছোটো ভাই যে এক লম্ফে তাকে ডিঙিয়ে তার সমস্ত কথার একটিমাত্র সংক্ষেপ রূঢ় প্রতিবাদ নিয়ে এসে হাজির হল তারও সে জবাব দিতে পারে না ; সে ভালোমানুষের মতো বলে, 'আমি কিছু জানি নে বাপু, আমাকে সে যা বলে দিয়েছে আমি তাই বয়ে এনেছি।' বাস্তবিক এনেছে বটে। একটি কথার এদিক ওদিক হয় নি— সমস্ত পথটি মাড়িয়ে, দীর্ঘ পথের কত চিহ্ন আষ্টেপৃষ্ঠে কত ছাপ নিয়েই বেচারা ঠিক সময়ে এসে উপস্থিত হয়েছে। তা হোক তার খবর ভুল, আমি তাকে ভালোবাসি। আর তারে চ'ড়ে চক্ষের পলকে টেলিগ্রাফ এলেন— কোথাও পথ-শ্রমের কোনো চিহ্ন নেই, লেফাফাখানি একেবারে রাঙা টক্‌টক্ করছে— হড়্‌বড়্ তড়্‌বড়্ করে যে-দুটো কথা বললেন তার ভিতর থেকে আটটা-দশটা কথা পড়ে গেছে— তার মধ্যে ব্যাকরণ নেই,

ভদ্রতা নেই, কিছু নেই— একটা সম্বোধন নেই, একটা বিদায়ের শিষ্টতাও নেই, আমার প্রতি যেন তার কিছুমাত্র বন্ধুতার ভাব নেই, কেবল কোনোমতে তাড়াতাড়ি কথাটা যেমন-তেমন করে বলে ফেলে দায় কাটিয়ে চলে যেতে পারলে বাঁচে। যাই হোক, গাউনটা যে পোস্ট্-অফিসে এতকাল শীতযাপন করছেন এটা যদিচ বিস্তর বিলম্বে শোনা গেল তবু টেলিগ্রাফ না থাকলে আরও বিলম্বে শুনতে হত, অতএব তাকে ধন্যবাদ।

সিমলা
১৭ মে ১৮৯৩

শিলাইদহ

১৬ মে। ১৮৯৩।

আমি বিকেলে, বেলা সাড়ে ছ'টার পর, স্নান করে ঠাণ্ডা এবং পরিষ্কার হয়ে চরের উপর নদীর ধারে ঘণ্টাখানেক বেড়াই, তার পর আমাদের নতুন জলিবোটটাকে নদীর মধ্যে টেনে নিয়ে গিয়ে তার উপরে বিছানাটি পেতে ঠাণ্ডা হাওয়ায় সন্ধ্যার অন্ধকারে চিৎ হয়ে চুপচাপ পড়ে থাকি। শৈ··· [আমার] কাছে বসে নানা কথা বকে যায়। চোখের উপরে আকাশ তারায় একেবারে খচিত হয়ে যায়— আমি প্রায় রোজই মনে করি, এই তারাময় আকাশের নীচে আবার কি কখনও জন্মগ্রহণ করব? যদি করি, আর কি কখনও এমন প্রশান্ত সন্ধ্যাবেলায় এই নিস্তব্ধ গোরাই নদীটির উপর বাংলাদেশের এই সুন্দর একটি কোণে এমন নিশ্চিন্ত মুগ্ধ মনে জলিবোটের উপর বিছানা পেতে পড়ে থাকতে পাব? হয়তো আর-কোনো জন্মে এমন একটি সন্ধেবেলা আর-কখনও ফিরে পাব না। তখন কোথায় দৃশ্যপরিবর্তন হবে— আর, কিরকম মন নিয়েই বা জন্মাব! এমন সন্ধ্যা হয়তো অনেক পেতেও পারি, কিন্তু সে সন্ধ্যা এমন নিস্তব্ধভাবে তার সমস্ত কেশপাশ ছড়িয়ে দিয়ে আমার বুকের উপরে এত সুগভীর ভালো-বাসার সঙ্গে পড়ে থাকবে না। আমি কি ঠিক এমনি মানুষটি তখন থাকব! আশ্চর্য এই আমার সবচেয়ে ভয় হয় পাছে আমি য়ুরোপে গিয়ে জন্মগ্রহণ করি। কেননা সেখানে সমস্ত চিত্তটিকে এমন উপরের দিকে উদ্ঘাটিত রেখে পড়ে থাকবার জো নেই এবং পড়ে থাকাও সকলে ভারী দোষের বিবেচনা করে। হয়তো একটা কারখানায় নয়তো ব্যাঙ্কে নয়তো পার্ল্যামেণ্টে সমস্ত দেহ মন প্রাণ দিয়ে খাটতে হবে— শহরের রাস্তা যেমন ব্যাবসা-বাণিজ্য গাড়িঘোড়া চলবার জন্যে ইঁটে-বাঁধানো কঠিন, তেমনি মনটা স্বভাবটা বিজ্‌নেস্ চালাবার

উপযোগী পাকা করে বাঁধানো— তাতে একটি কোমল তৃণ একটি অনাবশ্যক লতা গজাবার ছিদ্রটুকু নেই। ভারী ছাঁটাছোঁটা গড়াপেটা আইনে-বাঁধা মজবুত রকমের ভাব। কী জানি, তার চেয়ে আমার এই কল্পনাপ্রিয় অকর্মণ্য আত্মনিমগ্ন বিস্তৃত-আকাশ-পূর্ণ মনের ভাবটি কিছুমাত্র অগৌরবের বিষয় বলে মনে হয় না। জলিবোটে পড়ে পড়ে জগতের সেই কাজের লোকের কাছে আপনাকে কিছুমাত্র খাটো মনে হয় না। বরঞ্চ আমিও যদি কোমর বেঁধে কাজে লাগতুম তা হলে হয়তো সেই-সমস্ত বড়ো-বড়ো-ওক-গাছ-কাটা জোয়ান লোকদের কাছে আপনাকে ভারী যৎসামান্য মনে হত। কিন্তু তাই বলে কি সত্যিই এই জলিবোট-শায়ী বিমুগ্ধ যুবক রামমোহন রায়ের চেয়ে বড়লোক ?

সিমলা
২০ মে ১৮৯৩

৯৯

কলকাতা
২১ জুন। ১৮৯৩।

এবারকার ডায়ারিটা তো ঠিক প্রকৃতির স্তব নয়— মন-নামক একটা সৃষ্টিছাড়া চঞ্চল পদার্থ কোনো গতিকে আমাদের শরীরের মধ্যে প্রবেশ করাতে যে কিরকম একটা উৎপাত হয়েছে তৎসম্বন্ধে আলোচনা করা গেছে। আসলে, আমরা খাব, পরব, বেঁচে থাকব, এই রকম কথা ছিল— আমরা যে বিশ্বের আদিকারণ অনুসন্ধান করি, ইচ্ছে-পূর্বক খুব শক্ত একটা ছন্দ বানিয়ে তারই মধ্যে খুব শক্ত একটা ভাব ব্যক্ত করবার প্রয়াস করি, আবার তার মধ্যে পদে পদে মিল থাকা চাই, আপাদমস্তক ঋণে নিমগ্ন হয়েও মাসে মাসে ঘরের কড়ি খরচ করে সাধনা বের করি, এর কী আবশ্যক ছিল— ও দিকে নারায়ণ সিং দেখো ঘি দিয়ে আটা দিয়ে বেশ মোটা মোটা রুটি বানিয়ে তার সঙ্গে দধি সংযোগ করে আনন্দমনে ভোজন-পূর্বক দু-এক ছিলিম তামাক টেনে দুপুর বেলাটা কেমন স্বচ্ছন্দে নিদ্রা দিচ্ছে এবং সকালে বিকালে লো[কেনে]র সামান্য দু-চারটে কাজ ক'রে রাত্রে অকাতরে বিশ্রাম লাভ করছে; জীবনটা যে ব্যর্থ হল, বিফল হল, এমন কখনো তার স্বপ্নেও মনে হয় না— পৃথিবীর যে যথেষ্ট দ্রুতবেগে উন্নতি হচ্ছে না সেজন্যে সে নিজেকে কখনও দায়িক করে না। জীবনের সফলতা কথাটার কোনো মানে নেই— প্রকৃতির একমাত্র আদেশ হচ্ছে 'বেঁচে থাকো'। নারায়ণ সিং সেই আদেশটির প্রতি লক্ষ রেখেই নিশ্চিন্ত আছে— আর, যে হতভাগার বক্ষের মধ্যে মন-নামক একটা প্রাণী গর্ত খুঁড়ে বাসা করেছে তার আর বিশ্রাম নেই, কর্তব্যের শেষ নেই, মনের সন্তোষ নেই; তার পক্ষে কিছুই যথেষ্ট নয়, তার চতুর্দিক্‌বর্তী অবস্থার সঙ্গে সমস্ত সামঞ্জস্য নষ্ট হয়ে গেছে; সে যখন জলে থাকে তখন স্থলের জন্যে লালায়িত হয়, যখন স্থলে থাকে তখন

জলে সাঁতার দেবার জন্যে তার 'অসীম আকাঙ্ক্ষা'র উদ্রেক হয়। এই দুরন্ত অসন্তুষ্ট মনটাকে প্রকৃতির অগাধ প্রশান্তির মধ্যে বিসর্জন করে একটুখানি স্থির হয়ে বসতে পারলে বাঁচা যায়—কথাটা হচ্ছে এই।

সিমলা

২৪ জুন ১৮৯৩

১০০

কলকাতা

২২ জুন। ১৮৯৩।

তুই আমাকে সেদিনকার চিঠিতে খোঁটা দিয়েছিস, বিয়ে প্রভৃতি বিষয় আমরা কিছু বেশি থিওরেটিক্যালি দেখি— তোর সে কথাটা আমি ইতিমধ্যে অনেকবার ভেবে দেখেছি, এবং সবিশেষ পর্যালোচনা করে তার সত্যতা সম্বন্ধে আমার মনে আর কোনো সন্দেহ নেই। বাস্তবিক, আমার মতো লোক পৃথিবীর অধিকাংশ জিনিষ কিছু দূর থেকে দেখে— স্বভাবত প্রত্যেক বিষয়টাই চিন্তা করে দেখতে চায়। মন জিনিষটা বুল্‌স্‌-আই লণ্ঠনের মতো। যে সময়ে যে পদার্থের উপর চিন্তার আলোক নিক্ষেপ করে তার পাশের জিনিষটাকে দেখতে পায় না— এমন-কি সেটাকে আরও দ্বিগুণ অন্ধকার করে দিয়ে কেবল একটি জিনিষকেই অতিরিক্ত জাজ্বল্যমান করে তোলে। এরকম করে দেখার বিস্তর দোষ। আশপাশের সঙ্গে বেশ মিলিয়ে-জুলিয়ে দেখলে সব জিনিষই চোখে এবং মনে এক রকম সহ্য বোধ হয়— বৃহৎ সংসারের একটি অংশকে সমস্ত বৃহৎ সংসারের সঙ্গে যোগ করে দেখলে তাকে আর তেমন গুরুতর বলে বোধ হয় না। স্ব···র বিয়ের সম্বন্ধে আমি যে-সব ফিলজফাইজ করেছিলুম সেটা কোনো কাজেরই না। সুখ দুঃখ সকল অবস্থাতেই আছে, কোনোটা একেবারে অতিরিক্ত পরিমাণে নেই— মোটের উপরে দুটি নরনারী পরস্পরের জীবনে গ্রন্থি বদ্ধ করে মিলে-মিশে সুখে-স্বচ্ছন্দে থাকবারই কথা— পৃথিবীটা পৃথিবীর চেয়ে বেশি নয়, এই মনে রেখে সমস্ত মিলিয়ে দেখলে হিসেবে কিছু কমি দেখা যায় না। এই দেখ্‌-না স্ব··রা বেশ আনন্দেই আছে— অবশ্য এ উচ্ছ্বাস কিছুদিন বাদে কমে আসবে, তখন অভ্যাসবন্ধনে স্নেহবন্ধনে বদ্ধ হয়ে জীবনটি বিস্তৃত ব্যাপ্ত হয়ে ধীরে ধীরে প্রবাহিত হতে থাকবে। আমাদের মতো

লক্ষ্মীছাড়া 'চিন্তাশীল' লোকেরা এইটে ঠিকটি বুঝতে পারে না। আমরা নিজের সম্বন্ধেও কেবল চিন্তা ক'রে কল্পনা ক'রে নিজেকে ব্যর্থ বিফল ক'রে ফেলেছি— প্রত্যেক খণ্ড অবস্থাই আমাদের কাছে বড়ো বেশি প্রাধান্য ধারণ করে। সুখ অত্যন্ত অধিক সুখ হয় এবং দুঃখ একান্ত তীব্র হয়ে ওঠে, কিন্তু জীবনের যে প্রধান সুখ প্রধান শান্তি আপনার আদ্যোপান্তের মধ্যে একটি সামঞ্জস্য একটি ঐক্য সেটি নেই — তাই জন্যে অবিশ্রাম এই খণ্ড খণ্ড বিচ্ছিন্ন সুখদুঃখের উপর দিয়ে চলতে চলতে জীবন একেবারে পরিশ্রান্ত হয়ে পড়ে— মনে হয় সুখ দুঃখ আর কিছুই চাই নে, এখন দীর্ঘকালের জন্যে যদি প্রশান্ত নিশ্চেষ্টভাবে এই উদার উন্মুক্ত সুন্দর শান্ত প্রকৃতির উপরে প'ড়ে প'ড়ে রোদ পোহাতে পারি তা হলে বাঁচা যায়। কিন্তু যারা মন-পদার্থের দ্বারা অতিমাত্র উৎপীড়িত নয়, পৃথিবীতে কোনো অবস্থাতেই তাদের বিশেষ আশঙ্কা নেই— তারা সুখী হবেই, সুখী করবেই, এবং জীবনের সমস্ত কর্তব্য সম্পন্ন করা তাদের পক্ষে অত্যন্ত সহজ। আমার এই জীর্ণ হৃদয়ের রুগ্ন চিন্তাগুলো প্রকাশ করে সংসারটা তোদের কাছে অমূলক-বিভীষিকা-পরিপূর্ণ করে তোলা ভয়ানক অন্যায়। তোদের জন্যে পৃথিবীতে অনেক সুখ, জীবনে অনেক নব নব দৃশ্য এবং নব নব পরিবর্তন আছে— সে-সমস্ত তোরা আনন্দমনে পূর্ণহৃদয়ে ভোগ করতে পারবি।

শিমলা
২৫ জুন ১৮৯৩

১০১

শিলাইদহ

রবিবার। ২ জুলাই ১৮৯৩।

কোনো জিনিষ যথার্থ উপভোগ করতে গেলে তার চতুর্দিকে অবসরের বেড়া দিয়ে ঘিরে নিতে হয়— তাকে বেশ অনেকখানি মেলিয়ে দিয়ে, ছড়িয়ে দিয়ে, চতুর্দিকে বিছিয়ে দিয়ে, তবে তাকে ষোলো-আনা আয়ত্ত করা যায়। মফস্বলে একলা থাকবার সময় যে চিঠিপত্র এত ভালো লাগে তার একটা প্রধান কারণ হচ্ছে— চিঠির প্রত্যেক অক্ষরটি পর্যন্ত একটি একটি ফোঁটার মতো করে নিঃশেষপূর্বক গ্রহণ করবার অবসর পাওয়া যায়, মনের কল্পনা ওর প্রত্যেক কথায় কথায় ইনিয়ে-বিনিয়ে লতিয়ে-লতিয়ে জড়িয়ে-জড়িয়ে ওঠে-- বেশ অনেক ক্ষণ ধরে কল্পনার একটা গতি অনুভব করা যায়। অতি লোভে তাড়াতাড়ি করতে গিয়ে সেই সুখ থেকে বঞ্চিত হতে হয়। সুখের ইচ্ছেটা এমনি তাড়াতাড়ি এগিয়ে এগিয়ে চলে যে, অনেক সময়ে সুখটাকেই ডিঙিয়ে চলে যায় এবং চক্ষের পলকে সমস্ত ফুরিয়ে ফেলে। এই রকম জমি-জমা আমলা-মামলার মধ্যে কোনো চিঠিকেই যথেষ্ট মনে হয় না— মনে হয় যেন ক্ষুধার যোগ্য অন্ন পাওয়া গেল না। কিন্তু যত বয়স হচ্ছে তত এইটে দেখছি পাওয়াটা নিজের ক্ষমতার উপর নির্ভর করে। অন্যে কতটা দিতে পারে তা নিয়ে নালিশ-ফরিয়াদি করা ভুল, আমি কতটা নিতে পারি এইটেই হচ্ছে আসল কথা। যা হাতের কাছে আসে তাকেই পুরোপুরি হস্তগত করে নেওয়া, অনেক শিক্ষা সাধনা এবং সংযমের দ্বারা হয়। সে শিক্ষা লাভ করতে জীবনের প্রায় বারো আনা কাল চলে যায়, তার পরে সে শিক্ষার ফলভোগ করবার আর বড়ো সময় পাওয়া যায় না। ইতি সুখতত্ত্ব শাস্ত্রের প্রথম অধ্যায়।

সিমলা
৬ জুলাই ১৮৯৩

১০২

শিলাইদহ

সোমবার। ৩ জুলাই ১৮৯৩।

কাল সমস্ত রাত তীব্র বাতাস পথের কুকুরের মতো হুহু করে কেঁদেছিল —আর, বৃষ্টিও অবিশ্রাম চলছে। মাঠের জল ছোটো ছোটো নির্ঝরের মতো নানা দিক থেকে কল্ কল্ করে নদীতে এসে পড়ছে। চাষারা ওপারের চর থেকে ধান কেটে আনবার জন্যে কেউ বা টোগা মাথায় কেউ বা একখানা কচুপাতা মাথার উপর ধ'রে ভিজতে ভিজতে খেয়া নৌকোয় পার হচ্ছে— বড়ো বড়ো বোঝাই নৌকোর মাথার উপর মাঝি হাল ধরে বসে বসে ভিজছে, আর মাল্লারা গুণ কাঁধে করে ডাঙার উপর ভিজতে ভিজতে চলেছে। এমন দুর্যোগ তবু পৃথিবীর কাজকর্ম বন্ধ থাকবার জো নেই ; পাখিরা বিমর্ষ মনে তাদের নীড়ের মধ্যে বসে আছে, কিন্তু মানুষের ছেলেরা ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছে। আমার বোটের সামনে দুটি রাখাল-বালক এক পাল গোরু নিয়ে এসে চরাচ্ছে ; গোরুগুলি কচর্-মচর্ শব্দ করে এই বর্ষাসতেজ সরস শ্যামল সিক্ত ঘাসগুলির মধ্যে মুখ ভরে দিয়ে ল্যাজ নেড়ে পিঠের মাছি তাড়াতে তাড়াতে স্নিগ্ধ শান্ত নেত্রে আহার করে করে বেড়াচ্ছে — তাদের পিঠের উপর বৃষ্টি এবং রাখাল-বালকের যষ্টি অবিশ্রাম পড়ছে, দুইই তাদের পক্ষে সমান অকারণ অন্যায় এবং অনাবশ্যক, এবং দু'ই তারা সহিষ্ণুভাবে বিনা-সমালোচনায় সয়ে যাচ্ছে এবং কচর্-মচর্ করে ঘাস খাচ্ছে। এই গোরুগুলির চোখের দৃষ্টি কেমন বিষণ্ণ শান্ত সুগম্ভীর স্নেহময়— মাঝের থেকে মানুষের কর্মের বোঝা এই বড়ো বড়ো জন্তুগুলোর ঘাড়ের উপর কেন পড়ল ? নদীর জল প্রতিদিনই বেড়ে উঠছে। পরশু দিন বোটের ছাতের উপর থেকে যতখানি দেখা যেত, আজ বোটের জানলায় বসে প্রায় ততটা দেখা যাচ্ছে— প্রতিদিন সকালে উঠে দেখি তটদৃশ্য অল্প অল্প করে প্রসারিত

হয়ে যাচ্ছে। এতদিন সামনে ঐ দূর গ্রামের গাছপালার মাথাটা সবুজ পল্লবের মেঘের মতো দেখা যেত, আজ সমস্ত বনটা আগাগোড়া আমার সম্মুখে এসে উপস্থিত হয়েছে— ডাঙা এবং জল দুই লাজুক প্রণয়ীর মতো অল্প অল্প করে পরস্পরের কাছে অগ্রসর হচ্ছে— লজ্জার সীমা উপছে এল ব'লে, প্রায় গলাগলি হয়ে এসেছে। এই ভরা বাদরে ভরা নদীর মধ্য দিয়ে নৌকো করে যেতে বেশ লাগবে— বাঁধা বোট ছেড়ে দেবার জন্যে মনটা অধীর হয়ে আছে।

সিমলা

৭ জুলাই ১৮৯৩

১০৩

শিলাইদহ

মঙ্গলবার। ৪ জুলাই ১৮৯৩।

আজ সকাল বেলায় অল্প অল্প রৌদ্রের আভাস দিচ্ছে। কাল বিকেল থেকে বৃষ্টি ধরে গেছে, কিন্তু আকাশের ধারে ধারে স্তরে স্তরে এত মেঘ জমে আছে যে বড়ো আশা নেই— ঠিক যেন মেঘের কালো কার্পেটটা সমস্ত আকাশ থেকে গুটিয়ে নিয়ে এক প্রান্তে পাকিয়ে জড়ো করেছে। এখনি একটা ব্যস্তবাগীশ বাতাস এসে আবার সমস্ত আকাশময় বিছিয়ে দিয়ে যাবে, তখন নীলাকাশ এবং সোনালি রৌদ্রের কোনো চিহ্নমাত্র দেখা যাবে না। এবারে এত জলও আকাশে ছিল! আমাদের চরের মধ্যে নদীর জল প্রবেশ করেছে। চাষারা নৌকো বোঝাই করে কাঁচা ধান কেটে নিয়ে আসছে— আমার বোটের পাশ দিয়ে তাদের নৌকো যাচ্ছে আর ক্রমাগত হাহাকার শুনতে পাচ্ছি। যখন আর চার দিন থাকলে ধান পাকত তখন কাঁচা ধান কেটে আনা চাষার পক্ষে যে কী নিদারুণ তা বেশ বুঝতেই পারছিস। যদি ঐ শিষের মধ্যে দুটো-চারটে ধান একটু শক্ত হয়ে থাকে এই তাদের আশা। প্রকৃতির কার্যপ্রণালীর মধ্যে দয়া জিনিষটা কোনো এক জায়গায় আছে অবিশ্যি, নইলে আমরা পেলুম কোথা থেকে— কিন্তু সেটা যে ঠিক কোন্‌খানে আছে খুঁজে পাওয়া শক্ত। এই শত সহস্র নির্দোষী হতভাগ্যের নালিশ কোনো জায়গায় গিয়ে পৌঁচচ্ছে না— বৃষ্টি যেমন পড়বার তেমনি পড়ছে, নদী যেমন বাড়বার তেমনি বাড়ছে, বিশ্বসংসারে এ সম্বন্ধে কারও কাছে কোনো দরবার পাবার জো নেই। মনকে বোঝাতে হয় যে, কিছু বোঝবার জো নেই। কিন্তু এত বুদ্ধিই যদি মানুষকে দেওয়া হল তা হলে জগতে যে দয়া এবং ন্যায়বিচার আছে এটুকু বোঝবার বুদ্ধিও দেওয়া উচিত ছিল, কেননা ওটুকু বোঝা নিতান্ত আবশ্যক। কিন্তু এ-সমস্ত মিথ্যে

খুঁৎখুঁৎ মাত্র— কেননা সৃষ্টি কখনোই সুখের হতে পারে না। যতক্ষণ অপূর্ণতা ততক্ষণ অভাব, ততক্ষণ দুঃখ থাকবেই। জগৎ যদি জগৎ না হয়ে ঈশ্বর হত তা হলেই কোথাও কোনো খুঁত থাকত না— কিন্তু ততটা দূর পর্যন্ত দরবার করতে সাহস হয় না। ভেবে দেখলে সকল কথাই গোড়ায় গিয়ে ঠেকে যে, সৃষ্টি হল কেন। কিন্তু সেটা সম্বন্ধে কোনো আপত্তি যদি না করা যায়, তা হলে জগতে দুঃখ রইল কেন এ নালিশ উত্থাপন করা মিথ্যা। সেইজন্যে বৌদ্ধেরা একেবারে গোড়া ঘেঁষে কোপ মারতে চায়; তারা বলে যতক্ষণ অস্তিত্ব আছে ততক্ষণ দুঃখের সংশোধন হতে পারে না, একেবারে নির্বাণ চাই। খৃস্টানরা বলে দুঃখটা খুব উচ্চ জিনিষ, ঈশ্বর স্বয়ং মানুষ হয়ে আমাদের জন্যে দুঃখ বহন করেছেন। তাতে যতটা সান্ত্বনা হয়। কিন্তু নৈতিক দুঃখ এক, আর পাকা ধান ডুবে যাওয়ার দুঃখ আর। আমি বলি যা হয়েছে বেশ হয়েছে; এই-যে আমি হয়েছি এবং এই আশ্চর্য জগৎ হয়েছে, বড়ো তোফা হয়েছে— এমন জিনিষটা নষ্ট না হলেই ভালো। বুদ্ধদেব তদুত্তরে বলেন, এ জিনিষটা যদি রক্ষা করতে চাও তা হলে দুঃখ সইতে হবে। আমি নরাধম তদুত্তরে বলি, ভালো জিনিষ এবং প্রিয় জিনিষ রক্ষা করতে যদি দুঃখ সইতেই হয় তা হলে দুঃখ সব— তা, আমি থাকি আর আমার জগৎটি থাকুক। মাঝে মাঝে অন্নবস্ত্রের কষ্ট, মনঃক্ষোভ, নৈরাশ্য বহন করতে হবে; কিন্তু সে দুঃখের চেয়ে যখন অস্তিত্ব ভালোবাসি এবং অস্তিত্বের জন্যই সে দুঃখ বহন করি, তখন তো আর কোনো কথা বলা শোভা পায় না।

সিমলা

৮ জুলাই ১৮৯৩

১০৪

ইছামতী

বৃহস্পতিবার। ৬ জুলাই ১৮৯৩।

কাল সমস্ত দিন বেশ পরিষ্কার ছিল। অনেক দিন পরে মেঘ কেটে নতুন রৌদ্রে দশ দিক উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল ; প্রকৃতি যেন স্নানের পর নতুন-ধোওয়া বাসন্তী রঙের কাপড়টি প'রে পরিচ্ছন্ন প্রসন্ন প্রফুল্ল মুখে ভিজে চুলটি মৃদুমন্দ বাতাসে শুকোচ্ছিলেন— [তবে] কেবল আমার মনটি ভারী উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে ছিল। ঠিক যেন একান্ত কারায় [বদ্ধ] ভাবটা। কিন্তু আজ দিনের কাজকর্মের ভিড়ে সে ভাবটাকে মনের মধ্যে লালন করবার বড়ো বেশি সময় পাওয়া যায় নি। কাজ সেরে বেলা সাড়ে চারটে-পাঁচটার সময় যখন বোট ছেড়ে দিলুম তখন পূর্ব দিকে খুব একটা গাঢ় মেঘ উঠল। ক্রমশ একটু বাতাস এবং বৃষ্টিও যে হয় নি তা নয়। সেই শাখানদীটার ভিতরে যখন ঢুকলুম বৃষ্টি ধরে গেল। জলে চর ভেসে গেছে— মানুষপ্রমাণ লম্বা ঘাস এবং ঝাউবনের ভিতর দিয়ে সর্ সর্ শব্দে গুণ টেনে বোট চলতে লাগল। খানিক দূরে গিয়ে অনুকূল বাতাস পাওয়া গেল। পাল তুলে দিতে বললুম ; পাল তুলে দিলে। দু দিকে ঢেউ কেটে কল্ কল্ শব্দ তুলে বোট সগর্বে চলে যেতে লাগল। আমি বাইরে চৌকি নিয়ে বসলুম। সেই নিবিড় নীলমেঘের অন্তরালে অর্ধনিমগ্ন জনশূন্য চর এবং পরিপূর্ণ দিগন্তপ্রসারিত নদীর মধ্যে সূর্যাস্ত যে কী চমৎকার সে আমি বর্ণনা করতে চেষ্টা করব না। বিশেষত আকাশের অতি দূর প্রান্তে পদ্মার জলরেখার ঠিক উপরেই মেঘের যেখানে ফাঁক পড়েছে সেখানটা এমনি অতিমাত্রায় সূক্ষ্মতম সোনালি-তম সুদূরতম হয়ে দেখা দিয়েছিল, সেই স্বর্ণপটের উপর সারি সারি লম্বা কৃশ গাছগুলির মাথা এমনি সুকোমল সুনীল রেখায় অঙ্কিত হয়েছিল— প্রকৃতি সেখানে যেন আপনার চরম পরিণতিতে পৌঁছে

একটা কল্পলোকের মধ্যে শেষ হয়ে গেছে। মাঝি জিজ্ঞাসা করলে, 'চরের কাছারি-ঘাটে রাখব কি?' আমি বললুম, 'না, পদ্মা পেরিয়ে চল্।' মাঝি পাড়ি দিলে— বাতাস বেগে বইতে লাগল, পদ্মা নৃত্য করতে লাগল, পাল ফুলে উঠল, দিনের আলো মিলিয়ে এল, আকাশের ধারের মেঘগুলি ক্রমে আকাশের মাঝখানে ঘনঘটা করে জমে গেল, চার দিকে পদ্মার উদ্দাম চঞ্চল জল করতালি দিচ্ছে— সম্মুখে দূরে নীল মেঘস্তূপের নীচে পদ্মাতটের নীল বনরেখা দেখা যাচ্ছে— নদীর মাঝখানে আমাদের বোট ছাড়া আর একটিও নৌকো নেই— তীরের কাছে দুই-একটা জেলেডিঙি ছোটো ছোটো পাল উড়িয়ে গৃহমুখে চলেছে— আমি যেন প্রকৃতির রাজার মতো বসে আছি আর আমাকে তার দুরন্ত ফেনিলমুখ রাজ-অশ্ব সনৃত্য গতিতে বহন করে নিয়ে চলেছে।

সিমলা
১১ জুলাই ১৮৯৩

১০৫

সাজাদপুর
৭ জুলাই। ১৮৯৩।

ছোটোখাটো গ্রাম, ভাঙাচোরা ঘাট, টিনের-ছাত-ওয়ালা বাজার, বাঁখারির-বেড়া-দেওয়া গোলাঘর, বাঁশঝাড়, আম কাঁঠাল কুল খেজুর শিমুল কলা আকন্দ ভেরেণ্ডা ওল কচু লতাগুল্ম তৃণের সমষ্টি-বদ্ধ ঝোপঝাড় জঙ্গল, ঘাটে-বাঁধা মাস্তুল-তোলা বৃহদাকার নৌকোর দল, নিমগ্নপ্রায় ধান এবং অর্ধমগ্ন পাটের ক্ষেতের মধ্যে দিয়ে ক্রমাগত এঁকে বেঁকে কাল সন্ধের সময় সাজাদপুরে এসে পৌঁচেছি। এখন কিছুদিনের মতো এইখানেই স্থায়ী হওয়া গেল। অনেক দিন বোটে থাকার পর সাজাদপুরের বাড়িটা বেশ লাগে ভালো— একটা যেন নূতন স্বাধীনতা পাওয়া যায়— যতটা খুশি নড়বার চড়বার এবং শরীর প্রসারণ করবার জায়গা পাওয়া মানুষের মানসিক সুখের যে একটা প্রধান অঙ্গ সেটা হঠাৎ আবিষ্কার করা যায়। আজ প্রাতে মাঝে মাঝে বেশ একটুখানি রৌদ্র দেখা দিচ্ছে, বাতাসটি চঞ্চল বেগে বচ্ছে, ঝাউ এবং লিচু গাছ ক্রমাগত সর্‌সর্‌ মর্‌মর্‌ করে দুলছে, নানা জাতির পাখি নানা ভাষা নানা সুরে ডেকে ডেকে প্রাতঃকালের আরণ্য মজলিশ সর্‌গরম্‌ করে তুলেছে— আমি আমাদের দোতলার এই সঙ্গীহীন প্রশস্ত নির্জন আলোকিত উন্মুক্ত ঘরের মধ্যে ব'সে জানলা থেকে খালের উপরকার নৌকাশ্রেণী, ও পারের তরুমধ্যগত গ্রাম, এবং এ পারের অনতিদূরবর্তী লোকালয়ের মৃদুকর্মপ্রবাহ নিরীক্ষণ ক'রে বেশ একটুখানি মনের আনন্দে আছি। পাড়াগাঁয়ের কর্মস্রোত খুব বেশি তীব্রও নয়, অথচ নিতান্ত নিশ্চেষ্ট নির্জীবও নয়। কাজ এবং বিশ্রাম দুই যেন পাশাপাশি মিলিত হয়ে হাত ধরাধরি করে চলেছে। খেয়ানৌকো পারাপার করছে, পান্থরা ছাতা হাতে করে খালের ধারের রাস্তা দিয়ে চলেছে, মেয়েরা ধুচুনি ডুবিয়ে চাল ধুচ্ছে,

চাষারা আটিবাঁধা পাট মাথায় করে হাটে আসছে— দুটো লোক একটা গাছের গুঁড়ি মাটিতে ফেলে কুড়ুল নিয়ে ঠক্ ঠক্ শব্দে কাঠ চেলা করছে, একটা ছুতোর অশথ গাছের তলায় জেলেডিঙি উলটে ফেলে বাটারি হাতে মেরামত করছে, গ্রামের কুকুরটা খালের ধারে ধারে উদ্দেশ্যহীন ভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছে, গুটিকতক গোরু বর্ষার ঘাস অপর্যাপ্ত পরিমাণে আহার-পূর্বক অলসভাবে রৌদ্রে মাটির উপর প'ড়ে কান এবং লেজ নেড়ে মাছি তাড়াচ্ছে এবং কাক এসে তাদের মেরুদণ্ডের উপর বসে যখন বড়ো বেশি বিরক্ত করছে তখন একবার পিঠের দিকে মাথাটা নেড়ে আপত্তি জানাচ্ছে। এখানকার এই দুই-একটা একঘেয়ে ঠক্‌ঠক্ ঠুক্‌ঠাক্ শব্দ, উলঙ্গ ছেলেমেয়েদের খেলার কল্লোল, রাখালের করুণ উচ্চস্বরে গান, দাঁড়ের ঝুপ্‌ঝাপ ধ্বনি, কলুর ঘানির তীক্ষ্ণকাতর নিখাদ স্বর, সমস্ত কর্মকোলাহল একত্র মিলে এই পাখির ডাক এবং পাতার শব্দের সঙ্গে কিছুমাত্র অসামঞ্জস্য হচ্ছে না— সমস্তটাই যেন একটা শান্তিময় স্বপ্নময় করুণা-মাখা একটা বড়ো সোনাটার অন্তর্গত, কতকটা সোপ্যাঁর ধাঁচায়, কিন্তু খুব একটা বিস্তৃত বৃহৎ অথচ সংযত মাত্রায় বাঁধা। আমার মাথার মধ্যে সূর্যের আলোক এবং এই-সমস্ত শব্দ একেবারে যেন কানায় কানায় ভরে এসেছে অতএব ·· চিঠি বন্ধ করে খানিকক্ষণ পড়ে থাকা যাক।

শিমলা

১১ জুলাই ১৮৯৩

১০৬

সাজাদপুর

১০ জুলাই। ১৮৯৩।

আমার গানগুলো পেয়েছিস। 'বড়ো বেদনার মতো' গানের সুরটা ঠিক হয়তো মজলিসি বৈঠকি নয়।... এ-সব গান যেন একটু নিরালায় গাবার মতো। সুরটা যে মন্দ হয়েছে এমন আমার বিশ্বাস নয়, এমন-কি ভালো হয়েছে বললে খুব বেশি অত্যুক্তি হয় না। ও গানটা আমি নাবার ঘরে অনেক দিন একটু একটু করে সুরের সঙ্গে সঙ্গে তৈরি করেছিলুম— নাবার ঘরে গান তৈরি করবার ভারী কতকগুলি সুবিধা আছে। প্রথমত নিরালা, দ্বিতীয়ত অন্য কোনো কর্তব্যের কোনো দাবি থাকে না— মাথায় এক-টিন জল ঢেলে পাঁচ মিনিট গুন্ গুন্ করলে কর্তব্যজ্ঞানে বিশেষ আঘাত লাগে না— সব চেয়ে সুবিধা হচ্ছে কোনো দর্শকসম্ভাবনা-মাত্র না থাকাতে সমস্ত মন খুলে মুখভঙ্গী করা যায়। মুখভঙ্গী না করলে গান তৈরি করবার পুরো অবস্থা কিছুতেই আসে না। ওটা কিনা ঠিক যুক্তিতর্কের কাজ নয়, নিছক ক্ষিপ্তভাব। এ গানটা আমি এখনও সর্বদা গেয়ে থাকি— আজ প্রাতঃকালেও অনেক ক্ষণ গুন্‌গুন্ করেছি, গাইতে গাইতে গভীর একটা ভাবোন্মাদও জন্মায়। অতএব এটা যে আমার একটা প্রিয় গান সে বিষয়ে আমার কোনো সন্দেহ নেই।... এখানে আমি একলা খুব মুগ্ধ এবং তদ্গত চিত্তে অর্ধনিমীলিত নেত্রে গেয়ে থাকি, এবং জীবন ও পৃথিবীটা একটি সূর্যকরোজ্জ্বল অতি সূক্ষ্ম অশ্রুবাষ্পে আবৃত হয়ে সাতরঙা ইন্দ্রধনুরেখায় রঞ্জিত হয়ে দেখা দেয়— প্রতি-দিনের সত্যকে চিরদিনের সৌন্দর্যের মধ্যে তর্জমা করে দেওয়া যায়, দুঃখকষ্টও আভাময় হয়ে ওঠে। অনতিবিলম্বেই খাজাঞ্চি দুইটা আণ্ডা, এক ছটাক মাখন, এক পোয়া ঘি ও ছয় পয়সার সর্ষপ

তৈলের হিসাব এনে উপস্থিত করে। আমার এখানকার ইতিহাস এই রকম। ··

সিমলা

১৪ জুলাই ১৮৯৩

সাজাদপুর

৩০ আষাঢ়। ১৩০০।

আজকাল কবিতা লেখাটা আমার পক্ষে যেন একটা গোপন নিষিদ্ধ সুখসম্ভোগের মতো হয়ে পড়েছে— এ দিকে আগামী মাসের সাধনার জন্যে একটি লাইন লেখা হয় নি, ও দিকে মধ্যে মধ্যে সম্পাদকের তাড়া আসছে, অনতিদূরে আশ্বিন-কার্তিকের যুগল সাধনা রিক্তহস্তে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে ভর্ৎসনা করছে, আর আমি আমার কবিতার অন্তঃপুরে পালিয়ে পালিয়ে আশ্রয় নিচ্ছি। রোজ মনে করি আজ একটা দিন বৈ তো নয়— এমনি করে কত দিন কেটে গেল। আমি বাস্তবিক ভেবে পাই নে কোন্‌টা আমার আসল কাজ। এক-এক সময় মনে হয় আমি ছোটো ছোটো গল্প অনেক লিখতে পারি এবং মন্দ লিখতে পারি নে— লেখবার সময় সুখও পাওয়া যায়। এক-এক সময় মনে হয়— আমার মাথায় এমন অনেকগুলো ভাবের উদয় হয় যা ঠিক কবিতায় ব্যক্ত করবার যোগ্য নয়, সেগুলো ডায়ারি প্রভৃতি নানা আকারে প্রকাশ করে রেখে দেওয়া ভালো, বোধ হয় তাতে ফলও আছে আনন্দও আছে। এক-এক সময় সামাজিক বিষয় নিয়ে আমাদের দেশের লোকের সঙ্গে ঝগড়া করা খুব দরকার, যখন আর কেউ করছে না তখন তো কাজেই আমাকে এই অপ্রিয় কর্তব্যটা গ্রহণ করতে হয়। আবার এক-এক সময় মনে হয়, দূর হোক গে ছাই, পৃথিবী আপনার চরকায় আপনি তেল দেবে এখন— মিল করে ছন্দ গেঁথে ছোটো ছোটো কবিতা লেখাটা আমার বেশ আসে, সব ছেড়ে-ছুড়ে দিয়ে আপনার মনে আপনার কোণে সেই কাজই করা যাক। মদগর্বিতা যুবতী যেমন তার অনেকগুলি প্রণয়ীকে নিয়ে কোনোটিকেই হাতছাড়া করতে চায় না, আমার কতকটা যেন সেই দশা হয়েছে। মিউজদের মধ্যে আমি কোনোটিকেই নিরাশ করতে চাই নে— কিন্তু

তাতে কাজ অত্যন্ত বেড়ে যায় এবং হয়তো 'দীর্ঘ দৌড়ে' কোনোটিই পরিপূর্ণভাবে আমার আয়ত্ত হয় না। সাহিত্যবিভাগেও কর্তব্য-বুদ্ধির অধিকার আছে, কিন্তু অন্য বিভাগের কর্তব্যবুদ্ধির সঙ্গে তার একটু প্রভেদ আছে। কোন্‌টাতে পৃথিবীর সব চেয়ে উপকার হবে সাহিত্যকর্তব্যজ্ঞানে সে কথা ভাববার দরকার নেই, কিন্তু কোন্‌টা আমি সব চেয়ে ভালো করতে পারি সেইটেই হচ্ছে বিচার্য। বোধ হয় জীবনের সকল বিভাগেই তাই। আমার বুদ্ধিতে যতটা আসে তাতে তো বোধ হয় কবিতাতেই আমার সকলের চেয়ে বেশি অধিকার। কিন্তু আমার ক্ষুধানল বিশ্বরাজ্য ও মনোরাজ্যের সর্বত্রই আপনার জ্বলন্ত শিখা প্রসারিত করতে চায়। যখন গান তৈরি করতে আরম্ভ করি তখন মনে হয় এই কাজেই যদি লেগে থাকা যায় তা হলে তো মন্দ হয় না। আবার যখন একটা কিছু অভিনয়ে প্রবৃত্ত হওয়া যায় তখন এমনি নেশা চেপে যায় যে মনে হয় যে, চাই-কি, এটাতেও একজন মানুষ আপনার জীবন নিয়োগ করতে পারে। আবার যখন 'বাল্যবিবাহ' কিম্বা 'শিক্ষার হেরফের' নিয়ে পড়া যায় তখন মনে হয় এই হচ্ছে জীবনের সর্বোচ্চ কাজ। কী মুশকিলেই পড়েছি [বব]! আবার লজ্জার মাথা খেয়ে সত্যি কথা যদি বলতে হয় তো এটা স্বীকার করতে হয় যে, ঐ-যে চিত্রবিদ্যা ব'লে একটা বিদ্যা আছে তার প্রতিও আমি সর্বদা হতাশ প্রণয়ের লুব্ধ দৃষ্টিপাত করে থাকি—কিন্তু আর পাবার আশা নেই, সাধনা করবার বয়স চলে গেছে। অন্যান্য বিদ্যার মতো তাঁকে তো সহজে পাবার জো নেই— তাঁর একেবারে ধনুক-ভাঙা পণ; তূলি টেনে টেনে একেবারে হয়রান না হলে তাঁর প্রসন্নতা লাভ করা যায় না। আমার অবস্থাটা দ্রৌপদীর মতো হয়েছে— তিনি মনে করেছিলেন যে, আহা, সেই যদি আমার পাঁচটি স্বামীই হল তবে ঐ কর্ণকে-সুদ্ধ নিয়ে ছটি

হলেই দিব্যি হত। আমার বিশ্বাস যদি কর্ণকেও পেতেন তা হ'লে দুর্যোধন-দুঃশাসনকেও হাতছাড়া করতে ইচ্ছে হত না। কারণ, হয় এক, নয় অসংখ্য— এর মাঝখানে আর কোথাও বেশ স্বাভাবিক বিরামের স্থান নেই। পাঁচ বললে ছয় আপনি এগিয়ে আসে এবং ছয়ের পরে সাত আট নয় দশ প্রভৃতি সমস্ত সংখ্যাগুলি সার বেঁধে অনিমেষ লোচনে মুখের দিকে [চেয়ে] অপেক্ষা করে থাকে। অতএব একলা কবিতাটিকে নিয়ে থাকাই আমার পক্ষে সব চেয়ে সুবিধে— বোধ হয় যেন উনিই আমাকে সব চেয়ে বেশি ধরা দিয়েছেন— আমার ছেলে-বেলাকার ভালোবাসা, আমার বহুকালের অনুরাগিণী সঙ্গিনী।···

তুই যে নীরব কবি সম্বন্ধে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছিস সে সম্বন্ধে আমার বক্তব্য এই যে, সরব এবং নীরবের মধ্যে অনুভূতির পরিমাণ সমান থাকতে পারে, কিন্তু আসল কবিত্ব জিনিষটি স্বতন্ত্র। কেবল ভাষার ক্ষমতা ব'লে নয়, গঠন করবার শক্তি। একটা অলক্ষিত অচেতন নৈপুণ্যবলে ভাবগুলি কবির হাতে বিচিত্র আকার ধারণ করে। সেই সৃজনক্ষমতাই কবিত্বের মূল। ভাষা ভাব এবং অনুভাব তার সরঞ্জাম মাত্র। কারও বা ভাষা আছে, কারও বা অনুভাব আছে, কারও বা ভাষা এবং অনুভাব দু'ই আছে, কিন্তু আর-একটি ব্যক্তি আছে যার ভাষা অনুভাব এবং সৃজনী শক্তি আছে— এই শেষোক্ত লোকটিকে কবি নাম দেওয়া যেতে পারে। প্রথমোক্ত তিনটি লোক নীরবও হতে পারেন সরবও হতে পারেন, কিন্তু তাঁরা কবি নন। তাঁদের মধ্যে কাউকে কাউকে ভাবুক বললেই ঠিক বিশেষণটা প্রয়োগ করা হয়। তাঁরাও জগতে অত্যন্ত দুর্লভ এবং কবির তৃষিত চিত্ত সর্বদাই তাঁদের জন্যে ব্যাকুল হয়ে আছে।

উপরের এই ভূমিকার পরে আমার সেই 'জাল ফেলা' কবিতাটার ব্যাখ্যা একটু সহজ হবে। সেটার মানে তুই জিজ্ঞাসা করেছিস।

লেখাটা চোখের সামনে থাকলে তার মানে নিজে একটু ভালো করে বুঝে বোঝাবার চেষ্টা করতে পারতুম— তবু একটা ঝাপসা রকমের ভাব মনে আছে। মনে কর্ একজন ব্যক্তি তার জীবনের প্রভাতকালে সমুদ্রের ধারে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সূর্যোদয় দেখছিল— সে সমুদ্রটা তার আপনার মন কিম্বা ঐ বাহিরের বিশ্ব কিম্বা উভয়ের সীমানা-মধ্যবর্তী একটি ভাবের পারাবার, সে কথা স্পষ্ট করে বলা হয় নি। যাই হোক, সেই অপূর্ব সৌন্দর্যময় অগাধ সমুদ্রের দিকে চেয়ে চেয়ে লোকটার মনে হল এই রহস্যপাথারের মধ্যে জাল ফেলে দেখা যাক-না কী পাওয়া যায়। এই ব'লে তো সে ঘুরিয়ে জাল ফেললে। নানা রকমের অপরূপ জিনিষ উঠতে লাগল— কোনোটা বা হাসির মতো শুভ্র, কোনোটা বা অশ্রুর মতো উজ্জ্বল, কোনোটা বা লজ্জার মতো রাঙা। মনের উৎসাহে সে সমস্ত দিন ধরে ঐ কাজই কেবল করলে— গভীর তলদেশে যে-সকল সুন্দর রহস্য ছিল সেইগুলিকে তীরে এনে রাশীকৃত করে তুললে। এমনি করে জীবনের সমস্ত দিনটি যাপন করলে। সন্ধ্যার সময় মনে করলে এবারকার মতো তো যথেষ্ট হয়েছে, এখন এইগুলি নিয়ে তাকে দিয়ে আসা যাক্‌গে। কাকে যে, সে কথাটা স্পষ্ট করে বলা হয় নি— হয়তো তার প্রেয়সীকে, হয়তো তার স্বদেশকে। কিন্তু সে তো এ-সমস্ত অপূর্ব জিনিষ কখনও দেখে নি। সে ভাবলে এগুলো কী, এর আবশ্যকই বা কী, এতে কী অভাব দূর হবে, দোকানদারের কাছে যাচিয়ে দেখলে এর কতই বা মূল্য হতে পারবে? এক কথায়, এ বিজ্ঞান দর্শন ইতিহাস ভূগোল অর্থনীতি সমাজনীতি ধর্মনীতি তত্ত্বজ্ঞান প্রভৃতি কিছুই নয়— এ কেবল কতকগুলো রঙিন ভাব মাত্র, তারও যে কোন্‌টার কী নাম কী বিবরণ তাও ভালো পরিচয় পাওয়া যায় না। ফলত সমস্ত দিনের জাল-ফেলা অগাধ সমুদ্রের এই রত্নগুলি যাকে দেওয়া গেল সে বললে, এ আবার কী?

জেলেরও মনে তখন অনুতাপ হল, 'সত্যি বটে, এ তো বিশেষ কিছু নয়, আমি কেবল জাল ফেলেছি আর তুলেছি— আমি তো হাটেও যাই নি পয়সা কড়িও খরচ করি নি, এর জন্যে তো আমাকে কাউকে এক পয়সা খাজনা কিম্বা মাশুল দিতে হয় নি!' সে তখন কিঞ্চিৎ বিষণ্নমুখে লজ্জিতভাবে সেগুলো কুড়িয়ে নিয়ে ঘরের দ্বারে বসে বসে একে একে রাস্তায় ফেলে দিলে। তার পরদিন সকালবেলায় পথিকরা এসে সেই বহুমূল্য জিনিষগুলি দেশে বিদেশে আপন আপন ঘরে নিয়ে গেল। বোধ হচ্ছে এই কবিতাটি যিনি লিখেছেন তিনি মনে করছেন, তাঁর গৃহকার্যনিরতা অন্তঃপুরবাসিনী জন্মভূমি, তাঁর সমসাময়িক পাঠকমণ্ডলী, তাঁর কবিতাগুলির ঠিক ভাবগ্রহ করতে পারছে না— তার যে কতখানি মূল্য সে তাদের জ্ঞানগোচর নয়-- অতএব এখনকার মতো এ-সমস্ত পথেই ফেলে দেওয়া যাচ্ছে, 'তোমরাও অবহেলা করো আমিও অবহেলা করি', কিন্তু এ রাত্রি যখন পোহাবে তখন 'পস্টারিটি' এসে এগুলি কুড়িয়ে নিয়ে দেশে বিদেশে চলে যাবে। কিন্তু তাতে ঐ জেলে লোকটার মনের আক্ষেপ কি মিটবে! যাই হোক, 'পস্টারিটি' যে অভিসারিণী রমণীর মতো দীর্ঘরাত্রি ধরে ধীরে ধীরে কবির দিকে অগ্রসর হচ্ছে এবং হয়তো নিশিশেষে এসে উপস্থিত হতেও পারে এ সুখকল্পনাটুকু কবিকে ভোগ করতে দিতে কারও বোধ হয় আপত্তি না হতেও পারে।

সেই মন্দিরের কবিতার ঠিক অর্থটা কী ভালো মনে পড়ছে না। বোধ হয় সেটা সত্যিকার মন্দির সম্বন্ধে। অর্থাৎ, যখন কোণে বসে বসে কতকগুলো কৃত্রিম কল্পনার দ্বারা আপনার দেবতাকে আচ্ছন্ন করে নিজের মনটাকেও একটা অস্বাভাবিক সুতীব্র অবস্থায় নিয়ে যাওয়া গেছে এমন সময় যদি হঠাৎ একটা সংশয়বজ্র প'ড়ে সেই-সমস্ত সুদীর্ঘকালের কৃত্রিম প্রাচীর ভেঙে যায়, তখন হঠাৎ প্রকৃতির শোভা,

সূর্যের আলোক এবং বিশ্বজনের কল্লোলগান এসে আমার তন্ত্রমন্ত্র ধূপধুনার স্থান অধিকার করে এবং তখন দেখতে পাই সেই যথার্থ আরাধনা এবং তাতেই দেবতার তুষ্টি। বোধ হয় উড়িষ্যার মন্দিরগুলো দেখে দেখে আমার এই রকম একটা ভাব মনে এসে থাকবে। ভুবনেশ্বরের একটা মন্দিরের ভিতরে যেখানে দেবতা সেখানে ভয়ানক অন্ধকার, বদ্ধ, ধূপের গন্ধে নিশ্বাসরোধ হয়— ঠাকুরের অভিষেক-জলে মেজে স্যাঁৎসেতে, বাদুড় চামচিকে উড়ছে, সেখান থেকে বাইরের সুন্দর আলোতে হঠাৎ আসবামাত্র দেবতা যে কোন্‌খানে আছেন টের পাওয়া যায়।

সিমলা

১৭ জুলাই ১৮৯৩

১০৮

পতিসার

১১ অগস্ট্‌। ১৮৯৩।

অনেকগুলো বড়ো বড়ো বিলের মধ্যে দিয়ে আসতে হয়েছে। এই বিলগুলো ভারী অদ্ভুত— কোনো আকার আয়তন নেই, জলে স্থলে একাকার— পৃথিবী সমুদ্রগর্ভ থেকে নতুন জেগে ওঠবার সময় যেমন ছিল। কোথাও কিছু কিনারা নেই— খানিকটা জল, খানিকটা মগ্নপ্রায় ধান-ক্ষেতের মাথা, খানিকটা শেওলা এবং জলজ উদ্ভিদ ভাসছে— পানকৌড়ি সাঁতার দিচ্ছে, জাল ফেলবার জন্যে বড়ো বড়ো বাঁশ পোঁতা, তারই উপর কটা রঙের বড়ো বড়ো চিল বসে আছে— ভারী একাকার একঘেয়ে রকমের দৃশ্য। দ্বীপের মতো অতি দূরে গ্রামের রেখা দেখা যাচ্ছে— যেতে যেতে হঠাৎ আবার খানিকটা নদী, দু ধারে গ্রাম, পাটের ক্ষেত এবং বাঁশের ঝাড়, আবার কখন্‌ যে সেটা বিস্তৃত বিলের মধ্যে মিলিয়ে যাচ্ছে বোঝবার জো নেই।

ঠিক সূর্যাস্তের কাছাকাছি সময় যখন একটি গ্রাম পেরিয়ে আসছিলুম, একটা লম্বা নৌকোয় অনেকগুলো ছোকরা ঝপ্‌ ঝপ্‌ করে দাঁড় ফেলছিল এবং সেই তালে গান গাচ্ছিল—

'যোবতী, ক্যান্‌ বা কর মন ভারী?
পাবনা থাক্যে আন্যে দেব ট্যাকা দামের মোটরি।'

স্থানীয় কবিটি যে ভাব অবলম্বন করে সংগীত রচনা করেছেন— আমরাও ও ভাবের ঢের লিখেছি, কিন্তু কিছু ইতর-বিশেষ আছে। আমাদের যুবতী মন ভারী করলে তৎক্ষণাৎ জীবনটা দিতে কিম্বা নন্দনকানন থেকে পারিজাত এনে দিতে প্রস্তুত হই, কিন্তু এ অঞ্চলের লোক খুব সুখে আছে বলতে হবে— অল্প ত্যাগস্বীকারেই যুবতীর মন পায়। মোটরি জিনিষটি কী তা বলা আমার সাধ্য নয়, কিন্তু তার দামটাও নাকি পার্শ্বেই উল্লেখ করা আছে— তাতেই বোঝা

যাচ্ছে খুব বেশি দুর্মূল্য নয় এবং নিতান্ত অগম্য স্থান থেকেও আনতে হয় না। গানটা শুনে বেশ মজার লাগল। যুবতীর মন ভারী হলে জগতে যে আন্দোলন উপস্থিত হয়, এই বিলের প্রান্তেও তার একটা সংবাদ পাওয়া গেল। এ গানটি কেবল অস্থানেই হাস্যজনক, কিন্তু দেশকালপাত্র-বিশেষে এর যথেষ্ট সৌন্দর্য আছে। আমার অজ্ঞাতনামা গ্রাম্য কবিভ্রাতার রচনাগুলিও এই গ্রামের লোকের সুখদুঃখের পক্ষে নিতান্ত আবশ্যক, আমার গানগুলি সেখানে কম হাস্যজনক নয়।

সিমলা

১৫ অগস্ট ১৮৯৩

১০৯

পতিসার

১৩ অগস্ট্। ১৮৯৩।

এবারে এই বিলের পথ দিয়ে কালীগ্রামে আসতে আসতে আমার মাথায় একটি ভাব বেশ পরিষ্কাররূপে ফুটে উঠেছে। কথাটা নতুন নয়, অনেক দিন থেকে জানি, কিন্তু তবু এক-একবার পুরোনো কথাও নতুন করে অনুভব করা যায়। দুই দিকে দুই তীর দিয়ে সীমাবদ্ধ না থাকলে জলস্রোতের তেমন শোভা থাকে না— অনির্দিষ্ট অনিয়ন্ত্রিত বিল একঘেয়ে শোভাশূন্য। ভাষার পক্ষে ছন্দের বাঁধন ঐ তীরের কাজ করে। ভাষাকে একটি বিশেষ আকার এবং বিশেষ শোভা দেয়; তার একটি সুন্দর চেহারা ফুটে ওঠে। তীরবদ্ধ নদীগুলির যেমন একটি বিশেষ ব্যক্তিত্ব আছে, তাদের যেমন এক-একটি স্বতন্ত্র লোকের মতো মনে হয়, ছন্দের দ্বারা কবিতা সেইরূপ এক-একটি মূর্তিমান অস্তিত্বের মতো দাঁড়িয়ে যায়। গদ্যের সেইরকম সুন্দর সুনির্দিষ্ট স্বাতন্ত্র্য নেই: সে একটা বৃহৎ বিশেষত্ববিহীন বিলের মতো। আবার তটের দ্বারা আবদ্ধ হওয়াতেই নদীর মধ্যে একটা বেগ আছে, একটা গতি আছে, কিন্তু প্রবাহহীন বিল কেবল বিস্তৃতভাবে দিগ্‌বিদিক গ্রাস করে পড়ে আছে। ভাষার মধ্যেও যদি একটা আবেগ একটা গতি দেবার আবশ্যক হয় তবে তাকে ছন্দের সংকীর্ণতার মধ্যে বেঁধে দিতে হয়; নইলে সে কেবল ব্যাপ্ত হয়ে পড়ে, কিন্তু সমস্ত বল নিয়ে এক দিকে ধাবিত হতে পারে না। বিলের জলকে পল্লিগ্রামের লোকেরা বলে বোবা জল— তার কোনো ভাষা নেই, আত্মপ্রকাশ নেই। তটবদ্ধ নদীর মধ্যে সর্বদা একটা কলধ্বনি শোনা যায়; ছন্দের মধ্যে বেঁধে দিলে কথাগুলোও সেইরকম পরস্পরের প্রতি আঘাত সংঘাত করে একটা সংগীতের সৃষ্টি করতে থাকে। সেইজন্যে ছন্দের ভাষা বোবা ভাষা নয়, তার

মুখে সর্বদাই কলগান। বাঁধনের মধ্যে থাকাতেই গতির সৌন্দর্য, ধ্বনির সৌন্দর্য এবং আকারের সৌন্দর্য। বাঁধনের মধ্যে থাকাতে যেমন সৌন্দর্য তেমনি শক্তি। কবিতা যে স্বভাবতই ধীরে ধীরে একটি ছন্দের মধ্যে ধরা দিয়ে আপনাকে পরিস্ফুট করে তুলেছে, ওটা একটা কৃত্রিম-অভ্যাস-জাত সুখ দেবার জন্যে নয়— ওর একটি গভীর স্বাভাবিক সুখ আছে। অনেক মূর্খ মনে করে কবিতার ছন্দোবন্ধ কেবল একটা বাহাদুরি করা, ওতে কেবল সাধারণ লোকের বিস্ময় উৎপাদন করে সুখ দেয় — ও কেবল ভাষার ব্যায়াম মাত্র। কিন্তু সে ভারী ভুল। কবিতার ছন্দ যে নিয়মে উৎপন্ন হয়েছে বিশ্বজগতের সমস্ত সৌন্দর্যই সেই নিয়মে সৃষ্ট হয়েছে। একটি সুনির্দিষ্ট বন্ধনের মধ্যে দিয়ে বেগে প্রবাহিত হয়ে মনের মধ্যে আঘাত করে ব'লেই সৌন্দর্যের এমন অনিবার্য শক্তি। আর, সুষমার বন্ধন ছাড়িয়ে গেলেই সব একাকার হয়ে যায়, তার আর আঘাত করবার শক্তি থাকে না। বিল ছাড়িয়ে যেমনি নদীতে এবং নদী ছাড়িয়ে যেমনি বিলে গিয়ে পড়ছিলুম অমনি আমার মনে এই তথ্যটি দেদীপ্যমান হয়ে জেগে উঠছিল।

সিমলা

১৭ অগস্ট ১৮৯৩

১১০

পতিসার

২৬ শ্রাবণ ?

। ১৩০০ ।

শ্রাবণ মাসের ডায়ারিটা তুই ভালো বুঝতে পারিস নি [বব] ? বোঝাতে গেলে একখানা গ্রন্থবিশেষ লিখতে হয়।··· আমি অনেক দিন থেকে ভেবে দেখেছি পুরুষরা কিছু খাপছাড়া আর মেয়েরা বেশ সুসম্পূর্ণ। মেয়েদের কথাবার্তা বেশভূষা চালচলন আচারব্যবহার এবং জীবনের কর্তব্যের মধ্যে একটি অখণ্ড সামঞ্জস্য আছে। সমস্তটি যেন একটি অর্গ্যানিক হোল। তার প্রধান কারণ হচ্ছে যুগ যুগান্তর থেকে প্রকৃতি তাদের কর্তব্য নিজে নির্দিষ্ট করে দিয়ে তাদের আগাগোড়া সেই ভাবে সেই উদ্দেশ্যে গঠিত করে দিয়েছে— এ পর্যন্ত কোনো পরিবর্তন, কোনো রাষ্ট্রবিপ্লব, সভ্যতার কোনো ভাঙন-গড়নে তাদের সেই ঐক্য থেকে বিক্ষিপ্ত করে দেয় নি ; তারা বরাবর সেবা করেছে, ভালোবেসেছে, আদর করেছে, আর কিছু করে নি। তাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে ভাষায়-ভঙ্গীতে সেই কাজের নৈপুণ্য এবং সৌন্দর্য যেন মিশে এক হয়ে গেছে। তাদের স্বভাব এবং তাদের কাজ যেন পুষ্প এবং পুষ্পের গন্ধের মতো সম্মিলিত হয়ে গেছে, তাদের মধ্যে সেইজন্যে কোনো দ্বিধা কোনো ইতস্তত নেই। পুরুষের চরিত্রের মধ্যে বিস্তর উঁচুনিচু ; তারা যে নানা কার্য নানা শক্তি নানা পরিবর্তনের ভিতর দিয়ে তৈরি হয়ে এসেছে, তার অঙ্গে এবং স্বভাবে তার যেন চিহ্ন রয়ে গেছে। কোথাও কিছু নেই কপালটা হয়তো বৃহৎ উঁচু হয়ে উঠল, মাঝের থেকে হয়তো নাকটা এমনি ঠেলে উঠল যে তাকে কার সাধ্য দাবিয়ে রাখে— চোয়াল দুটো হয়তো সৌষম্যের কোনো নিয়ম মানলে না। যদি চিরকাল পুরুষ এক ভাবে চালিত, এক কার্যে শিক্ষিত হয়ে আসত, তা হলে তাদেরও মুখে এবং স্বভাবে একটা

সামঞ্জস্য দাঁড়িয়ে যেত— একটা ছাঁচ বহুকাল থেকে তৈরি হয়ে যেত— তা হলে তাদের আর বল প্রকাশ ক'রে বহু চিন্তা ক'রে কাজ করতে হত না। সকল কাজ সুন্দরভাবে সহজে সম্পন্ন হত— তা হলে তাদের একটা সহজ নীতিও দাঁড়িয়ে যেত। অর্থাৎ, বহু যুগ থেকে অবিচ্ছেদে যে কাজ করে আসছে সেই কাজের কাছে তার মন বশ মানত, সেই বহু যুগের অভ্যস্ত কর্তব্য থেকে কোনো সামান্য শক্তি তাদের বিক্ষিপ্ত করতে পারত না। স্ত্রীলোককে প্রকৃতি মা করে দিয়ে তাকে একেবারে ছাঁচে ঢালাই করে ফেলেছে। পুরুষের সে-রকম কোনো স্বাভাবিক আদিম বন্ধন নেই, সেইজন্যে একটি ধ্রুব-কেন্দ্র-আশ্রয়ে পুরুষ সর্বতোভাবে তৈরি হয়ে যায় নি। সে চিরকাল ধরে কেবলই বিক্ষিপ্ত হয়ে হয়ে এসেছে, তার শতমুখী উচ্ছৃঙ্খল প্রবৃত্তি তাকে একটি সুন্দর সমগ্রতা গড়ে তুলতে দেয় নি। আমি তোকে সেদিনকার চিঠিতে বন্ধনকে সৌন্দর্যের কারণ ব'লে অনেকখানি লিখেছিলুম মনে আছে— মেয়েরা সেইরকম একটি স্বাভাবিক ছন্দের বন্ধনে সম্পূর্ণ সুন্দর হয়ে তৈরি হয়ে এসেছে। আর, পুরুষরা গদ্যের মতো বন্ধনহীন এবং সৌন্দর্যহীন, তাদের আগাগোড়ার মধ্যে কোনো-একটি 'ছাঁদ নেই'। জানি নে আমি কিছু বোঝাতে পারলুম কি না, কিন্তু আমার মনে কথাটা খুব পরিস্ফুট। মেয়েদের সঙ্গে-যে লোকে চিরকাল সংগীতের, কবিতার, লতার, ফুলের, নদীর তুলনা দিয়ে এসেছে এবং কখনও পুরুষের সঙ্গে দেবার কথা মনেও উদয় হয় নি তার কারণই এই। প্রকৃতির সমস্ত সুন্দর জিনিষ যেমন সুসম্বদ্ধ সুসম্পূর্ণ সুসংহত সুসংযত, মেয়েরাও সেই রকম। তাদের মধ্যে কোনো দ্বিধা কোনো চিন্তা কোনো মন এসে তাদের ছন্দোভঙ্গ করে দিচ্ছে না, কোনো তর্ক এসে তাদের মিল নষ্ট করে দিচ্ছে না— তারা এক-একটি ছিপ্‌ছিপে মিষ্টি কবিতার মতো। গোড়ায় গলদের চন্দ্র যে-

রকম বর্ণনা করেছিল সেইরকম। ডায়ারির চেয়ে চিঠি যে বেশি স্পষ্ট হল এমন মনে হচ্ছে না, কিন্তু এতে তো কোনো প্রত্যক্ষ পরিষ্কার প্রমাণ প্রয়োগ করবার জো নেই।

সিমলা

২২ অগস্ট ১৮৯৩

১১১

কলকাতা

২১ অগস্ট্। ১৮৯৩।

আজ তোর কাছ থেকে কতকগুলো খবরের কাগজের কাঁচি-ছাঁটা টুকরো পাওয়া গেল। কোথায় প্যারিসের আর্টিস্ট্-সম্প্রদায়ের উদ্দাম উন্মত্ততা আর কোথায় আমার কালীগ্রামের সরল চাষী প্রজাদের দুঃখদৈন্য-নিবেদন! আহা, এমন প্রজা আমি দেখি নি— এদের অকৃত্রিম ভালোবাসা এবং এদের অসহ্য কষ্ট দেখলে আমার চোখে জল আসে। আমার কাছে এই-সমস্ত দুঃখপীড়িত অটলবিশ্বাস-পরায়ণ অনুরক্ত ভক্ত প্রজাদের মুখে এমন একটি কোমল মাধুর্য আছে, এদের দিকে চেয়ে এবং এদের কথা শুনে সত্যি সত্যি বাৎসল্যে আমার হৃদয় বিগলিত হয়ে যায়। বাস্তবিক, এরা যেন আমার একটি দেশজোড়া বৃহৎ পরিবারের লোক। এই-সমস্ত নিঃসহায় নিরুপায় নিতান্তনির্ভরপর সরল চাষাভুষোদের আপনার লোক মনে করতে বড়ো একটা সুখ আছে। এদের ভাষা শুনতে আমার এমন মিষ্টি লাগে— তার ভিতর এমন স্নেহমিশ্রিত করুণা আছে! এরা যখন কোনো-একটা অবিচারের কথা বলে আমার চোখ ঝাপসা হয়ে আসে— অন্য নানা ছলে আমাকে সামলে নিতে হয়। এরা অনেক দুঃখ অনেক ধৈর্য-সহকারে সহ্য করেছে, তবু এদের ভালোবাসা কিছুতেই ম্লান হয় না। আজ একজন এসে বলছিল, 'সে বছর ভালো ধান হয় নি ব'লে চুঁচড়োয় বুড়ো বাপের কাছে এন্‌ছাপ নিতে গিয়েছিলুম। তা সে বললে, আমি তোদের কিছু ছেড়ে দিচ্ছি, তোরাও আমাকে কিছু খেতে দিস্। তার কাছে দরবার করতে গিয়েছিলুম ব'লে সেই মনোবাদে এখানকার আমিন আমাকে ফেরেবি মকদ্দমা করে তিন মাস জেল খাটিয়েছিল। আমি তখন তোমার মাটিকে সেলাম ক'রে ভিন এলাকায় গিয়েছিলুম।' কিন্তু

তবু তার এমনি ভক্তি যে সেই ভিন এলাকার জমিদার আমাদের কতক জমি চুরি করে ভোগ করছিল ব'লে সে এখানকার সেরেস্তায় জানিয়ে যায়, সেই রাগে তার নতুন জমিদার তার ধান-সুদ্ধ জমি কেড়ে নিয়েছে। সে বলে, 'আমি যার মাটিতে বুড়োকাল পর্যন্ত মানুষ হয়েছি তার হিতের কথা তাকে আমি বলতে পাব না!' এই ব'লে সে চোখ থেকে দুই-এক ফোঁটা জল মুছে ফেললে। তুই যদি তাকে দেখতিস, তার কথা শুনতিস, সে যে কেমন সহজে কোনো-রকম চাতুরি না ক'রে যেন একটা খবর দিয়ে যাবার মতো সমস্তটা বলে গেল, তা দেখলে এই ব্যাপারটার যথার্থ গভীরতা বুঝতে পারতিস। এদের উপর যে আমার কতখানি শ্রদ্ধা হয়, আপনার চেয়ে যে এদের কতখানি ভালো মনে হয়, তা এরা জানে না। কিন্তু তবু প্যারিসের সভ্যতা থেকে কত তফাত! সে এর চেয়ে কত কঠিন, কত উজ্জ্বল, কত সুগঠিত! তবু এখানকার মানুষের মধ্যে যে জিনিষটি আছে সে বড়ো অনাদরের নয়। যতক্ষণ না সভ্যতার মাঝখানে এই স্বচ্ছ সরলতার প্রতিষ্ঠা হয় ততক্ষণ সভ্যতা কখনোই সম্পূর্ণ এবং সুন্দর হবে না। য়ুরোপের সভ্যতা ক্রমে যেন মর্বিড হয়ে আসছে, সে কেবল এই জিনিষটির অভাবে। তার ভিতরে একটা অস্বাস্থ্য একটা কীট তাকে ক্রমাগত দংশন করে জীর্ণ করে ফেলছে। সরলতাই মানুষের স্বাস্থ্যের একমাত্র উপায়— সে যেন গঙ্গার মতো, তার মধ্যে স্নান করে সংসারের অনেক তাপ দূর হয়ে যায়। আর, য়ুরোপ সমস্ত তাপকে যেন লালন করে তুলছে এবং তার উপরে আবার সহস্রবিধ মাদকতার কৃত্রিম উত্তাপে আপনাকে রাত্রিদিন উত্তেজিত করে তুলছে। খবরের কাগজের যে-ক'টি টুকরো পাঠিয়েছিস প্রত্যেকটিতেই ঐ প্রমাণ দেয়।

সিমলা
২৪ অগস্ট, ১৮৯৩.

১১২

কর্মাঠার

শনিবার, ৯ সেপ্টেম্বর। ১৮৯৩।

গোলাপ ফুলে বাগান একেবারে আচ্ছন্ন হয়ে গেছে। একটা শিরীষ ফুলের গাছ আগাগোড়া ফুলে ভরে আছে, গন্ধে ভুর‍্ভুর‍্ করছে। শিরীষ ফুল যেমন চমৎকার দেখতে তেমনি সুন্দর গন্ধ।··· টেবিলে আমার সামনে গুটিকতক ফুল জড়ো হয়ে আছে, একেবারে যেন নরম মিষ্টি আদরের মতো, চোখের ঘুমের মতো।··· শিরীষ ফুল কালিদাসের প্রিয় ফুল ছিল। কালিদাসের বইয়ে শিরীষ ফুল সৌকুমার্যের তুলনা-স্থল ছিল।···

তুই আমাকে পূর্বের একটা চিঠিতে জিজ্ঞাসা করেছিস মানুষের সঙ্গ কেন আমার ভালো লাগে না। একটা কারণ এই বলতে পারি, মন যখন চিন্তা করে কিম্বা ভাব অনুভব করে তখন কিছুতে তার কোনো ব্যাঘাত করলে মনের সেই নিজের ভিতরে বাধাপ্রাপ্ত নিষ্ফল চেষ্টায় ভারী শ্রান্তি উপস্থিত হয়— মানুষের প্রতি মনোযোগ এবং আপনার ভাবনা ভাবা এই দুটো কাজই এক সঙ্গে করার চেষ্টা করতে গিয়ে মনটা যেন তিতিবিরক্ত হয়ে ওঠে। তবে মানুষটি যদি এমন হয় যে সে আর-সমস্ত চিন্তা ও চেষ্টা দূর করে দিয়ে একমাত্র নিজের দিকেই সমগ্র মনটি আকর্ষণ করে নিতে পারে তা হলে বড়ো আরাম পাওয়া যায়। আসল কথা এই, আমি একাগ্রভাবে কিছুতে নিবিষ্ট না থাকলে কিছুতে সুস্থির হতে পারি নে ; যে-সমস্ত জিনিষ এ বয়সে আমার সমস্ত মনটা না নেয় তারা আমাকে বড়ো ক্লান্ত করে— যেন মনের সমস্ত ভার রাখবার জায়গা পাওয়া যায় না, মাঝখানে ঝুলতে হয়।··· আমাকে চিঠি লিখেছিল— অনুরোধ করেছিল তার সঙ্গে আর-একটু জমিয়ে বন্ধুত্ব এবং ঘনিয়ে চিঠি-লেখালেখি করতে। আমি তাকে পাকে-প্রকারে লিখেছি যে, আমার শৌখিনভাবের বন্ধুত্ব করবার

সময় নেই। এ বয়সে কেবল কাজ করতে হবে, এবং পুরাতন যা-কিছু আছে তাকেই প্রাণের গভীর ভাবে উপভোগ ও আশ্রয় করতে হবে। এখন টুকিটাকির শখ মেটাতে আর প্রবৃত্তি হয় না।

সিমলা

১২ সেপ্টেম্বর ১৮৯৩

১১৩

পতিসার

রবিবার ?

১৯ ফেব্রুয়ারি। ১৮৯৪।

যে পারে বোট লাগিয়েছি এ পারে খুব নির্জন— গ্রাম নেই, বসতি নেই, চষা মাঠ ধূ ধূ করছে, নদীর ধারে ধারে খানিকটা করে শুকনো ঘাসের মতো আছে, সেই ঘাসগুলো ছিঁড়ে ছিঁড়ে গোটাকতক মোষ চরে বেড়াচ্ছে। আর, আমাদের দুটো হাতি আছে তারাও এ পারে চরতে আসে। তাদের দেখতে বেশ মজা লাগে। একটা পা উঠিয়ে ঘাসের গোড়ায় দু-চারবার একটু একটু ঠোকর মারে, তার পরে শুঁড় দিয়ে টান মারতেই বড়ো বড়ো ঘাসের চাপড়া একেবারে মাটিসুদ্ধ উঠে আসে। সেই চাপড়াগুলো শুঁড়ে করে দুলিয়ে দুলিয়ে ঝাড়ে, তার মাটিগুলো ঝরে ঝরে পড়ে যায়, তার পরে মুখের মধ্যে পুরে দিয়ে খেয়ে ফেলে। আবার এক-এক সময় খেয়াল যায়, খানিকটা ধুলো শুঁড়ে করে নিয়ে ফুঁ দিয়ে নিজের পেটে পিঠে সর্বাঙ্গে হুস করে ছড়িয়ে দেয় —এই রকম তো হাতির প্রসাধনক্রিয়া। বৃহৎ শরীর, বিপুল বল, শ্রীহীন আয়তন, অত্যন্ত নিরীহ —এই প্রকাণ্ড জন্তুটাকে দেখতে আমার বেশ লাগে। এর এই প্রকাণ্ডত্ব এবং বিশ্রীত্বর জন্যেই যেন এর প্রতি একটা কী বিশেষ স্নেহের উদ্রেক হয়— এর সর্বাঙ্গের অসৌষ্ঠব (awkwardness) থেকে একে একটা মস্ত শিশুর মতো মনে হয়— বেড়াল কুকুর ঘোড়ার চেয়ে যেন এদের প্রতি একটু বেশি মমতার সঞ্চার হয়। তা ছাড়া জন্তুটা বড়ো উদার প্রকৃতির, শিব ভোলানাথের মতো— যখন খ্যাপে তখন খুব খ্যাপে, যখন ঠাণ্ডা হয় তখন অগাধ শান্তি। আমি এক-একবার ভাবছিলুম হাতির প্রতি আমার মনের এই স্নেহরসার্দ্র ভাব, অনেকটা হয়তো পুরুষজাতির প্রতি মেয়েদের মনের ভাবের মতো। বড়োত্বর সঙ্গে সঙ্গে যে-এক-রকম

শ্রীহীনত্ব আছে তাতে অন্তরকে বিমুখ করে না, বরঞ্চ আকর্ষণ করে আনে। আমার ঘরে যে বেঠোভেনের ছবি আছে, অনেক সুন্দর মুখের সঙ্গে তুলনা করলে তাকে দর্শনযোগ্য মনে না হতে পারে, কিন্তু আমি যখন তার দিকে চাই সে আমাকে খুব টেনে নিয়ে যায়— ঐ উস্কোখুস্কো মাথাটার ভিতরে কত বড়ো একটা শব্দহীন শব্দজগৎ! এবং কী একটা অপরিসীম বেদনা রুদ্ধ ঝড়ের মতো ঐ লোকটার ভিতরে ঘূর্ণ্যমান হত। ব··কে দেখলেও আমার ঐ রকমের একটা সসম্ভ্রম করুণার উদয় হয়— ওঁর সমস্ত অপরিচ্ছন্ন অনবধানের মধ্যে একটা অশান্ত অসম্পূর্ণ ক্লিষ্ট প্রতিভা প্রকাশ পায়। সব পুরুষ বেঠোভেন কিম্বা ব·· নয়, এবং বেঠোভেন ও ব··কে যে মেয়েরা ভালোবাসে তাও নয়— কিন্তু ওঁদের মধ্যে আমি খুব একটা সৌন্দর্য দেখতে পাই। সাধারণত পুরুষদের বলের সঙ্গে সঙ্গে একটা অকওয়ার্ড্ অসহায়তা এবং বুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বহুল পরিমাণে জড়বুদ্ধিত্ব মিশল আছে বলে তাদেব প্রতি মেয়েদের মনে কিয়ংপরিমাণে শ্রদ্ধার সহিত অনেকটা পরিমাণে মাতৃস্নেহের উদ্রেক হয়। আমার বোধ হয় ছেলেরা যত বেশি মাতৃস্নেহ জাগ্রত করতে পারে এমন মেয়েরা নয়। যা হোক, এ সব কথা অনেকটা আনুমানিক— নিজের প্রকৃতির মধ্যে যে-একটা মেয়েলি অংশ আছে তারই কাছ থেকে যেটুকু আভাস পাওয়া যায়।

কলকাতা। ২০ ফেব্রুয়ারি ১৮৯৪

রবীন্দ্রনাথ ১১৩-সংখ্যক পত্রে এবং পরবর্তী বহু পত্রে যুগপৎ বার ও তারিখ লিখিয়াছিলেন, শতাব্দ-পঞ্জী মিলাইয়া দেখিলে উভয়ের সংগতি দেখা যায় না। রবিবার, শুক্রবার, মঙ্গলবার— যথাক্রমে শনি, বৃহস্পতি, সোম হইলে অমিল হইত না। ১৮৯৪ সনের পরিবর্তে ১৮৯৩ সনের ডায়ারি দেখিলে বারে ও তারিখে আশ্চর্য মিল দেখা যায়— ইহাও বিবেচনার বিষয়।

১১৪

পতিসার

রবিবার ?

২৬ ফেব্রুয়ারি। ১৮৯৪।

মাঝে মাঝে মেঘ করছে, মাঝে মাঝে পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে— থেকে থেকে হঠাৎ হুহু করে একটা হাওয়া এসে আমার বোটের গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে বিচিত্র কঁ্যা-কেঁ্যাঃ শব্দে আর্তনাদ তুলছে— আজ দুপুর বেলাটা এমনি ভাবে চলছে।··· এখন বেলা একটা বেজেছে— তোরা যথানিয়মে আহারাদি করে হিসেবপত্র দেখে এতক্ষণ বোধ হয় রুদ্ধদ্বার শয়নালয়ে নিদ্রা দিতে গেছিস। পাড়াগেঁয়ে মধ্যাহ্নের এই হাঁসের ডাক, পাখির ডাক, কাপড় কাচার শব্দ, নৌকো-চলা জলের ছল্ ছল্ ধ্বনি, দূরে গোরুর পাল পার করবার হৈ হৈ রব, এবং আপনার মনের ভিতরকার একটা উদাস আলস্যপূর্ণ স্বগত সংগীত-স্বর কলকাতার চৌকি-টেবিল-সমাকীর্ণ বর্ণবৈচিত্র্যবিহীন নিত্য-নৈমিত্তিকতার মধ্যে কল্পনাও করতে পারি নে। কলকাতাটা বড়ো ভদ্র এবং বড়ো ভারী, গবর্মেণ্টের আপিসের মতো। জীবনের প্রত্যেক দিনটাই যেন একই আকারে একই ছাপ নিয়ে টাঁকশাল থেকে তক্‌তকে হয়ে কেটে কেটে বেরিয়ে আসছে— নীরস মৃত দিন, কিন্তু খুব ভদ্র এবং সমান ওজনের। এখানে আমি দলছাড়া, এবং এখানকার প্রত্যেক দিন আমার নিজের দিন— নিত্য-নিয়মিত-দম-দেওয়া কলের সঙ্গে কোনো যোগ নেই। আমার আপনার মনের ভাবনাগুলি এবং অখণ্ড অবসরটিকে হাতে করে নিয়ে মাঠের মধ্যে বেড়াতে যাই— সময় কিম্বা স্থানের মধ্যে কোনো বাধা নেই। সন্ধেটা জলে স্থলে আকাশে ঘনিয়ে আসতে থাকে, আমি মাথাটা নিচু করে আস্তে আস্তে বেড়াতে থাকি।

কলকাতা

২৭ ফেব্রুয়ারি ১৮৯৪

১১৫

পতিসার

শুক্রবার রাত্রি ?

[১৭ মার্চ, ১৮৯৪]

জ্যোৎস্না প্রতি রাত্রেই অল্প অল্প করে ফুটে উঠছে। আমি তাই আজকাল সন্ধের পরেও অনেক ক্ষণ বাইরে বেড়াই। নদীর এ পারের মাঠে কোথাও কিছু সীমাচিহ্ন নেই, গাছপালা নেই— চষা মাঠে একটি ঘাসও নেই, কেবল নদীর ধারের ঘাসগুলো প্রখর রৌদ্রে শুকিয়ে হলদে হয়ে এসেছে। জ্যোৎস্নায় এই ধূ ধূ শূন্য মাঠ ভারী অপূর্ব দেখতে হয়— সমুদ্র এই রকম অসীম বলে মনে হয়, কিন্তু তার একটা অবিশ্রাম গতি এবং শব্দ আছে— এই মাটির সমুদ্রের কোথাও কিছু গতি নেই, শব্দ নেই, বৈচিত্র্য নেই, প্রাণ নেই— ভারী একটা উদাস মৃত শূন্যতা— চলবার মধ্যে কেবল এক প্রান্তে আমি একটি প্রাণী চলছি এবং আমার পায়ের কাছে একটি ছায়া চলে বেড়াচ্ছে। বহুদূরের মাঠে এক-এক জায়গায় যেখানে গত শস্যের শুকনো গোড়া কিছু অবশিষ্ট ছিল সেইখানে চাষারা আগুন লাগিয়ে দিয়েছে, মাঝে মাঝে কেবল সেই আগুনের শ্রেণী দেখা যাচ্ছে। এমন একটা প্রকাণ্ড বিস্তারিত প্রাণহীনতার উপর যখন অস্পষ্ট চাঁদের আলো এসে পড়ে তখন যেন একটা বিশ্বব্যাপী বিচ্ছেদশোকের ভাব মনে আসে— যেন একটি মরুময় বৃহৎ গোরের উপরে একটি শাদা-কাপড়-পরা মেয়ে উপুড় হয়ে মুখ ঢেকে মূর্ছিতপ্রায় নিস্তব্ধ পড়ে রয়েছে।

কলকাতা

১৯ মার্চ ১৮৯৪

১১৬

পতিসর

২১ মার্চ্‌। ১৮৯৪।

এখানকার প্রজাদের উপর বাস্তবিক মনের স্নেহ উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে— এদের কোনোরকম কষ্ট দিতে আদবে ইচ্ছে করে না— এদের সরল ছেলেমানুষের মতো অকৃত্রিম স্নেহের আবদার শুনলে বাস্তবিক মনটা আর্দ্র হয়ে ওঠে। যখন তুমি বলতে বলতে তুই ব'লে ওঠে, যখন আমাকে ধমকায় তখন ভারী মিষ্টি লাগে। এক-এক সময় আমি ওদের কথা শুনে হাসি, তাই দেখে ওরাও হাসে। সেদিন আমি সন্ধের সময় বেড়াচ্ছিলুম একজন প্রজা এসে বললে 'একটু খাড়া হও তুমি'— আমি কিছু আশ্চর্য হয়ে চুপ করে দাঁড়ালুম। সে আমার পায়ের ধুলো নিয়ে বুকে মাথায় মেখে বললে, 'আমার জনম সার্থক হল।' সে বললে, তার কাশি এবং জ্বর হয়েছিল, তিন দিন লঙ্ঘন দিয়ে (অর্থাৎ উপবাস ক'রে) ছিল, আজ অন্ন পথ্য করে আমার পদধূলি নিতে এসেছে। তার সরল ভক্তির গুণে আমার পায়ের ধুলোর যদি কোনো ফল ফলে বলতে পারি নে। ভক্তি ভালোবাসা স্নেহ অযথা পরিমাণে এবং অযোগ্য পাত্রে পড়লেও তার এমন একটি আশ্চর্য সৌন্দর্য আছে— আমার এখানকার প্রজারা সেই পরিপূর্ণ ভক্তির সরলতায় সুন্দর। তাদের রেখাঙ্কিত বৃদ্ধমুখের মধ্যেও একটি শৈশবের সৌকুমার্য আছে। কিন্তু এসব কথা তোকে পূর্বের চিঠিতে অনেকবার বলেছি— অতএব দূর থেকে তোর কাছে এ-সমস্তই পুরাতন পুনরুক্তি মনে হতে পারে। কিন্তু আমার কাছে প্রতিদিন প্রতিবার নতুন করে ঠেকে। এই প্রাচীন পৃথিবীতে কেবল সৌন্দর্য এবং মানুষের হৃদয়ের জিনিযগুলো কোনোকালেই কিছুতেই পুরোনো হয় না, তাই এই পৃথিবীটা তাজা রয়েছে এবং কবির কবিতা কোনো-কালেই একেবারে নিঃশেষ হয়ে যায় না।

কলকাতা। ২২ মার্চ্‌ ১৮৯৪

পতিসর

বুধবার ?

২২ মার্চ্‌। ১৮৯৪।

'পশুপ্রীতি' বলে ব[লু] একটা প্রবন্ধ লিখে পাঠিয়েছে, আজ সমস্ত সকাল বেলায় সেইটে নিয়ে পড়েছিলুম। কাল আমি বোটে বসে জানলার বাইরে নদীর দিকে চেয়ে আছি এমন সময় হঠাৎ দেখি— একটা কী পাখি সাঁৎরে তাড়াতাড়ি ওপারের দিকে চলে যাচ্ছে আর তার পিছনে মহা ধর্‌-ধর্‌ মার্‌-মার্‌ রব উঠেছে। শেষকালে দেখি একটি মুরগি— তার আসন্ন মৃত্যুকালে আমার বাবুর্চিখানার নৌকো থেকে হঠাৎ কিরকম ছাড়া পেয়ে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে পেরিয়ে যাবার চেষ্টা করছিল, ঠিক যেই তীরের কাছে গিয়ে পৌঁচেছে অমনি যমদূত মানুষ ক্যাঁক্‌ করে তার গলা টিপে ধরে আবার নৌকো করে ফিরিয়ে নিয়ে এল। আমি ফটিককে ডেকে বললুম আমার জন্যে আজ মাংস হবে না। এমন সময় ডাকে বলুর 'পশুপ্রীতি' লেখাটা এসে পৌঁছল, আমি পেয়ে কিছু আশ্চর্য হলুম। আমার তো আর মাংস খেতে রুচি হয় না [বব্‌]। আমরা যে কী অন্যায় এবং কী নিষ্ঠুর কাজ করি তা ভেবে দেখি নে ব'লে মাংস গলাধঃকরণ করতে পারি। পৃথিবীতে অনেক কাজ আছে যার দূষণীয়তা মানুষের স্বহস্তে গড়া— যার ভালোমন্দ অভ্যাসপ্রথা - দেশাচার - লোকাচার - সমাজনিয়মের উপর নির্ভর করে, কিন্তু নিষ্ঠুরতা সে রকম নয়। এটা একেবারে আদিম দোষ— এর মধ্যে কোনো তর্ক নেই, কোনো দ্বিধা নেই; হৃদয় যদি আমাদের অসাড় না হয়, হৃদয়কে যদি চোখ বেঁধে অন্ধ করে না রেখে দিই তা হলে নিষ্ঠুরতার বিরুদ্ধে নিষেধ একেবারে স্পষ্ট শুনতে পাই। অথচ ওটা আমরা হেসে খেলে সকলে মিলে খুব অনায়াসে আনন্দ-সহকারে করে থাকি; এমন-কি, যে না করে তাকে কিছু

অদ্ভুত বলে মনে হয়। পাপপুণ্য সম্বন্ধে মানুষের এমনি একটা কৃত্রিম অপূর্ব ধারণা। আমার বোধ হয় সকল ধর্মের শ্রেষ্ঠ ধর্ম সর্ব জীবে দয়া। প্রেম হচ্ছে সমস্ত ধর্মের মূল ভিত্তি। জগতে আমা হতে যেন দুঃখের সৃজন না হয়ে সুখের বিস্তার হতে থাকে। আমি যেন সকল প্রাণীর সুখ দুঃখ বেদনা বুঝে নিজের স্বার্থের জন্যে কাউকে আঘাত না করি —এই যথার্থ ধর্ম, এই যথার্থ ঈশ্বরচরিত্রের আদর্শে আপনাকে গঠিত করা। সেদিন একটা ইংরিজি কাগজে পড়লুম, পঞ্চাশ হাজার পৌন্‌ড্ মাংস ইংলন্‌ড্ থেকে আফ্রিকার কোনো-এক সেনানিবাসে পাঠানো হয়েছিল। মাংসটা খারাপ হওয়াতে তারা ফিরে পাঠিয়ে দেয়, তার পরে সেই মাংস পোর‍্ট্‌স্‌মাউথে পাঁচ-ছ শো টাকায় নিলেম হয়ে যায় — ভেবে দেখ্ দেখি [বব] জীবের জীবনের কী ভয়ানক অপব্যয় এবং কী অল্প মূল্য! আমরা যখন একটা খানা দিই তখন কত প্রাণী কেবলমাত্র ডিশ-পূরণের জন্যে আত্মবিসর্জন দেয়; হয়তো কেবল ফিরে ফিরে যায়, কেউ নেয় না। যতক্ষণ আমরা অচেতন ভাবে থাকি এবং অচেতন ভাবে হিংসা করি ততক্ষণ আমাদের কেউ দোষ দিতে পারে না। কিন্তু যখন মনে দয়া উদ্রেক হয় তখন যদি সেই দয়াটাকে গলা টিপে মেরে দশজনের সঙ্গে মিশে হিংস্রভাবে কাজ করে যাই, তা হলেই যথার্থ আপনার সমস্ত সাধুপ্রকৃতিকে অপমান করা হয়। আমি তো মনে করেছি [বব] আরও একবার নিরামিষ খাওয়া ধরে দেখব। ··

(আমার একটি নির্জনের প্রিয়বন্ধু জুটেছে— আমি লো [কেনে] র ওখেন থেকে তার একখানা Amiel's Journal ধার করে এনেছি— যখনি সময় পাই সেই বইটা উল্টে-পাল্টে দেখি। ঠিক মনে হয় তার সঙ্গে মুখোমুখি হয়ে কথা কচ্ছি— এমন অন্তরঙ্গ বন্ধু আর খুব অল্প ছাপার বইয়ে পেয়েছি। অনেক বই এর চেয়ে ভালো লেখা

আছে এবং এ বইয়ের অনেক দোষ থাকতে পারে, কিন্তু এ বইটি আমার মনের মতো বই। অনেক সময় আসে যখন সব বই ছুঁয়ে ছুঁয়ে ফেলে দিতে হয়, কোনো বই ঠিক আরামের বোধ হয় না— যেমন রোগের সময় অনেক সময় বিছানায় ঠিক আরামের অবস্থাটি পাওয়া যায় না, নানা রকমে পাশ ফিরে দেখতে ইচ্ছে করে, কখনো বালিশের উপর বালিশ চাপাই, কখনো বালিশ ফেলে দিই— সেই রকম মানসিক অবস্থায় আমিয়েলের যেখানেই খুলি সেখানেই মাথাটি ঠিক গিয়ে পড়ে, শরীরটা ঠিক বিশ্রাম পায়। আমার সেই অন্তরঙ্গ বন্ধু আমিয়েল পশুদের প্রতি মানুষের নিষ্ঠুরতা সম্বন্ধে এক জায়গায় লিখেছে— [বলুর] লেখায় আমি সেইটে সমস্তটা নোট বসিয়ে দিয়েছি। সব-সুদ্ধ [বলুর] এ লেখাটা আমার তেমন ভালো লাগে নি —অনেকটা যেন টেনেটুনে গড়ে পিটে লিখেছে। ঠিক যেন সমস্ত মনের সঙ্গে লেখে নি— ইনিয়ে-বিনিয়ে বানিয়ে-বানিয়ে লিখেছে— সহৃদয়তাপূর্ণ অত্যুক্তিশূন্য সত্যের সরলতার সুর দিচ্ছে না।··· বানানো কথা অনেক স্থলে দূষণীয় নয়, কিন্তু এ রকম জিনিষ ঠিক খাঁটি না হলে মনটা ভারী বিমুখ ও বিরক্ত হয়ে ওঠে। কাদম্বরীর সেই মৃগয়া -বর্ণনা থেকে অনেকটা আমি [বলুকে] তর্জমা করতে বলে দিয়েছি। পাখিরাও যে কতটা আমাদেরই মতো— একটা জায়গা আছে যেখানে তাতে আমাতে প্রভেদ নেই— পাখির সন্তানবাৎসল্য প্রাণের মমতা ঠিক আমাদেরই মতো— এইটে বাণভট্ট আপন করুণ কল্পনাশক্তির দ্বারা অনুভব ও প্রকাশ করেছেন— সেই touch of nature makes the whole world kin !

কলকাতা

২৩ মার্চ ১৮৯৪

১১৮

পতিসর

২৪ মার্চ্‌। ১৮৯৪।

আজকাল আমার সন্ধ্যাভ্রমণের একমাত্র সঙ্গীটির অভাব হয়েছে, সেটি আর কেউ নয়, আমাদের শুক্লপক্ষের চাঁদ। কাল থেকে আর তাঁর দেখা নেই। ভারী অসুবিধে হয়েছে, শীঘ্রই অন্ধকার হয়ে যায়, যথেষ্ট বেড়াবার পক্ষে একটু ব্যাঘাত জন্মায়।··· ··· আজকাল ভোরের বেলায় চোখ মেলেই ঠিক আমার খোলা জানলার সামনেই শুকতারা দেখতে পাই, তাকে আমার ভারী মিষ্টি লাগে— সেও আমার দিকে চেয়ে থাকে, ঠিক তোদের কারও একজনের মতো মনে হয়, যেন বহুকালের আমার আপনার লোক। মনে আছে যখন শিলাইদহে কাছারি করে সন্ধেবেলায় নৌকো করে নদী পার হতুম এবং রোজ আকাশে সন্ধ্যাতারা দেখতে পেতুম, আমার ভারী একটা সান্ত্বনা বোধ হত— ঠিক মনে হত আমার নদীটি যেন আমার ঘর সংসার, এবং আমার সন্ধ্যাতারাটি আমার এই ঘরের গৃহলক্ষ্মী, আমি কখন্‌ কাছারি থেকে ফিরে আসব এই জন্যে সে উজ্জ্বল হয়ে সেজে বসে আছে। তার কাছ থেকে এমন একটি চোখের দৃষ্টি এমন একটি স্নেহস্পর্শ পেতুম! তখন নদীটি নিস্তব্ধ হয়ে থাকত, বাতাসটি ঠাণ্ডা, কোথাও কিছু শব্দ নেই, ভারী যেন একটা ঘনিষ্ঠতার ভাবে আমার সেই প্রশান্ত সংসারটি পরিপূর্ণ হয়ে থাকত। আমার সেই শিলাইদহে প্রতি সন্ধ্যায় নিস্তব্ধ অন্ধকারে নদী পার হওয়াটা খুব সুস্পষ্টরূপে প্রায়ই মনে পড়ে। ভোরের বেলায় প্রথম দৃষ্টিপাতেই শুকতারাটি দেখে, তাকে আমার একটি বহুপরিচিত সহাস্যসহচরী না মনে করে থাকতে পারি নে— সে যেন একটি চিরজাগ্রত কল্যাণকামনার মতো ঠিক আমার নিদ্রিত মুখের উপর প্রফুল্ল স্নেহ বিকিরণ করতে থাকে।···

আজ বেড়িয়ে বোটে ফিরে এসে দেখি বাতির কাছে এত বেশি

পতঙ্গের ভিড় হয়েছে যে টেবিলে বসা অসাধ্য। আজ তাই বাতি নিবিয়ে দিয়ে বাইরে কেদারা নিয়ে অন্ধকারে বসেছিলুম— আকাশের সমস্ত জ্যোতির্জগৎ সমস্ত লোকলোকান্তর অনন্ত রহস্যের অন্তঃপুর -বাসিনী মেয়ের দলের মতো উপরের তলার খড়্‌খড়ি থেকে আমাকে দেখছিল, আমি তাদের কিছুই জানি নে এবং কোনোকালেই জানতে পাব কিনা তাও জানি নে— অথচ ঐ জ্যোতির্ময়গুলীর মধ্যে বিচিত্র জীবনের অনন্ত ইতিহাস প্রবাহিত হয়ে যাচ্ছে। আজ সন্ধের সময় তোকে আর চিঠি লেখা হয়ে ওঠে নি, তাই এখন লিখছি। এখন কত রাত হবে বল্‌ দেখি? এগারোটা। এখন বোধ হয় তুই বিছানার মধ্যে অগাধ নিদ্রায় আচ্ছন্ন। যখন চিঠিটা পাবি তখন দিনের বেলাকার প্রখর আলোকে খুবই সজাগ সচঞ্চল, নানান কাজে ব্যস্ত —তখন কোথায় এই সুষুপ্ত নিস্তব্ধ রাত্রি, কোথায় ঐ অনন্ত বিশ্ব-লোকের জ্যোতির্ময় শব্দহীন বার্তা! এত সুতীব্র প্রভেদ! কিছুতে ঠিক ভাবটি মনে আনা যায় না। মানুষের মনের ক্ষমতা এত সামান্য। যে খুবই পরিচিত, চোখ বুজে তার আকৃতির প্রত্যেক রেখাটি মনে আনা যায় না— এক সময় যা সর্বপ্রধান আর-এক সময় তা যথার্থরূপে স্মৃতিগম্য করাও শক্ত হয়ে ওঠে। দিনের বেলায় রাতকে ভুলি, রাতের বেলায় দিনকে ভুলি। আমার এ চিঠি পড়ে বেশ বুঝতে পারবি এটা অর্ধরাত্রির চিঠি।… …

চাঁদের খণ্ড অনেক ক্ষণ হল উঠেছে— চতুর্দিক একেবারে নিস্তব্ধ নিদ্রিত, কেবল গ্রামের গোটা-দুই কুকুর ওপার থেকে ডাকছে, আমার এই বোটে কেবল একটি বাতি জ্বলছে, আর সব জায়গায় আলো নিবেছে। নদীতে একটু গতি মাত্র নেই, তাতেই মনে হয় মাছগুলো রাত্তিরে ঘুমোয়। জলের ধারে সুপ্ত গ্রাম এবং জলের উপর গ্রামের সুপ্ত ছায়া।

কলকাতা
২৫ মার্চ ১৮৯৪

১১৯

পতিসর

মঙ্গলবার ?

২৮ মার্চ্‌। ১৮৯৪।

এ দিকে গরমটাও বেশ পড়েছে। কিন্তু রৌদ্রের উত্তাপটাকে আমি বড়ো একটা গ্রাহ্য করি নে, সে বোধ হয় তুই জানিস। তপ্ত বাতাস ধুলোবালি খড়কুটো উড়িয়ে নিয়ে হূহু শব্দ করে ছুটেছে— প্রায়ই হঠাৎ এক-এক জায়গায় একটা আজগবি ঘূর্ণি বাতাস দাঁড়িয়ে উঠে শুকনো পাতা এবং ধুলোর ওড়না ঘুরিয়ে ঘুরতে-ঘুরতে নেচে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে— সেটা দেখতে বেশ লাগে। নদীর ধারে বাগান থেকে পাখিগুলো ভারী মিষ্টি করে ডাকছে— মনে হচ্ছে ঠিক বসন্তই বটে, খোলা থেকে একেবারে গরম গরম নাবিয়ে এনেছে। কিন্তু গরমটা কিঞ্চিৎপরিমাণে বেশি, আর একটুখানি জুড়িয়ে আনলে বিশেষ ক্ষতি ছিল না। কিন্তু আজ সকাল বেলাটায় হঠাৎ দিব্যি ঠাণ্ডা পড়েছিল —এমন-কি প্রায় শীতকালেরই মতো, স্নান করবার সময় মনে খুব প্রবল উৎসাহ ছিল না। এই প্রকৃতি-নামক একটা বৃহৎ ব্যাপারের মধ্যে কখন যে কী হচ্ছে তার হিসেব পাওয়া শক্ত— কোথায় তার কোন্‌ অজ্ঞাত কোণে কী-একটা কাণ্ড ঘটছে আর অকস্মাৎ চার দিকের সমস্ত ভাবখানা বদলে যাচ্ছে। আমি কাল ভাবছিলুম মানুষের মনখানাও ঠিক ঐ প্রকাণ্ড প্রকৃতির মতো রহস্যময়। চতুর্দিকে শিরা উপশিরা স্নায়ু মস্তিষ্ক মজ্জার ভিতর কী এক অবিশ্রাম ইন্দ্রজাল চলছে —হু হুঃ শব্দে রক্তস্রোত ছুটেছে, স্নায়ুগুলো কাঁপছে, হৃৎপিণ্ড উঠছে পড়ছে, আর এই রহস্যময়ী মানবপ্রকৃতির মধ্যে ঋতুপরিবর্তন হচ্ছে। কোথা থেকে কখন্‌ কী হাওয়া আসে আমরা কিছুই জানি নে। আজ মনে করলুম জীবনটা দিব্যি চালাতে পারব— বেশ বল আছে, সংসারের দুঃখযন্ত্রণাগুলোকে একেবারে ডিঙিয়ে চলে যাব।

এই ভেবে সমস্ত জীবনের প্রোগ্রামটি ছাপিয়ে এনে শক্ত করে বাঁধিয়ে পকেটে রেখে নিশ্চিন্ত হয়ে বসে আছি— কাল দেখি কোন্ অজ্ঞাত রসাতল থেকে আর-একটা হাওয়া দিয়েছে, আকাশের ভাবগতিক সমস্ত বদলে গেছে, তখন আর কিছুতেই মনে হয় না এ দুর্যোগ কোনোকালে কাটিয়ে উঠতে পারব। এ-সব উৎপত্তি কোন্‌খানে? কোন্ শিরার মধ্যে স্নায়ুর মধ্যে কী একটা নড়্‌চড়্ হয়ে গেছে, মাঝের থেকে আমি আমার সমস্ত বলবুদ্ধি নিয়ে আর কুলিয়ে উঠতে পারি নে। নিজের ভিতরকার এই অপার রহস্যের কথা মনে করলে ভারী ভয় হয়— কী করতে পারব না-পারব কিছুই জোর করে বলতে পারি নে— মনে হয়, কিছুই না জেনে আমি এ কী একটা প্রকাণ্ড কাণ্ড সর্বদাই স্কন্ধে বহন করে নিয়ে বেড়াই, আয়ত্তও করতে পারি নে, অথচ এর হাতও কিছুতেই এড়াতে পারি নে— জানি নে এ আমাকে কোথায় নিয়ে যাবে, আমিই বা একে কোথায় নিয়ে যাব— আমার স্কন্ধে এই ভয়ংকর রহস্যভারটা যোজনা করে দেবার কী আবশ্যক ছিল! বুকের ভিতর কী হয়, শিরার মধ্যে কী চলছে, মস্তিষ্কের মধ্যে কী নড়ছে, কত কী অসংখ্য কাণ্ড আমাকে অবিশ্রাম আচ্ছন্ন করে ঘটছে, আমি দেখতেও পাচ্ছি নে, আমার সঙ্গে পরামর্শও করছে না, অথচ সব-সুদ্ধ নিয়ে খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে কর্তাব্যক্তির মতো মুখ করে মনে করছি আমি একজন আমি! তুমি তো ভারী তুমি— তোমার নিজের কতটুকুই বা জানো তার ঠিক নেই। আমি তো অনেক ভেবে-চিন্তে এইটুকু ঠিক করেছি আমি নিজেকে কিছুই জানি নে। আমি একটা সজীব পিয়ানো যন্ত্রের মতো— ভিতরে অন্ধকারের মধ্যে অনেকগুলো তার এবং কল-বল আছে; কখন কে এসে বাজায় কিছুই জানি নে, কেন বাজে তাও সম্পূর্ণ বোঝা শক্ত, কেবল কী বাজে সেইটেই জানি— সুখ বাজে কি ব্যথা বাজে, কড়ি বাজে কি

কোমল বাজে, তালে বাজে কি বেতালে বাজে এইটুকুই বুঝতে পারি। আর জানি আমার অক্টেভ নীচের দিকেই বা কতদূর উপরের দিকেই বা কতদূর। না, তা'ও কি ঠিক জানি? আমি সিম্প্যাথেটিক গ্র্যান্ড্ পিয়ানো কি কটেজ পিয়ানো সে সম্বন্ধেও ভ্রম হয়।

কলকাতা

২৯ মার্চ ১৮৯৪

১২০

পতিসর

বৃহস্পতিবার ?

৩০ মার্চ্। ১৮৯৪।

এত অকারণ আশঙ্কা এবং কষ্ট মানুষের অদৃষ্টে থাকে! ছোটো বড়ো এত সহস্র বিষয়ের উপর আমাদের মনের সুখ শান্তি নির্ভর করে! কাল অনর্থক অনেক ক্ষণ পর্যন্ত নিরুপায় ভাবে দুঃখ ভোগ করেছি। অনেক দুঃখ আছে যা আমার নিজকৃত এবং যা সবিনয়ে সহিষ্ণুভাবে বহন করা কর্তব্য মনে হয়; কিন্তু চিঠি না পেয়ে যখন আশঙ্কা হয় যে বুঝি একটা-কিছু বিপদ কিম্বা ব্যামো হয়েছে তখন কষ্টটাকে শান্ত করবার জন্যে হাতের কাছে কোনো ফিলজফিই পাওয়া যায় না। তখন বুদ্ধিটাও একেবারে কাজের বার হয়ে যায়। কাল সমস্ত ক্ষণ বেড়াতে বেড়াতে এমন-সকল অসম্ভব এবং অসংগত কল্পনা মনে উদয় হচ্ছিল এবং বুদ্ধি তার কোনো প্রতিবাদ করছিল না যে, আজ তা স্মরণ করে হাসিও পাচ্ছে লজ্জাও বোধ হচ্ছে। অথচ স্থির নিশ্চয় জানি যে, আসছে বারে যেদিন এই রকম ঘটনা হবে, ঠিক আবার এরই পুনরাবৃত্তি হবে। আমি তো তোকে অনেকবার বলেছি— বুদ্ধিটা মানুষের নিজস্ব জিনিষ নয়, ওটা এখনও আমাদের মনের মধ্যে ন্যাচরলাইজ্‌ড্‌ হয়ে যায় নি।...

যখন মনে করি জীবনের পথ সুদীর্ঘ এবং দুঃখকষ্টের কারণ অসংখ্য এবং অবশ্যম্ভাবী তখন এক-এক সময় মনের বল রক্ষা করা প্রাণপণ কঠিন হয়ে পড়ে। যখন দুদিন কোনো কারণে চিঠি না পেলে এতটা বেশি অধৈর্য উপস্থিত হয় তখন নিজের উপর বিশ্বাস চলে যায়। অনেক সময় সন্ধের সময় একলা বসে বসে টেবিলের বাতির আলোর দিকে দৃষ্টি নিবিষ্ট করে মনে করি জীবনটাকে বীরের মতো অবিচলিত-ভাবে নীরবে এবং বিনা অভিযোগে বহন করব— সেই কল্পনায় মনটা

উপস্থিতমত অনেকখানি স্ফীত হয়ে ওঠে এবং আপনাকে হাতে হাতে একজন মস্ত বীরপুরুষ বলে ভ্রম হয়। তার পরে পথ চলতে পায়ে যেই কুশের কাঁটাটি ফোটে অমনি যখন লাফিয়ে উঠি তখন ভবিষ্যতের পক্ষে ভারী সন্দেহ উপস্থিত হয়, তখন আবার জীবনটাকে সুদীর্ঘ এবং আপনাকে সম্পূর্ণ অযোগ্য মনে হয়। কিন্তু সে যুক্তিটা বোধ হয় ঠিক নয়— বাস্তবিক, বোধ হয় কুশের কাঁটায় বেশি অস্থির করে। মনের ভিতরে একটি গোছালো গিন্নিপনা দেখা যায়— সে দরকার বুঝে ব্যয় করে, সামান্য কারণে বলের অপব্যয় করতে চায় না। সে যেন বড়ো বড়ো সংকট এবং আত্মত্যাগের জন্যে আপনার সমস্ত বল কৃপণের মতো সযত্নে সঞ্চয় করে রাখে। ছোটো ছোটো বেদনায় হাজার কান্নাকাটি করলেও তার রীতিমত সাহায্য পাওয়া যায় না। কিন্তু যেখানে দুঃখ গভীরতম সেখানে তার আলস্য নেই। এই জন্যে জীবনে একটা প্যারাডক্স্ প্রায়ই দেখা যায় যে, বড়ো দুঃখের চেয়ে ছোটো দুঃখ যেন বেশি দুঃখকর। তার কারণ, বড়ো দুঃখে হৃদয়ের যেখানটা বিদীর্ণ হয়ে যায় সেইখান থেকেই একটা সান্ত্বনার উৎস উঠতে থাকে, মনের সমস্ত দলবল সমস্ত ধৈর্য এক হয়ে আপনার কাজ করতে থাকে— তখন দুঃখের মাহাত্ম্যের দ্বারাই তার সহ্য করবার বল বেড়ে যায়। মানুষের হৃদয়ে এক দিকে যেমন সুখলাভের ইচ্ছা তেমনি আর-এক দিকে আত্মত্যাগের ইচ্ছাও আছে; সুখের ইচ্ছা যখন নিষ্ফল হয় তখন আত্মত্যাগের ইচ্ছা বলিষ্ঠ হয়ে ওঠে এবং সেই ইচ্ছার চরিতার্থতা সাধন করবার অবসর পেয়ে মনের ভিতরে একটা উদার উৎসাহ সঞ্চার হয়। ছোটো দুঃখের কাছে আমরা কাপুরুষ, কিন্তু বড়ো দুঃখ আমাদের বীর করে তোলে, আমাদের যথার্থ মনুষ্যত্বকে জাগ্রত করে দেয়। তার ভিতরে একটা সুখ আছে। দুঃখের সুখ ব'লে একটা কথা অনেক দিন থেকে প্রচলিত

আছে, সেটা নিতান্ত বাক্‌চাতুরী নয়— এবং সুখের অসন্তোষ একটা আছে সেও সত্যি। তার মানে বেশি শক্ত নয়। যখন আমরা নিছক সুখভোগ করতে থাকি তখন আমাদের মনের একার্ধ অকৃতার্থ থাকে, তখন একটা কিছুর জন্যে দুঃখভোগ এবং ত্যাগ স্বীকার করতে ইচ্ছে করে, নইলে আপনাকে সুখলাভের অযোগ্য বলে মনে হয়— এই কারণেই যে সুখের সঙ্গে দুঃখ মিশ্রিত সেই সুখই স্থায়ী এবং সু-গভীর, তাতেই যথার্থ আমাদের সমস্ত প্রকৃতির চরিতার্থতা-সাধন হয়।

কিন্তু সুখদুঃখের ফিলজফি ক্রমেই বেড়ে চলতে লাগল। সুন্দর-রূপে জীবন ধারণ করাটাকে যদি একটা আর্টের মধ্যে গণ্য করতে হয় তা হলে এ ফিলজফির বিশেষ আবশ্যক আছে, কিন্তু চিঠি লেখাটারও একটা আর্ট্ আছে— সেটাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করা উচিত হয় না। অনেক জিনিষ আছে যা নিজের আবশ্যকীয়; সুখ দুঃখ সম্বন্ধে সমস্ত কথা বেশ পাকাপাকি করে বেঁধে নিতে পারলে আমার অনেক সাহায্যে লাগে, সেই জন্যে চিঠি লেখার উপলক্ষ্যে নিজের স্বগত উক্তিকে সুব্যক্ত পরিস্ফুট করে তোলবার ইচ্ছে হয়— কিন্তু সে কাজটা সব সময়ে ঠিক সংগত হয় না।...

কিন্তু এত ঠিকঠাক হিসেব মিলিয়ে আশা করতে গেলে কপালে দুঃখ ঘটবার সম্ভাবনা— অতএব আগামী কল্য চিঠি পাব না এই-রকমই স্থির করলুম। কাল না পাই পরশু তো পাবই— কিন্তু ঐ 'পাবই' শব্দের 'ই' অক্ষরটা বড়ো ভালো নয়, ঐ 'ই' অক্ষরটাতেই কাল আমাকে বিশেষ নাকাল করেছে। জীবনের সমস্ত হিসাব থেকে যত্ন-পূর্বক সাবধানে ঐ 'ই' অক্ষরটা বাদ দেওয়া কর্তব্য— জীবনধারণ-রূপ আর্টের এই একটা প্রধান নিয়ম। ওর হাত থেকে পরিত্রাণ পাওয়া বড়ো শক্ত— একেবারে জোঁকের মতো লেগে থাকে, এবং রক্তও শুষে খায়।

কলকাতা। ৩১ মার্চ ১৮৯৪

১২১

শিলাইদহ

২৪ জুন। ১৮৯৪।

সবে দিন চারেক হল এখানে এসেছি, কিন্তু মনে হচ্ছে যেন কতদিন আছি তার ঠিক নেই— মনে হচ্ছে আজই যদি কলকাতায় যাই তা হলে যেন অনেক বিষয়ে অনেক পরিবর্তন দেখতে পাব … আমিই কেবল সময়স্রোতের বাইরে একটি জায়গায় স্থির হয়ে আছি, আর সমস্ত জগৎ আমার অজ্ঞাতে একটু একটু করে ঠাঁই বদল করছে। আসলে, কলকাতা থেকে এখানে এলে সময়টা চতুর্গুণ দীর্ঘ হয়ে আসে— কেবল আপনার মনোরাজ্যে বাস করতে হয়, সেখানে ঘড়ি ঠিক চলে না। ভাবের তীব্রতা -অনুসারে মানসিক সময়ের পরিমাপ হয়— কোনো কোনো ক্ষণিক সুখ দুঃখ মনে হয় যেন অনেক ক্ষণ ধরে ভোগ করছি। যেখানে বাইরের লোকপ্রবাহ এবং বাইরের ঘটনা এবং দৈনিক কার্যপরম্পরা আমাদের সর্বদা সময়গণনায় নিযুক্ত না রাখে সেখানে, স্বপ্নের মতো, ছোটো মুহূর্ত দীর্ঘকালে এবং দীর্ঘকাল ছোটো মুহূর্তে সর্বদাই পরিবর্তিত হতে থাকে। তাই আমার মনে হয় খণ্ড কাল এবং খণ্ড আকাশ আমাদের মনের ভ্রম। প্রত্যেক পরমাণু অসীম এবং প্রত্যেক মুহূর্তই অনন্ত। এ সম্বন্ধে পারস্য উপন্যাসে খুব ছেলেবেলায় একটা গল্প পড়েছিলুম, সেটা আমার ভারী ভালো লেগেছিল— এবং তখন যদিও খুব ছোটো ছিলুম তবু তার ভিতরকার ভাবটা এক রকম করে বুঝতে পেরেছিলুম। কালের পরিমাণটা যে কিছুই নয় সেইটে দেখাবার জন্যে একজন ফকির একটা টবের মধ্যে মন্ত্রঃপূত জল রেখে বাদশাকে বললে, 'তুমি এর মধ্যে ডুব দিয়ে স্নান করো।' বাদশা ডুব দেবা-মাত্র দেখলে সে এক সমুদ্রের ধারে নতুন দেশে গিয়ে উপস্থিত ; সেখানে সে দীর্ঘ জীবন ধরে নানা ঘটনা নানা অবস্থার মধ্যে দিয়ে নানা সুখ দুঃখ অতিবাহন করলে। তার বিয়ে

হল, তার একে একে অনেকগুলি ছেলে হল, ছেলেরা মরে গেল, স্ত্রী মরে গেল, টাকাকড়ি সব নষ্ট হয়ে গেল এবং সেই শোকে যখন সে একেবারে অধীর হয়ে পড়েছে এমন সময় হঠাৎ দেখলে সে আপন রাজসভায় জলের টবের মধ্যে। ফকিরের উপর খুব ক্রোধ প্রকাশ করাতে সভাসদ্‌রা সকলেই বললে, 'মহারাজ, আপনি কেবলমাত্র জলে ডুব দিয়েই মাথা তুলেছেন।'

আমাদের সমস্ত জীবনটা এবং জীবনের সমস্ত সুখ দুঃখ এইরকম এক মুহূর্তের মধ্যে বদ্ধ— আমরা সেটাকে যতই সুদীর্ঘ এবং যতই সুতীব্র মনে করি, যেমনি সংসারের টব থেকে মাথা তুলব অমনি সমস্তটা মুহূর্তকালের স্বপ্নের মতো ক্ষুদ্র হয়ে যাবে। কালের ছোটো বড়ো কিছুই নেই— আমরাই ছোটো বড়ো। কেবল তোর চিঠি পাওয়ার সময় নির্ণয় করতে গিয়ে যে আমার এত কথা মনে হল তা নয়— থেকে থেকে এই কথাটা আমার মনে হয়, এবং জীবনের তীব্রতম সুখ দুঃখ বাসনাও যে স্থায়ী নয় এ কথার কোনো উত্তর দিতে না পেরে ভারী কষ্ট হয়। এর একটা উত্তর এই যে, সুখ দুঃখ স্থায়ী না হোক তার ফল স্থায়ী হতে পারে। কিন্তু আমাকে ভুলিয়ে আমাকে মিথ্যা ফাঁকি দিয়ে ফলভোগ কেন করাচ্ছে? আমাকে কেন বলছে 'ভালোবাসার ধন চিরকালের'? মানুষকে এমন মিথ্যা আশ্বাস কে দিয়েছে যে প্রেম মৃত্যুর উপরেও জয়লাভ করে, যে মিথ্যা আশ্বাসের প্রলোভনে মানুষ নিজে সাবিত্রী সত্যবানের গল্প রচনা ক'রে নিজে সান্ত্বনা লাভ করছে? ইত্যাদি ইত্যাদি ইত্যাদি।

কাল দিনের বেলাটা বেশ ছিল। আমার এই নদীর জলরেখা, বালির চর, এবং ও পারের বনদৃশ্যের উপরে মেঘ এবং রৌদ্রের মুহুর্‌-মুহু নতুন খেলা চলছিল— খোলা জানলার ভিতর দিয়ে যে দিকেই চোখ পড়ছিল এমন সুন্দর দেখাচ্ছিল! স্বপ্নের মতো! সুন্দরকে

কেন যে স্বপ্নের মতো বলে ঠিক জানি নে, বোধ হয় নিছক সৌন্দর্যটা প্রকাশ করবার জন্যে, অর্থাৎ ওর মধ্যে যেন realityর ভারটুকু মাত্র নেই— অর্থাৎ, এই শস্যক্ষেত্র থেকে যে আহার সংগ্রহ করতে হয়, এই নদী দিয়ে যে পাটের নৌকো যাবার রাস্তা, এই চর যে জমিদারের সঙ্গে খাজনা দিয়ে বন্দোবস্ত করে নিতে হয় ইত্যাদি শত সহস্র কথা মন থেকে দূর করে দিয়ে কেবলমাত্র হিসাবহীন আবশ্যক-হীন বিশুদ্ধ আনন্দময় সৌন্দর্যের ছবি যখন আমরা উপভোগ করি তখন আমরা সেটাকে স্বপ্নের মতো বলি। অন্য সময়ে আমরা জগৎকে প্রধানত সত্য বলে দেখি, তার পরে তাকে আমরা সুন্দর অথবা অন্যরূপে জানি। কিন্তু যে সময়ে তাকে আমরা প্রধানত সুন্দর হিসাবে দেখি, তার পরে সত্য হোক না-হোক লক্ষ্য করি নে, তখন আমরা তাকে বলি 'স্বপ্নের মতো'।··· সত্য এবং সুন্দরকে মানুষ মাঝে মাঝে পৃথক করে নেয়— science সত্য থেকে সুন্দরকে বাদ দেয় এবং কাব্য সুন্দরকে সত্য-হিসাবে খাতির করে না। scienceএ যে সৌন্দর্য পাওয়া যায় সেটা হচ্ছে সত্যের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য সৌন্দর্য, কাব্যে যে সত্য পাওয়া যায় সেটা হচ্ছে সৌন্দর্যের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য সত্য। স্থান অল্প বলে তুই এ যাত্রায় অনেক বকুনির হাত থেকে বেঁচে গেলি।

কলকাতা

২৫ জুন ১৮৯৪

১২২

শিলাইদহ

২৬ জুন। ১৮৯৪।

আজ সকালে বিছানা থেকে উঠেই দেখি পাংশুবর্ণ মেঘে আকাশ অন্ধকার এবং অবনত, বাদলার ভিজে হাওয়া দিচ্ছে, টিপ টিপ করে অবিশ্রাম বৃষ্টি পড়ছে, নদীতে নৌকো বেশি নেই, ধান কাটবার জন্যে কাস্তে হাতে চাষারা মাথায় টোকা প'রে গায়ে চট মুড়ি দিয়ে খেয়া-নৌকোয় পার হচ্ছে, মাঠে গোরু চরছে না এবং ঘাটে স্নানার্থিনী জনপদবধূদের বাহুল্য নেই— অন্যদিন এতক্ষণ আমি তাদের উচ্চকণ্ঠের কলধ্বনি এ পার থেকে শুনতে পেতুম, আজ সে-সমস্ত কাকলি এবং পাখির গান নীরব। যে দিক থেকে বৃষ্টির ছাঁট আসবার সম্ভাবনা সে দিককার জানলা এবং পর্দা ফেলে দিয়ে অন্য দিককার জানলা খুলে আমি এতক্ষণ কাজের প্রত্যাশায় বসে ছিলুম। অবশেষে ক্রমেই আমার ধারণা হচ্ছে আজ এ বাদলায় আমলারা ঘরের বার হবে না— হায়, আমিও শ্যাম নই, তারাও রাধিকা নয়— বর্ষাভিসারের এমন সুযোগ মাঠে মারা গেল। তা ছাড়া বাঁশি যদি বাজাতুম এবং রাধিকার যদি কিছুমাত্র সুরবোধ থাকত তা হলে বৃকভানুনন্দিনী বিশেষ 'হর্ষিত' হত না। যাই হোক, অবস্থাগতিকে যখন রাধিকাও আসছেন না, আমলারাও আসছেন না এবং আমার 'Muse'ও সম্প্রতি আমাকে পরিত্যাগ করে বাপের বাড়ি চলে গেছেন, তখন বসে বসে একখণ্ড চিঠি লেখা যেতে পারে। আসল, হয়েছে কী, এতক্ষণ কোনো কাজ না থাকাতে নদীর দিকে চেয়ে গুন্ গুন্ স্বরে ভৈরবী টোড়ি রামকেলি মিশিয়ে একটা প্রভাতী রাগিণী সৃজন-পূর্বক আপন-মনে আলাপ করছিলুম, তাতে অকস্মাৎ মনের ভিতরে এমন একটা সুতীব্র অথচ সুমধুর চাঞ্চল্য জেগে উঠল, এমন একটা অনির্বচনীয় ভাবের এবং বাসনার আবেগ উপস্থিত হল, এক মুহূর্তের

মধ্যেই আমার এই বাস্তবিক জীবন এবং বাস্তবিক জগৎ আগাগোড়া এমন একটা মূর্তিপরিবর্তন করে দেখা দিলে, অস্তিত্বের সমস্ত দুরূহ সমস্যার এমন একটা সংগীতময় ভাবময় অথচ ভাষাহীন অর্থহীন অনির্দেশ্য উত্তর কানে এসে বাজতে লাগল, এবং সেই সুরের ছিদ্র দিয়ে নদীর উপর জলের তরল পতনশব্দ অবিশ্রাম ধ্বনিত হয়ে এমন একটা পুলক সঞ্চার করতে লাগল— জগতের প্রান্তবর্তী এই সঙ্গীহীন একটিমাত্র প্রাণীকে ঘিরে আষাঢ়ের অশ্রুসজল ঘনঘোর শ্যামল মেঘের মতো 'সুখমিতি বা দুঃখমিতি বা' এমনি স্তরে স্তরে ঘনিয়ে এল যে, হঠাৎ এক সময়ে বলে উঠতে হল যে, 'থাক্, আর কাজ নেই, এইবার Criticisms on Contemporary Thought and Thinkers পড়তে বসা যাক।' কিন্তু বাদলার সকালে একেবারে অতটা-দূর পর্যন্ত বীরত্ব দেখানো আমার মতো দুর্বল লোকের কর্ম নয়। সেই জন্যে একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে দোয়াত কলম নিয়ে চিঠি লিখতে বসাই স্থির করেছি।

আজকাল আমার নিজের কতবার ইচ্ছে করে যে, কোনোমতে নির্জন নিঃশব্দ খ্যাতিহীনতার মধ্যে ফিরে যাই। নিদেন, আমি যতদিন বেঁচে থাকি আমার জীবনের সমস্ত খ্যাতিকীর্তি কেবল আপনার মধ্যে বদ্ধ থাকে। তা হলে বেশ আরামে থাকতে পারি। অবশ্য, তোদের মানসিক প্রকৃতি -অনুসারে আমার সব লেখা তোদের কাছে ভালো না লাগতে পারে, এমন-কি, অনেক ভালো লেখাও অনাদৃত হতে পারে— কিন্তু তবু আর বাইরে বেরতে ইচ্ছা করে না।

কলকাতা

২৭ জুন ১৮৯৪

শিলাইদহ

মঙ্গলবার ?

২৭ জুন। ১৮৯৪।

কাল থেকে হঠাৎ আমার মাথায় একটা হ্যাপি থট এসেছে। আমি চিন্তা করে দেখলুম, পৃথিবীর উপকার করব ইচ্ছা থাকলেও কৃতকার্য হওয়া যায় না, কিন্তু তার বদলে যেটা করতে পারি সেইটে করে ফেললে অনেক সময় আপনি পৃথিবীর উপকার হয়, নিদেন একটা কাজ সম্পন্ন হয়ে যায়। আজকাল মনে হচ্ছে, যদি আমি আর কিছু না ক'রে ছোটো ছোটো গল্প লিখতে বসি তা হলে কতকটা মনের সুখে থাকি এবং কৃতকার্য হলে বোধ হয় পাঁচজন পাঠকেরও মনের সুখের কারণ হওয়া যায়। সাধনায় উচ্চ বিষয়ে প্রবন্ধ লিখে বঙ্গদেশকে উন্নতিপথে লগি ঠেলে নিয়ে যাওয়া খুব মহৎ কাজ সন্দেহ নেই, কিন্তু সম্প্রতি তাতে আমি তেমন সুখ পাচ্ছি নে এবং পেরেও উঠছি নে। গল্প লেখবার একটা সুখ এই, যাদের কথা লিখব তারা আমার দিনরাত্রির সমস্ত অবসর একেবারে ভরে রেখে দেবে, আমার একলা মনের সঙ্গী হবে, বর্ষার সময় আমার বদ্ধ ঘরের বিরহ দূর করবে এবং রৌদ্রের সময় পদ্মাতীরের উজ্জ্বল দৃশ্যের মধ্যে আমার চোখের 'পরে বেড়িয়ে বেড়াবে। আজ সকালবেলায় তাই গিরিবালা-নাম্নী উজ্জ্বলশ্যামবর্ণ একটি ছোটো অভিমানিনী মেয়েকে আমার কল্পনারাজ্যে অবতারণ করা গেছে। সবেমাত্র পাঁচটি লাইন লিখেছি, এবং সে পাঁচটি লাইনে কেবল এই কথা বলেছি যে, কাল বৃষ্টি হয়ে গেছে, আজ বর্ষণ-অন্তে চঞ্চল মেঘ এবং চঞ্চল রৌদ্রের পরস্পর শিকার চলছে, হেনকালে পূর্বসঞ্চিত বিন্দু-বিন্দু বারিশীকর -বর্ষী তরুতলে গ্রামপথে উক্ত গিরিবালার আসা উচিত ছিল, তা না হয়ে আমার বোটে আমলাবর্গের আগমন হল— তাতে করে সম্প্রতি

গিরিবালাকে কিছুক্ষণের জন্যে অপেক্ষা করতে হল। তা হোক, তবু সে মনের মধ্যে আছে। দিনযাপনের আজ আর-এক রকম উপায় পরীক্ষা করে দেখা গেছে। আজ বসে বসে ছেলেবেলাকার স্মৃতি এবং তখনকার মনের ভাব খুব স্পষ্ট প্রত্যক্ষবৎ মনে আনবার চেষ্টা করছিলুম। যখন পেনেটির বাগানে ছিলুম, যখন পৈতের নেড়া মাথা নিয়ে বাবামশায়ের সঙ্গে প্রথমবার বোলপুরের বাগানে গিয়েছিলুম, যখন পশ্চিমের বারান্দার সব-শেষের ঘরে আমাদের ইস্কুল-ঘর ছিল এবং আমি একটা নীল কাগজের ছেঁড়া খাতায় বাঁকা লাইন কেটে বড়ো বড়ো কাঁচা অক্ষরে প্রকৃতির বর্ণনা লিখতুম— যখন সেজদাদাদের ঘরে তোষাখানা ছিল এবং চিন্তা বলে একটা চাকর শীতকালের সকালে গুন্ গুন্ স্বরে গান করতে করতে কয়লার আগুনে জ্যোতিদাদার জন্যে মাখন দিয়ে রুটি তোষ করত— তখন আমাদের গরম কাপড় ছিল না, একখানা কামিজ প'রে সেই আগুনের কাছে বসে শীত নিবারণ করতুম এবং সেই সশব্দ-বিগলিত-নবনী-সুগন্ধি রুটিখণ্ডের উপরে লুব্ধহৃদয়াশ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে চুপ করে বসে চিন্তার গান শুনতুম (সে সুরটা এখনও মনে আছে, তাকে মধুকানের সুর বলে)— সেই-সমস্ত দিনগুলিকে ঠিক বর্তমানের মতো করে দেখছিলুম এবং সেই-সমস্ত দিনগুলির সঙ্গে এই রৌদ্রালোকিত পদ্মা এবং পদ্মার চর ভারী এক রকম সুন্দরভাবে মিশ্রিত হচ্ছিল, ঠিক যেন আমার সেই ছেলেবেলাকার খোলা জানলার ধারে বসে এই পদ্মার একটি দৃশ্যখণ্ড দেখছি বলে মনে হচ্ছিল। তার পরে ভাবলুম আমার হাতে কত ক্ষমতা আছে— আমি ইচ্ছা করলে গল্প লিখতে পারি, ইচ্ছা করলে আপনাকে বর্তমান থেকে অনেক দূর দেশে দূর কালে প্রত্যক্ষবৎ নিয়ে যেতে পারি, আমি কোনো বাস্তবিক সামগ্রী না নিয়েও আপনাকে অনেকটা সুখী করতে পারি। তার পরেই

মনে পড়ল, প্রবাদ আছে : nothing succeeds like success। 'টাকায় টাকা আসে', তেমনি সুখে সুখ আনে। আমরা সুখের সময় মনে করি আমাদের সুখী হবার অসীম ক্ষমতা আছে— তার পরে দুঃখের সময় দেখি কোনো ক্ষমতাই কোনো কাজ করছে না, কিছুই হাতের কাছে পাওয়া যায় না, সব কল একেবারেই বিগড়ে গেছে। কাল বোধ হয় একটু কিছু সুখের জিনিষ মনের ভিতরে রী রী করে উঠেছিল, তাই সমস্ত কলগুলো একেবারে চলতে আরম্ভ করেছিল— জীবনের অতীত স্মৃতি এবং প্রকৃতির বর্তমান শোভা এক-সঙ্গে সজীব হয়ে উঠেছিল, তাই সকালে আজ জেগে উঠেই মনে হল আমি কবি— আমার ক্ষমতার অন্ত নেই, আমি আমার রচনায় কল্পনায় আনন্দে পৃথিবী প্লাবিত করে দিতে পারি। যতই কবিত্ব থাক্, যতই ক্ষমতার গর্ব করি, মানুষ ভয়ানক পরাধীন। পৃথিবীর ভিতর থেকে এই কাঙাল জীবগুলো লম্বা হয়ে খাড়া হয়ে শীর্ণ হয়ে বেড়াচ্ছে— আস্ত স্বর্গ চায়, তার পরে টুকরো-টাকরা যা পায় তাতেই ক্ষুধানিবৃত্তির চেষ্টা করে, অবশেষে ভিক্ষাপ্রসারিত ঊর্ধ্বগামী দেহ ধূলিলুণ্ঠিত হয়ে পড়ে এবং মৃত্যুকে স্বর্গপ্রাপ্তি বলে রটনা করে। যেটুকু সুখে জীবনের সমস্ত কলগুলো চলে সেইটুকু সুখ যদি চিরকাল ধরে রাখা যায়, তা হলে সমস্ত শক্তি বিকশিত, সমস্ত কাজ সমাধা করে যাওয়া যেতে পারে। আজ গিরিবালা অনাহূত এসে উপস্থিত হয়েছেন, কাল বড়ো আবশ্যকের সময় বোধ হয় তাঁর দোদুল্যমান বেণীর সূচ্যগ্র-ভাগটুকুও দেখা যাবে না। কিন্তু সে কথা নিয়ে আজ আন্দোলনের আবশ্যক নেই। শ্রীমতী গিরিবালার তিরোধান-সম্ভাবনা থাকে তো থাক্— আজ যখন তাঁর শুভাগমন হয়েছে তখন সেটা আনন্দের বিষয় তার আর সন্দেহ নেই।...

তোর এবারকার পত্রে অবগত হওয়া গেল আমার ঘরের

ক্ষুদ্রতমাটি তাঁর ক্ষুদ্র ঠোঁট ফুলিয়ে অভিমান করতে শিখেছেন। আমি সে চিত্র বেশ দেখতে পাচ্ছি। তার সেই নরম নরম মুঠোর আঁচড়ের জন্যে আমার মুখটা নাকটা চোখটা যেন তৃষার্ত হয়ে আছে। সে যেখানে-সেখানে আমাকে মুঠো করে ধরে টল্‌মলে মাথাটা নিয়ে হাম ক'রে খেতে আসত, এবং ক্ষুদে ক্ষুদে আঙুল-গুলোর মধ্যে আমার চশমার হারটা জড়িয়ে নিতান্ত নির্বোধ নিশ্চিন্ত গম্ভীর ভাবে গাল ফুলিয়ে চেয়ে থাকত। তার মোটা মোটা ফুলো হাতটা গায়ের উপর এমনি মিষ্টি লাগে!

কলকাতা

২৮ জুন, ১৮৯৪

১২৪

শিলাইদহ

[২৮ জুন ১৮৯৪]

তবু আমার চিঠির কোনোরকম গোলমাল হলে ভারী ব্যস্ত হয়ে পড়ি। বোধ হয় ওর ভিতরেও খানিকটা নিজের সুখ আছে··· নিয়মিত সময়ে আমার বকুনিগুলো তোদের কাছে গিয়ে পৌঁচচ্ছে এইটে কল্পনা করার একটা সুখ আছে। হঠাৎ সেই প্রবাহটা ভেঙে গেলে মনটা ছট্‌ফট্‌ করে ওঠে। আমার বোধ হয় দুঃখ-মাত্রেই ঐ একই কারণে। জীবনের সমস্ত প্রবাহ যে অভিমুখে সহজে ধাবিত হচ্ছে সেখানে বাধা পেলেই আহত হয়ে ফেনিল হয়ে নিজের মধ্যে বিভক্ত হয়ে ক্রন্দন করে ওঠে। নদী যেমন চলতে চলতে আপনার রাস্তা সুগম এবং সুগভীর করে খনন করে ফেলে আমাদের জীবনের শত সহস্র অভ্যাস সেইরকম বারম্বার চলতে চলতে আপনার পথ প্রস্তুত করে রাখে, সেই পথে হঠাৎ বাধা পেলে সে পীড়িত হয়ে পড়ে। আমার বাড়ি, আমার বন্ধু, আমার প্রিয়জন —প্রত্যেকেই আমার জীবনপ্রবাহের চিরপরিচিত সহজ পথ। আমার ইচ্ছা, আমার কল্পনা, আমার কাজ তাদের উপর দিয়ে শতসহস্র ধারায় প্রবাহিত হচ্ছে। জীবনপ্রবাহের প্রত্যেক পথই যে আমার অভ্যাসরচিত পথ তা না হতেও পারে, স্বাভাবিক পথও আছে। নির্ঝর যেমন উপত্যকার দিকে যায়— উপত্যকা তার নিজের রচিত নয়। তেমনি প্রত্যেক মানুষের জীবননির্ঝরের এক-একটা বিশেষ উপত্যকা আছে— তার সমস্ত শক্তি সমস্ত গতি সেই দিকে ধাবমান হয়— তা যদি না হতে পায়, কোথাও যদি রুদ্ধ হয়ে পড়ে, তা হলে তার সমস্ত গতি, তার শক্তি, তার প্রাণ ব্যর্থ হয়ে পড়ে। তোর গেল চিঠিতে সুখদুঃখের প্রশ্ন তুলেছিস, তাই প্রসঙ্গক্রমে কথাটা বেশি ফলাও হয়ে পড়ছে। জীবনের সমস্ত শক্তির বিকাশ সমস্ত অংশের গতিকেই বলে সুখ এবং চরিতার্থতা। ভালোবাসা বল,

ঈশ্বরে ভক্তি বল্, পৃথিবীর উপকার বল্, নানা লোকে নানা উপায়ে আপনার জীবনকে গতি দেয়; যার যেটা নিকটবর্তী, যার যেটা সহজসাধ্য, যার যেটাতে অধিকাংশ জীবনের পরিতৃপ্তি, সে সেইটেই অবলম্বন করতে চেষ্টা করে— এ বিষয়ে বক্তৃতা দেওয়া বৃথা। সুখের উপায় পৃথিবীতে অনেক থাকতে পারে, কিন্তু সব উপায় সকলের কাছে নেই। যে দুর্ভাগ্য কোনো উপায়েই আপনার রুদ্ধ জীবনকে উন্মুক্ত করতে পারলে না তার কানের কাছে নীতিশাস্ত্র আউড়ে কী করব! হিমালয়ের শিখরে গঙ্গোত্রী আছে ব'লে আমাদের কালীগ্রামের রক্তদহর বিলকে গতি দিতে পারি নে। পৃথিবীতে চিরদুঃখী অনেক আছে, সে কথা অস্বীকার করবার জো নেই। কর্তব্যপালন করলেই সুখ হয় এ কথা নীতিশাস্ত্রের প্রতারণা, যেমন শিশুশিক্ষায় পড়তুম—

লেখাপড়া করে যেই
গাড়ি ঘোড়া চড়ে সেই।

এখন জানি লেখাপড়া করেও ট্রাম-গাড়ি চড়বার পয়সা অনেককে চেয়ে চিন্তে নিতে হয়, তেমনি অনেক হতভাগ্যকে সুখ না পেয়েও, এমন-কি দুঃখ পেয়েও কর্তব্য কর্ম করে যেতে হয়। তার পরে অভ্যাসের দ্বারা পথ ক্ষয়ে আসে; দুঃখের পথেও ক্রমশ অভ্যাসে কিয়ৎপরিমাণে জীবনের সুগম রাস্তা কেটে আসে— প্রতিকূলতার পথেও খানিকটা অভ্যাসের রেখা পড়ে আসে, তার পরে হয়তো সমুদ্রের মধ্যে চরিতার্থতা লাভ না করে সমস্ত জীবন অর্ধপথে মরুভূমির মধ্যে শোষিত হয়ে যেতে পারে। এমন ঢের হয়ে থাকে, এগুলো হচ্ছে fact, এর উপরে মাথা খুঁড়ে মলেও একে মিথ্যা বলে প্রমাণ করা যায় না এবং বেদ পুরাণ কোরান বাইবেল থেকে শ্লোক উদ্ধৃত করে দেখালেও দুঃখ দুঃখই থেকে যাবে। পৃথিবীতে শত শত ফুল কুঁড়ি-অবস্থা থেকে

আরম্ভ করে কীটের দংশনে জর্জরীভূত হয়ে কোনো ফল প্রসব না করেই ঝরে পড়ে মাটি হয়ে যায়— কৈফিয়ত জিজ্ঞাসা করলে উত্তর দেওয়া যায় না ব'লে ঘটনাটা অস্বীকার করবার দরকার দেখি নে। পৃথিবীতে শত শত অকৃতার্থ জীবন পরম দুঃখে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, কোথায় তাদের কী সান্ত্বনা আছে জানি নে। মানুষরা আদিমকাল থেকে নানাবিধ সান্ত্বনা রচনা করে আসছে— কতরকম অনুমান কতরকম কল্পনা স্তূপাকার করে তুলছে তার আর সংখ্যা নেই। আমি একদিন বোটে বসে ভাবছিলুম— মানুষ ভারাক্রান্ত জীব, তার সমস্ত আবশ্যকীয় জিনিষেরই ভার আছে, এমন-কি মনের ভাব প্রকাশ করে বই লিখেছে তাও পার্শেল পোস্টে পাঠাতে মাশুল দিতে প্রাণ বেরিয়ে যায়— কাপড়চোপড় বাসস্থান আহার প্রভৃতি তার সমস্ত জিনিষ শত শত মুটের বোঝা। এইজন্যে এই-সকল ভার রক্ষা করেও কী উপায়ে ভার লাঘব করা যেতে পারে মানুষের এই এক প্রধান চেষ্টা। গাড়ির চাকা একটা মস্ত উপায়; অনেক ভার চাকার উপরে ফেলে সহজে নিয়ে যেতে পারে। জলের উপরে নৌকো এক মস্ত উপায় বেরিয়েছে; বিস্তর ভার অনায়াসে স্রোতের উপর সমর্পণ করে দেশ-বিদেশে নিয়ে যাওয়া যাচ্ছে। আমাদের ধর্মশাস্ত্র নীতিশাস্ত্র সমাজ সেইরকম ভারলাঘবের উপায়। অভাব বিচ্ছেদ মৃত্যু মানুষকে দুঃখভারে আক্রান্ত করবেই; এইজন্যে মানুষ আপনার ধর্মমত আপনার সমাজকে এমন করে গড়বার চেষ্টা করছে যাতে সেই ভারকে যথাসম্ভব হাল্কা করে ভাসিয়ে দেওয়া যায়। ভারগুলো যদি নিজের উপর স্থাপন করি তা হলে দুঃসহ হয়, যদি ধর্মের উপর সামাজিক কর্তব্যের উপর স্থাপন করি তা হলে অনেকটা আরাম পাওয়া যায়। কোনো একটা বৃহৎ idea-র গুণ হচ্ছে— বড়ো নদীর মতো তার একটা ভারবহনের এবং ভারচালনের শক্তি আছে; আমরা তার মধ্যে আপনাদের নিক্ষেপ করবামাত্র

অনেকটা হাল্কা হয়ে যাই, আমাদের নিজের দুঃখকষ্টকে আর নিজের স্কন্ধে বহন করতে হয় না। যে বিষয়ের অবতারণা করা গেছে এর আর শেষ নাই। অথচ রাত্রি অনেক হয়ে আসছে এবং চিঠিও বাড়ছে। আর, আমার মনে হচ্ছে যে-সব কথার ভালো মীমাংসা নেই সে-সব কথা মানুষ চেপে রাখতেই ভালোবাসে— বেশি খোলসা করে বলতে গেলে শ্রোতার বিরক্তি বোধ হতে পারে।

কলকাতা
২৯ জুন ১৮৯৪

১২৫

শিলাইদহ

শনিবার, ৩০ জুন। ১৮৯৪।

আমি মনে করেছিলুম, সমস্ত গোলমাল একদিনে সেরে ফেলাই ভালো। নির্জনতার একটা প্রোগ্র্যাম ক্রমশই পাকাপাকি বাঁধা হয়ে যায়, তখন তার অখণ্ড সম্পূর্ণতাটুকু মাঝে মাঝে ভাঙতে কিছুতেই ইচ্ছা করে না— কেননা একবার এক দিনের মতোও ভেঙে গেলে আবার তার সূত্রগুলো জুড়ে নেওয়া কঠিন হয়ে ওঠে। বরঞ্চ প্রথম দিন-কতক মনটা যখন নূতন নীড়ে আপনার স্থান করে নিতে পারে না ব'লে উড়ু-উড়ু করতে থাকে তখন বন্ধুসঙ্গ সহ্য হয়। এখন আমি আমার কাজের অবসরগুলি কল্পনা দিয়ে ভরাট করে নিয়েছি— সে জায়গায় হঠাৎ মানুষ এসে পড়লে ভারী একটা গোলোযোগ বেধে যায়। কল্পনা-জীবটি হরিণীর মতো ভীরুস্বভাব; প্রথমটা তাকে পোষ মানিয়ে আপনার করে নিতে কিছু সময় যায়, তার পরে আবার যদি তার বিচরণের স্থানে মানুষ এসে দাঁড়ায় তা হলে কিছুকালের মতো আবার তার দর্শন পাওয়া দুর্ঘট হয়ে ওঠে। সেই জন্যে আমার এই নির্জন রাজ্যে যেখানে আমার শরীরের চেয়ে মন ঢের বেশি জায়গা অধিকার করে থাকে, সেখানে হয় এমন লোক আসুক যে আমার কল্পনার চেয়ে প্রিয়, নয় এমন লোক আসুক যার প্রতি আমার মনোনিবেশ করবার তিলমাত্র আবশ্যক নেই। এর মাঝামাঝি হলেই মুশকিল। আমার এই ক্ষুদ্র নির্জনতাটি আমার মনের work-shopএর মতো, তার নানাবিধ অদৃশ্য যন্ত্রতন্ত্র এবং সমাপ্ত ও অসমাপ্ত কাজ চার দিকে ছড়ানো রয়েছে— বন্ধু যখন আসেন তখন সেগুলি তাঁর চোখে পড়ে না, কখন্ কোথায় পা ফেলেন তার ঠিক নেই, দিব্যি অজ্ঞানে হাস্যমুখে বিশ্বসংসারের খবর আলোচনা করতে করতে আমার অবসরের-তাঁতে-চড়ানো অনেক সাধনার সূক্ষ্ম সূত্রগুলি পট্

পট্ করে ছিঁড়তে থাকেন— যখন স্টেশনে তাঁকে পৌঁছে দিয়ে পুনর্বার একাকী আমার কর্মশালায় ফিরে আসি তখন দেখতে পাই আমার কত লোকশান হয়েছে। আমি ঠিক কিরকম ভাবে আমার জীবনটিকে রচনা করছি অন্য লোকে তা কী করে বুঝবে! যখন অন্য লোকের সঙ্গে একত্র বাস করা যায় তখন পরস্পর পরস্পরকে রচনা করে থাকি— তখন পরস্পরের জন্যে যথেষ্ট জায়গা রেখে দিই, এমন-কি নিজের জন্যে অতি অল্পই বাকি থাকে। কিন্তু যখন সম্পূর্ণ একলা থাকি— আমার সম্পূর্ণ 'আমি' কারও জন্যে কোনো মার্জিন না রেখে সম্পূর্ণ নিজের রচনা বিস্তার করতে থাকে, অনেকগুলি সূক্ষ্ম সুকুমার জিনিষ নির্ভয়ে চারি দিকে বিছিয়ে দেয়— সেগুলি নিয়ে মহা বিপদ।· অনেক কথা, অনেক কাজ, অনেক আলোচনা আছে, যা অন্যের পক্ষে সামান্য এবং জনতার মধ্যে স্বাভাবিক— কিন্তু আমার নির্জন-জীবনের পক্ষে ভারী আঘাতজনক। তার কারণ, নির্জনে আমাদের সমস্ত গোপন অংশ, গভীর অংশ, বিচ্ছিন্ন অংশ সমগ্র হয়ে জেগে ওঠে— সে অনেকটা নিজের মতো, সুতরাং সৃষ্টিছাড়া অদ্ভুত হয়— সে অবস্থায় সে লোকসঙ্গের অনুপযোগী হয়ে ওঠে এবং তার সমস্ত প্রকৃতি একটা ঐক্য লাভ করাতে, যা-কিছু সেই ঐক্য ভেঙে দেয় তাই তাকে আঘাত করে।··· বাহ্যপ্রকৃতির একটা মস্ত গুণ এই, সে অগ্রসর হয়ে মনের সঙ্গে কোনো বিরোধ করে না; তার নিজের মন ব'লে কোনো বালাই না থাকাতে আমার মনটিকে তার সমস্ত স্থান ছেড়ে দিতে রাজি আছে— সঙ্গীর মতো নিয়ত সঙ্গ দান করে, অনন্ত স্থান অধিকার করে থাকে, অথচ আমার একতিল জায়গা জোড়ে না— নির্বোধের মতো বকে না, সুবুদ্ধির মতো তর্ক করে না, আমার মীরার মতো আকাশের কোলে শুয়ে থাকে, যখন শান্তভাবে থাকে সেও মিষ্টি লাগে, যখন গর্জন ক'রে হাত পা ছুঁড়তে থাকে সেও মিষ্টি লাগে—

বিশেষত যখন তার স্নান পান বেশপরিবর্তনের আশ্চর্য সুবন্দোবস্ত আছে, আমার উপরে তার কোনো ভার নেই, তখন সেই ভাষাহীন মনোহীন প্রকাণ্ড পরিপুষ্ট সুন্দর শিশুটি আমার নির্জনের পক্ষে বেশ। ভাষাপরিপূর্ণ বুদ্ধিমান বয়ঃপ্রাপ্ত মনুষ্য লোকালয়েই অত্যন্ত উপাদেয়। এ-সব অসামাজিক কথা প্রকাশ না করাই উচিত, কিন্তু যে ভাবে বলছি সে ভাবটি গ্রহণ করলে ব্যাপারটা তত বেশি দোষাবহ মনে হবে না।

সাতারা

৫ জুলাই ১৮৯৪

১২৬

শিলাইদহ

৫ জুলাই। ১৮৯৪।

নতুনের মতো এমন স্বল্পস্থায়ী জিনিষ আর কিছুই নেই। মানুষের হৃদয়টা সৌভাগ্যক্রমে এমন তরল যে প্রায় প্রত্যেক পাত্রেই অল্প-কালের মধ্যেই সে আপনাকে মাপে মিলিয়ে নিতে পারে— কেবল কখনো কখনো ছোটো পাত্রে তাকে ধরে না এবং বড়ো পাত্রে তার ঢিলে বোধ হয়। এবং দৈবাৎ দু-চারটে হৃদয় পাওয়া যায় যারা পুরাতনের মধ্যে জমে শক্ত হয়ে যায়— তাদের নূতন পাত্রে পূরতে গেলে ভেঙে ফেলতে হয়।

সাতারা
১০ জুলাই ?
১৮৯৪

১২৭

শিলাইদহ

বৃহস্পতিবার ?

৬ জুলাই। ১৮৯৪।

কাল দুপুরবেলা সবেমাত্র একটুখানি জমিয়ে লিখতে বসেছি, পাঁচ লাইন লিখেছি কি না, এমন সময় মৌলবী এসে উপস্থিত। সে আমাকে লিখতে দেখে প্রথমে আশ্বাস দিলে যে কেবল 'দোঠো কথা' বলে সে চলে যাবে— তার পরে সেই 'দোঠো কথা' বলতে ঠিক দোঠো ঘণ্টা কাটিয়ে সে যেমন চলে যাচ্ছে অমনি ডাঙা থেকে এক চীৎকারধ্বনি শোনা গেল— 'মহারাজ, আজ এক-সপ্তাহ-কাল দর্শন-প্রার্থী হয়ে আছি, কিন্তু দৌবারিকগণ নিষেধ করছে।' ভাষা শুনেই বোঝা গেল লোকটি যে-সে নন। 'দৌবারিক'কে নিষেধ করতে নিষেধ করলুম। তখন একটি গেরুয়াবসন ও তিলকধারী দীর্ঘশ্মশ্রু বিরলকেশ উচ্চললাট প্রসন্ন-প্রশান্ত-মূর্তি ব্রাহ্মণ আমার সম্মুখে এসে দাঁড়িয়ে এক মস্ত কাগজ বের করলে। ভাবলুম দরখাস্ত। তার পরে দেখি স্বয়ং সেটি উচ্চস্বরে পড়তে আরম্ভ করে দিলে। প্রথম ছত্র পড়বামাত্রই বোঝা গেল সেটি কবিতা। তাতে ব্রাহ্মণ বৈকুণ্ঠনিবাসী হরির গুণগান করছেন। আমি গম্ভীর হয়ে বসে শুনতে লাগলুম। যতক্ষণ হরি বৈকুণ্ঠে ছিলেন ততক্ষণ কবিতা ত্রিপদীতে চলছিল, তার পরে দেখি হরি হঠাৎ 'জগৎসংসারে-খ্যাতা রাজধানী কলিকাতা'য় ঠাকুর উপাধি রক্ষা-পূর্বক দ্বারকানাথ হয়ে পৃথিবীতে নেমে এসেছেন— কবিতাও ত্রিপদী থেকে ক্রমে পয়ারে নেমে এল। পয়ার ক্রমে দেবেন্দ্রনাথের স্তব সমাধা করে যখন রবীন্দ্রনাথে এসে দাঁড়ালো তখন আমি মনে মনে অস্থির হয়ে উঠলুম। আমার কবিত্ব আমার বদান্যতা যে বিশ্বজগতে রবিকিরণের মতো বিকীর্ণ হচ্ছে এবং তাতে করে অজ্ঞান এবং দারিদ্র্য-অন্ধকার দূরীভূত হচ্ছে, এ তুলনাটা যতই সুন্দর হোক, এ সংবাদটা

আমার কাছে নূতন বলে ঠেকল। আর যাই হোক, বদান্যতার খ্যাতিটা প্রচার হওয়া কিছু না। আমি তাঁকে বলে দিলুম, 'কাছারিতে যাও, আমার অন্য কাজ আছে।' সে লোকটি বললে, 'আপনার কাজ আপনি করে যান আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খানিকক্ষণ আপনার মুখ-চন্দ্রমা নিরীক্ষণ করি'— ব'লে বিস্ময়ের ভঙ্গী ধারণ করে আমার সামনে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে একদৃষ্টে অত্যন্ত অবোধ জন্তুর মতো আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল; আমার সংকুচিত অন্তরাত্মা সমস্ত শরীরের ভিতর যেন সুড়্ সুড়্ করতে লাগল। তাকে বারম্বার যেতে বললুম। তখন সে বললে, 'কী দিতে ইচ্ছে করেন এই কাগজে লিখে দিন, আমি নায়েব মশায়ের কাছে নিয়ে যাই এবং তাঁকেও শুনিয়ে আসি।' আমি মনে মনে ভাবলুম, আমারও এই ব্যাবসা, আমি কবিতা শুনিয়ে পয়সা পেয়ে থাকি। কিন্তু আমাকেও অনেক দ্বার থেকে রিক্ত হস্তে ফিরে আসতে হয়— ব্রাহ্মণকেও ফিরতে হল। শ্রীহরির চারি হস্তে শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম আছে। শ্রীহরির এই অবতারটি, যে হস্তে গদা কেবল সেই হস্তটা ব্রাহ্মণকে দেখিয়ে বিদায় করে দিলেন। সে বোটের বার হতে না হতে দ্বারী মজুমদার ব'লে এই বিরাহিমপুরের একটি সুবিখ্যাত বক্তা এসে উপস্থিত। আমি বক্ষের উপর দুই হস্ত আবদ্ধ করে চৌকিতে হেলান দিয়ে কঠিন প্রস্তরমূর্তির মতো আড়ষ্ট হয়ে বসে রইলুম। সে প্রথমে আরম্ভ করে দিলে— 'মহারাজ, পুরাকালে যুধিষ্ঠিরের হিস্টিরিয়া (হিস্ট্রি) পাঠ করে অনেকেই অবিশ্বাস করে থাকেন; তাঁরা বলেন এতদূর কি কখনো সম্ভব হতে পারে, কিন্তু এতকাল পরে আপনাকে চাক্ষুষ দেখে যুধিষ্ঠিরের কীর্তিকলাপের প্রতি তাঁদের সন্দেহভঞ্জন হয়েছে।'— এই রকম ভাবে চলল। আমি যখন তাকে বললুম 'এইবার তুমি কাছারিতে বিশ্রাম করো গে' সে বললে, 'আজ আর আমার বিশ্রাম কিসের! আজ কতদিন পরে হুজুরের

দর্শন পেয়েছি, আজ প্রায় সাত আট ম মাস অপেক্ষা করে অবশেষে শ্রীচরণ দেখতে পেলুম— দেখতেঁ যে পাব সে কি আর আশা ছিল!' বলতে বলতে তার কণ্ঠস্বর কম্পিত এবং রুদ্ধ হয়ে এল, বার বার শুষ্ক চক্ষু চাদরে মুছতে লাগল; ক্রমে, তার প্রতি তার পূর্বপ্রভু জ্যোতি-দাদার যে অসীম স্নেহ এবং বিশ্বাস ছিল তাই মনে পড়ে তার চিত্ত উত্তরোত্তর অধিকতর উদ্‌বেলিত হয়ে উঠতে লাগল।…… সে কী কী কাজ করেছিল, কী কী ঘটনা ঘটেছিল, তার মনিবরা কী কী কথা বলেছিল এবং সে তার কী কী উত্তর দিয়েছিল তার কোনোটাই বাদ না দিয়ে সমস্তই আনুপূর্বিক বলে যেতে লাগল। সূর্য অস্ত গেল, সন্ধ্যা হল; পাখিরা নীড়ে, গাভীরা গোষ্ঠে, চাষারা কুটীরে ফিরে গেল— দ্বারী মজুমদার বোট থেকে নড়ে না। এমন সময় কুস্টিয়া থেকে আর-একটি দর্শনপ্রার্থী যখন এল তখন সে 'কাল প্রাতঃকালে' বাকি কথাগুলো বলতে আসবে ব'লে আমাকে সান্ত্বনা করে চলে গেল। এখনো সে আসে নি, কিন্তু তারই সমান বক্তা একজন এসে আমার পার্শ্ববর্তী বেঞ্চিতে ব'সে বক্তৃতার অবসর-প্রতীক্ষায় আছেন।

সাতারা

১১ জুলাই ১৮৯৪

সাহাজাদপুর-পথে

শুক্রবার ?

[৭ জুলাই ১৮৯৪]

আমি এখন পথে। কাল যখন দুপুরবেলায় বোট ছাড়তে যাচ্ছি একজন আমলা এসে করযোড়ে বললে, 'ধর্মাবতার, আজকে বোট না ছেড়ে কাল সকালবেলায় ছাড়লে ভালো হয়।' আমি তার কারণ জিজ্ঞাসা করাতে বললে, ত্র্যহস্পর্শ পড়েছে, আজ বড়ো অযাত্রা। আমি বললুম, আমি প্রমাণ করে দেব আজ যাত্রা শুভ— আমি নির্বিঘ্নে সাজাদপুরে পৌঁছব। এই ব'লে গ্রহ তারা তিথির মুখের উপর তুড়ি মেরে বেরিয়ে পড়লুম। পথে স্থানে স্থানে পদ্মার ভয়ানক স্রোত — জল ঘুরে-ঘুরে ফুলে-ফুলে ডাঙার উপর গিয়ে ঠেসে পড়ছে ; বোট কিছুতেই এগোতে চায় না, তার সমস্ত পাঁজরা থর্‌থর্‌ করে কাঁপে, যারা গুণ টানছে তারা সবলে মাটির উপর ঝুঁকে পড়েও প্রায় কিছুতেই পা রাখতে পারে না ; আমি ভাবলুম গ্রহ তারা তিথি এইবার বুঝি আমার নাকের উপরে তুড়ি দিচ্ছে। খানিকটা দূর গিয়ে গড়ুই পেরিয়ে যখন আসল পদ্মায় পড়লুম তখন পাল পাওয়া গেল— তখন সগর্বে সবেগে প্রতিকূল স্রোতের বক্ষ বিদীর্ণ করে ঢেউয়ের উপর দিয়ে নাচতে নাচতে চলে যেতে লাগলুম। বিকেলে পাঁচটা-ছটা বেলায় ইছামতী নদীর মধ্যে প্রবেশ করা গেল।···

সন্ধেবেলায় পাবনা শহরের একটি খেয়া ঘাটের কাছে বোট বাঁধা গেল। ও পার থেকে জন-কতক লোক বাঁয়াতবলার সঙ্গে গান গাচ্ছে, একটা মিশ্রিত কলরব কানে এসে প্রবেশ করছে, রাস্তা দিয়ে স্ত্রী-পুরুষ যারা চলেছে তাদের ব্যস্ত ভাব, গাছপালার ভিতর দিয়ে সব দীপালোকিত কোটাবাড়ি দেখা যাচ্ছে, খেয়াঘাটে ভদ্র অভদ্র নানা শ্রেণীর লোকের ভিড়। আকাশে খুব নিবিড় একটা একরঙা মেঘ,

সন্ধ্যাও অন্ধকার হয়ে এসেছে ; ও পারে সার-বাঁধা মহাজনি নৌকোয় আলো জ্বলে উঠল, মন্দির থেকে সন্ধ্যারতির কাঁসর ঘণ্টা বাজতে লাগল— বাতি নিবিয়ে দিয়ে বোটের জানলায় বসে আমার মনে ভারী একটা অপূর্ব ভাবের আবেগ উপস্থিত হল। অন্ধকারের আবরণের মধ্যে দিয়ে এই লোকালয়ের একটি যেন সজীব হৃৎস্পন্দন আমার বক্ষের উপর এসে আঘাত করতে লাগল। এই মেঘলা আকাশের নীচে নিবিড় সন্ধ্যার মধ্যে কত লোক, কত ইচ্ছা, কত কাজ, কত গৃহ, গৃহের মধ্যে জীবনের কত রহস্য— মানুষে মানুষে কাছাকাছি ঘেঁষাঘেঁষি কত শত সহস্র প্রকারের ঘাত প্রতিঘাত! বৃহৎ জনতার সমস্ত ভালোমন্দ সমস্ত সুখদুঃখ এক হয়ে তরুলতাবেষ্টিত ক্ষুদ্র বর্ষানদীর দুই তীর থেকে একটি সকরুণ সুন্দর রাগিণীর মতো আমার হৃদয়ে এসে প্রবেশ করতে লাগল। আমার 'শৈশবসন্ধ্যা' কবিতাটায় বোধ হয় কতকটা এই ভাব প্রকাশ করতে চেষ্টা করেছিলুম। কথাটা সংক্ষেপে বোধ হয় এই যে, মানুষ ক্ষুদ্র এবং ক্ষণস্থায়ী, অথচ ভালোমন্দ এবং সুখদুঃখ -পরিপূর্ণ জীবনের প্রবাহ সেই পুরাতন সুগভীর কলস্বরে চিরদিন চলছে এবং চলবে— নগরের প্রান্তে সন্ধ্যার অন্ধকারে সেই চিরন্তন কলধ্বনি শুনতে পাওয়া যায়। তখন মানুষের দৈনিক জীবনের ক্ষণিকতা এবং স্বাতন্ত্র্য সেই অবিচ্ছিন্ন সুরের সঙ্গে মিলিয়ে যায়— সব-সুদ্ধ খুব একটা বৃহৎ বিস্তৃত বিষাদ-পূর্ণ রহস্যময় আদি-অন্ত-শূন্য প্রশ্নোত্তরহীন নিরুদ্দেশ মহাসমুদ্রের একতান শব্দের মতো অন্তরের নিস্তব্ধতার মধ্যে গিয়ে প্রবেশ করতে থাকে। কাল সন্ধ্যাবেলায় আমার মনের ভিতরে যেরকম করছিল সে বোধ হয় বর্ণনাদ্বারা ঠিক বোঝাতে পারব না। এক-এক সময়ে কোথাকার কোন্ ছিদ্র দিয়ে জগতের বড়ো বড়ো প্রবাহ আমাদের হৃদয়ের মধ্যে প্রবেশ করে, তার যে-একটা ধ্বনি হতে থাকে সেটাকে

কথায় তর্জমা করা অসাধ্য। সেই জন্যে দেখেছি আমার মনের অনেক সুতীব্র সুগভীর ভাব কবিতায় লেখা হয় নি। হয়তো আমার লেখার মধ্যে মাঝে মাঝে আভাসের মতো প্রকাশ পেয়ে থাকবে।

সাতারা
১৩ জুলাই ১৮৯৪

১২৯

সাজাদপুর-পথে

৭ জুলাই। ১৮৯৪।

The Jew ব'লে একটা Polish নভেল পড়ে দিন কাটাতে হল। অদৃষ্টক্রমে সে নভেলটা নিতান্তই অপাঠ্য— কেবলমাত্র আরম্ভ করেছিলুম ব'লে প্রাণপণে শেষ করে ফেললুম। আরম্ভ করেছি ব'লেই যে শেষ করতে হবে এ কর্তব্যবোধের অর্থ বোঝা শক্ত। ওটা ঠিক কর্তব্যবোধ নয়— লো[কেন] যে বলে আমাদের সমস্ত মনোবৃত্তির একটা অহংকার আছে সেটা কতকটা ঠিক। তারা কেউ সহজে স্বীকার করতে চায় না আমরা সামান্য বা ক্ষণস্থায়ী বা অল্প বাধাতেই পরাভূত— এই জন্যে অনেক সময়ে তারা নিজেকে ধুঁইয়ে ধুঁইয়ে জাগিয়ে রাখে। আমাদের ইচ্ছাশক্তিরও একটা গর্ব আছে— সে একটা জিনিষ নিজে আরম্ভ করেছে বলেই অবশেষে নিজের বিরুদ্ধেও সেটা শেষ করতে চায়। সেই একগুঁয়ে অনাবশ্যক অহংকার -বশত একটা বাজে-বকুনি-ভরা অসংলগ্ন প্রকাণ্ড অপাঠ্য গ্রন্থ একটি দীর্ঘ বর্ষাদিনে বদ্ধ ঘরে বসে শেষ করলুম— শেষ করবার মহৎ সুখ ছাড়া আর কোনো সুখ পেলুম না। লেখবার বাসনা ছিল, কিন্তু অবরুদ্ধ স্যাঁৎসেঁতে অবস্থায় লেখা হয় না। আমি ভাবছিলুম, এই সংকীর্ণ বাঁকা ইছামতীর ভিতর দিয়ে আমি যতবার গেছি তোকে রোজ চিঠি লিখেছি— এবারেও লিখছি। আমার মফস্বলের চিঠিগুলো ঠিক সেই একই স্থান, একই দৃশ্য, একই অবস্থার মধ্যে বারম্বার লেখা— সবগুলো মিলিয়ে দেখলে বোধ হয় কতই যে পুনরাবৃত্তি পাওয়া যায় তার আর সংখ্যা নেই। বোধ হয় কতবার অবিকল একই ভাষা ব্যবহার করেছি। কলকাতায় থাকলে নিত্য নতুন কথা বলা সহজ— কিন্তু পাড়াগাঁয়ে কেবল দুটি মাত্র বিষয় আছে, প্রকৃতি এবং স্বয়ং আমি— এই দুটি বিষয়ই আমার পক্ষে

যথেষ্ট আনন্দদায়ক— এবং এই দুটি বিষয়ের মধ্যে বৈচিত্র্যেরও অভাব নেই— কিন্তু মানুষের 'পএন্ট্ অফ্ ভিয়ু' এবং প্রকাশ করবার ভাষা এবং ক্ষমতা সীমাবদ্ধ— কাজেই সহস্রবার পুনরুক্তি করা ছাড়া আর উপায় নেই। বারম্বার একই কথা শুনে শুনে তোর বোধ হয় আমার মফস্বলের মনের ভাব এবং দৈনিক জীবন এক রকম কণ্ঠস্থ হয়ে গেছে —তুই বোধ হয় অনায়াসে আমার মফস্বলের চিঠি জাল করে লিখতে পারিস। এবারে যদি বৃষ্টি না হয়ে রৌদ্র হত এবং জানলার কাছে বসে সমস্তদিন নদীতীরের দৃশ্য দেখতে পেতুম, তা হলে নিশ্চয় এই বাঁকা নদী সম্বন্ধে এমন সব কথা লিখতুম যা পূর্বে নিদেন চারবার লিখেছি ; এবং মনে করতুম যেন এ-সব কথা এই প্রথম লিখছি। কেবল তাই নয়, মনে হ'ত— ইছামতীর নদীতীর দেখে আমার মনে অনির্বচনীয় ভাবোদ্রেক যেমন আমার কাছে তেমনি তোর কাছে একটা অসামান্য মস্ত খবর— সেটাকে ঠিক যথার্থ ভাবে এবং সম্পূর্ণ ভাবে প্রকাশ করা, সেটাকে দুর্গম মনোরাজ্য থেকে সমূলে সংগ্রহ করা এবং আদ্যোপান্ত তোর কাছে পাঠিয়ে দেওয়া একটা প্রাণপণ আবশ্যকীয় কাজ। আজকাল প্রমাণ হয়েছে যারা জাত-লেখক তারা পাগলের রূপান্তর। আমার সেটা অনেকটা ঠিক বোধ হয়। মনের ভাব ব্যক্ত করতে না পারলে দুঃখ অনুভব করা, ওটা একটা পাগলামি মাত্র।

ব[ড়দাদা] তাঁর বক্সোমেট্রি না লিখে থাকতে পারেন না। বী[রেন্দ্র] দেয়ালে দেয়ালে এবং তেতালার প্রত্যেক টবে সূর্য এঁকে তার মাঝখানে লিখে রাখছেন 'সূর্য'— কত ধ'রে ধ'রে, কতবার মুছে, কত যত্ন ক'রে যে আঁকেন তার ঠিক নেই। ঐ সূর্যটি ঠিক প্রকাশ করার উপরে তাঁর এবং পৃথিবীর কী সুখ নির্ভর করছে তা অন্তর্যামী জানেন। আমারও সেই একই পাগলামি, কেবল বিষয়ভেদ এবং প্রকারভেদ।

জুলাই ১৮৯৪

যারা সম্পূর্ণ অথবা বারো-আনা পাগল তারা নিজের পাগলামি বুঝতে পারে না। আমি জানি আমার এক অংশ পাগল — যতই ইচ্ছা করি, চেষ্টা করি, আমি ইহজীবনে কিছুতেই তাকে বাঁধতে পারব না ; আমার সহজ অংশ যা প্রতিজ্ঞা করে আমার পাগল তা রক্ষা করে না, ভেঙে দেয়।

সাতারা
১৩ জুলাই ১৮৯৪

সাজাদপুর

১০ জুলাই। ১৮৯৪।

যারা আমাদের কাছাকাছির লোক এবং যাদের চিরদিন কাছাকাছি রাখতে ভালোবাসি তাদের জীবনের কোনো অংশ দৃষ্টিপথাতীত করতে ইচ্ছে করে না— কিন্তু ভালো করে ভেবে দেখলে হাসি পায় যে, অত্যন্ত ঘনিষ্ঠতা থাকলেও ইহজীবনে দুটো মানুষে কতটুকু অংশ রেখায় রেখায় সংলগ্ন। যাকে দশ বৎসর জানি, সেই দশ বৎসরের কত সুদীর্ঘ অংশ তাকে জানি নে— বোধ হয় আজীবন সম্পর্কের জমা খরচ হিসাব করলে খুব একটা বড়ো রকম অঙ্ক হাতে থাকে না। এই তো কেবল চোখের জানা, তার পরে মনের জানার তো কথাই নেই। সে কথা ভেবে দেখলে সবাইকেই অপরিচিত বলে বোধ হয় এবং তখন বুঝতে পারি আমাদের মধ্যে খুব বেশি পরিচয় হবার কোনো কথা নেই— কেননা আমাদের দুদিন পরে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হতে হবে, এবং আমাদের পূর্বে কোটি কোটি লোক এই সূর্যালোকে নীলাকাশের নীচে জীবনের পান্থশালায় মিলেছে এবং বিচ্ছিন্ন হয়ে বিস্মৃত হয়ে অপসৃত হয়ে গেছে। এ রকম করে ভেবে দেখলে কোনো কোনো প্রকৃতিতে হয়তো বৈরাগ্যের উদয় হয়, মনে হয় 'তবে আর কেন'— কিন্তু আমার ঠিক উল্টো হয়। আমার আরও বেশি করে দেখতে, বেশি করে জানতে, বেশি করে পেতে ইচ্ছে করে। এক-এক সময় মনে হয়, এই-যে আমরা গুটিকতক সচেতন প্রাণী জড়-মহাসমুদ্রের মধ্যে মাথা তুলে বুদ্‌বুদের মতো ভেসে উঠেছি এবং কাছাকাছি এসে ঠেকেছি এ একটা আকস্মিক সংযোগ— এই সংযোগটুকুর মধ্যে যত বিস্ময় যত প্রেম যত আনন্দ তা আবার অনন্তকালের মধ্যে গড়ে উঠবে কি না সন্দেহ। বসন্তরায়ের কবিতায় এক জায়গায় একটা লাইন আছে—

জুলাই ১৮৯৪

নিমিখে শতেক যুগ হারাই হেন বাসি।

বাস্তবিক মানুষের এক নিমেষের মধ্যে শত যুগের সংযোগ বিয়োগ ঘটতে পারে। সেই জন্যে নিমেষগুলোকে দুর্মূল্য বলে বোধ হয়। কথাগুলো নতুন নয়, কিন্তু আমার কাছে এক-এক সময় এমন আশ্চর্য নতুন বলে ঠেকে। এবারে চলে আসবার আগে যেদিন একদিন দুপুরবেলায় স··· পার্ক্ স্ট্রীটে এসেছিলেন, তুই পিয়ানোয় বসেছিলি, আমি গান গাবার উদ্যোগ করছিলুম, হঠাৎ তোদের দিকে চেয়ে আমার মনে হল, এই-যে তুই দুপুরবেলায় চুল বেঁধে কাপড় প'রে একটি বিশেষ মেঘলা দিনে খোলা জানলার সামনে পিয়ানোর কাছে বসেছিস, আমি-নামক এক ব্যক্তি পিয়ানোর ডালার উপর হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছি, স ·· গান শোনবার অপেক্ষা করে বসে আছেন —অনন্তকালের অসীম ঘটনাপরম্পরার মধ্যে এই একটুখানি আশ্চর্য ব্যাপার। মনে হল এর মধ্যে যেটুকু সৌন্দর্য আছে এবং আনন্দ আছে তার আর সীমা নেই, এই-যে মেঘলা আকাশের আলোটুকু আসছে এ এক অসাধারণ লাভ। প্রতিদিনের অভ্যাসের জড়ত্ব হঠাৎ এক মুহূর্তের জন্যে এক-এক সময়ে কেন যে একটুখানি ছিঁড়ে যায় জানি নে; তখন যেন সদ্যোজাত হৃদয় দিয়ে আপনাকে, সম্মুখবর্তী দৃশ্যকে এবং বর্তমান ঘটনাকে অনন্তকালের চিত্রপটের উপর প্রতিফলিত দেখতে পাই। তখন তোরা যে তোরা এবং আমি যে আমি—এবং আমি যে তোদের চেয়ে দেখছি এবং তোদের কথা শুনছি এবং তোদের আপন ভাবছি এবং তোরা আমাকে আপন ভাবছিস, অনন্তকালের মাঝখানে এই একটি আশ্চর্য ঘটনা নূতন করে বৃহৎ করে দেখতে পাই। এমন আশ্চর্য ঘটনা আবার কখনও হতে পারবে কি না কে জানে! আমি অনেক সময়েই এক রকম করে জীবনটাকে এবং পৃথিবীটাকে দেখি যাতে করে মনে অপরিসীম বিস্ময়ের উদ্রেক

হয়— সে আমি হয়তো আর কাউকে ঠিক বোঝাতে পারব না। সেই জন্যে আমার কাছে অনেক জিনিষ এমন বেশি হয়ে ওঠে যা অন্যের কাছে অস্বাভাবিক আতিশয্য বলে মনে হতে পারে। ‘সকল-তাতেই বাড়াবাড়ি’। অভ্যাসের একটা গুণ আছে যে, অনেকগুলো জিনিষকে কমিয়ে এনে হাল্কা করে দিয়ে যায়, বর্মের মতো আচ্ছন্ন করে বাইরের অনেকগুলো সংস্পর্শ থেকে মনকে রক্ষা করে, কিন্তু সেই অভ্যাস আমার মনকে সম্পূর্ণ আবৃত করতে পারে না— আমার কাছে পুরাতন প্রতিদিন নূতন করে ঠেকে। সেইজন্যে অন্য লোকের সঙ্গে ক্রমশ আমার মনের perspective আলাদা হয়ে যায়; ভয়ে ভয়ে পরীক্ষা করে দেখতে হয় কে কোন্‌খানে আছি।

সাতারা

১৫ জুলাই ১৮৯৪

১৩১

কলকাতা-পথে

১৩ জুলাই ?

। ১৮৯৪ ।

ইছামতীর ভিতরে ঢোকা গেল। কী সুন্দর উজ্জ্বল দিনটি হয়েছিল! ছোটো নদীটির দুই ধারের দৃশ্য দেখে চোখ ফেরানো যায় না। আকাশে মেঘ প্রায় নেই— নদীর ধারের বনগুলি এবং গাঢ়সবুজ শস্যক্ষেত্র রৌদ্রে প্রফুল্ল হয়ে রয়েছে, বাতাসটি বেশ মিষ্টি লাগছে— বিছানার উপরে জানলার কাছে গোটা পাঁচ-ছয় বালিশ উঁচু করে রাজার মতো আরামে বসে রইলুম, চোখের উপরে কে যেন স্বপ্ন মাখিয়ে দিয়েছে— জেলেরা মাছ ধরছে, মেয়েরা কাপড় কাচছে, ছেলেরা জলের মধ্যে পড়ে তোলপাড় করছে, গোরুগুলো চরছে, জলমগ্ন ধানের ক্ষেতে বক বসে রয়েছে, সমস্ত ছবির মতো দেখাচ্ছে। কেন যে এমন অত্যন্ত ভালো লাগছিল তা বর্ণনা করে বোঝাবার যো নেই। সুন্দর জিনিষকে যে কারণে স্বপ্নের মতো বলি ঠিক সেই কারণে তাকে ছবির মতো বলি। নইলে কথাটা আসলে একটু অদ্ভুত— জিনিষের মতো ছবি বললে অন্যায় হয় না, কিন্তু ছবির মতো জিনিষ বললে এক হিসাবে কথাটা উল্টো হয়। কিন্তু প্রকৃত অর্থটা হচ্ছে এই যে, ছবিতে জিনিষের কেবল একটিমাত্র অংশ আমাদের চোখের সামনে ধরে দেওয়াতে শুদ্ধমাত্র দৃশ্যসৌন্দর্যের উপভোগটাই আমাদের মনে তীব্র হয়ে ওঠে। আমার বোধ হয় আর্ট্ মাত্রেরই কাজ হচ্ছে বিশ্বের যেটুকু আমাদের মনোহরণ করে সেইটুকুকে সযত্নে তার অন্য অংশ থেকে বিচ্ছিন্ন করে আমাদের কাছে অবিমিশ্র উজ্জ্বল করে ধরা। সত্যের উপরিভাগ থেকে সেইটুকু ছেঁকে নেওয়া— সাজিয়ে তোলা আর্টিস্টের কাজ। সেইজন্যে আমার মনে হয় বিশুদ্ধ আর্ট্ হচ্ছে ছবি এবং গান— সাহিত্য নয়। মানুষের ভাষা, মানুষের তূলি এবং

কণ্ঠের চেয়ে ঢের বেশি মুখর বলে সাহিত্যে আমরা অনেক জিনিষ মিশিয়ে ফেলি— সৌন্দর্যপ্রকাশের উপলক্ষে খবর দিই, উপদেশ দিই, নানা কথা বলে নিই। যাই হোক, আমরা 'ছবির মতো' 'গানের মতো' 'স্বপ্নের মতো' কথা বার বার ব্যবহার করে থাকি— কিন্তু ওটা কথার কথা নয়। আমরা সত্যের চেয়ে সৌন্দর্য, জ্ঞানের চেয়ে আনন্দ বেশি স্বর্গীয় বলে বোধ করি।—

কিন্তু এ দিকে আমার বোট এগোচ্ছে না। যে বাতাস যমুনায় আমাদের বাধা দিচ্ছিল সেই বাতাস ইছামতীতে আমাদের অনুকূল হতে পারত, সেই ভরসায় এ পথে প্রবেশ করেছিলুম। কিন্তু বাতাসের উপর বিশ্বাস স্থাপন করা সুবুদ্ধির কাজ নয়। পাগলামি উনপঞ্চাশ শ্রেণীতে বিভক্ত করে লোকে তাকে উনপঞ্চাশ বায়ু নাম দিয়েছে। বাস্তবিক পঞ্চভূতের মধ্যে বায়ুতে যে পরিমাণে পাগলামি আছে এমন আর কোনোটাতে নেই।

সাতারা
১৮ জুলাই ?
১৮৯৪

১৩২

কলকাতা

১৫ জুলাই। ১৮৯৪।

স্টীমার যখন ইছামতী থেকে বেরিয়ে সন্ধ্যাবেলায় পদ্মার মধ্যে এসে পড়ল তখন যে কী সুন্দর শোভা দেখেছিলুম সে আর কী বলব। কোথাও কোনো কূল কিনারা দেখা যাচ্ছে না— ঢেউ নেই, সমস্ত প্রশান্ত গম্ভীর পরিপূর্ণ। ইচ্ছা করলে যে এখনই প্রলয় করে দিতে পারে সে যখন সুন্দর প্রসন্ন মূর্তি ধারণ করে, সে যখন তার প্রকাণ্ড প্রবল ক্ষমতাকে সৌম্য মাধুর্যে প্রচ্ছন্ন করে রেখে দেয়, তখন তার সৌন্দর্য এবং মহিমা একত্র মিশে একটি চমৎকার উদার সম্পূর্ণতা ধারণ করে। ক্রমে যখন গোধূলি ঘনীভূত হয়ে চন্দ্র উঠল তখন আমার মুগ্ধ হৃদয়ের মধ্যে সমস্ত তারগুলো যেন বেজে উঠতে লাগল।

সাতারা

১৯ জুলাই ১৮৯৪

কলকাতা
১৬ জুলাই। ১৮৯৪।

সদ্যোনিদ্রোত্থিত তেতালার ঘরে গিয়ে দেখি, আমার কনিষ্ঠ শাবকটি শয়নগৃহের মেজের মাদুরের উপরে প'ড়ে প'ড়ে কলরব করবার চেষ্টায় আছে। সেটা প্রায় ঠিক পূর্ববৎই আছে, গাল-দুটো সেইরকম ফুলো-ফুলো, চোখ দুটো সেইরকম অবুঝভাবে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করছে— ঘাড়ের উপর মাথাটা সেইরকম সর্বদাই টল্‌টল্ ঢল্‌ঢল্ করছে। সব-সুদ্ধ ক্ষুদ্র ব্যক্তিটি নলিনীদলগত শিশিরবিন্দুর মতো বৃহৎ পৃথিবীটার উপর টলমল করছে। তাকে কোলে তুলে নেওয়া গেল। প্রথমটা খানিক ক্ষণ যেন পূর্বপরিচয়ের স্মৃতি মনে আনবার চেষ্টা করছিল— অল্প একটুখানি থম্‌থমে ভাবে আমাকে কপোলনিমগ্ন দুই চক্ষুর দ্বারা পর্যালোচনা করতে লাগল। মাঝে মাঝে, কোনো বিশেষ কারণ না থাকা সত্ত্বেও, একটু একটু করে স্মিতহাস্য চলছিল। ক্রমে অনতিকাল মধ্যেই খরনখরসুদ্ধ মোটা মোটা নরম নরম করতল দিয়ে নাক মুখ চোখ চুল গোঁফ দাড়ি যা সম্মুখে পড়তে লাগল তাতেই হস্তক্ষেপ করতে আরম্ভ করে দিলে, কেবল তাই নয়, হুংকার-শব্দ-পূর্বক আগ্রহসহকারে নাক চোখ ধরে মুখের মধ্যে পূরে দিতে চেষ্টা করতে লাগল। বিছানার উপর উপুড় হয়ে প'ড়ে টল্‌টলে মাথা এবং মোটা মোটা হাত পা দিয়ে খানিকক্ষণ সানন্দে সন্তরণও হল। পরিবর্তনের মধ্যে মনে হল যেন, প বর্গের দুটো-একটা অক্ষর বহুকষ্টে আজকাল উচ্চারণ করতে সক্ষম হয়েছে এবং চক্ষুতারকায় একটুখানি বুদ্ধিজ্যোতি পরিস্ফুট হয়েছে। নিজের নামের শব্দটা চিনেছে এবং আত্মীয়স্বজনদেরও কতক কতক পরিচয় লাভ করতে পেরেছে। তার গায়ের গন্ধটিও সেইরকম কাঁচা-কাঁচা আছে। কলকাতায় এসে অবধি আমার অধিকাংশ সময় তারই সঙ্গে হাস্যালাপে কেটে যাচ্ছে।

সাতারা।
২০ জুলাই ১৮৯৪

১৩৪

কলকাতা

১৯ জুলাই। ১৮৯৪।

মীরার জন্যে আমার কোনো কাজ হবার যো নেই [বব]। ... ... সেই ছোটো ব্যক্তিটি বিছানার উপরে চিৎ হয়ে পড়ে আপনার পা দুখানিকে দুর্লভ সামগ্রীর মতো একবার আকাশে তুলে দিয়ে তার পরে নিজের মুখের মধ্যে পূরে দিয়ে যখন উচ্চকলস্বরে আঃ বাঃ বাঃ বাঃ শব্দে চীৎকার আরম্ভ করে দেন তখন আমার পক্ষে লেখাপড়া কিম্বা কোনো কাজ করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। তার পাশে এক জায়গায় উপুড় হয়ে পড়ি, সে বিবিধ চঞ্চল ভঙ্গীতে তার বাহু দুটি বিক্ষেপ করে আমার গোঁফ দাড়ি চুল নাক কান চশমা ঘড়ির-চেন নিয়ে মহা উপদ্রব করতে থাকে, এবং ক্রমশই উত্তেজিত হয়ে গর্জন করতে আরম্ভ করে। এমনি ভাবে আমার সময় চলে যায়। এক-একদিন রাত্রে শুনতে পাই, সে বিছানায় জেগে উঠে কলরব করতে আরম্ভ করেছে— কাছে গিয়ে উপস্থিত হলেই একটুখানি হাসি হয়; ভাবটা এই যে, একজন খেলবার সঙ্গী পাওয়া গেল। তার পর অনেক ক্ষণ ধরে আর কিছুতেই ঘুম নেই, উপুড় হয়ে পড়ে বিছানাময় সাঁৎরে বেড়াতে থাকে।

সাতারা

২৩ জুলাই ১৮৯৪

কলকাতা

২১ জুলাই। ১৮৯৪।

আমার ভারী ইচ্ছে— আমার ঘরের কাছে একজন কেউ গান বাজনা করবার লোক থাকে। বে[লি] যদি দিশী এবং ইংরাজি সংগীতে বেশ ওস্তাদ হয়ে ওঠে তা হলে আমার অনেকটা সাধ মিটবে। কিন্তু ওস্তাদও হয়ে উঠবে আর আমার ঘর থেকেও অমনি চলে যাবে। সেদিন অ[ভী] যখন গান করছিল আমি ভাবছিলুম মানুষের সুখের উপকরণগুলি যে খুব দুর্লভ তা নয়— পৃথিবীতে মিষ্টিগলার গান নিতান্ত অসম্ভব আইডিয়ালের মধ্যে নয়, অথচ ওতে যে আনন্দ পাওয়া যায় তা অত্যন্ত গভীর। কিন্তু জিনিষটি যতই সুলভ হোক, ওর জন্যে যথোপযুক্ত অবকাশ করে নেওয়া ভারী শক্ত। যে ইচ্ছাপূর্বক গান গাবে এবং যে ইচ্ছাপূর্বক গান শুনবে পৃথিবীতে কেবল এই দুটি মাত্র লোক নেই, চতুর্দিকে অধিকাংশ লোক আছে যারা গান গাবেও না গান শুনবেও না। তাই সব-সুদ্ধ মিশিয়ে ও আর হয়েই ওঠে না; দিনের পর দিন চলে যায়, অন্তঃকরণটা তৃষিত হয়ে উঠতে থাকে, সংসারটা যেন জীর্ণ অস্থিচর্মসার হয়ে আসে। আমি অনেক সময় ভাবি যে, আমাদের বড়ো বড়ো ইচ্ছাগুলো সফল হয় না ব'লে আমরা দুঃখ পাই সত্য, কিন্তু আমাদের ছোটো ছোটো ক্ষুধাতৃষ্ণাগুলি দিনে দিনে মুহূর্তে মুহূর্তে অতৃপ্ত থেকে যায় ব'লে আমাদের অজ্ঞাতসারে আমাদের প্রকৃতি ক্রমশ শীর্ণ শুষ্ক হয়ে আসতে থাকে— আমরা সেটাকে সব সময় গণ্য করি নে, কিন্তু পরিমাণে সে জিনিষটি সামান্য নয়। অন্তঃকরণ যখন তার নানা খাদ্য থেকে বঞ্চিত হয়ে উপবাসী হয়ে থাকে তখন দুঃখভার বহন করা তার পক্ষে বড়ো বেশি দুঃসহ হয়ে পড়ে। আমি জানি, আমার প্রকৃতি সংগীত চায়, শিল্প চায়, সৌন্দর্য চায়, ভাবুক মানুষের সঙ্গ চায়, সাহিত্যের আলোচনা চায়— কিন্তু

জুলাই ১৮৯৪

এ দেশে আমার বৃথা আকাঙ্ক্ষা, বৃথা চেষ্টা। এখানকার লোকেরা বিশ্বাসও করতে পারে না যে, এ জিনিষগুলো কারও পক্ষে অত্যাবশ্যক। আমিও ক্রমে ভুলে যেতে আরম্ভ করি যে, আমার প্রকৃতির প্রায় কোনো শিকড়ই কোনো খাদ্য পাচ্ছে না। শেষকালে হঠাৎ যেদিন কোনো একটা খাদ্য কিছু পরিমাণে জোটে তখন হৃদয়ের তীব্র আগ্রহ দেখে মনে পড়ে যে, এতদিন আমি উপবাস করে ছিলুম, এ জিনিষটা আমার প্রকৃতির জীবনধারণের পক্ষে আবশ্যক।

সাতারা

২৫ জুলাই ১৮৯৪

কলকাতা

১ অগস্ট্। ১৮৯৪।

শরৎচন্দ্র রায় ব'লে একজন কে দেখা করতে এসেছিল, আমি দেখা করলুম না। বাঙালির ছেলেকে একবার ঘরের মধ্যে ঢোকালে, বের করে দেওয়া দায় হয়ে ওঠে। কিন্তু বাঙালির মেয়ে মীরাটিও বড়ো কম নন— তিনিও একবার কলরব-সহকারে আমার ঘরের মধ্যে প্রবেশ করলে আর শীঘ্র বের হন না। আমাকে থাবড়ে থুবড়ে, আমার বুকের উপর নৃত্য ক'রে— আমার দাড়ি গোঁফ, চুলের সিঁথে, লেখবার খাতা, গল্পের প্লট, ভাবের অনুবৃত্তি সমস্ত দুই ক্ষুদ্র হাতে ঘেঁটে নাস্তানাবুদ করে দিয়ে তবে তিনি আমার গৃহ হতে নিঃসৃত হন। আবার মুশকিল এই যে, সে না এলে আমাকে তার কাছে যেতে হয়— পাশের ঘর থেকে সে চেঁচাতে আরম্ভ করে, নিকটবর্তী যার কানে সেই চীৎকারধ্বনি প্রবেশ করতে থাকে সেই উতলা হয়ে কাজকর্ম সমস্ত ফেলে শব্দ-অভিমুখে ছুটতে থাকে— গিয়ে দেখে একটি মোটাসোটা গোলাকার উপুড়মূর্তি প্রকাণ্ড বিছানাটার মাঝখানে পড়ে বালিশ চাপড়াচ্ছে এবং অকারণ আনন্দভরে কল্লোল করছে। অভ্যাগতকে দেখবামাত্রই তৎক্ষণাৎ মুখখানি হাস্যবিকশিত হয়ে ওঠে, কখনো বা যথাসাধ্য হাঁ করে কী একটা অব্যক্ত ভাবকে প্রকাশ করবার চেষ্টা করে নিরস্ত হয়। অবশেষে তার ক্ষুদ্র দেহটির পাশে আপনার বিপুল দেহটি প্রসারিত ক'রে অনেক ক্ষণ পর্যন্ত তার সঙ্গে নিতান্তই অর্থহীন অসম্বদ্ধ মিষ্টালাপ করে তবে আপনার কর্তব্যকার্যে মনোযোগ দিতে পারি। বড়োলোকের সঙ্গে আলাপ করতে গেলে ক্রমে আলাপের বিষয় ফুরিয়ে যায়, সুতরাং শীঘ্র ছুটি পাওয়া যেতে পারে, কিন্তু যে স্থলে কোনো বিষয়মাত্র নেই অথচ আলাপ আছে সেখানে কোথায় থামতে হবে কিছুই ভেবে ঠিক করা যায় না— মীরাতে

অগস্ট, ১৮৯৪

আমাতে সদাসর্বদা যে-সকল টেট-আ-টেট হয়ে থাকে তার কোনো জায়গায় ভাবের বিরাম পাওয়া যায় না, সুতরাং থামতে গেলে নিতান্তই গায়ের জোরে থামতে হয়।

সাতারা
৫ অগস্ট, ১৮৯৪

১৩৭

কলকাতা

২ অগস্ট্। ১৮৯৪।

প্রি[য়] বাবুর সঙ্গে দেখা করে এলে আমার একটা মহৎ উপকার এই হয় যে, সাহিত্যটাকে পৃথিবীর মানব-ইতিহাসের একটা মস্ত জিনিষ বলে প্রত্যক্ষ দেখতে পাই এবং তার সঙ্গে এই ক্ষুদ্র ব্যক্তির ক্ষুদ্র জীবনের যে অনেকখানি যোগ আছে তা অনুভব করতে পারি। তখন আপনার জীবনটাকে রক্ষা করবার এবং আপনার কাজগুলো সম্পন্ন করবার যোগ্য বলে মনে হয়— তখন আমি কল্পনায় আপনার ভবিষ্যৎ জীবনের একটা অপূর্ব ছবি দেখতে পাই। দেখি যেন আমার দৈনিক জীবনের সমস্ত ঘটনা সমস্ত শোকদুঃখের মধ্যস্থলে একটি অত্যন্ত নির্জন নিস্তব্ধ জায়গা আছে, সেইখানে আমি নিমগ্নভাবে বসে সমস্ত বিস্মৃত হয়ে আপনার সৃষ্টিকার্যে নিযুক্ত আছি— সুখে আছি। সমস্ত বড়ো চিন্তার মধ্যেই একটি উদার বৈরাগ্য আছে। যখন অ্যাস্ট্রনমি প'ড়ে নক্ষত্রজগতের সৃষ্টির রহস্যশালার মাঝখানে গিয়ে দাঁড়ানো যায় তখন জীবনের ছোটো ছোটো ভারগুলো কতই লঘু হয়ে যায়! তেমনি আপনাকে যদি একটা বৃহৎ ত্যাগস্বীকার কিম্বা পৃথিবীর একটা বৃহৎ ব্যাপারের সঙ্গে আবদ্ধ করে দেওয়া যায় তা হলে তৎক্ষণাৎ আপনার অস্তিত্বভার অনায়াসে বহনযোগ্য বলে মনে হয়। দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের দেশের শিক্ষিত লোকদের মধ্যেও ভাবের সমীরণ চতুর্দিকে সঞ্চারিত সমীরিত নয়, জীবনের সঙ্গে ভাবের সংস্রব নিতান্তই অল্প, সাহিত্য যে মানবলোকে একটা প্রধান শক্তি তা আমাদের দেশের লোকের সংসর্গে কিছুতেই অনুভব করা যায় না— নিজের মনের আদর্শ অন্য লোকের মধ্যে উপলব্ধি করবার একটা ক্ষুধা চিরদিন থেকে যায়।

সাতারা

৬ অগস্ট, ১৮৯৪

শিলাইদহ

৪ অগস্ট্‌। ১৮৯৪।

দৃশ্য পরিবর্তন হয়েছে। কোথায় সেই কলকাতা, সেই তেতালার ছাত, সেই বিশৃঙ্খল খাট পালং চৌকির নিবিড়তার মধ্যে নিয়মিত জীবনযাত্রা, সেই পাশের ঘরে পিয়ানোর স্কেল-প্র্যাক্‌টিস— সেই মীরা, যিনি অতি ক্ষুদ্র হয়েও আমার পক্ষে জগতে অত্যন্ত বৃহৎ স্থান অধিকার করে আছেন! হঠাৎ স্বপ্নের মতো চার দিকের অভ্রভেদী অট্টালিকাগুলি বায়ুতরঙ্গিত শ্যামল ধান্যক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে, চিৎপুরের বড়ো রাস্তাটি প্রশস্ত প্রসারিত তরলকলগীতিময় তরঙ্গিণীরূপে প্রবাহিত, ধূলিপূর্ণ ঘন বাতাস নির্মল স্বচ্ছ হয়ে অবাধ মুক্ত আকাশময় প্রাণহিল্লোল সঞ্চার করে দিচ্ছে— একটি উন্মুক্তবাতায়ন তরণীর মধ্যে একটি ক্যাম্প্‌-টেবিলের শীর্ষদেশে বেত্রাসনে প্রধান নায়ক শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ প্রভাতে পত্রলিখনে নিযুক্ত এবং তাঁহার সম্মুখভাগে অপর বেত্রাসনে তদীয় বন্ধু শ্রীযুক্ত ·· সাধনার জন্যে গল্পরচনায় একাগ্রমনে প্রবৃত্ত। আজকের দিনের দৃশ্য তো এমনি ভাবে আরম্ভ হয়েছে। এখনি অনতিবিলম্বে নায়েব এবং পেশকারের খাতা এবং বান্‌ডিলবদ্ধ কাগজপত্র হস্তে প্রবেশ হবে, তার পরে যে ভাবে ডায়ালগ আরম্ভ হবে কোনো মানবনাট্যকারের হাতে ভার থাকলে এমন দৃশ্যে এমন কালে সেরকম ডায়ালগ রচিত হত না এবং হলেও সমালোচকবৃন্দের দ্বারা নিন্দিত হত। কিন্তু যে অদৃষ্ট কবি আমাদের জীবননাট্যকে প্রতিদিন নব নব গর্ভাঙ্কে বিভক্ত করে পঞ্চম অঙ্কের পরিণামের দিকে নিয়ে যাচ্ছেন, তিনি দেশকালপাত্রের সংগতি, রচনাকৌশল, ঘটনাসংস্থানের প্রতি দৃক্‌পাত মাত্র করেন না; তিনি পদ্মাতরঙ্গচঞ্চল সাধের তরণীর মধ্যে আমলার সমাবেশ করেন, নায়ক-নায়িকার আলাপের মধ্যে পদে পদে ব্যাকরণ এবং অলংকার-দোষ ঘটিয়ে থাকেন

এবং যদি বা শুভাদৃষ্টক্রমে নায়কের ভাগ্যে অলংকারশাস্ত্রসম্মত কবিত্ব-পূর্ণ প্রেমপত্রিকা জোটে, তার লেখক পুরুষ হয়ে দাঁড়ায়।

আজ সুন্দর দৃশ্য, সুন্দর আলো এবং সুন্দর বাতাস। ইচ্ছা করছে বেশ মধুরভাবে মগ্ন হয়ে একটা কিছু লিখি বা গুন্ গুন্ করে গান তৈরি করি, কিম্বা বেশ একটি সরল সুন্দর অতিশয়বৈচিত্র্যবিহীন এবং বিশ্লেষণশূন্য গল্পের বই পড়ি— আরামে চৌকিতে হেলান দিয়ে জগৎসংসার বিস্মৃত হয়ে যাই, পড়তে পড়তে চোখের কোণে তীরের শ্যামল রেখা একটু একটু পড়বে এবং কানে জলের তরল কলশব্দ অবিরল প্রবেশ করতে থাকবে। কিন্তু এই-সমস্ত অপেক্ষাকৃত সুলভ সাধও আপাতত পূর্ণ হবার সম্ভাবনা দেখছি নে। কারণ, চিঠি লিখতে লিখতে ইতিমধ্যেই নায়েব ও মৌলবী এসে প্রবেশ করেছেন। নায়েব আমাদের জমিদারি-প্রচলিত হিসাবপত্রের পদ্ধতি শ্রী··· বাবুকে বোঝাতে আরম্ভ করেছে; তাই নিয়ে যে জামিদারিক ভাষার আন্দোলন উপস্থিত হয়েছে তার কণামাত্র যদি এই পত্রপ্রান্তে নমুনা-স্বরূপ উদ্‌ধৃত করে দিই তা হলে বোধ হয় ইহজন্মে তুই আর আমাকে মার্জনা করবি নে— সেই জন্যে বিরত হলুম।

সাতারা

৯ অগস্ট ১৮৯৪

শিলাইদহ

৫ অগস্ট্‌। ১৮৯৪।

কাল সমস্ত রাত্রি বৃষ্টি খুব অজস্র ধারে হয়ে গেছে— আজ ভোরে যখন উঠ্‌লুম তখনও অশ্রান্ত বৃষ্টি চলছে এবং চতুর্দিক ম্লান হয়ে আছে। এই মাত্র স্নানের ঘর থেকে বেরিয়ে এসে দেখি পশ্চিম দিকে আউষ ধানের ক্ষেতের উপর খুব সজল শ্যামল অবনত মেঘ স্তূপে স্তূপে স্তরে স্তরে জমে রয়েছে এবং পূর্বদক্ষিণ দিকে মেঘ খানিকটা বিচ্ছিন্ন হয়ে রোদ্‌দুর ওঠবার চেষ্টা হচ্ছে, রোদ্‌দুরে বৃষ্টিতে খানিক ক্ষণের জন্যে যেন সন্ধি হয়েছে। যে দিকে ছিন্ন মেঘের ভিতর দিয়ে সকাল বেলাকার আলো বিচ্ছুরিত হয়ে বেরিয়ে আসছে সে দিকে অপার পদ্মা-দৃশ্যটি বড়ো চমৎকার হয়েছে— জলের রহস্যগর্ভ থেকে একটি স্নানশুভ্র অলৌকিক জ্যোতিঃপ্রতিমা উদিত হয়ে নীরব মহিমায় দাঁড়িয়ে আছে আর ডাঙার উপরে কালো মেঘ স্ফীতকেশর সিংহের মতো ভ্রূকুটি করে ধান্যক্ষেত্রের মধ্যে থাবা মেলে দিয়ে চুপ করে বসে আছে, সে যেন একটি সুন্দরী দিব্যশক্তির কাছে হার মেনেছে, কিন্তু এখনও পোষ মানে নি— দিগন্তের একটি কোণে আপনার সমস্ত রাগ এবং অভিমান গুটিয়ে নিয়ে বসে আছে। এখনি আবার বৃষ্টি হবে তার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে, রীতিমত শ্রাবণের বর্ষণের উপক্রম হচ্ছে— সুপ্তোত্থিত সহাস্য জ্যোতীরশ্মি যে মুক্তদ্বারের সামনে এসে দাঁড়িয়েছিল সেই দ্বারটি আবার আস্তে আস্তে রুদ্ধ হয়ে আসছে— পদ্মার ঘোলা জলরাশি ছায়ায় আচ্ছন্ন হয়ে এসেছে, নদীর এক তীর থেকে আর-এক তীর পর্যন্ত মেঘের সঙ্গে মেঘ আবদ্ধ হয়ে সমস্ত আকাশ অধিকার করে নিয়েছে— খুব নিবিড় রকমের আয়োজনটা হয়েছে।···

এতদিনে আউষধান এবং পাটের ক্ষেত শূন্যপ্রায় হয়ে যাওয়া উচিত ছিল, কিন্তু এবারে দেব্‌তার গতিকে ক্ষেতের সমস্ত শস্য

ক্ষেতেই আন্দোলিত হচ্ছে। দেখতে ভারী সুন্দর হয়েছে— বর্ষার আকাশ সজল মেঘে স্নিগ্ধ এবং সমস্ত পৃথিবী হিল্লোলিত সরস শ্যাম শস্যে কোমলা— উপরে একটি গাঢ় রঙ, নীচেও আর-একটি গাঢ় রঙের প্রলেপ— মাটি কোথাও অনাবৃত নয়, মাটির আসল রঙটি কেবল এই মাঝখানে প্রবাহিত ঘোলা নদীর জলের মধ্যে দেখা যাচ্ছে। নদী বিষম ঘোলা। পদ্মা এক-একটি দেশ প্রদেশ বহন করে নিয়ে চলেছে ; ওর জলের মধ্যে কত জমিদারের জমিদারি গুলিয়ে রয়েছে। পদ্মা ভীষণ কৌতুকে এক রাজার রাজ্য হরণ করে আপন গেরুয়া আঁচলের মধ্যে লুকিয়ে অন্য রাজার দরজায় রাতারাতি থুয়ে আসছে— শেষে প্রাতঃকালে রাজায় রাজায় মহা লাঠালাঠি বেধে যাচ্ছে।

সাতারা

১০ অগস্ট ১৮৯৪

শিলাইদহ
৮ অগস্ট্। ১৮৯৪।

আজ সমস্ত দিন ···বাবু নেই, আজ সমস্ত দিন নদীর কল্লোল শোনা গেছে। কোনো অসংলগ্ন প্রশ্নের অনাবশ্যক উত্তর দিতে হয় নি। একটিমাত্র মানুষ কেবলমাত্র সামনে উপস্থিত থাকলেই প্রকৃতির অর্ধেক কথা কানে আসে না। আমি দেখেছি থেকে থেকে টুকরো-টুকরো কথাবার্তা কওয়ার চেয়ে মানসিক শক্তির অপব্যয় আর কিছুতে হয় না। যদি কোনো একটা সৃজনে প্রবৃত্ত হবার পূর্বে বুদ্ধিশক্তি কল্পনাশক্তি তাজা রাখা আবশ্যক হয় তা হলে অনেক ক্ষণ সম্পূর্ণ নীরব থাকা আবশ্যক। নিজের কথার দ্বারা মন নিজে ভারী উদ্ভ্রান্ত হয়ে পড়ে। দিনের পর দিন কথা না কয়ে কাটছে এমন অভিজ্ঞতা তোদের বোধ হয় কখনও হয় নি। যদি হ'ত তা হলে বুঝতে পারতিস সেই অবস্থায় আপনার চতুর্দিক্‌কে গ্রহণ করবার এবং উপভোগ করবার ক্ষমতা আশ্চর্য বেড়ে ওঠে— তখন হঠাৎ টের পাওয়া যায় আমাদের চতুর্দিক্‌ই কথা কচ্ছে, কেবল যদি কিছু ক্ষণের জন্যে আমাদের অন্তহীন বক্‌বক্‌ থামে তা হলেই সেই-সমস্ত বিচিত্র ভাষা আমাদের কানে আসে। আজ নদীর কলধ্বনির প্রত্যেক তরল লকার আমার সর্বাঙ্গে যেন কোমল আদর বর্ষণ করছে— আমার মনটি আজ অত্যন্ত নির্জন এবং সম্পূর্ণ নিস্তব্ধ, মেঘমুক্ত আলোক-পূর্ণ শস্যহিল্লোলিত জলকল্লোলিত উদার চতুর্দিকের সঙ্গে মুখোমুখি বিশ্রব্ধ প্রীতিসম্মিলনের উপযুক্ত একটি নীরব গোপনতা আমার মধ্যে স্থির-ভাবে বিরাজ করছে— আমি জানি আজ সন্ধের সময় যখন কেদারা টেনে বোটের ছাতের উপর একলাটি বসব তখন আমার আকাশে আমার সেই সন্ধ্যাতারাটি ঘরের লোকের মতো দেখা দেবে! আমার এই পদ্মার উপরকার সন্ধ্যাটি আমার অনেক দিনের পরিচিত —আমি শীতের সময় যখন এখানে আসতুম এবং কাছারি থেকে

ফিরতে অনেক দেরি হত, আমার বোট ও পারে বালির চরের কাছে বাঁধা থাকত, ছোটো জেলেডিঙি চড়ে নিস্তব্ধ নদীটি পার হতুম, তখন এই সন্ধ্যাটি সুগম্ভীর অথচ সুপ্রসন্ন মুখে আমার জন্যে অপেক্ষা করে থাকত; আমার জন্যে একটি শান্তি, একটি কল্যাণ, একটি বিশ্রাম সমস্ত আকাশময় প্রস্তুত থাকত; সন্ধ্যাবেলাকার নিস্তরঙ্গ পদ্মার উপরকার নিস্তব্ধতা এবং অন্ধকার ঠিক যেন নিতান্ত আমার অন্তঃপুরের ঘরের মতো বোধ হত। এখানকার প্রকৃতির সঙ্গে সেই আমার একটি মানসিক ঘরকন্নার সম্পর্ক, সেই একটি অন্তরঙ্গ আত্মীয়তা আছে— যা ঠিক আমি ছাড়া আর কেউ জানে না। সেটা যে কতখানি সত্য তা বললেও কেউ উপলব্ধি করতে পারবে না। জীবনের যে গভীরতম অংশ সর্বদা মৌন এবং সর্বদা গোপন— সেই অংশটি আস্তে আস্তে বের হয়ে এসে এখানকার অনাবৃত সন্ধ্যা এবং অনাবৃত মধ্যাহ্নের মধ্যে নীরবে এবং নির্ভয়ে সঞ্চরণ করে বেড়িয়েছে। এখানকার দিনগুলি তার সেই অনেক কালের পদচিহ্ন-দ্বারা যেন অঙ্কিত।

আমাদের দুটো জীবন আছে— একটা মনুষ্যলোকে আর-একটা ভাবলোকে। সেই ভাবলোকের জীবনবৃত্তান্তের অনেকগুলি পৃষ্ঠা আমি এই পদ্মার উপরকার আকাশে লিখে গেছি। যখনি আসি এবং যখনি একলা হতে পাই, তখনি সেগুলি চোখে পড়ে। এখানে যখন আসি তখন বেশ বুঝতে পারি— আমার কবিতায় আমি কিছুই লিখতে পারি নি। যা অনুভব করি তা ব্যক্ত করতে পারি নে। কারণ, ভাষা তো কেবল আমার একলার নয়— ভাষা সাধারণের ব্যবহারের জন্যে, আমি আমার সমস্ত প্রকৃতি দিয়ে যা অনুভব করি সাধারণে তা করে না এবং সাধারণের ভাষাও সে সম্বন্ধে কোনো কথা স্পষ্ট করে বলতে চায় না।

সাতারা
১৩ অগস্ট ১৮৯৪

শিলাইদহ

৯ অগস্ট ? । ১৮৯৪ ।

নদী একেবারে কানায় কানায় ভরে এসেছে। ও পারটা প্রায় দেখা যায় না। জল এক-এক জায়গায় টগ্‌বগ্‌ করে ফুটছে, আবার এক-এক জায়গায় কে যেন অস্থির জলকে দুই হাত দিয়ে চেপে চেপে সমান করে মেলে দিয়ে যাচ্ছে। আজকাল প্রায়ই দেখতে পাই ছোটো ছোটো মৃত পাখি স্রোতে ভেসে আসছে— তাদের মৃত্যুর ইতিহাস বেশ স্পষ্ট বোঝা যায়। কোন্‌-এক গ্রামের ধারের আমবাগানের আম্রশাখায় তাদের বাসা ছিল। তারা সন্ধের সময় বাসায় ফিরে এসে পরস্পরের নরম নরম গরম ডানাগুলি একত্র করে শ্রান্ত দেহে ঘুমিয়ে ছিল; হঠাৎ রাত্রে পদ্মা একটু খানি পাশ ফিরেছেন, অমনি গাছের নীচেকার মাটি ধসে পড়ে গেছে, গাছ তার সমস্ত ব্যাকুল প্রসারিত শিকড়গুলো নিয়ে জলে পড়ে গেছে, নীড়চ্যুত পাখিগুলি হঠাৎ রাত্রে এক মুহূর্তের জন্যে জেগে উঠল— তার পরে আর জাগতে হল না। এই ভাসমান মৃত পাখিগুলিকে দেখলে হঠাৎ মনের মধ্যে ভারী একটা আঘাত লাগে। বুঝতে পারি আমরা যে প্রাণকে সব চেয়ে ভালোবাসি প্রকৃতির কাছে তার মূল্য যৎসামান্য। আমি দেখেছি আমি যখন মফস্বলে থাকি তখন পশুপক্ষী জীবজন্তু আমার ভারী নিকটবর্তী হয়ে আসে— আপনাকে তাদের চেয়ে খুব বেশি স্বতন্ত্র কিম্বা উঁচুদরের মনে হয় না। একটি বৃহৎ সর্বগ্রাসী রহস্যময়ী প্রকৃতির কাছে আমার সঙ্গে অন্য জীবের প্রভেদ অকিঞ্চিৎকর সামান্য ব'লে উপলব্ধি হয়। এই পাখিগুলি যে অবহেলায় মরেছে এবং অবহেলায় ভেসে চলেছে সে আমার মৃত্যুর চেয়ে কম শোচনীয় বলে মনে হয় না। শহরে মনুষ্য-সমাজ এত জটিল এবং মনুষ্যকীর্তি এত জাজ্বল্যমান যে, মানুষ সেখানে অত্যন্ত প্রধান হয়ে ওঠে— সে সেখানে নিষ্ঠুরভাবে আপনার সুখ-

দুঃখের কাছে অন্য কোনো প্রাণীর সুখদুঃখ গণনার মধ্যেই আনে না। য়ুরোপেও মানুষ এত জটিল এবং এত প্রধান যে তারা জন্তুদের বড়ো বেশি জন্তু মনে করে। ভারতবর্ষীয়েরা জন্মক্রমে মানুষ থেকে জন্তু এবং জন্তু থেকে মানুষ হওয়া কিছুই মনে করে না— কীটপতঙ্গ পর্যন্ত প্রাণী মাত্রেরই একটা সমশ্রেণিতা আছে, সেটা তারা খুব অনুভব করে— এই জন্যে আমাদের শাস্ত্রে সর্বভূতে দয়াটা একটা অসম্ভব আতিশয্য বলে পরিত্যক্ত হয় নি। মফস্বলের উদার প্রকৃতির মাঝখানে এলে, তার সঙ্গে দেহে দেহে ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শ হলে আমার সেই ভারতবর্ষীয় স্বভাবটি জাগ্রত হয়ে ওঠে— আমি জীবজন্তুর সুখদুঃখের মধ্যে প্রবেশ করতে পারি। সামান্য ক্ষুধানিবারণের জন্যে পাখির মাংস খেতে গেলে, আমার নিজের শাবকদের কথা মনে পড়ে। একটি পাখির সুকোমল পালখে আবৃত স্পন্দমান ক্ষুদ্র বক্ষটুকুর মধ্যে জীবনের আনন্দ যে কত প্রবল তা আর আমি অচেতন ভাবে ভুলে থাকতে পারি নে। সেইজন্যে প্রতিবারেই মফস্বলে এসে মাংস খাওয়ার প্রতি আমার আন্তরিক ধিক্কার জন্মে, আবার কলকাতায় জনসমাজের মধ্যে গিয়ে মাংসাশী হয়ে উঠি। সেখানে মানুষ ছাড়া সমস্ত সজীব প্রাণী জড়ের সমান হয়ে আসে। পাড়াগাঁয়ে আমি ভারতবাসী হই, আর কলকাতায় গিয়ে আমি য়ুরোপীয় হয়ে যাই। কোন্‌টা আমার যথার্থ প্রকৃতি কে জানে?

সাতারা

১৪ অগস্ট ১৮৯৪

১৪২

শিলাইদহ

১০ অগস্ট্। ১৮৯৪।

কাল খানিক রাত্রে জলের শব্দে আমার ঘুম ভেঙে গেল। নদীর মধ্যে হঠাৎ একটা তুমুল কল্লোল এবং প্রবল চঞ্চলতা উপস্থিত হয়েছে। বোধ হয় অকস্মাৎ একটা নতুন জলের স্রোত এসে পড়েছে। রোজই প্রায় এই রকম ব্যাপার ঘটছে। বসে আছি আছি হঠাৎ দেখতে পাই নদী ছল্‌ছল্‌ কল্‌কল্‌ করে জেগে উঠেছে আর সব-সুদ্ধ খুব একটা ধুমধাম পড়ে গেছে। বোটের তক্তার উপর পা রাখলে বেশ স্পষ্ট বোঝা যায় তার নীচে দিয়ে কত রকমের বিচিত্র গতি অবিশ্রাম চলছে— খানিকটা কাঁপছে, খানিকটা টলছে, খানিকটা ফুলছে, খানিকটা আছাড় খেয়ে পড়ছে। ঠিক যেন আমি সমস্ত দেশের নাড়ীর স্পন্দন অনুভব করছি। কাল অর্ধেক রাত্রে হঠাৎ একটা চঞ্চল উচ্ছ্বাস এসে নাড়ীর নৃত্য অত্যন্ত বেড়ে উঠেছিল। আমি অনেক ক্ষণ জানলার ধারে বেঞ্চের উপর বসে রইলুম। খুব এক রকম ঝাপসা আলো ছিল, তাতে করে সমস্ত উতলা নদীকে আরও যেন পাগলের মতো দেখাচ্ছিল। আকাশে মাঝে মাঝে মেঘ। একটা খুব জ্বল্‌জ্বলে মস্ত তারার ছায়া দীর্ঘতর হয়ে জলের মধ্যে অনেক দূর পর্যন্ত একটা জ্বালাময় বিদ্ধ বেদনার মতো থরথর করে কাঁপছিল। নদীর দুই তীর অস্পষ্ট আলোকে এবং গাঢ় নিদ্রায় আচ্ছন্ন অচেতন। মাঝখান দিয়ে একটা নিদ্রাহীন উন্মত্ত অধীরতা ভরপূর বেগে একেবারে নিরুদ্দেশ হয়ে চলেছে। অর্ধেক রাত্রে ঐ রকম দৃশ্যের মধ্যে জেগে উঠে বসে থাকলে আপনাকে এবং জগৎকে কী-এক নতুন রকমের মনে হয়— দিনের বেলাকার লোকসংসর্গের জগৎটা সম্পূর্ণ মিথ্যা হয়ে যায়। আবার আজ সকালে উঠে, আমার সেই গভীর রাত্রের জগৎ স্বপ্নের মতো কত দূরবর্তী এবং লঘু হয়ে গেছে। মানুষের পক্ষে দুটোই সত্য,

অথচ দুটোই বিষম স্বতন্ত্র। আমার মনে হয়, দিনের জগৎটা য়ুরোপীয় সংগীত, সুরে-বেসুরে খণ্ডে-অংশে মিলে একটা গতিশীল প্রকাণ্ড হার্মনির জটলা— আর রাত্রের জগৎটা আমাদের ভারতবর্ষীয় সংগীত, একটি বিশুদ্ধ করুণ গম্ভীর অমিশ্র রাগিণী। দুটোই আমাদের বিচলিত করে, অথচ দুটোই পরস্পরবিরোধী। কী করা যাবে— প্রকৃতির গোড়ায় একটা দ্বিধা একটা মস্ত বিরোধ আছে, রাজা এবং রানীর মধ্যে সমস্ত বিভক্ত। দিন এবং রাত্রি, বিচিত্র এবং অখণ্ড, পরিব্যক্ত এবং অনাদি। আমরা ভারতবর্ষীয়েরা সেই রাত্রির রাজত্বে থাকি। আমরা অখণ্ড অনাদির দ্বারা অভিভূত। আমাদের নির্জন এককের গান, য়ুরোপের সজন লোকালয়ের গান। আমাদের গানে শ্রোতাকে মনুষ্যের প্রতিদিনের সুখদুঃখের সীমা থেকে বের করে নিয়ে নিখিলের মূলে যে-একটি সঙ্গীহীন বৈরাগ্যের দেশ আছে সেইখানে নিয়ে যায়, আর য়ুরোপের সংগীত মনুষ্যের সুখদুঃখের অনন্ত উত্থান-পতনের মধ্যে বিচিত্রভাবে নৃত্য করিয়ে নিয়ে চলে।

সাতারা

১৫ অগস্ট ১৮৯৪

শিলাইদহ

১২ অগস্ট্। ১৮৯৪।

গেটের জীবনীটা তোর ভাল লাগছে? একটা তুই লক্ষ্য করে দেখে থাকবি— গেটে যদিও এক হিসাবে খুব নির্লিপ্ত প্রকৃতির লোক ছিল, তবু সে মানুষের সংশ্রব পেত, মানুষের মধ্যে মগ্ন ছিল। সে যে রাজসভায় থাকত সেখানে সাহিত্যের জীবন্ত আদর ছিল, জর্মনিতে তখন খুব একটা ভাবের মন্থন আরম্ভ হয়েছিল— হের্ডের শ্লেগেল হুম্বোল্ট্ শিলার কান্ট্ প্রভৃতি বড়ো বড়ো চিন্তাশীল এবং ভাবুকগণ দেশের চারি দিকে জেগে উঠছিল, তখনকার মানুষের সংসর্গ এবং দেশব্যাপী ভাবের আন্দোলন খুব প্রাণপরিপূর্ণ ছিল। আমরা হতভাগ্য বাঙালি লেখকেরা মানুষের ভিতরকার সেই প্রাণের অভাব একান্ত মনে অনুভব করি— আমরা আমাদের কল্পনাকে সর্বদাই সত্যের খোরাক দিয়ে বাঁচিয়ে রাখতে পারি নে, নিজের মনের সঙ্গে বাইরের মনের একটা সংঘাত হয় না ব'লে আমাদের রচনাকার্য অনেকটা পরিমাণে আনন্দবিহীন হয়। আমাদের দেশের লোক এত যে ইংরাজি সাহিত্য পড়েছে, কিন্তু তাদের অস্থিমজ্জার মধ্যে ভাবের প্রভাব প্রবেশ করতে পারে নি— তাদের ভাবের ক্ষুধাই জন্মায় নি, তাদের জড়শরীরের ভিতরে একটা মানসশরীর এখনো গঠিত হয়ে ওঠে নি, সেইজন্যে তাদের মানসিক আবশ্যক ব'লে একটা আবশ্যক-বোধ নিতান্তই কম— অথচ মুখের কথায় সেটা বোঝবার যো নেই, কেননা বোলচাল সমস্তই ইংরাজি থেকে শিখে নিয়েছে। এরা খুব অল্প অনুভব করে, অল্প চিন্তা করে এবং অল্পই কাজ করে— সেইজন্যে এদের সংসর্গে মনের কোনো সুখ নেই। গেটের পক্ষেও যদি শিলারের বন্ধুত্ব আবশ্যক ছিল তা হলে আমাদের মতো লোকের পক্ষে একজন যথার্থ খাঁটি ভাবুকের প্রাণসঞ্চারক সঙ্গ যে কত

অত্যাবশ্যক তা আর কী করে বোঝাব! আমাদের সমস্ত জীবনের সফলতাটা যে জায়গায় সেইখানে একটা প্রেমের স্পর্শ, একটা মনুষ্য-সঙ্গের উত্তাপ সর্বদা পাওয়া আবশ্যক— নইলে তার ফুলফলে যথেষ্ট বর্ণ গন্ধ এবং রস সঞ্চারিত হয় না।

সাতারা

১৭ অগস্ট ১৮৯৪

১৪৪

শিলাইদহ

১৩ অগস্ট্‌। ১৮৯৪।

যদিও আমার এমন অনেক লেখা বেরোয় যা তুচ্ছ, যা কেবলমাত্র সাধনার স্থান পোরাবার জন্যে লিখি, তবু তার মধ্যেও আমি যথাসাধ্য এবং যথাসম্ভব যত্ন প্রয়োগ করে থাকি। লেখার মধ্যে আমার ভিতরকার সত্য যথোচিত শ্রদ্ধা এবং অকৃত্রিমতার সঙ্গে প্রকাশ করবার চেষ্টা করি— আমার সরস্বতীকে আমি কোনো অবস্থাতেই অবহেলা করতে পারি নে। সম্প্রতি · ইংরাজি লেখা পড়েছিলুম— তার ··· লেখক ··· খ্যাতিপ্রাপ্ত একজন আর্টিস্ট্‌। তার সঙ্গে আমার অনেক বিষয়ে অনেক অনৈক্য আছে, কিন্তু দুটি বিষয়ে আমাদের মিল দেখলুম। এক হচ্ছে এই চতুর্দিকের বাস্তবিক জগতের অসম্পূর্ণতার মধ্যেই আপনার সৌন্দর্যের আদর্শকে আপনার প্রতিভাকে চরিতার্থ করা, দ্বিতীয় হচ্ছে নিজেকে প্রকাশ করবার একটা প্রবল ইচ্ছা। অহমিকার প্রভাবে যে নিজের কথা বলতে চাই তা নয়; কিন্তু যেটা যথার্থ চিন্তা করব, যথার্থ অনুভব করব, যথার্থ প্রাপ্ত হব, যথার্থরূপে প্রকাশ করাই তার একমাত্র স্বাভাবিক পরিণাম— এটা একেবারে আমার প্রকৃতিসিদ্ধ— ভিতরকার একটা চঞ্চল শক্তি ক্রমাগতই সেই দিকে কাজ করছে। অথচ সে শক্তিটা যে আমারই তা ঠিক মনে হয় না, মনে হয় সে একটা জগৎব্যাপ্ত শক্তি আমার ভিতর দিয়ে কাজ করছে। প্রায় আমার সমস্ত রচনাই আমার নিজের ক্ষমতার অতীত বলে মনে হয়— এমন-কি, আমার অনেক সামান্য গদ্য লেখাও। যে-সমস্ত তর্কযুক্তি আমি আগে থাকতে ভেবে রাখি, তার মধ্যেও আমার আয়ত্তের বহির্ভূত আর-একটি পদার্থ এসে নিজের স্বভাব-মত কাজ করে এবং সমস্ত জিনিষটাকে মোটের উপরে আমার অচিন্ত্যপূর্ব করে দাঁড় করিয়ে দিয়ে যায়। সেই শক্তির হাতে মুগ্ধভাবে

আত্মসমর্পণ করাই আমার জীবনের প্রধান আনন্দ। সে আমাকে কেবল যে প্রকাশ করায় তা নয়, অনুভব করায়, ভালোবাসায়। সেই জন্যে আমার অনুভূতি আমার নিজের কাছেই প্রত্যেকবার নূতন এবং বিস্ময়জনক। প্রকৃতির মধ্যে এসে আমার নিজের মনে যে ভাবোদয় হয় সেটা মনে হয় যেন আমার স্বভাবের, আমার শক্তির অতিরিক্ত একটা ব্যাপার। সেইজন্যে মনে হয় আমি সেটা কাউকে বোঝাতে এবং বিশ্বাস করাতে পারব না। আমার সব অনুভূতির মধ্যে ঐ রকম আমার অতিরিক্ত একটা উপাদান আছে। মীরাটাকে যখন আমার ভালো লাগে তখন তার মধ্যে আমি এমন একটা অসীম রহস্য অনুভব করি যে, সে কেবল আর আমার কন্যা মীরা থাকে না— সে বিশ্বের সমস্ত মূলরহস্য মূলসৌন্দর্যের অঙ্গ হয়ে পড়ে, আমার স্নেহ-উচ্ছ্বাস একটা উপাসনার মতো হয়ে আসে। আমার বিশ্বাস আমাদের সব স্নেহ সব ভালোবাসাই রহস্যময়ের পূজা— কেবল সেটা আমরা অচেতন ভাবে করি। ভালোবাসা মাত্রই আমাদের ভিতর দিয়ে বিশ্বজগতের অন্তরস্থিত শক্তির সজাগ আবির্ভাব— যে নিত্য-আনন্দ নিখিল জগতের মূলে সেই আনন্দের ক্ষণিক উপলব্ধি। নইলে ওর কোনোই অর্থ থাকে না। যে জগৎব্যাপী আকর্ষণশক্তিতে সমস্ত ভ্রাম্যমান বিশ্বজগৎ এক সূত্রে বাঁধা, সেই আকর্ষণেই আপেল ফল গাছ থেকে মাটিতে এসে পড়ে। বাহ্য জগতে যেমন এই আকর্ষণ, মনোজগতে সেই রকম একটা বিশ্বব্যাপী আনন্দের আকর্ষণ আছে— সেই আকর্ষণেই আমরা বিশ্বের মধ্যে সৌন্দর্য, হৃদয়ের মধ্যে প্রেম অনুভব করি— জগতের ভিতরকার একটা অনন্ত আনন্দের ক্রিয়া আমার মনের ভিতরেও কার্য করে। আমরা সেটাকে যদি বিচ্ছিন্নভাবে দেখি তবে তার যথার্থ কোনো অর্থ থাকে না। প্রকৃতির মধ্যে মানুষের মধ্যে আমরা আনন্দ কেন পাই (সে আনন্দ যতই ক্ষুদ্র যতই চঞ্চল

হোক)— তার একটি মাত্র সদুত্তর হচ্ছে : আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে, আনন্দেন জাতানি জীবন্তি, আনন্দং প্রয়ন্ত্যভি-সংবিশন্তি। এ কথা নিজে না বুঝলে কাউকে বোঝাবার যো নেই।

সাতারা
১৮ অগস্ট ১৮৯৪

শিলাইদহ

১৬ অগস্ট্। ১৮৯৪।

এখন শুক্লপক্ষ কিনা, বেড়াবার সময় চমৎকার জ্যোৎস্না পাই— তার পরে বোটে ফিরে এসে বাইরে কেদারায় পা ছড়িয়ে বসি। ঈষৎ শারীরিক শ্রান্তির পর সেই চৌকি, সেই জ্যোৎস্না, সেই জলের কল্লোল স্বর্গসুখ বহন করে আনে। নদী বেড়ে উঠে প্রায় ডাঙার সমান রেখায় এসে দাঁড়িয়েছে, তাই বোটের উপর বসে তীরের এবং জলের সমস্ত দৃশ্য একেবারে চোখের সম্মুখে প্রসারিত দেখতে পাই। আমার দক্ষিণে সুবিস্তীর্ণ মাঠ, মাঝে মাঝে আউষ ধান হয়েছে— অধিকাংশই সবুজ ঘাস, এক প্রান্ত দিয়ে একটি পদচিহ্নরচিত সংকীর্ণ মেঠো রাস্তা, সম্মুখে পূর্বদিকে হাটের গোলাঘর, সামনে স্তূপাকার খড় জমা হয়ে রয়েছে— জ্যোৎস্নায় সেই জীর্ণ কুটির এবং খড়ের স্তূপ ভারী সুন্দর ছবির মতো দেখতে হয়। সন্ধেবেলাটি আমার মাথার উপর, আমার চোখের সামনে, আমার পায়ের তলায়, আমার চতুর্দিকে এমন সুন্দর, এমন শান্তিময়, এমন নির্জন নিস্তব্ধ, অথচ এমন পরিপূর্ণ হয়ে উদয় হয়, মানুষের মতো এমন নিবিড়ভাবে আমার নিকটবর্তী হয়ে আসে যে, আকাশের নক্ষত্রলোক থেকে আর পদ্মার সুদূর ছায়াময় তীররেখা পর্যন্ত সমস্ত বৃহৎ দৃশ্যটি আমার চতুর্দিকে একটি নিভৃত আরামের গোপন গৃহের মতো ছোটো হয়ে ঘিরে দাঁড়ায়— আমার মধ্যে যে-দুটি প্রাণী আছে, আমি এবং আমার সেই অন্তঃপুরবাসী আত্মা, এই দুটিতে মিলে সমস্ত ঘরটি দখল করে বসে থাকি— এই দৃশ্যের মধ্যগত সমস্ত পশু পক্ষী প্রাণী আমাদের দুজনের অন্তর্গত হয়ে যায়— কানে জলের কলশব্দ আসতে থাকে, মুখের উপর মাথার উপর জ্যোৎস্নার শুভ্রহস্ত আদরের স্পর্শ করতে থাকে, আকাশে চকোর পাখি ডেকে চলে যায়, জেলের নৌকো পদ্মার মাঝখানে খরস্রোতের উপর দিয়ে

বিনা চেষ্টায় অনায়াসে পিছ্‌লে বহে যেতে থাকে, আকাশব্যাপী স্নিগ্ধ রাত্রি আমার রোমে রোমে প্রবেশ করে ধীরে ধীরে শরীরের উত্তাপ জুড়িয়ে দেয়— চোখ বুজে, কান পেতে, দেহ প্রসারিত ক'রে প্রকৃতির একমাত্র যত্নের জিনিষের মতো পড়ে থাকি : তার সহস্র সহচরী আমার সেবা করে। মনের কল্পনারও কোনো বাধা থাকে না, সেও তার দুটি হস্তে থালা সাজিয়ে অনেকগুলি ছায়াময়ী মায়াসেবিকা -পরিবৃত হয়ে আমার পাশে এসে দাঁড়ায়— মৃদুমন্দ বাতাসের সঙ্গে তার কোমল অঙ্গুলির স্পর্শ আমার চুলের মধ্যে অনুভব করি।

সাতারা

২১ অগস্ট ১৮৯৪

শিলাইদহ

১৯ অগস্ট্‌। ১৮৯৪।

এবারে আমার সঙ্গে আমি রামমোহন রায়ের বাংলা গ্রন্থাবলী এনেছি —তাতে গুটি-তিনেক সংস্কৃত বেদান্ত গ্রন্থ এবং তার অনুবাদ আছে; তার থেকে আমার অনেকটা সাহায্যলাভ হয়েছে। বেদান্তপাঠে বিশ্ব এবং বিশ্বের আদিকারণ সম্বন্ধে অনেকেই নিঃসংশয় হয়ে থাকেন। রামমোহন রায়ের মতো অত বড়ো একজন প্রখরবুদ্ধিমান লোকও বৈদান্তিক ছিলেন, ডয়্‌সেন-সাহেবও আগাগোড়া বেদান্তের খুব প্রশংসা করে গেছেন, কিন্তু আমার মনের কোনো সংশয় দূর হয় নি। এক হিসাবে অন্য অনেক মতের অপেক্ষা বেদান্ত-মত সরল; কারণ, দুইয়ের চেয়ে এক সরল। সৃষ্টি এবং সৃষ্টিকর্তা কথাটা শুনতে খুব সংগত এবং সহজ, কিন্তু এমন জটিল সমস্যা মানুষের বুদ্ধির পক্ষে আর কিছু নেই। বেদান্ত গর্ড্যান গ্রন্থি ছেদন করে দুইয়ে মিলিয়ে এক করে বসে আছেন; আর কিছু না হোক, সমস্যাটাকে আধখানা ছেঁটে দিয়েছে। সৃষ্টি একেবারেই নেই, আমরা কেউ নেই— আছেন কেবল এক ব্রহ্ম, আর মনে হচ্ছে যেন আমরা আছি। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, মানুষ এ কথা মনে স্থান দিতে পারে— আরও আশ্চর্য এই কথাটা কানে শুনতে যতটা বেশি অদ্ভুত হয় আসলে তা নয়। বস্তুত, কিছু যে আছে এইটে প্রমাণ করাই ভারী শক্ত। ঐ বৈদান্তিক মতটা আজকাল য়ুরোপেও অনেকটা ব্যাপ্ত হচ্ছে, কিন্তু সে দেশের জল-হাওয়ায় ওটা ঠিক টি কতে পারবে কি না সন্দেহ। কিম্বা হয়তো একটা নতুন মূর্তি পরিগ্রহ করে বসবে। যাই হোক, আজকাল সন্ধেবেলায় যখন জ্যোৎস্না ওঠে, এবং আমি যখন অর্ধনিমীলিত চোখে বোটের বাইরে লম্বা কেদারায় পা ছড়িয়ে বসি এবং স্নিগ্ধ সন্ধ্যাসমীরণ আমার চিন্তাক্লান্ত তপ্ত ললাট স্পর্শ করতে থাকে, তখন এই

জল স্থল আকাশ, এই নদীকল্লোল, ডাঙার উপর দিয়ে কদাচিৎ এক-আধজন পথিক এবং জলের উপর দিয়ে কদাচিৎ এক-আধখানা জেলে-ডিঙির গতায়াত, জ্যোৎস্নালোকে অপরিস্ফুট মাঠের প্রান্ত এবং দূরে অন্ধকারমিশ্রিত বনশ্রেণীবেষ্টিত সুপ্তপ্রায় গ্রাম, সমস্তই ছায়ার মতো মায়ারই মতো বোধ হয়, অথচ সে মায়া সত্যের চেয়ে বেশি সত্য হয়ে জীবন মনকে জড়িয়ে ধরে— এবং এই মায়ার হাত থেকে পরিত্রাণ পাওয়াই যে মানবাত্মার মুক্তি এ কথা কিছুতে মনে হয় না। দার্শনিক বলতে পারেন, সন্ধ্যাবেলায় জগৎকে যে পরিমাণে মায়া বলে উপলব্ধি করা হয় সেই পরিমাণে মুক্তি লাভ করা যায় এবং আমি যে আনন্দ পেতে থাকি সেটা যথার্থত মুক্তিরই আনন্দ— অর্থাৎ জগৎটাকে সত্য জ্ঞান করার দরুন দিনের বেলায় আমার যে একটা দৃঢ় বন্ধন থাকে, সন্ধ্যাবেলায় সমস্ত ছায়াময় হয়ে আসাতে সেই বন্ধন অনেকটা পরিমাণে শিথিল হয়ে আসে : যখন জগৎটাকে একেবারে সম্পূর্ণই অসৎ বলে অন্তরের মধ্যে দৃঢ় উপলব্ধি জন্মাবে তখন যে-একটি পরিপূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করব সেই স্বাধীনতায় আমি ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হব। এ কথাটা আমি অতি ঈ—ষৎ অনুমান এবং অনুভব করতে পারি; হয়তো কোন্‌দিন দেখব বৃদ্ধ বয়সের পূর্বে আমি জীবন্মুক্ত হয়ে বসে আছি।

সাতারা
২৪ অগস্ট ১৮৯৪

১৪৭

কুষ্টিয়ার পথে

২৪ অগস্ট । ১৮৯৪ ।

আমাদের এখানে নদীর জল যতদূর বাড়বার তার সীমা পর্যন্ত গেছে, বরঞ্চ আধ হাত আন্দাজ ছাড়িয়ে গেছে— জলে স্থলে প্রায় সমান হয়ে এসেছে। পদ্মাকে এখন খুব জাঁকালো দেখতে হয়েছে, একেবারে বুক ফুলিয়ে চলেছে— ও পারটা একটি মাত্র কাজলের নীল রেখার মতো দেখা যাচ্ছে। আমার ডান দিকের জানলা দিয়ে যতদূর চেয়ে দেখি নিবিড়সবুজ শস্যক্ষেত্র, বাম দিকের জানলা দিয়ে চেয়ে দেখি অপার উদার জলরাশি। ডান দিকে শস্যের মৃদুমন্দ আন্দোলন আর বাম দিকে আগাগোড়া একটা প্রকাণ্ড প্রচণ্ড ধাবমান গতি। আমি এই জলের দিকে চেয়ে চেয়ে অনেক সময় ভাবি— বস্তু থেকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে গতিকে যদি কেবল গতিভাবেই উপলব্ধি করতে ইচ্ছা করি তা হলে নদীর স্রোতে সেটি পাওয়া যায়। মানুষ পশু এবং তরুলতার মধ্যে যে চলাচল তাতে খানিকটা গতি খানিকটা বিশ্রাম, একটা অংশের গতি আর-একটা অংশের নিশ্চলতা। কিন্তু নদীর আগাগোড়াই চলছে— সেইজন্যে আমাদের মনের সঙ্গে, আমাদের চেতনার সঙ্গে তার একটা সাদৃশ্য পাওয়া যায়। আমাদের শরীর আংশিক ভাবে পদচালনা ক'রে অঙ্গচালনা ক'রে চলে— আমাদের মন স্বভাবতই সমগ্রতই চলছে। সেই জন্যে এই ভাদ্রমাসের পদ্মাকে একটা প্রবল মানসশক্তির মতো বোধ হয়— সে মনের ইচ্ছার মতো ভাঙছে চুরছে এবং চলেছে, মনের ইচ্ছার মতো সে আপনাকে বিচিত্র তরঙ্গভঙ্গে এবং অস্ফুট কলসংগীতে নানাপ্রকারে প্রকাশ করবার চেষ্টা করছে। বেগবান একাগ্রগামিনী নদী আমাদের মনের ইচ্ছার মতো— আর স্থির শান্ত সুবিস্তীর্ণ বিচিত্রশস্যশালিনী ভূমি আমাদের ইচ্ছার সামগ্রীর মতো। আমি মাঝখানে বোট নিয়ে আমার বামে

ইচ্ছার তীব্র বেগ ও ক্রন্দন এবং দক্ষিণে সফলতার শান্ত সৌন্দর্য এবং মৃদু মর্মর বিভক্ত করে বসে আছি। আমাদের বোট ছেড়ে দিয়েছে। স্রোতের মুখে বোট ছুটে চলেছে। তীরটা এখন বামে পড়েছে -- এমন সুন্দর দেখতে হয়েছে সে আর কী বলব! খুব নিবিড় প্রচুর সরস সবুজের উপর খুব ঘননীল সজল মেঘরাশি মাতৃস্নেহের মতো অবনত হয়ে রয়েছে। মাঝে মাঝে গুরু গুরু মেঘ ডাকছে। বৈষ্ণব পদাবলীতে বর্ষাকালের যমুনাবর্ণনা মনে পড়ে— প্রকৃতির অনেক দৃশ্যই আমার মনে বৈষ্ণবকবির ছন্দোঝংকার এনে দেয়— তার প্রধান কারণ, এই-সমস্ত সৌন্দর্য আমার কাছে শূন্য সৌন্দর্য নয়— এর মধ্যে মানব-ইতিহাসের যেন সমস্ত পুরাকালীন প্রীতিসম্মিলনগাথা পূর্ণ হয়ে রয়েছে, এর মধ্যে যেন একটি চিরন্তন হৃদয়ের লীলা অভিনীত হচ্ছে, এই সৌন্দর্যের মধ্যে বৈষ্ণবকবিদের সেই অনন্তবৃন্দাবন রয়ে গেছে। বৈষ্ণবকবিতার যথার্থ মর্মের ভিতরে যে প্রবেশ করেছে সে সমস্ত প্রকৃতির ভিতর সেই বৈষ্ণবকবিতার ধ্বনি শুনতে পায়। কিন্তু অধিকাংশ পাঠক সে রকম করে বৈষ্ণবপদ পড়ে না— বাইরে থেকে নিতান্ত সমালোচকভাবে দেখে তারা প্রত্যেক লাইন প্রত্যেক পদ স্বতন্ত্র করে দেখে, সেইজন্যে অনেক দোষ দেখতে পায়। সেগুলো চোখে পড়াই উচিত নয়— stranger অনেক জিনিষ দেখতে পায় যা অন্তরঙ্গ আত্মীয় দেখতে পায় না, তেমনি আত্মীয় যে জিনিষটি দেখতে পায় strangerএর তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তা পড়ে না।

সাতারা

২৯ অগস্ট ১৮৯৪

১৪৮

কলকাতা

২৯ অগস্ট্। ১৮৯৪।

আজ সকালে বসে বসে আমার একটা নতুন গানে সুর দিচ্ছিলুম— সুরটা যে খুব নতুন তা নয়, এক রকম কীর্তনের ধরণের ভৈরবী। কিন্তু তবু ছন্দে ছন্দে গাইতে গাইতে শরীরের সমস্ত রক্তের মধ্যে একটা সংগীতের মাদকতা প্রবেশ করতে থাকে— সমস্ত শরীর এবং সমস্ত মন আগাগোড়া একটা বাজনার যন্ত্রের মতো কম্পিত এবং গুঞ্জরিত হয়ে উঠতে থাকে এবং সেই সুরের স্পন্দন আমার শরীর মন থেকে সমস্ত বাইরের জগতে সঞ্চারিত এবং ব্যাপ্ত হয়ে বিশ্বের সঙ্গে আমার সঙ্গে একটা স্বরসম্মিলন স্থাপিত হয়ে যায়। বীণার তার যখন বাজতে থাকে তখন সেটা যেমন আবছায়া দেখতে হয়, গানের সুরে সমস্ত জগৎটা সেইরকম বাষ্পময় এবং ঝঙ্কারপূর্ণ হয়ে ওঠে। কিন্তু এই রকম করে গাইতে গাইতে কাজকর্মের সময় অতিবাহিত হয়ে গেল, প্রুফগুলো পড়ে রইল, দুপুর বেজে গেল, রৌদ্রের আলোক এবং তাপ ক্রমেই তীব্র হয়ে মস্তিষ্কের মধ্যে প্রবেশ করতে লাগল— আজ আর কিছু হল না। ও দিকে রেণু এবং খোকা একটা শব্দওয়ালা খেলনা কিনে পশ্চিমের বারান্দায় চড়্‌বড়্ শব্দ করে খেলা করছে শুনতে পাচ্ছি, কাক চড়ুই প্রভৃতি অনেকগুলি পাখির শব্দ মিশ্রিত হয়ে আকাশে একটা অনির্দিষ্ট শব্দ হচ্ছে, মদনবাবুর গলি দিয়ে ফেরিওয়ালা করুণসুরে ডেকে যাচ্ছে— পিঠের দিক থেকে অল্প অল্প দক্ষিনে বাতাস এসে লাগছে— কলিকাতার বিচিত্র রকমের সুর এবং শব্দ মধ্যাহ্নের রৌদ্রে একটা গভীর ঔদাস্য এবং শ্রান্তি প্রকাশ করছে। এখনো আমার ভাত কেন এল না জানি নে, বামুনটাও সকালে ভাতের কাঠি ফেলে সুর বাঁধতে বসেছিল কিনা কে জানে, কিন্তু কারও কোনো সাড়াশব্দ শুনতে পাচ্ছি নে— মনে হচ্ছে যেন চাকর মনিব জগৎসংসার সমস্তই আজ ছুটি নিয়েছে।

সাতারা। ২ সেপ্টেম্বর ১৮৯৪

১৪৯

সাজাদপুর

৫ সেপ্টেম্বর। ১৮৯৪।

অনেক কাল বোটের মধ্যে বাস করে হঠাৎ সাজাদপুরের বাড়িতে এসে উত্তীর্ণ হলে বড়ো ভালো লাগে। বড়ো বড়ো জানলা দরজা, চার দিক থেকে অবারিত ভাবে আলো এবং বাতাস আসতে থাকে — যে দিকে চেয়ে দেখি সেই দিকেই গাছের সবুজ ডাল চোখে পড়ে এবং পাখির ডাক শুনতে পাই— দক্ষিণের বারান্দায় বেরোবা-মাত্র কামিনী ফুলের গন্ধে মস্তিষ্কের সমস্ত রন্ধ্রগুলি পূর্ণ হয়ে ওঠে। হঠাৎ বুঝতে পারি এতদিন বৃহৎ আকাশের জন্যে ভিতরে ভিতরে একটা ক্ষুধা ছিল, সেটা এখানে এসে পেট ভরে পূর্ণ করে নেওয়া গেল। আমি চারটি বৃহৎ ঘরের একলা মালিক— সমস্ত দরজাগুলি খুলে বসে থাকি। এখানে যেমন আমার মনে লেখবার ভাব এবং লেখবার ইচ্ছা আসে এমন আর কোথাও না। বাইরের জগতের একটা জীবন্ত প্রভাব আমার সমস্ত মুক্ত দ্বার দিয়ে অবাধে প্রবেশ করতে থাকে— আলোতে আকাশে বাতাসে শব্দে গন্ধে সবুজহিল্লোলে এবং আমার মনের নেশায় মিশিয়ে অনেক রকম গল্প তৈরি হয়ে উঠতে থাকে। বিশেষত এখানকার দুপুর বেলাকার মধ্যে বড়ো একটি নিবিড় মোহ আছে। রৌদ্রের উত্তাপ, নিস্তব্ধতা, নির্জনতা, পাখিদের বিশেষত কাকের ডাক, এবং সুদীর্ঘ সুন্দর অবসর— সব-সুদ্ধ জড়িয়ে আমাকে ভারী উদাস এবং আকুল করে। কেন জানি নে, মনে হয় এই রকম সোনালি-রৌদ্রে-ভরা দুপুর বেলা দিয়ে আরব্য উপন্যাস তৈরি হয়েছে — অর্থাৎ সেই পারস্য এবং আরব্য দেশ, ডামাস্ক্ সমরকন্দ্ বুখারা— আঙুরের গুচ্ছ, গোলাপের বন, বুলবুলের গান, শিরাজের মদ— মরুভূমির পথ, উটের সার, ঘোড়সওয়ার পথিক, ঘন খেজুরের ছায়ায় স্বচ্ছ জলের উৎস— নগর, মাঝে মাঝে চাঁদোয়া-খাটানো সংকীর্ণ

রাজপথ, পথের প্রান্তে পাগড়ি এবং ঢিলে কাপড় -পরা দোকানি খর্‌মুজ এবং মেওয়া বিক্রি করছে— পথের ধারে বৃহৎ রাজপ্রাসাদ, ভিতরে ধূপের গন্ধ, জানলার কাছে বৃহৎ তাকিয়া এবং কিন্‌খাপ বিছানো— জরির চটি ফুলো পায়জামা এবং রঙিন কাঁচলি -পরা আমিনা জোবেদি সুফি, পাশে পায়ের কাছে কুণ্ডলায়িত গুড়্‌গুড়ির নল গড়াচ্ছে, দরজার কাছে জমকালো-কাপড়-পরা কালো হাবষি পাহারা দিচ্ছে— এবং এই রহস্যপূর্ণ অপরিচিত সুদূর দেশে, এই ঐশ্বর্যময় সৌন্দর্যময় অথচ ভয়ভীষণ বিচিত্র প্রাসাদে, মানুষের হাসিকান্না আশা-আশঙ্কা নিয়ে কত শত সহস্র রকমের সম্ভব অসম্ভব গল্প তৈরি হচ্ছে। আমার এই সাজাদপুরের দুপুর বেলা গল্পের দুপুর বেলা— মনে আছে ঠিক এই সময়ে এই টেবিলে বসে আপনার মনে ভোর হয়ে পোস্ট্‌মাস্টার গল্পটা লিখেছিলুম। আমিও লিখছিলুম এবং আমার চার দিকের আলো এবং বাতাস এবং তরুশাখার কম্পন তাদের ভাষা যোগ করে দিচ্ছিল। এই রকম চতুর্দিকের সঙ্গে সম্পূর্ণ মিশে গিয়ে নিজের মনের মতো একটা-কিছু রচনা করে যাওয়ার যে সুখ তেমন সুখ জগতে খুব অল্পই আছে। আজ সকালে বসে 'ছড়া' সম্বন্ধে একটা লেখা লিখতে প্রবৃত্ত হয়েছিলুম— সেটার ভিতরে বেশ সম্পূর্ণ নিমগ্ন হতে পেরেছিলুম, বড়ো ভালো লাগছিল। 'ছড়া'র একটা স্বতন্ত্র রাজ্য আছে, সেখানে কোনো আইন কানুন নেই— মেঘ-রাজ্যের মতো। দুর্ভাগ্যক্রমে, যে রাজ্যে আইন-কানুনের প্রাবল্য বেশি সেই বৈষয়িক রাজ্য সর্বত্রই পিছনে পিছনে অনুসরণ করেন। লিখতে লিখতে হঠাৎ মাঝখানে আমলাদের একটা উপপ্লব উপস্থিত হল, আমার মেঘরাজ্য ঝড়ে উড়িয়ে নিয়ে গেল। সেই-সমস্ত ব্যাপার নিয়ে আহারের সময় এল। দুপুর বেলায় পেট ভরে খাওয়ার মতো এমন জড়ত্বজনক জিনিষ আর কিছু নেই, ওতে মানুষের কল্পনাশক্তি

এবং উচ্চ অঙ্গের সমস্ত হৃদয়বৃত্তি একেবারে অভিভূত করে ফেলে। বাঙালিরা প্রচুর পরিমাণে মধ্যাহ্নভোজন করে ব'লেই মধ্যাহ্নের একটি নিবিড় ভাবসৌন্দর্য উপভোগ করতে পারে না— দরজা বন্ধ করে তামাক খেতে খেতে পান চিবোতে চিবোতে অত্যন্ত পরিতৃপ্ত পরিপূর্ণভাবে নিদ্রার আয়োজন করতে থাকে। তাতে ক'রেই দিব্যি চিক্‌চিকে গোলগাল হয়ে ওঠে। কিন্তু বাংলাদেশের বৈচিত্র্যবিহীন অসীম সমতল শস্যক্ষেত্রের মধ্যে জনহীন শ্রান্ত মধ্যাহ্ন যেমন বৃহৎভাবে নিস্তব্ধভাবে বিস্তীর্ণ হতে পারে এমন আর কোথাও না। আমাকে খুব ছেলেবেলা থেকে এই মধ্যাহ্নকাল ব্যাকুল করে আসছে। তখন বাইরের তেতালায় কেউ থাকত না, সেখানে খোলা দরজায় উত্তপ্ত বাতাসে বাঁকা কৌচে আমি একলাটি পড়ে থাকতুম— সমস্ত দীর্ঘ দিন কী কল্পনায়, কী অব্যক্ত আকাঙ্ক্ষায়, কী রকম করে কাটত!

সাতারা

১০ সেপ্টেম্বর ১৮৯৪

সাজাদপুর

৭ সেপ্টেম্বর। ১৮৯৪।

আমি চিঠি পাই সন্ধের সময়, আর আমি চিঠি লিখি দুপুর বেলায়। রোজ একই কথা লিখতে ইচ্ছা করে— এখানকার এই দুপুর বেলাকার কথা। কেননা, আমি এর মোহ থেকে কিছুতেই আপনাকে ছাড়াতে পারি নে। এই আলো, এই বাতাস, এই স্তব্ধতা আমার রোমকূপের মধ্যে প্রবেশ করে আমার রক্তের সঙ্গে মিশে গেছে— এ আমার প্রতিদিনকার নতুন নেশা, এর ব্যাকুলতা আমি নিঃশেষ করে বলে উঠতে পারি নে। প্রতিদিনের শরৎকালের দুপুর বেলা আমার কাছে রোজ একই ভাবে উদয় হয়— পুরাতন প্রতিদিনই নূতন করে আসে, এবং আমার ঠিক সেই কালকের মনোভাব আজ আবার তেমনি করে জেগে ওঠে। প্রকৃতি প্রতিদিন পুনরাবৃত্তি করতে কিছুমাত্র সংকোচ বোধ করে না। আমাদেরই সংকোচ বোধ হয়, মনে হয় আমাদের ভাষার মধ্যে সেই অনন্ত উদারতা নেই যাতে রোজ এক ভাবকে নতুন করে দেখাতে পারে। অথচ সকল কবিই চিরকাল উল্টেপাল্টে প্রায় একই কথা বলে আসছে এবং সেই এক কথাই সহস্র আকার ধারণ করছে। কোনো কোনো ক্ষুদ্র কবি কিছু জবর্দস্তি করে নূতনত্ব আনবার চেষ্টা করে— তাতে এই প্রমাণ হয় যে, পুরাতনের মধ্যে যে চিরনূতনত্ব আছে তার ক্ষুদ্র কল্পনায় সেটা আর অনুভব করতে পারে না, সেইজন্যে সৃষ্টিছাড়া নূতনত্বের জন্যে ঘুরে বেড়ায়। অনেক বোধ-শক্তি-বিহীন পাঠক আছে যারা নূতনকে কেবলমাত্র তার নূতনত্বের জন্যই পছন্দ করে। কিন্তু আসল ভাবুকরা এই-সকল নূতনত্বের ফাঁকিকে তুচ্ছ প্রবঞ্চনা বলে ঘৃণা করে। তারা এ নিশ্চয় জানে যে, যা আমরা যথার্থ অনুভব করি তা কোনো কালেই পুরোনো হতে পারে না। কিন্তু যখনি একটা জিনিষ আমাদের অনুভব থেকে বিচ্যুত

হয়ে কেবলমাত্র আমাদের জ্ঞানে এসে দাঁড়ায়, তখনি তার জরা উপস্থিত হয়। তখন তাকে মৃত্যুর হস্ত থেকে রক্ষা করা কারও সাধ্য নয়। সেই জন্যে যারা জ্ঞানের দ্বারা একটা জিনিষকে সুন্দর বলে জানে অথচ সম্পূর্ণ অনুভব করে না, তারা সে সম্বন্ধে বাড়াবাড়ি করে, খুব একটা প্রবল কিম্বা খুব একটা নতুন কথা বলবার চেষ্টা করে— কিন্তু যথার্থ প্রবল কথা এবং যথার্থ নতুন কথা তাদের মুখ দিয়ে বেরোয় না। আমি ছোটো কবি কি বড়ো কবি সে বিষয়ে আলোচনা করবার কোনো দরকার দেখি নে— কিন্তু এটা আমি বারম্বার দেখেছি, পৃথিবীর কোনো জিনিষকেই যেন আমি শেষ করতে পারি নি। যা আমার একবার মনে লেগেছে তা আমার চিরকালই মনে লাগে, এবং প্রত্যেক দিনই তার নূতনত্বে আমাকে নিবিড় বিস্ময়ে পূর্ণ করতে থাকে। আমার পুনঃপুনঃ স্পর্শ লেগে কোনো জিনিষ জীর্ণ হয় না; বরঞ্চ প্রতিবারেই তার উজ্জ্বলতা বেড়ে ওঠে, অথচ সে উজ্জ্বলতার মধ্যে অমূলক বা কাল্পনিক কিছু নেই— মিথ্যা কাল্পনিকতাকে আমি ভারী ঘৃণা করি। আমি সমস্ত জিনিষের বাস্তবিকতাটুকু স্পষ্ট দেখতে পাই; অথচ তারই ভিতরে, তার সমস্ত ক্ষুদ্রতা এবং সমস্ত আত্মবিরোধের মধ্যেও আমি একটা অনির্বচনীয় স্বর্গীয় রহস্যের আভাস পাই। আমার বয়স এবং অভিজ্ঞতার সঙ্গে সঙ্গে সেই রহস্যের বিস্ময় এবং আনন্দ যেন বাড়ছে বৈ কমছে না— তার থেকেই আমি প্রতিদিন বুঝতে পারছি, যারা আমাকে আনন্দ দিচ্ছে তারা কোনো অংশে ফাঁকি নয়, তারা কিছুমাত্র সামান্য নয়, তাদের মধ্যে অনন্তসত্য অনন্ত-আনন্দ আছে। এ কথা পরিষ্কার করে বললে অধিকাংশ লোক অবাক হয়, কিন্তু যারা নিজের জীবন দিয়ে এ-সব কথা অনুভব করে নি তাদের শুধু মুখের কথায় আমি কী করে অনুভব করাব! তারা ছোটো ছোটো বাঁধি গতের বেড়া বেঁধে সেই বেড়ার মধ্যেকার

জমিটুকুকেই জগৎসংসার মনে করে নিশ্চিন্ত হয়ে বসে আছে, অনন্তের আলোক তাদের সেই ক্ষুদ্র দম্ভের উপর কোনোদিন আঘাত করে নি। তারা সুখে আছে সন্দেহ নেই, কিন্তু যদি আত্মা ব'লে কিছু থাকে তবে নিশ্চয়ই সে সুখ প্রার্থনীয় নয় এবং যখন সেই সাংসারিক বাঁধি সুখকে ক্ষুদ্র বলে মনে হয় এবং দুঃখের মধ্যে একটা আন্তরিক বন্ধন-মুক্তি দেখা যায় তখনি বুঝতে পারি— আত্মা ব'লে একটা জিনিষ আছে, সে জিনিষ এক জিনিষই স্বতন্ত্র।

সাতারা

১২ সেপ্টেম্বর ১৮৯৪

সাজাদপুর

৭ সেপ্টেম্বর। ১৮৯৪।

যখন এইরকম লিখতে লিখতে লেখা বেড়ে যায়, এবং প্রতিদিন সকালে বিছানা থেকে উঠেই মনে হয় কাল সেই লেখাটা কোথায় ছেড়ে দিয়েছিলুম এবং আজ কোথা থেকে আরম্ভ করতে হবে, তখন ভারী ভালো লাগে— দিনগুলিকে বেশ লেখায় পরিপূর্ণ করে ভরা কলসীর মতো সন্ধেবেলায় ঘরে নিয়ে গিয়ে তুলি, এবং সেই-সব লেখার ধ্বনি প্রতিধ্বনির রেশ সমস্ত শরীর মনের মধ্যে বাজতে থাকে। আজকাল এই ছড়ার রাজ্যে ভ্রমণ করতে করতে আমি কত রকমের ছবি এবং কত রকমের সুখ দুঃখ ও হৃদয়বৃত্তির ভিতর দিয়ে ছুঁয়ে ছুঁয়ে চলে যাচ্ছি তার আর ঠিকানা নেই। এমন-কি লিখতে লিখতে এক-এক সময় চোখ ছল্ ছল্ করে ওঠে, আবার এক-এক সময় মুখে হাসিও দেখা দেয়। আজ বেড়াতে বেড়াতে ভাবছিলুম এতে আমার এত আনন্দ কিসের? আসল কথা হচ্ছে, অনুভব করাতেই আমাদের হৃদয়ের ক্ষমতা প্রকাশ হয়— আমি যখন একটা প্রাচীন স্মৃতির জন্য হৃদয়ের মধ্যে ব্যথা পাই তখন সেই ব্যথার মধ্যে আনন্দ এইটুকু যে, স্মৃতিটুকুকে আমি উপলব্ধি করতে পারছি, সেটা আমার কাছে আসছে— প্রত্যক্ষ থেকে অপ্রত্যক্ষ অবধি, বর্তমান থেকে অতীত পর্যন্ত আমার হৃদয়ের বোধশক্তি প্রসারিত হয়ে যাচ্ছে। বরঞ্চ সুখের চেয়ে দুঃখে সেই বোধশক্তি আমরা বেশি করে অনুভব করি, যে কল্পনা আমাদের ব্যথা দেয় সে আমাদের কাছে গভীরতর এবং স্পষ্টতররূপে প্রতীয়মান হয়— এইজন্যে আর্টের এলাকায় দুঃখের ব্যাপ্তিই কিছু বেশি। দয়া, সৌন্দর্যবোধ, ভালোবাসা, এ-সমস্ত হৃদয়বৃত্তিতে আমরা নিজের দ্বারা অন্যকে লাভ করি, এইজন্যে এদের ভিতরকার দুঃখ-কষ্টেও একটা আনন্দের অভাব নেই; কিন্তু বীভৎসকল্পনাজনিত ঘৃণা

কিম্বা নিষ্ঠুরকল্পনাজনিত পীড়ায় আমাদের বিমুখ করে দেয়, আমাদের হৃদয়ের স্বাধীনগতিকে বাধা দিতে থাকে, এইজন্যে সে-সকল বৃত্তিতে আমাদের কোনো আনন্দ নেই। ওথেলোর মধ্যে যেটুকু করুণা আছে সেটুকু আমাদের আকর্ষণ করে, কিন্তু ওর শেষ অংশে যেটা বর্বর নিষ্ঠুরতা সেটা আমাকে ওথেলো থেকে বিমুখ করে দেয়— মনে হয় যেন সেটা আর্টের সীমার বাইরে। কিন্তু বড়ো সংগীতের হার্মনিতে যেমন অনেক সময় সুরটাকে বিচিত্র এবং জাজ্বল্যমান করবার জন্যে বেসুরো মিশিয়ে দেয় তেমনি বড়ো বড়ো কাব্যে খানিকটা পরিমাণে অকাব্যও মেশানো থাকে ; তাতে মোটের উপরে হয়তো কাব্যাংশটা বেশি স্ফূর্তি পায়— সেইজন্যে ওরকম একটা অংশ ধরে কিছু বলা যায় না। কিন্তু তবু আমি নিজের কথা বলতে পারি, উঁচুদরের সাহিত্যের মধ্যে ওথেলো এবং কেনিল্‌ওয়ার্থ্‌ আমার দ্বিতীয়বার পড়তে কিছুতেই মন ওঠে না। এর মধ্যে একটা প্রশ্ন আছে এই যে, বাস্তব জগতের সুখদুঃখ এবং কাব্যজগতের সুখদুঃখে আনন্দের অনেক প্রভেদ আছে, তার কারণ কী ? তার কারণ হচ্ছে— বাস্তব জগতের সুখদুঃখ ভারী জটিল এবং মিশ্রিত। তার সঙ্গে আমাদের স্বার্থ আমাদের শরীরের চেষ্টা প্রভৃতি অনেক জিনিষ জড়িত। কাব্যজগতের সুখদুঃখ বিশুদ্ধরূপে মানসিক, তার সঙ্গে আমাদের অন্য কোনো দায় নেই, স্বার্থ নেই, জড়জগতের বাধা নেই; শারীরিক তৃপ্তি বা শ্রান্তি নেই। আমাদের হৃদয় স্বাধীনভাবে সম্পূর্ণভাবে অমিশ্রভাবে অনুভব করবার অবসর পায়— কাব্যে আমাদের আনন্দ একেবারে অব্যবহিত ; কোনো প্রয়োজনের মধ্য দিয়ে, কোনো ইন্দ্রিয়ের মধ্য দিয়ে তার সাক্ষাৎকার লাভ করতে হয় না— আমরা দেহবদ্ধ অধীন মানুষ হয়েও কেবলমাত্র আমাদের হৃদয় দিয়ে একটা মানসিক জগতে অবাধে বিচরণ করতে পারি। এই জন্যে কাব্যের আনন্দে আমাদের আনন্দের সীমায় নিয়ে গিয়ে ঠোকর খাইয়ে

ফিরিয়ে নিয়ে আসে না, প্রত্যেক আনন্দের সঙ্গে একটা অশ্রান্তি অতৃপ্তি এবং অসীমতার আস্বাদ দেয়।··· নিজের মনের কথাও আমাদের নিজের কাছে ভারী দুরূহ— আমরা ঠিক কী ভাবছি তা আমরা সম্পূর্ণ জানতে পারি নে, তার আর্ধেক কথা কেবলমাত্র অন্তর্যামীই জানেন। আমি নিজের কথা প্রকাশ করে বলতে গিয়ে নিজের কাছ থেকে নিজে শিক্ষা লাভ করি— আমার অধিকাংশ শিক্ষাই এমনি করে হয়েছে, আমার মুখ বন্ধ করে দিলেই আমার বিদ্যালয় বন্ধ হয়ে যায়। সেইজন্যে এবং নিজের মনের ঝোঁকে তোর কাছে বসে বসে আমার প্রতিদিনের বকুনি বকে যাই।

সাতারা

১২ সেপ্টেম্বর ১৮৯৪

১৫২

পতিসর

১০ সেপ্টেম্বর। ১৮৯৪।

কাল সকাল থেকে জলপথে রয়েছি। চারি দিকেই কেবল বিল, ধানের ডগাগুলি জেগে রয়েছে— গুটিকতক ঘনবদ্ধ কুটির নিয়ে গ্রামগুলি দূরে দূরে ভাসছে— মৃদু সুগন্ধবিশিষ্ট সবুজ শৈবাল অনেক দূর পর্যন্ত জমাট বেঁধে রয়েছে, হঠাৎ ডাঙা বলে বোধ হয়; তারই মধ্যে বিচিত্র জলচর পাখির আড্ডা। ভাদ্র মাসের দিন, বাতাস বেশি নেই, বোটের শিথিল পাল ঝুলে ঝুলে পড়ছে এবং নৌকোটি সমস্তদিন আলস্যমন্থর গমনে নিতান্ত উদাসীনের মতো চলেছে। এই শৈবাল-বিকীর্ণ সুবিস্তীর্ণ জলরাজ্যের মধ্যে শরতের উজ্জ্বল রৌদ্র পড়েছে, আমি জানলার কাছে এক চৌকিতে বসে আর-এক চৌকিতে পা তুলে দিয়ে সমস্তদিন কেবল গুন্‌গুন্ করে গান করছি। রামকেলি প্রভৃতি সকাল বেলাকার যে-সমস্ত সুর কলকাতায় নিতান্ত অভ্যস্ত এবং প্রাণহীন বোধ হয়, এখানে তার একটু আভাসমাত্র দিলেই অমনি তার সমস্তটা সজীব হয়ে ওঠে। তার মধ্যে এমন একটা অপূর্ব সত্য এবং নবীন সৌন্দর্য দেখা দেয়, এমন একটা বিশ্বব্যাপী গভীর করুণা বিগলিত হয়ে চারি দিককে বাষ্পাকুল করে তোলে যে, এই রাগিণীকে সমস্ত আকাশ এবং সমস্ত পৃথিবীর গান বলে মনে হতে থাকে। এ একটা ইন্দ্রজাল, একটা মায়ামন্ত্রের মতো। আমার সুরের সঙ্গে কত টুকরো টুকরো কথা যে আমি জুড়ি তার আর সংখ্যা নেই— এমন এক লাইনের গান সমস্ত দিন কত জমছে এবং কত বিসর্জন দিচ্ছি। রীতিমত বসে সেগুলোকে পুরো গানে বাঁধতে ইচ্ছা করছে না। এই চৌকিটাতে বসে আকাশ থেকে সোনালি রোদ্দুরটুকু পান করতে করতে এবং জলের উপরকার সরস শৈবালের নবীন কোমলতার উপর চোখ দুটো স্নেহস্পর্শের মতো বুলোতে বুলোতে যতটুকু অনায়াস আলস্যভরে

আপনিই মনে উদয় হয় তার বেশি চেষ্টা করা আপাতত আমার সাধ্যাতীত। আজ সমস্ত সকাল নিতান্ত সাদাসিধা ভৈরবী রাগিণীতে যে গোটা দুই-তিন ছত্র ক্রমাগত আবৃত্তি করছিলুম সেটুকু মনে আছে এবং নমুনাস্বরূপে নিম্নে উদ্‌ধৃত করা যেতে পারে।—

ওগো তুমি নব নব রূপে এসো প্রাণে!
(আমার নিত্যনব!)
এসো গন্ধ বরণ গানে!
আমি যে দিকে নিরখি তুমি এসো হে
আমার মুগ্ধ মুদিত নয়ানে!

সাতারা
১৫ সেপ্টেম্বর ১৮৯৪

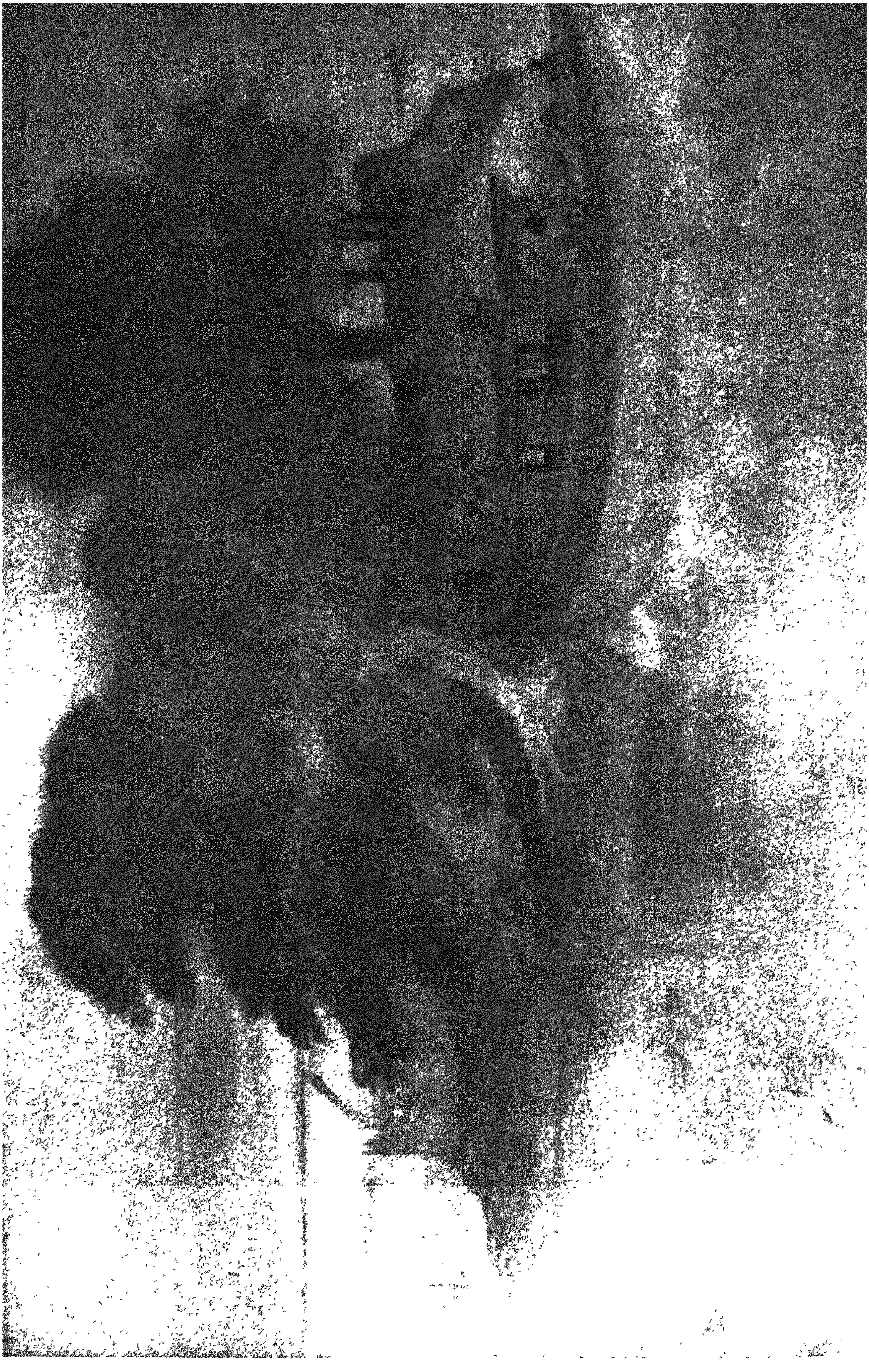

১৫৩

দিঘপতিয়া জলপথে

২০ সেপ্টেম্বর। ১৮৯৪।

পদ্মার ও দিকে এখন জল কমে যাচ্ছে, কিন্তু এ দিকে জল বাড়বার এই সময়। চতুর্দিকে তার পরিচয় পাচ্ছি। বড়ো বড়ো গাছ জলের মধ্যে তার সমস্ত গুঁড়িটি ডুবিয়ে দিয়ে শাখাপ্রশাখা জলের উপর অবনত করে দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে— আমগাছ বটগাছের অন্ধকার জঙ্গলের ভিতরে নৌকো বাঁধা এবং তারই মধ্যে প্রচ্ছন্ন হয়ে গ্রামের লোকেরা স্নান করছে। এক-একটি কুঁড়েঘর স্রোতের মধ্যে দাঁড়িয়ে রয়েছে, তার চারি পার্শ্বের সমস্ত প্রাঙ্গণ জলমগ্ন। কোথাও মাঠের চিহ্ন দেখবার জো নেই, কেবল ধানের ডগা জলের উপরে একটুখানি মাথা তুলে রয়েছে। বিল-খাল নদী-নালা কত রকম জলপথের মধ্যে দিয়েই যে চলেছি তার ঠিক নেই। ধানের ক্ষেতের ভিতর দিয়ে বোট সর্‌সর্‌ শব্দে যেতে যেতে হঠাৎ একটা পুকুরের মধ্যে গিয়ে পড়ে— সেখানে আর ধান নেই— নালবনের মধ্যে সাদা সাদা নাল ফুল ফুটে রয়েছে এবং কালোবর্ণ পানকৌড়ি জলের ভিতরে ডুব দিয়ে দিয়ে মাছ ধরছে। আবার যেতে যেতে হঠাৎ এক জায়গায় ছোটো নদীর মধ্যে এসে পড়ে — সেখানে এক তীরে ধানের ক্ষেত, আর-এক তীরে ঘন ঝোপঝাড়ের মধ্যে গ্রাম— মাঝখান দিয়ে একটি পরিপূর্ণ জলস্রোত এঁকে বেঁকে চলে গেছে। জল যেখানে সুবিধে পাচ্ছে সেইখানেই প্রবেশ করছে — স্থলের এমন পরাভব তোরা বোধ হয় কখনও দেখিস নি। বড়ো বড়ো গোল মাটির গামলার মধ্যে বসে একখণ্ড বাখারিকে দাঁড়ের মতো ব্যবহার করে গ্রামের লোকেরা ইতস্তত যাতায়াত করছে— ডাঙাপথ একেবারেই নেই। আর-একটু জল বাড়লেই ঘরের ভিতরে জল প্রবেশ করবে— তখন মাচা বেঁধে তার উপরে বাস করতে হবে, গোরুগুলো দিনরাত্রি এক হাঁটু জলের মধ্যে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মরবে,

তাদের খাবার যোগ্য ঘাস ক্রমেই দুর্লভ হয়ে দাঁড়াবে, সাপগুলো তাদের জলমগ্ন গর্ত পরিত্যাগ করে কুঁড়েঘরের চালের মধ্যে এসে আশ্রয় নেবে এবং যত রাজ্যের গৃহহীন কীটপতঙ্গ সরীসৃপ মানুষের সহবাস গ্রহণ করবে। একে গ্রামের চতুর্দিক ঘন জঙ্গলে আচ্ছন্ন এবং অন্ধকার— তাতে আবার তারই মধ্যে জল প্রবেশ করে সমস্ত পাতা লতা গুল্ম পচতে থাকে, গোয়ালঘর এবং মানবগৃহের আবর্জনা সমস্ত চার দিকে ভাসতে থাকে, পাট-পচা দুর্গন্ধ জলের রঙ নীল হয়ে ওঠে, উলঙ্গ পেট-মোটা পা-সরু রুগ্ন ছেলেমেয়েগুলো যেখানে সেখানে জলে কাদায় মাখামাখি ঝাঁপাঝাঁপি করতে থাকে, মশার ঝাঁক স্থির পচা জলের উপর একটি বাষ্পস্তরের মতো ঝাঁক বেঁধে ভন্ ভন্ করতে থাকে — এ অঞ্চলের বর্ষার গ্রামগুলি এমন অস্বাস্থ্যকর আরামহীন আকার ধারণ করে যে তার পাশ দিয়ে যেতে গা কেমন করে। যখন দেখতে পাই গৃহস্থের মেয়েরা একখানা ভিজে শাড়ি গায়ে জড়িয়ে বাদলার ঠাণ্ডা হাওয়ায় বৃষ্টির জলে ভিজতে ভিজতে হাঁটুর উপর কাপড় তুলে জল ঠেলে ঠেলে সহিষ্ণু জন্তুর মতো ঘরকর্নার নিত্যকর্ম করছে, তখন সে দৃশ্য কিছুতেই ভালো লাগে না। এত কষ্ট এত অনারাম মানুষের কী করে সয় আমি ভেবে পাই নে— এর উপরে প্রতি ঘরে ঘরে বাতে ধরছে, পা ফুলছে, সর্দি হচ্ছে, জ্বর হচ্ছে, পিলেওয়ালা ছেলেগুলো অবিশ্রাম ঘ্যান্ ঘ্যান্ করে কাঁদছে, কিছুতেই তাদের বাঁচাতে পারছে না— একটা একটা করে মরে যাচ্ছে। এত অবহেলা অস্বাস্থ্য অসৌন্দর্য দারিদ্র্য বর্বরতা মানুষের আবাসস্থলে কিছুতেই শোভা পায় না। সকল রকম ক্ষমতার কাছেই আমরা পরাভূত হয়ে আছি— প্রকৃতি যখন উপদ্রব করে তাও সয়ে থাকি, রাজা যখন উপদ্রব করে তাও সয়ে থাকি, এবং শাস্ত্র চিরকাল ধরে যে-সমস্ত দুঃসহ উপদ্রব করে আসছে তার বিরুদ্ধেও কথাটি বলতে সাহস হয় না। এরকম

জাতের পৃথিবী ছেড়ে একেবারে পলাতকা হওয়া উচিত— এদের দ্বারা জগতের কোনো সুখও নেই, শোভাও নেই, এবং সুবিধেও নেই।

সাতারা

২৫ সেপ্টেম্বর ১৮৯৪

১৫৪

বোয়ালিয়া-পথে

বৃহস্পতিবার ?

২২ সেপ্টেম্বর। ১৮৯৪।

আজ চতুর্দিক নির্মল হয়ে ভারী সুন্দর রোদ উঠেছে [বব]। ছোটো নদী, সুতীব্র স্রোত, তারই প্রতিকূলে গুণ টেনে চলাতে ক্রমাগত কল্‌কল্‌ ছল্‌ছল্‌ শব্দ কানে আসছে। এতদিন বৃষ্টিতে ভেজার পর আজ শরতের নবীন রৌদ্রে নদীর দুই ধারের গাছপালা এবং গ্রামগুলি এমন একটি আরামপুলকের ভাব প্রকাশ করছে! আজ আকাশ এবং পৃথিবী থেকে দুর্দিনের স্মৃতি সমস্ত একেবারে মুছে গেছে। যেন জগতে কোনো কালেই আনন্দের অবসান ছিল না। এই আকাশ-ভরা সোনার রৌদ্রটি আজ আমারও মনের উপর সম্পূর্ণ বিস্তারিত হয়েছে— সেখানে আমার জীবনের সমস্ত সুখস্মৃতির দেশটি শরতের আলোতে এক অপরূপ মায়ারাজ্যের মতো দেখাচ্ছে। যখন ভেবে দেখি এ জীবনে কেবলমাত্র বত্রিশটি শরৎকাল এসেছে এবং গেছে তখন ভারী আশ্চর্য বোধ হয়— অথচ মনে হয় আমার স্মৃতিপথ ক্রমেই অস্পষ্টতর হয়ে কুহেলিকাময় অনাদিকালের দিকে চলে গেছে, এবং এই-সমস্ত বৃহৎ মানস রাজ্যের উপর যখন মেঘমুক্ত সুন্দর প্রভাতের রৌদ্রটি এসে পড়ে তখন আমি যেন আমার এক মায়া-অট্টালিকার বাতায়নে বসে এক সুদূরবিস্তৃত মায়াময়ী মরীচিকা-রাজ্যের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থাকি, এবং আমার কপালে যে বাতাসটি এসে লাগতে থাকে সে যেন অতীতের সমস্ত অস্পষ্ট মিশ্রিত মৃদু গন্ধপ্রবাহ বহন করে আনতে থাকে। আমি আলো এবং আকাশ এত ভালোবাসি! বোধ হয় আমার নামের সার্থকতার জন্যে! গেটে মরবার সময় বলেছিলেন: More light!— আমার যদি সে সময় কোনো ইচ্ছা প্রকাশ করবার থাকে তো আমি বলি: More light and more space! আমার

একটা কবিতায় আমি ইচ্ছা প্রকাশ করেছি—

শূন্য ব্যোম অপরিমাণ,
মদ্যসম করিব পান
মুক্ত করি রুদ্ধ প্রাণ
ঊর্ধ্ব নীলাকাশে।

এই আকাশ পান করে আমার এ পর্যন্ত তৃপ্তি হয় নি। অনেকে বাংলাদেশকে সমতলভূমি বলে আপত্তি প্রকাশ করে, কিন্তু সেই জন্যেই বাংলাদেশের মাঠের দৃশ্য, নদীতীরের দৃশ্য, আমার এত বেশি ভালো লাগে। যখন সন্ধ্যার আলোক এবং সন্ধ্যার শান্তি উপর থেকে নামতে থাকে তখন সমস্ত অনবরুদ্ধ আকাশটি একটি নীলকান্ত মণির পেয়ালার মতো আগাগোড়া পরিপূর্ণ হয়ে উঠতে থাকে, যখন স্তিমিত শান্ত নীরব মধ্যাহ্ন তার সমস্ত সোনার আঁচলটি বিছিয়ে দেয় তখন কোথাও সে বাধা পায় না— চেয়ে চেয়ে দেখবার এবং দেখে দেখে মনটা ভরে নেবার এমন জায়গা আর নেই। আমি সেই জন্যে পর্বতের চেয়ে সমুদ্রতীর ঢের বেশি ভালোবাসি। পুরীতে যে দিন সমুদ্রতীরে গিয়ে উপস্থিত হলুম— এক দিকে ধূসর বালি ধূ ধূ করছে, আর-এক দিকে গাঢ়নীল সমুদ্র এবং পাণ্ডুনীল আকাশ দৃষ্টিসীমা পর্যন্ত প্রসারিত হয়ে গেছে— সেদিন সমস্ত অন্তঃকরণ যে কী রকম পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছিল সে ঠিক বলা যায় না। তাই আমার ভারী ইচ্ছে হয়েছিল— পুরীতে সমুদ্রতীরে একটি ছোটো বাড়ি তৈরি ক'রে প'ড়ে থাকি। এখনও সেই গৃহহারা তরঙ্গের গর্জনশব্দ দূর স্বপ্নের মতো কানে এসে লাগে। সন্ন্যাসীরা যে রকম করে বেড়িয়ে বেড়ায় তেমনি করে ভ্রমণ করা যদি আমার পক্ষে সহজ হত তা হলে এই অবারিত পৃথিবীর হাতে আপনাকে সমর্পণ করে দিয়ে একবার দেশে দেশান্তরে ঘুরে আসতুম। কিন্তু আকাশও দুই হাত বাড়িয়ে ডাকে, এবং গৃহও দুই হাত ধরে টেনে

নিয়ে আসে। উভচর জীব হয়ে আমি ভারী মুশকিলে পড়েছি। সকল বিষয়েই আমি উভচর— মানসজগৎ এবং বস্তুজগৎ দুইয়ের মধ্যেই আমার সমান বন্ধন।

সাতারা

২৭ সেপ্টেম্বর ১৮৯৪

বোয়ালিয়া

সোমবার, ২৪ সেপ্টেম্বর। ১৮৯৪।

তুই যে লিখেছিস যাদের অনুভাব বেশি প্রবল তারা জগতে বেশি দুঃখী হয়, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ থাকতে পারে না— কারণ, দুঃখ-ভোগ করবার ক্ষমতা অনুভবশক্তির উপরেই নির্ভর করে। কিন্তু আমি অনেক সময়ে ভেবে দেখেছি সুখী হলুম কি দুঃখী হলুম সেইটে আমার পক্ষে শেষ কথা নয়। আমাদের অন্তরতম প্রকৃতি সমস্ত সুখ-দুঃখের ভিতরে নিজের একটা বৃদ্ধি অনুভব করতে থাকে। আমাদের ক্ষণিক জীবন এবং চিরজীবন দুটো একত্র সংলগ্ন হয়ে আছে মাত্র, কিন্তু দুটো এক নয়, এ আমি মাঝে মাঝে স্পষ্ট উপলব্ধি করতে পারি। আমাদের ক্ষণিক জীবন যে সুখ দুঃখ ভোগ করে আমাদের চিরজীবন তার থেকে সারাংশ গ্রহণ করে। তুই বোধ হয় জানিস গাছের সবুজ পাতা সূর্যকিরণকে বিশ্লেষণ করে তার থেকে কার্বন-নামক অঙ্গারপদার্থ-সঞ্চয়ের সাহায্য করে, যে কার্বন থাকাতে গাছ পোড়ালে আগুন হয়। গাছের পাতা প্রতিদিন রৌদ্রে প্রসারিত হয়ে শুষ্ক হয়ে ঝরে যাচ্ছে, আবার নতুন নতুন পাতা গজাচ্ছে— গাছের ক্ষণিক জীবন কেবল রৌদ্র ভোগ করছে এবং সেই উত্তাপেই শুকিয়ে পড়ে যাচ্ছে— আর গাছের চিরজীবন তার ভিতর থেকে দাহহীন চির-অগ্নি সঞ্চয় করছে। আমাদেরও প্রতিদিনের প্রতি মুহূর্তের পল্লবরাশি চতুর্দিকে প্রসারিত হয়ে জগতের সমস্ত প্রবহমাণ সুখ দুঃখ ভোগ করছে এবং সেই সুখদুঃখের উত্তাপে শুষ্ক হয়ে দগ্ধ হয়ে ঝরে ঝরে পড়ছে, কিন্তু আমাদের চিরজীবনকে সেই প্রতি মুহূর্তের দাহ স্পর্শ করতে পারে না— অথচ তার তেজটুকু সে আপনার অন্তরে ক্রমাগতই অলক্ষিত অচেতন ভাবে সঞ্চয় করতে থাকে। যে গাছের পাতা সবুজ নয় সে গাছ উচ্চশ্রেণীর গাছ নয়, তার কার্বন-সঞ্চয়ও সামান্য। যে মানুষের

প্রতি মুহূর্তের অনুভব-শক্তি সুখদুঃখভোগ-শক্তি সামান্য, তার দাহও অল্প, তার চিরপ্রাণের সঞ্চয়ও অতি অকিঞ্চিৎকর। তার ক্ষণিক জীবনটা সুখদুঃখের তাপ থেকে সংরক্ষিত হয়ে অনেকদিন স্থায়ী হয়— অর্থাৎ প্রায় দেখা যায়, প্রতিদিনের ক্ষুদ্র সংসার, সংকীর্ণ জীবনযাত্রার অতি সংকীর্ণ সীমা, তাদের কাছে চিরকাল যথেষ্ট থাকে ; সেটা তাদের শুষ্ক হয় না, ঝরে যায় না। তারা অচেতনতার আবরণে ক্ষণিককে অপেক্ষাকৃত স্থায়ী করে রাখে ; দুদিনকে এমন তাজা রেখে দেয় যে দেখে মনে হয় তা চিরদিনের ; সংসারের সামান্য ব্যাপারকে এমন করে তোলে যেন তা অসামান্য। কিন্তু সংসারের সর্বত্রই ক্ষতিপূরণের একটা নিয়ম আছে, যাকে বলে 'law of compensation'। প্রতিদিনকে সজীবভাবে সংরক্ষণ করতে চেষ্টা করলে চিরদিনকে নির্জীব করা হয়। যারা অনুভবশক্তির জড়ত্ব*-বশত সংকীর্ণ গণ্ডির মধ্যে সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট সেই সংসারী বিষয়ী লোকেরা ক্ষণিকজীবনের সন্তোষসুখে হৃষ্টপুষ্ট হয়ে ওঠে, কিন্তু চিরজীবনের সুগভীর আনন্দ তাদের কল্পনার অতীত, ধারণার অগম্য— তারা সেটাকে কবিতার অলংকার বলে জ্ঞান করে, মনের সঙ্গে বিশ্বাস করে না। সেই জন্য, যে সুখ সাংসারিক সুখ নয় এবং যে দুঃখ সাংসারিক দুঃখ সেইটেকে পরিত্যাগ করে চলাই জীবনযাত্রার আদর্শ বলে জ্ঞান করে এবং কারও সাধ্য নেই তাদের মনে এর চেয়ে উচ্চতর আদর্শের যথার্থ উপলব্ধি জন্মিয়ে দেওয়া— তাদের বুঝিয়ে দেওয়া যে, যারা অত্যন্ত বৃহৎ দুঃখের দ্বারা দুঃখ পাচ্ছে তারাও তোমার মতো কৃপাপাত্র নয়। আমি আমার ভাবটা ঠিক পরিষ্কার করতে পেরেছি কিনা জানি নে [বব]। আমাদের মনের যেগুলো যথার্থ কথা সেগুলো এত অন্তরে বসতি করে যে অন্যের কাছে তাদের ঠিক পরিদৃশ্যমান করে তোলা, ঠিক সত্যরূপে প্রতীয়মান করে তোলা, ভারী কঠিন বলে মনে হয়— সেই জন্যে গোড়ায় চেষ্টা করতেই ভয়

হয়। যা আমার পক্ষে সর্বাপেক্ষা গভীরতম সত্য— যা আমাদের জীবনের মর্মস্থানে বিরাজ করে— তাকে আমরা নানা আকারে, নানা কথায়, নানা কাজে, অজ্ঞাতসারে খণ্ড খণ্ড করে প্রকাশ করি। কিন্তু একেবারে সমগ্রভাবে তাকে অন্যের কাছে, এমন-কি নিজের কাছে প্রত্যক্ষগ্রাহ্য করা বড়ো শক্ত— ভয় হয় পাছে, যে জিনিষটা অন্তঃ-করণের পক্ষে একান্ত সত্য সেইটেই বাইরে বেরোতে গেলে কাল্পনিক বেশ ধারণ করে আসে।

সাতারা

২৯ সেপ্টেম্বর ১৮৯৪

১৫৬

বোয়ালিয়া

২৪ সেপ্টেম্বর। ১৮৯৪।

আমার স্বীকার করতে লজ্জা করে এবং ভেবে দেখতে দুঃখ বোধ হয়— সাধারণত মানুষের সংসর্গ আমাকে বড়ো বেশি উদ্‌ভ্রান্ত করে দেয়, আমাকে ভিতরে ভিতরে পীড়ন করতে থাকে— সকলের মতো হয়ে, সকল মানুষের সঙ্গে বেশ সহজভাবে মিলেমিশে, সহজ আমোদ-প্রমোদে আনন্দ লাভ করবার জন্যে আমার মনকে আমি প্রতিদিন দীর্ঘ উপদেশ দিয়ে থাকি, কিন্তু আমার চারি দিকেই এমন একটি গণ্ডী আছে আমি কিছুতেই সে লঙ্ঘন করতে পারি নে। লোকের মধ্যে আমি নতুন প্রাণী, কিছুতেই তাদের সঙ্গে আমার সঙ্গে সম্পূর্ণ পরিচয় হয় না— আমার যারা বহুকালের বন্ধু তাদের কাছ থেকেও আমি বহু দূরে। যখন আমি স্বভাবতই দূরে তখন সামাজিকতার খাতিরে জোর করে নিকটে থাকা মনের পক্ষে বড়োই শ্রান্তিজনক। অথচ মানুষের সঙ্গ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকাও যে আমার পক্ষে স্বাভাবিক তাও নয়; থেকে থেকে সকলের মাঝখানে গিয়ে পড়তে ইচ্ছে করে— কোথায় কী কাজকর্ম হচ্ছে, কী আন্দোলন চলছে, তাতে আমারও যোগ দিতে, সাহায্য করতে ইচ্ছে হয়— মানুষের সঙ্গের যে জীবনোত্তাপ সেও যেন মনের প্রাণধারণের পক্ষে আবশ্যক। এই দুই বিরোধের সামঞ্জস্য হচ্ছে— এমন নিতান্ত আত্মীয় লোকের সহবাস যারা সংঘর্ষের দ্বারা মনকে শ্রান্ত করে দেয় না, এমন-কি, যারা আনন্দদান করে মনের সমস্ত স্বাভাবিক ক্রিয়াগুলিকে সহজে এবং উৎসাহের সহিত পরিচালিত করবার সহায়তা করে।

সাতারা

২৯ সেপ্টেম্বর ১৮৯৪

বোয়ালিয়া

২৫ সেপ্টেম্বর। ১৮৯৪।

ভেবে দেখ্, আমরা যখন খুব বড়ো রকমের আত্মবিসর্জন করি সেটা কেন করি। একটা মহৎ আবেগে আমাদের তুচ্ছ ক্ষণিক জীবনটা আমাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, তার সুখ দুঃখ আমাদের স্পর্শই করতে পারে না। আমরা হঠাৎ দেখতে পাই আমরা সুখদুঃখের চেয়েও বড়ো, আমরা নিত্যনৈমিত্তিক তুচ্ছ বন্ধন থেকে মুক্ত। সুখের চেষ্টা এবং দুঃখের পরিহার এই আমাদের ক্ষণিক জীবনের প্রধান নিয়ম ; কিন্তু এক-একটা সময় আসে যখন আমরা আবিষ্কার করতে পারি যে, আমাদের ভিতরে এমন একটি জায়গা আছে যেখানে সে নিয়ম খাটে না— যেখানে দুঃখ দুঃখই নয় এবং সুখ একটা উদ্দেশ্যের মধ্যেই গণ্য হয় না— যেখানে আমরা সমস্ত ক্ষুদ্র নিয়মের অতীত, স্বাধীন। তখন আমরা আমাদের ক্ষণিক জীবনটাকে পরাভূত করেই একটা আনন্দ পাই, দুঃখকে গলার হার করে নিয়ে প'রেই একটা উল্লাস পাই— তখন মনে হয় আমার ভিতরকার সেই স্বাধীন পুরুষের বলেই আমি চিরকাল সমস্ত সুখদুঃখের ভিতর দিয়ে আনন্দে আমার প্রকৃতির সফলতা সাধন করব। কিন্তু আবার চারি দিকের সংসার, লোকের সংসর্গ, প্রতিদিনের কথাবার্তা ক্ষুধাতৃষ্ণা প্রবল হয়ে বেড়ে উঠে আমাদের সেই অন্তরতম স্বাধীনতার ক্ষেত্র আমাদের চোখ থেকে ঢেকে ফেলে— তখন আবার আত্মবিসর্জন সুকঠিন হয়ে ওঠে, স্বার্থসুখ প্রবল হয়ে দেখা দেয়। মহৎ লোকের সঙ্গে ইতর লোকের প্রধান প্রভেদ এই যে, মহৎ লোকেরা অধিকাংশ সময়ে আপনার ভিতরকার সেই স্বাধীনতার ক্ষেত্রে সেই চিরজীবনের ভিতরে বাস করতে পারে, ইতর লোকের পক্ষে সে জায়গাটা অধিকাংশ সময়ে দুর্গম এবং অজ্ঞাত। [বব], আমি যখন একলা মফস্বলে থাকি তখন প্রকৃতির ভিতরকার

সৌন্দর্য আনন্দ আমার অন্তরের সেই নিগূঢ় আনন্দনিকেতনের দ্বার খুলে দিয়ে ভিতরে বাইরে এক করে দেয়, তখন সংসারের ক্ষণিক মূর্তি আমার কাছ থেকে দূরে চলে যায়— গানের সুরের দ্বারা গানের তুচ্ছ কথাগুলো যেমন অমরতা প্রাপ্ত হয় তেমনি প্রতিদিনের সংসারের বাহ্য আকারটা আমার মনের ভিতরকার চিরানন্দরাগিণীর দ্বারা একটা চির-মহিমা লাভ করে। আমাদের সমস্ত স্নেহপ্রীতির সম্বন্ধ একটা বিনম্র আত্মবিস্মৃত ধর্মোপাসনার ভাবে জ্যোতির্ময় হয়ে ওঠে— দুঃখের দুঃখত্বটা যে চলে যায় তা নয়, কিন্তু সে আমার স্বার্থের সীমা অতিক্রম করে এমন সুবৃহৎ আকাশে ব্যাপ্ত হয়ে যায় যে, সেখানে সে একটা সৌন্দর্য বিকিরণ করতে থাকে— যেমন সূর্যাস্তের আলোক সমস্ত জলে স্থলে আকাশে একটা বিষাদের ছায়া ফেলে বটে, কিন্তু তার মধ্যে একটি উত্তাপবিহীন সুকোমল সৌন্দর্যের আনন্দ মিশ্রিত থাকে। এবার বোটে থাকতে আমি অন্তর্যামী-নামক একটি কবিতা লিখেছি, তাতে আমি আমার এই অন্তরজীবনের কথা অনেকটা প্রকাশ করতে চেষ্টা করেছি। কৃতকার্য হয়েছি কি না জানি নে— কারণ, প্রকাশ হওয়া লেখকের ক্ষমতার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে না, পাঠকের অভিজ্ঞতার উপরেও অনেকটা নির্ভর করে। কিছুদিন হল তোর একখানি চিঠিতে এই অন্তরজীবনের প্রকাশ দেখে আমি ভারী খুশি হয়েছিলুম— নিশ্চয় তুই অনেক সময় তোর নিজের ভিতরকার এই যথার্থ স্বরূপ অনুভব করিস, কিন্তু নিজের প্রতি অবিশ্বাস করে প্রকাশ করতে চাস নে। তোর সন্দেহ হয় যে, এক-এক দিনের সেই ভাবটাই সত্য, না, প্রতি-দিনের তুচ্ছতাই সত্য। সে রকম সন্দেহ করিস নে [বব]। কারণ, সত্যকে সন্দেহ করলে অনেক সময় সত্যকে নষ্ট করা হয়। যে-সমস্ত শুভমুহূর্তে আমরা নিজেকে খুব বড়ো বলে অনুভব করি সেই মুহূর্তগুলিকে চিহ্নিত করে রেখে দিলে তারা স্মৃতির সাহায্য ক'রে ভবিষ্যতে পথ-

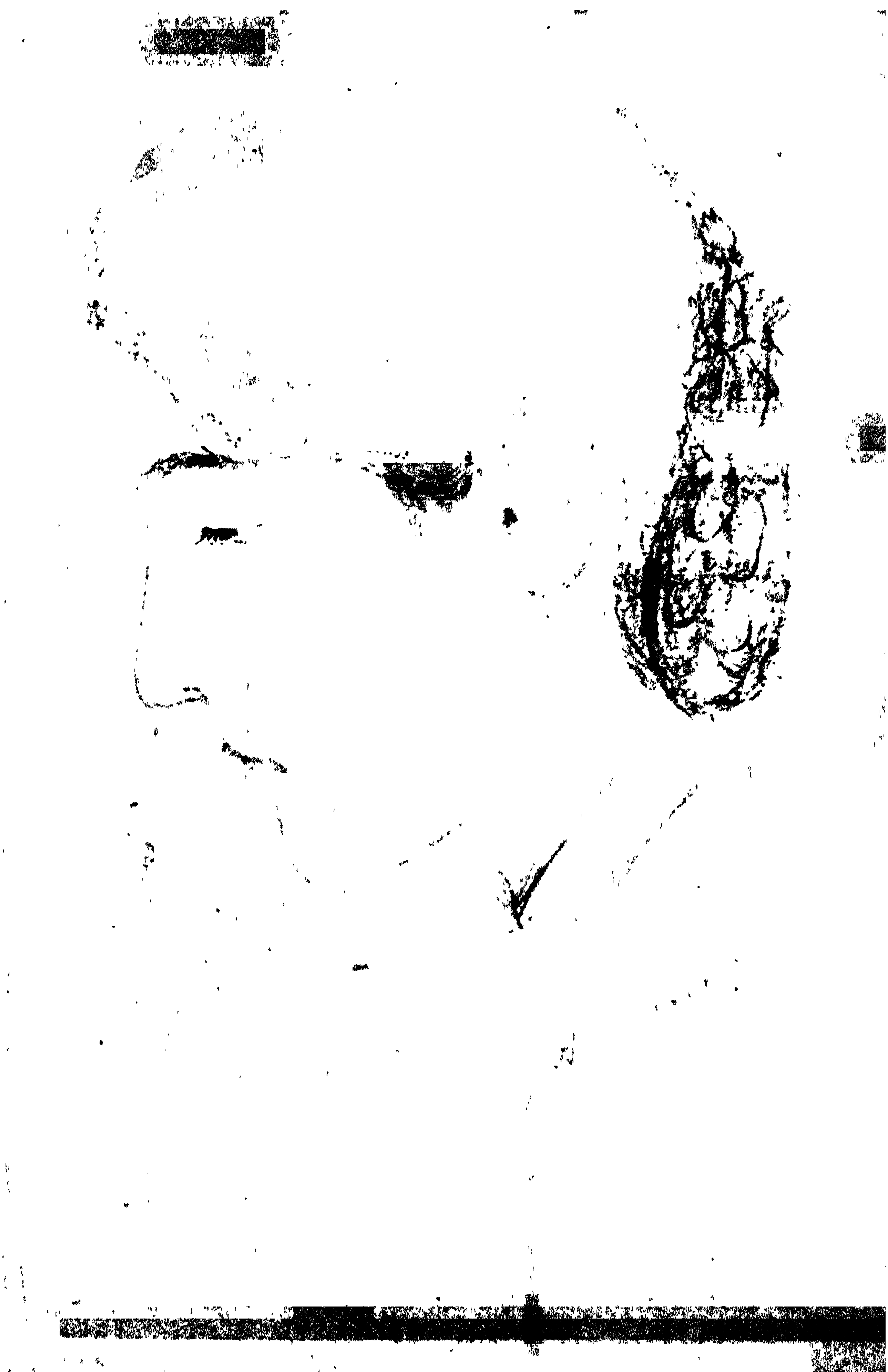

ইন্দিরাদেবী

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর -অঙ্কিত

প্রদর্শনের উপায় হয়। আমি আমার সৌন্দর্য-উজ্জ্বল আনন্দের মুহূর্তগুলিকে ভাষার দ্বারা বারম্বার স্থায়ীভাবে মূর্তিমান করাতেই ক্রমশই আমার অন্তর্জীবনের পথ সুগম হয়ে এসেছে— সেই মুহূর্তগুলি যদি ক্ষণিক সম্ভোগেই ব্যয় হয়ে যেত তা হলে তারা চিরকালই অস্পষ্ট সুদূর মরীচিকার মতো থাকত, ক্রমশ এমন দৃঢ় বিশ্বাস এবং সুস্পষ্ট অনুভবের মধ্যে সুপরিস্ফুট হয়ে উঠত না। অনেক দিন থেকে জ্ঞাতসারে এবং অজ্ঞাতসারে ভাষার দ্বারা চিহ্নিত করে এসে জগতের অন্তর্-জগৎ, জীবনের অন্তর্জীবন, স্নেহপ্রীতির দিব্যত্ব আমার কাছে আজ আকার ধারণ করে উঠছে— নিজের কথা আমার নিজেকে সহায়তা করেছে— অন্যের কথা থেকে আমি এ জিনিষ কিছুতে পেতুম না।

সাতারা

৩০ সেপ্টেম্বর ১৮৯৪

কলকাতা

২৯ সেপ্টেম্বর। ১৮৯৪

আশ্চর্য এই যে, আজকাল আমার কবিতার প্রশংসা শুনলে আমার মনে সেরকম একটা পুলকসঞ্চার হয় না। আসল, তার কারণ, যে আমাকে লোকে প্রশংসা করছে সেই আমিই যে কবিতা লিখে থাকে এ আমার সম্পূর্ণ হৃদয়ঙ্গম হয় না। আমি জানি, যে-সমস্ত ভালো কবিতা আমি লিখেছি সে আমি ইচ্ছে করলেই লিখতে পারি নে— তার একটা লাইন হারিয়ে গেলেও বহু চেষ্টায় সে লাইন গড়তে পারি কিনা সন্দেহ। প্রশংসা শুনলেই মনে হয় এ প্রশংসার যোগ্য আমি হতে পারব কিনা— ভালো লেখা যা-কিছু লিখেছি হয়তো সেরকম আর কখনো লিখতে পারব না। কারণ, যে শক্তি আমাকে লেখায় সে আমার ক্ষমতার বাইরে। তোকে একখানা কাগজ থেকে আমার একটা সমালোচনা পাঠিয়ে দিচ্ছি। এ লোকটা কিছু ওরিজিনাল চাল চেলেছে। এ আমার কবিতাগুলোকে গাল দিয়ে আমার গল্পগুলোকে আকাশে তুলে দিয়েছে। আবার এক সম্প্রদায়ের লোক আছে যারা ঠিক এর উল্টো দিক দিয়ে যায়। মধ্যখানে আমি বিস্ময়ান্বিত হয়ে সকৌতুকভাবে বসে থাকি। লেখকজীবন যতদিন থাকবে ততদিন কত রকম-বেরকম কথাই যে শুনতে হবে তার আর ঠিক নেই। আবার, একদল লোক আছে যারা বলে আমার অন্য সব রচনা ক্ষণস্থায়ী, কেবল একমাত্র গানই আমাকে লোকসমাজে অমর করে রেখে দেবে। আমি ভাবি, যদি খ্যাতিলাভ মানুষের দুরাকাঙ্ক্ষার শেষ লক্ষ্য হয় তবে আমার আর ভাবনা নেই— অন্ধকার অমরতাকে লক্ষ্য করে আমি অনেকগুলো ঢিল ছুঁড়তে বসেছি, যেটা হোক একটা লেগে যেতেও পারে। কিন্তু একবার দৈবাৎ লাগা এক, আর চিরকাল লেগে থাকা এক। চিরকাল কোন্ জিনিষটা থাকবে না-থাকবে তা কেউ বলতে

পারে না এবং আমিও সে সম্বন্ধে কোনোরকম তর্কবিতর্ক করতে চাই নে— নিজের মনের ভিতর যখন একটা সফলতার আনন্দ অনুভব করা যায় সেইটেই লেখকের পক্ষে যথার্থ অমরতা। দুর্ভাগ্যক্রমে সে আনন্দ খুব ভালো লেখক থেকে খুব খারাপ লেখক পর্যন্ত প্রায় সকলেই ন্যূনাধিক পরিমাণে অনুভব করে থাকে।

সাতারা

৩ অক্টোবর ১৮৯৪

১৫৯

কলকাতা

৫ অক্টোবর। ১৮৯৪।

কাল সমস্ত বৃষ্টি বাদলা শেষ হয়ে গেছে। আজ সকালে সুন্দর রোদ্‌দুর উঠেছে। আজ সকালের বাতাসের মধ্যে অতি ঈষৎ শীতের সঞ্চার হয়েছে, একটুখানি যেন শিউরে ওঠার মতো। কাল দুর্গাপূজা আরম্ভ হবে, আজ তার সুন্দর সূচনা হয়েছে। ঘরে ঘরে সমস্ত দেশের লোকের মনে যখন একটা আনন্দের হিল্লোল প্রবাহিত হচ্ছে তখন তাদের সঙ্গে সামাজিক বিচ্ছেদ থাকা সত্ত্বেও সে আনন্দ মনকে স্পর্শ করে। পরশু দিন সকালে [সুরেশ সমাজপতির] বাড়ি যাবার সময় দেখছিলুম রাস্তার দু ধারে প্রায় বড়ো বড়ো বাড়ির দালান মাত্রেই দুর্গার দশ-হাত-তোলা প্রতিমা তৈরি হচ্ছে— এবং আশে পাশে সমস্ত বাড়ির ছেলের দল ভারী চঞ্চল হয়ে উঠেছে। দেখে আমার মনে হল দেশের ছেলেবুড়ো সকলেই হঠাৎ দিনকতকের মতো ছেলেমানুষ হয়ে উঠে সবাই মিলে একটা বড়ো গোছের পুতুল-খেলায় প্রবৃত্ত হয়েছে। ভালো করে ভেবে দেখতে গেলে সমস্ত উচ্চ-অঙ্গের আনন্দ মাত্রই পুতুল-খেলা, অর্থাৎ তাতে কোনো উদ্দেশ্য নেই, লাভ নেই— বাইরে থেকে দেখে মনে হয় বৃথা সময় নষ্ট। কিন্তু, সমস্ত দেশের লোকের মনে যাতে ক'রে একটা ভাবের আন্দোলন, একটা বৃহৎ উচ্ছ্বাস এনে দেয়, সে জিনিষটি কখনোই নিষ্ফল এবং সামান্য নয়। সমাজের মধ্যে কত লোক আছে যারা কঠিন নীরস বিষয়ী লোক, যাদের কাছে কবিতা সংগীত প্রভৃতি সমস্তই তুচ্ছ, তারাও এই উৎসব-উপলক্ষে একটা সর্বব্যাপী ভাবের দ্বারা বিচলিত হয়ে সকলের সঙ্গে এক হয়ে যায়। প্রতি বৎসরের এই ভাবের প্লাবনে নিশ্চয়ই মানুষকে অনেকটা পরিমাণে humanize করে দেয়; কিছুকালের জন্যে মনের এমন একটি অনুকূল আর্দ্র অবস্থা এনে দেয় যাতে স্নেহ

প্রীতি দয়া সহজে অঙ্কুরিত হতে পারে— আগমনী বিজয়ার গান, প্রিয়-সম্মিলন, নহবতের সুর, শরতের রৌদ্র এবং আকাশের স্বচ্ছতা, সমস্তটা মিলে মনের ভিতরে একটি আনন্দময় সৌন্দর্যকাব্য রচনা করে দেয়। আমার এবারকার 'মেয়েলি ছড়া' প্রবন্ধটাতে কতকটা বলেছি যে, ছেলেদের যে আনন্দ সেইটেই বিশুদ্ধ আনন্দের আদর্শ। তারা একটা তুচ্ছ উপলক্ষ্য নিয়ে সেইটেকে নিজের মনের ভাবে পরিপূর্ণ করে তুলতে পারে— তারা সামান্য একটা কদাকার অসম্পূর্ণ পুতুলকে নিজের প্রাণ এবং নিজের সুখ দুঃখে জীবন্ত করে তোলে। সে ক্ষমতাটা যে লোক বড়ো বয়স পর্যন্ত রাখতে পারে তাকেই আমরা ভাবুক বলি। তার কাছে চতুর্দিক্‌বর্তী সমস্ত জিনিষ নিতান্ত কেবল জিনিষ নয়, কেবল দৃষ্টিগোচর বা শ্রুতিগোচর নয়, কিন্তু ভাবগোচর— তার সমস্ত সংকীর্ণতা এবং অসম্পূর্ণতা সে একটি সংগীতের দ্বারা পূর্ণ করে নেয়। সেই ভাবুকতা দেশের সমস্ত লোকের কাছে কখনোই আশা করা যায় না, কিন্তু এই রকম উৎসবের সময় ভাবস্রোত দেশের অধিকাংশ লোকের মন অধিকার করে নেয়। তখন, যেটাকে আমরা দূর থেকে শুষ্ক হৃদয়ে সামান্য পুতুলমাত্র দেখছি সেইটে কল্পনায় মণ্ডিত হয়ে পুতুল-আকার ত্যাগ করে : তখন তার মধ্যে এমন একটি বৃহৎ ভাবের এবং প্রাণের সঞ্চার হয় যে, দেশের রসিক-অরসিক সকল লোকই তার সেই অমৃতধারায় অভিষিক্ত হয়ে ওঠে। তার পরে আবার পুতুল যখন পুতুল হয়ে আসে তখন সেটাকে জলে ফেলে দেয়। পৃথিবীর সকল জিনিষই এই পুতুল। আমরা যাকে ভালোবাসি, অন্য লোকের কাছে সে একটি দৃশ্যমান আকারবিশিষ্ট মানুষ মাত্র— কিন্তু আমার কাছে সে একটি অপরূপ ভাবের জ্যোতিতে দীপ্যমান, আমার কাছে সে অসীম অনন্ত। যার কান নেই তার কাছে গান শব্দমাত্র, আমার কাছে সেই শব্দ সংগীত। পৃথিবীর

সৌন্দর্য যে দেখতে পায় না পৃথিবী তার কাছে : মৃৎপিণ্ডো জলরেখয়া বলয়িতঃ। কিন্তু সেই জলরেখাবলয়িত মৃৎপিণ্ডই আমার কাছে পৃথিবী। অতএব এক রকম করে দেখতে গেলে সব জিনিষই পুতুল, কিন্তু হৃদয়ের ভিতর দিয়ে, কল্পনার ভিতর দিয়ে দেখতে গেলে তাদের দেবতা বলে চেনা যায়— তাদের সীমা পাওয়া যায় না। এই কারণে, সমস্ত বাংলাদেশের লোক যাকে উপলক্ষ্য করে আনন্দে ভক্তিতে প্লাবিত হয়ে উঠেছে, তাকে আমি মাটির পুতুল বলে যদি দেখি তবে তাতে কেবল আমারই ভাবের অভাব প্রকাশ পায়।

সাতারা
৯ অক্টোবর ১৮৯৪

১৬০

কলকাতা

৭ অক্টোবর। ১৮৯৪।

আমিও জানি [বব] তোকে আমি যে সব চিঠি লিখেছি তাতে আমার মনের সমস্ত বিচিত্র ভাব যে রকম ব্যক্ত হয়েছে এমন আমার আর কোনো লেখায় হয় নি। আমার প্রকাশিত লেখা আমি যাদের দিই, ইচ্ছা করলেও আমি তাদের এ-সমস্ত দিতে পারি নে। সে আমার ক্ষমতার মধ্যে নেই। তোকে আমি যখন লিখি তখন আমার এ কথা কখনো মনে উদয় হয় না যে, তুই আমার কোনো কথা বুঝবি নে, কিম্বা ভুল বুঝবি, কিম্বা বিশ্বাস করবি নে, কিম্বা যেগুলো আমার পক্ষে গভীরতম সত্য কথা সেগুলোকে তুই কেবলমাত্র সুরচিত কাব্যকথা বলে মনে করবি। সেই জন্যে আমি যেমনটি মনে ভাবি ঠিক সেই রকমটি অনায়াসে বলে যেতে পারি। যখন মনে জানি পাঠকরা আমাকে ভালো করে জানে না, আমার অনেক কথাই তারা ঠিকটি বুঝবে না এবং নম্রভাবে বোঝবার চেষ্টাও করবে না, এবং যেটুকু তাদের নিজের মানসিক অভিজ্ঞতার সঙ্গে মিলবে না সেটুকু আমার উপর বিশ্বাস স্থাপন করে গ্রহণ করবে না— তখন মনের ভাবগুলি তেমন সহজে ভাষায় প্রবাহিত হতে চায় না এবং যতটুকু প্রকাশ হয় তার মধ্যে অনেকখানি ছদ্মবেশ থেকে যায়। এর থেকেই বেশ বুঝতে পারি আমাদের সব চেয়ে যা শ্রেষ্ঠ প্রকাশ সে আমরা কাউকে নিজের ইচ্ছা-অনুসারে দিতে পারি নে। আমাদের ভিতরে সব চেয়ে যা গভীরতম উচ্চতম অন্তরতম সে আমাদের আয়ত্তের অতীত ; তা আমাদের দান-বিক্রয়ের ক্ষমতা নেই ; মূল্য নিয়ে বিক্রি করতে চেষ্টা করলেই তার উপরকার আবরণটি কেবল পাওয়া যায়, আসল জিনিষটি হাত থেকে সরে যায়। নিজের যা সর্বোৎকৃষ্ট তা ক'জন লোক পৃথিবীতে রেখে যেতে পেরেছে? ক'জনই

বা তাকে নিজে ধরতে পেরেছে? সেই জন্যেই তো আমি জীবন-চরিতে বিশ্বাস করি নে। আমরা দৈবক্রমে প্রকাশ হই, আমরা ইচ্ছা করলে চেষ্টা করলেও প্রকাশ হতে পারি নে— চব্বিশ ঘণ্টা যাদের সঙ্গে থাকি তাদের কাছেও আপনাকে ব্যক্ত করা আমাদের সাধ্যের অতীত। তুই আমাকে অনেক দিন থেকে জেনে আসছিস ব'লেই যে তোর কাছে আমার মনের ভাব ভালো করে ব্যক্ত হয় তা নয়; তোর এমন একটি অকৃত্রিম স্বভাব আছে, এমন একটি সহজ সত্যপ্রিয়তা আছে যে, সত্য আপনি তোর কাছে অতি সহজেই প্রকাশ হয়। সে তোর নিজের গুণে। যদি কোনো লেখকের সব চেয়ে ভালো লেখা তার চিঠিতেই দেখা দেয় তা হলে এই বুঝতে হবে যে, যাকে চিঠি লেখা হচ্ছে তারও একটি চিঠি লেখাবার ক্ষমতা আছে। আমি তো আরও অনেক লোককে চিঠি লিখেছি, কিন্তু কেউ আমার সমস্ত লেখাটা আকর্ষণ করে নিতে পারে নি। তার একটা প্রধান কারণ হচ্ছে এই যে, নানান লোকের নানান ধরণ, নানান রকম-সকম, সেই রকম-সকম-গুলোকে বাঁচিয়ে চলতে হয়। ধরণ-ধারণ-ওয়ালা মানুষের কাছে কথাবার্তাগুলো সহজেই বেঁকেচুরে প্রকাশ পায়— তারা নিজেও সমস্ত জিনিষ নিজের ধরণে দেখে এবং তাদের নিকটবর্তী সকলেও তাদের কাছে কেবল তাদেরই মাপে আপনাকে প্রকাশ করে। তোর অকৃত্রিম স্বভাবের মধ্যে একটি সরল স্বচ্ছতা আছে, সত্যের প্রতিবিম্ব তোর ভিতরে বেশ অব্যাহতভাবে প্রতিফলিত হয়। সেই জর্মন মেয়েটি যে তোর কাছে তার মনের সমস্ত গভীর ভাব ব্যক্ত ক'রে সুখী হয়, তোর স্বাভাবিক প্রশান্ত স্বচ্ছতাই তার কারণ। সহজে সত্য আকর্ষণ করে নেবার ক্ষমতাটি তোর আছে। সত্য মানে হচ্ছে অকৃত্রিম ভিতরের কথাটি, যে কথাটি সব সময়ে আমরা নিজেও জানতে পারি নে— কেবল গল্প-গুজব আলাপ-পরিচয় হাসি-তামাসা নয়।

বায়্‌রন মূর'কে যে-সমস্ত চিঠিপত্র লিখেছিল তাতে কেবল বায়্‌রনের স্বভাব প্রকাশ পায় নি, মূরের স্বভাবও প্রকাশ পেয়েছে— সে-সব চিঠি যত ভালোই হোক তাতে বায়্‌রনের আন্তরিক স্বভাব সম্পূর্ণ প্রকাশ পায় নি, মূরের স্বভাবের উপর প্রতিহত হয়ে সে এক বিশেষ মূর্তি ধারণ করেছে। যে শোনে এবং যে বলে এই দুজনে মিলে তবে রচনা হয়—

'তটের বুকে লাগে জলের ঢেউ,
তবে সে কলতান উঠে।
বাতাসে বনসভা শিহরি কাঁপে,
তবে সে মর্মর ফুটে।'

সাতারা
১১ অক্টোবর ১৮৯৪

১৬১

কলকাতা

৯ অক্টোবর। ১৮৯৪।

শাস্ত্রে আছে অনেকগুলি আবরণের দ্বারা আমরা নির্মিত। যথা, অন্নময় কোষ, প্রাণময় কোষ, মনোময় কোষ, বিজ্ঞানময় কোষ এবং আনন্দময় কোষ। আমি যখন কলকাতায় থাকি তখন অন্নময় প্রাণময় কোষটাই প্রবল হয়ে উঠে অন্য সমস্ত সূক্ষ্ম কোষগুলিকে অভিভূত করে ফেলে। বাংলাদেশের অধিকাংশ লোকের মতো খাইদাই, ঘুমোই বেড়াই, গল্প করি, নিত্যনিয়মিত জড় অভ্যাসের জালে প্রতিদিন জড়ীভূত হয়ে পড়ি— ভাববার, অনুভব করবার, কল্পনা করবার, মনের ভাব প্রকাশ করবার অবসর এবং উত্তেজনা অল্পে অল্পে চলে যায়— সমস্ত যেন ভাত-চাপা পড়ে যায়। অবশ্য ভিতরে ভিতরে দিন-রাত্তির একটা অবিশ্রাম খুঁৎখুঁৎ চলতে থাকে— জড়ত্বের ভার প্রতি মুহূর্তেই দুর্বহ হয়ে ওঠে। সাদাসিধা রকমের খাওয়া পরা এবং উচ্চ রকমের ভাবাচিন্তা এইটেই বাস্তবিক আমার মনের আদর্শ। আরাম এবং সাজসরঞ্জাম এবং ছোটোখাটো নিয়মিত অভ্যাস আমাকে যেন গরম রাত্রে পালক-ভরা লেপের মতো হাঁপ ধরিয়ে দিতে থাকে। চতুর্দিকটা বেশ সাদাসিধা ফাঁকা হলে মনের জন্যে অনেকখানি জায়গা পাওয়া যায়, নইলে যতই জিনিষ-পত্র চাকর-বাকর উদ্যোগ-আয়োজন বাড়তে থাকে ততই মানসিক দৃষ্টির পার্‌স্‌পেক্‌টিভ অবরুদ্ধ হয়ে যায় এবং আনন্দের চেয়ে আরামটাই প্রচুর হয়ে ওঠে। জাপানিদের গৃহসজ্জা যেরকম শোনা যায়— ধব্‌ধবে পরিষ্কার একটিমাত্র মাদুর, দেয়ালের একটি ফুলদানিতে একটিমাত্র পুষ্পমঞ্জরী, আর কোনো-কিছু আসবাবের ভিড় নেই— সে আমার মনে করতে বেশ লাগে। যদি চোখের সুখ দিতে চাও তবে এমন বন্দোবস্ত করো যাতে জানলাটি খুলে আকাশটি অবারিত এবং চারি দিকটি গাছপালায়

মনোরম দেখতে পাওয়া যায়। নিজের শরীরের চারি দিকেই অর্থহীন জিনিষপত্রের ঘেঁষাঘেঁষিটা বড়ো শ্রান্তিজনক— কারণ, জিনিষপত্র কর্তা হয়ে উঠলে মনের পক্ষে সেটা বড়োই অসহ্য। আমি তো এখান থেকে পালাই-পালাই করছি। শীঘ্রই বোলপুরে যাব সংকল্প করেছি। আমি বেশ বুঝতে পারছি সেখানে যখন সেই গাড়িবারান্দার ছাতের উপর বড়ো কেদারা পেতে একলাটি শরতের সন্ধ্যালোকে বোলপুরের দিগন্তপ্রসারিত সবুজ মাঠের উপর আমার অন্তঃকরণের সমস্ত ভাঁজ-গুলি খুলে দিয়ে তাকে বিস্তৃত করে দিতে পারব তখন অগাধ শান্তিরসে আমার সমস্ত জীবন অভিষিক্ত হয়ে উঠবে।

সাতারা

১৩ অক্টোবর ১৮৯৪

১৬২

কলকাতা

বুধবার ?

১১ অক্টোবর। ১৮৯৪।

আজ শরৎকালের সুন্দর সকাল বেলাটা চুপচাপ করে কৌচে পড়ে কাটিয়েছি— আমার টবের গাছপালাগুলোকে কাঁপিয়ে কাঁপিয়ে সুন্দর বাতাস এসে গায়ে লাগছিল। আমার ভারী ইচ্ছা করছিল আমি এই রকম করে শুয়ে থাকি আর পাশের ঘর থেকে কেউ আপন ইচ্ছামত পিয়ানোতে একটার পর একটা বাজনা বাজিয়ে যায়। তার মধ্যে আমার সেই Chopinটাও থাকে। মনের ভিতর এই রকম যে-একটা ইচ্ছা জন্মায়, সেই ইচ্ছাটা অপরিতৃপ্ত থাকলেও তার ভিতরে এক রকম সুখ আছে। সব চেয়ে কষ্টের অবস্থা— যখন মনেতে ইচ্ছাও জন্মায় না। মনটা যখন অসাড় জড়বৎ হয়ে যায়। প্রকৃতির মধ্যে সর্বদা যে-একটি বাজনা বাজছে আমাদের মনের ভিতরে সেইটেই বিচিত্র ব্যাকুল ইচ্ছা-আকারে সংগীত রচনা করে – সেই ইচ্ছাগুলির একটি সুন্দর রাগিণী আছে, খুব কোমল-সুর-ওয়ালা সকাল বেলাকার গানের মতো— সেই রাগিণীর দ্বারা সেই অতৃপ্ত ইচ্ছাগুলির বিষাদটিও সান্ত্বনাময় লাবণ্যময় হয়ে ওঠে। যখন বিশ্বপ্রকৃতির সেই বীণাধ্বনি মনের অত্যন্ত ছায়াময় দূর দূরান্তর পর্যন্ত সকরুণ হা হা স্বরে প্রতিধ্বনিত হয়ে না ওঠে তখনি মনটা যথার্থ নিরানন্দ নিশ্চেষ্ট নির্জীব হয়ে পড়ে। তখন মনের বিশেষ কোনো বেদনা না থাকতে পারে, কিন্তু তার ভারটা জগদ্দল পাথরের মতো চেপে থাকে।......

বীণটা ভারী চমৎকার বাজিয়েছিল। অনেকটা সেই বদ্রির মতো —মুচড়ে-মুচড়ে নিংড়ে-নিংড়ে কাঁদিয়ে-কাঁদিয়ে সুর বের করতে লাগল — এক-একবার সরু মোটা সব ক'টা তারের প্রবল ঝংকারে মনের এক দিক থেকে আর-একটা দিক পর্যন্ত দ্রুতপদে অনেকগুলো ঢেউ তুলে

দিয়ে চলে গেল, আবার খানিক বাদে অত্যন্ত মৃদু করুণ মিলিতপ্রায় মর্মরধ্বনিতে দুখানি সুকোমল করতল দিয়ে মনের সর্বশেষ প্রান্ত পর্যন্ত সমস্ত ঢেউগুলিকে যেন সমান মসৃণ করে দিয়ে গেল। যন্ত্রটা যে কত রকমের কথা কইতে লাগল তার সব কথা কে বুঝতে পারবে— একেবারে যেন বুকের ভিতরে মুখ দিয়ে তার যা-কিছু বলবার ছিল সমস্ত বলে গেল— এক-একবার যখন মোটা তারটার পুরুষকণ্ঠোচিত গাম্ভীর্যের ভিতর থেকে একটা উদার করুণা ভেঙে ভেঙে পড়তে লাগল তখন মনে হতে লাগল সংসারের সমস্তই সম্পূর্ণ মিথ্যা এবং মিথ্যা ব'লেই এমন অনন্তবেদনাময় এবং এমন অসীমসুন্দর, তাই তার মধ্যে এত রাগিণী এবং এত মূর্ছনা। ... ...

কাল রাত জেগে আজ সকাল বেলায় সর্বাঙ্গে একটি ক্লান্তি নিয়ে কৌচে পড়ে ছিলুম— তাই অর্ধনিমীলিত চোখে রোদ্দুর এবং গাছের কম্পন এবং শ্রান্ত শরীরে বাতাসটি খুব মিষ্টি লাগছিল। আজ শরতের সকালটি প্রতিমাবিসর্জন এবং উৎসবের স্মৃতি -দ্বারা পূর্ণ হয়ে যেন ছল্ ছল্ করছিল ; যেন যে-সমস্ত নহবতের বাজনা থেমে গেছে তারা আজ নীরবভাবে সমস্ত নির্মল আকাশে ব্যাপ্ত হয়ে রয়েছে এবং উৎসব-আনন্দের অবসানে যে-একটি দীর্ঘনিশ্বাসজড়িত কর্মবিহীন ক্লান্তি এবং অবসাদ উপস্থিত হয় তাই আজ শরতের রৌদ্রে মিশ্রিত বিস্তৃত হয়ে সমস্ত জল স্থল আকাশকে একটি নিস্তব্ধ বিষাদে মণ্ডিত করে রেখেছে।

সাতারা

১৫ অক্টোবর ১৮৯৪

কলকাতা

১৭ অক্টোবর। ১৮৯৪।

কাল 'ব…র' সঙ্গে 'মেয়েলি ছড়া' প্রবন্ধ নিয়ে কথা হচ্ছিল। তিনি বলছিলেন, অমন একটা তুচ্ছ উদ্দেশ্যবিহীন বিষয় নিয়ে আমি কেন সাধারণের কাছে বক্তৃতা দিতে গেলুম তিনি বুঝতে পারেন নি। আমি বললুম, কালিদাস শকুন্তলা কেন লিখেছিলেন এবং সেটা আজ পর্যন্ত কেন টিকে আছে? আমাদের চার দিকে যে-সমস্ত ছোটো বড়ো জিনিষ আছে এবং প্রতি মুহূর্তে এসে পড়ছে তাদের কত রকম ভাবে দেখা যেতে পারে, তাদের ভিতর থেকে কত রকম সুখ আবিষ্কার করা যেতে পারে—এইটেই হচ্ছে মানুষের সব-প্রধান চর্চার বিষয়। যে শিক্ষায় মানুষের মনকে সচেতন করে দেয়, বিশ্বসংসারকে নানাভাবে অনুভব করবার শক্তি সঞ্চার করে, সেইটেই হচ্ছে মানুষের পক্ষে খুব একটা মূল্যবান শিক্ষা। সাহিত্যে আর কোনো প্রত্যক্ষ ফল নেই, কিন্তু সে মানুষের প্রকৃতিকে সব দিকে সচতেন করে তোলে—তার অর্থ, সে মানুষের প্রকৃতিকে বৃহৎ করে দেয়, পূর্বে যেখানে তার কোনো অধিকার ছিল না সেখানেও তার অধিকার বিস্তার হতে থাকে। প্রাপ্ত ফলের অপেক্ষা পাবার শক্তিটা ঢের বড়ো—সেই জন্যে সাহিত্যে অবলম্ব্য বিষয়ের দিকে ততটা বেশি মনোযোগ দেয় না যেমন তার রচনার দিকে, কল্পনার দিকে, প্রকাশের দিকে। কিন্তু এ সমস্ত কথা ব… ঠিক বুঝতে পারলেন কি না ঠিক বলতে পারি নে।

সাতারা

২১ অক্টোবর ১৮৯৪

১৬৪

বোলপুর

১৮ অক্টোবর। ১৮৯৪।

কাল সন্ধের সময় বোলপুরে এসে উপস্থিত হয়েছি। আজ ভোরে উঠে স্নান করে দক্ষিণের ঘরে এসে বসেছি, আমার মনের সমস্ত গ্লানি যেন দূর হয়ে গেছে। সকাল বেলাটি এমনি গভীর নিস্তব্ধ এবং সুন্দর এবং উজ্জ্বল যে, আমার মনে হচ্ছে আমার মনটা যেন একটি স্বচ্ছ এবং শীতল আলোকের মধ্যে সুগভীর ভাবে অবগাহন করে নির্মল নিরাময় হয়ে উঠছে। আমার পাশে একটি প্লেটের উপর শৈশবের মতো নবীন এবং যৌবনের মতো পরিস্ফুট রাশীকৃত শিউলিফুল রেখে দিয়েছে— বারান্দার উপর শরতের রৌদ্র এসে পড়েছে, বিছানার চাদরটি সাদা ধব্‌ধব্‌ করছে, সমস্ত পরিষ্কার এবং ফাঁকা, লোকজনের ভিড় নেই, নিত্যনৈমিত্তিক কাজ নেই, পাখির ডাক শোনা যাচ্ছে, সামনে তরুশ্রেণীর অবকাশপথে অনেকখানি সবুজ মাঠ চোখে পড়ছে। সিম্‌লের সেই রৌদ্রোত্তপ্ত বারান্দাটিতে গিয়ে দাঁড়ালে পল্লবভূষণা নীলাম্বরী প্রকৃতি ঠিক যেমন একেবারে চোখের বুকের কোলের সামনে এসে দেখা দিত, এখানকার এই দক্ষিণের ঘরটিতে বসেও ঠিক সেই-রকমটি মনে হচ্ছে। সমস্তটা ঠিক সেই রকমটি নয়, কিন্তু মনের মধ্যে সেই শান্তি এবং সৌন্দর্যের ভাবটি অবতীর্ণ হচ্ছে। মনে হচ্ছে তোরা যেন সেই রকম পাশের ঘরে রয়েছিস, তোদের স্নেহ এবং তোদের সেবা আমার জন্যে প্রস্তুত হয়ে রয়েছে। আমার পক্ষে তোদের সেই স্নেহ এখন প্রকৃতির মধ্যে মিশে গেছে— এই শরৎপ্রভাতের মৃদুশীতল বাতাসের মধ্যে তোদের সেই সেবাপূর্ণ স্নেহকরস্পর্শ রয়ে গেছে।— চারি দিকে কী গভীর নিস্তব্ধতা [বব]! অনন্ত নির্মল স্নিগ্ধ নীলাকাশ যেন কেবল একলা আমার অন্তরাত্মাকে নীরবে আলিঙ্গন করে রয়েছে। আর এই শিউলি ফুলগুলির সুকোমল সরস শুভ্রতা আমার দুই

চোখের উপর স্নেহ বর্ষণ করছে। আমাকে যদি আমার দেবতা আমার সমস্ত কর্মশৃঙ্খল থেকে বিচ্ছিন্ন করে এইখানে নির্বাসিত করে দেন, তা হলে বেশ ধীর শান্তভাবে বাহিরের আকাশ এবং আপন অন্তরের মধ্যে সম্পূর্ণ নিমগ্ন হয়ে আপনার কাজ করে যেতে পারি। ··· ··· ঘরের জাজিমের উপর লুটিয়ে প'ড়ে একটা পেন্সিল এবং খাতা হাতে একটা কোনো রচনার মধ্যে প্রবেশ করতে ইচ্ছা করছে। সকাল বেলাটি বেশ স্নিগ্ধ এবং নবীন আছে, এই বেলা আরম্ভ করে দেওয়াই ভালো। ··· ··· মন এমন পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে যে তাকে যেন স্পর্শ-দ্বারা অনুভব করতে পারছি, তার ধ্বনি খুব নিকটে শোনা যাচ্ছে।

সাতারা
২২ অক্টোবর ১৮৯৪

১৬৫

বোলপুর

শুক্রবার, ১৯ অক্টোবর। ১৮৯৪।

কাল কেবল বিছানায় উপুড় হয়ে পড়ে একখানি ছোটো কবিতা লিখেছি এবং একটি তিব্বত-ভ্রমণের বই পড়েছি। এই রকম নির্জন জায়গায় একলা বসে ভ্রমণের বই পড়তে আমার ভারী ভালো লাগে। এ রকম জায়গায় নভেল আমি ছুঁতে পারি নে। এই জনশূন্য মাঠের মধ্যে, শালবনের ভিতর, সমস্ত-দরজা-খোলা জাজিম-পাতা দোতলার একলা ঘরে, পাখিদের করুণকলধ্বনিপূর্ণ স্বপ্নাবেশময় শরৎ-মধ্যাহ্নে বিলিতি নভেল কোনোমতেই খাপ খায় না। ভ্রমণবৃত্তান্তের একটা মস্ত সুবিধা এই যে, তার মধ্যে অবিশ্রাম গতি আছে, অথচ প্লটের বন্ধন নেই— মনের একটি অবারিত স্বাধীনতা পাওয়া যায়। এখানকার জনহীন মাঠের মাঝখান দিয়ে একটি রাঙা রাস্তা চলে গেছে— সেই রাস্তা দিয়ে যখন দুই-চার জন লোক অথবা দুটো-একটা গোরুর গাড়ি অত্যন্ত মন্থর গমনে চলতে থাকে তার একটা ভারী আকর্ষণ আছে, বোধ করি তাতে করে চারি দিকের গতিহীন লোকহীনতা আরও বেশি করে ফুটিয়ে দেয়— মাঠ আরও ধূ ধূ করে ওঠে এবং মনে হয় এই মানুষগুলো যে কোথায় যাচ্ছে তার যেন আর ঠিকানা নেই। ভ্রমণ-বৃত্তান্তের বইও আমার এই মানসিক নিরালার মধ্যে সেই রকম একটি গতিপ্রবাহের ক্ষীণ রেখা অঙ্কিত করে দিয়ে চলে যেতে থাকে— তাতে করে আমার মনের সুবিস্তীর্ণ নিস্তব্ধ নির্জন আকাশটি আরও যেন বেশি করে অনুভব করতে পারি। ভ্রমণকারী একটি ফরাসী, সেই জন্যে সে ভ্রমণ করতেও জানে এবং লিখতেও জানে। এক জায়গায় পাহাড় থেকে হঠাৎ মরুভূমির মধ্যে এসে পড়ে লোকটার মনে 'sensation of the desert' ব'লে একটা ভাবের উদয় হয়েছিল— সেইখানে সে বলেছে পাহাড়-পর্বতের চেয়ে এই রকম প্রশস্ত মরুভূমি তার

লাগে ভালো : Solitude is a true balm, which heals up the many wounds that the chances of life have inflicted ; its monotony has a calming effect upon nerves made over-sensitive from having vibrated too much ; its pure air acts as a douche which drives petty ideas out of the head. In the desert too the mind sees more clearly, and mental processes are carried on more easily।— মন যখন সংসারক্ষেত্রে কর্মক্ষেত্রে থাকে তখন সে আপনার সমস্ত শক্তি সংহত করে অনেকটা ক্ষুদ্র মূর্তি ধারণ করে। কিন্তু সে যখন বিশ্রাম করতে চায় তখন তাকে শয়ন করাবার জন্যে দিক হতে দিগন্ত পর্যন্ত প্রকাণ্ড একটি শয্যা বিছিয়ে দেওয়া আবশ্যক হয়ে পড়ে— তখন সে একা একটি দেশ জুড়ে পড়ে থাকতে চায় ; তখন সমস্ত শহর ঘুরে সে আর জায়গা খুঁজে পায় না, অবারিত আকাশ এবং প্রান্তর এবং সমুদ্র না হলে তার আর চলে না। কোনো ইংরাজ ভ্রমণকারী এই sensation of the desertকে ঠিক সুখকর বলে মনে করত কিনা আমি সন্দেহ করি। ইংরাজ ভ্রমণ-কারীদের যতগুলো বই পড়েছি প্রায় সবগুলোতেই তাদের উদ্ধত পাশব প্রকৃতির এবং আত্মাভিমানের পরিচয় পাওয়া যায়। তারা অন্য জাতের প্রতি সুবিচার করতে এবং ভালোবাসা দিতে পারে না। অথচ বিধাতা এদের উপরে যত ভিন্ন জাতের ভার সমর্পণ করেছেন এমন আর কারও উপর করেন নি।

সাতারা

২৩ অক্টোবর ১৮৯৪

বোলপুর

শনিবার, ২০ অক্টোবর। ১৮৯৪।

কাল রাত্তির থেকে অল্প অল্প মেঘ করে আসছে। কিন্তু রোদ্দুরও আছে। আকাশের ধারে ধারে স্তূপাকার কালো মেঘ জমেছে এবং সূর্যালোকে তাদের পাড়গুলো শুভ্র জ্যোতির্ময় হয়ে উঠেছে। মাঠের চারি দিক নতুন আমন ধানের গাঢ় এবং সরস সবুজবর্ণ ধারণ করেছে, তার উপরে স্নিগ্ধ মেঘের আভা দেখাচ্ছে ভালো। মনে পড়ছে, আমি যখন প্রথম বাবামশায়ের সঙ্গে বোলপুরে আসি তখন আমার বয়স ন-দশ বৎসর হবে— তখন মাঠে ধান কিরকম দেখতে হয় কখনো চক্ষে দেখি নি, সেটা দেখবার জন্যে ভারী একটা কৌতূহল ছিল। রাত্তিরে বোলপুরে এসে পৌঁছলুম ; পাল্কি করে আসবার সময় দু দিকে ভালো করে চেয়ে দেখলুম না, পাছে সেই অস্পষ্ট আলোতেই কৌতূহলের খানিকটা নিবৃত্তি হয়। ভোরের বেলা উঠেই বাইরে এসে দেখলুম— চারি দিকেই মাঠ, কোথাও ধানের চিহ্ন নেই। জায়গায় জায়গায় মাটি খোঁড়া, শুনলুম সেই-সব জায়গায় চাষ হয়েছে। তখন মনের মধ্যে রাশীকৃত কৌতূহল ছিপি-আঁটা শ্যাম্পেনের মতো চাপা ছিল— এখন তো পৃথিবীর মোটামুটি সবই এক রকম দেখে নিয়েছি, কিন্তু তবু আনন্দের হ্রাস হয় নি, বরঞ্চ তার গাঢ়তা ঢের বেশি বেড়েছে। সেই প্রথম বোলপুর-দর্শনের কত কথাই মনে পড়ে। তখনো কবিতা লিখতুম। মনে ধারণা ছিল— খোলা আকাশে গাছের তলায় বসে কবিতা লিখলে ঠিক দস্তুরমত কবিত্ব করা হয়। তাই ভোরে উঠেই একখানা পুরোনো Letts' Diary এবং পেন্সিল হাতে বাগানের প্রান্তে একটি ছোটো নারকোল গাছের তলায় বসে 'পৃথ্বীরাজের পরাজয়' বলে একটা বীররসাত্মক কবিতা লিখেছিলুম। সেটা লিখতে দিন সাতেক লেগেছিল। কোথায় সে খাতা এবং সে কবিতা! তার

একটা লাইনও মনে নেই। কেবল মনে আছে বড়দাদা সেই কবিতাটা পছন্দ করেছিলেন। কবির যেরকমটি হওয়া উচিত সে সম্বন্ধে তখন আমার বিশেষ দৃষ্টি ছিল— দুপুর বেলায় মাঠের ভিতর খোয়াইয়ের মধ্যে একটা গুহার ছায়ায় পা ছড়িয়ে দিয়ে বসতুম, সামনে দিয়ে ক্ষীণ জলস্রোত বালির উপর দিয়ে বয়ে যেত, আপনাকে রীতিমত কবি বলে মনে হত। বুনো খেজুর গাছে ছোটো ছোটো খেজুর ফলে থাকত, সেগুলো খেতে আদবেই ভালো লাগত না, কিন্তু তবু মরুপ্রান্তরের মধ্যে বুনো গাছ থেকে বুনো ফল স্বহস্তে পেড়ে খাচ্ছি এই মনে করে একটা বিশেষ গর্ব অনুভব করতুম। এই খোয়াইয়ের মধ্যে আমানি-ডোবা বলে একটি ছোট্ট ডোবা ছিল, তার মধ্যে খুব ছোট্ট মাছ থাকত, কাপড়-চোপড় খুলে সেই ডোবার মধ্যে গিয়ে পড়তুম— মনে হত নির্ঝরের জলে স্নান করছি। কোনো লোকজন কেউ কোথাও নেই, কোনো বন্ধন নেই, শাসন নেই, মাঠের ভিতরকার সেই গুহাগুলোর মধ্যে সমস্ত দিন একলা আপন মনে কবিত্ব-খেলা করতুম —এক-একদিন ডাকাতের ভয় হত, কিন্তু সেই ভয়ের মধ্যেও কবিত্ব ছিল। এখনো কবিতা লিখি বটে, কিন্তু নিজেকে উপন্যাসে ইতিহাসে বর্ণনযোগ্য কবি ব'লে আর অনুভব করি নে— বরঞ্চ নিজের কবিতা পড়ে মনে হয় যেন সে কবিতা আমি নিজে লিখি নি : যেন আমি দৈবাৎ ভালো কবিতা লিখি, কিন্তু ইচ্ছা করলে ভালো কবিতা লিখতে পারি নে। আর কিছু না হোক, এখন গাছের তলায় বসে কবিতা লেখা আমার পক্ষে অসম্ভব ; মন চতুর্দিকে বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে।

যাই হোক, সেই Letts' Diaryটা যদি খুঁজে পাই তা হলে আবার একবার ভোরের বেলায় সেই নারকেল-তলায় বসে সেই 'পৃথ্বীরাজের পরাজয়'টা পড়ে দেখতে ইচ্ছে করে।

সাতারা
২৫ অক্টোবর ১৮৯৪

১৬৭

শান্তিনিকেতন

মঙ্গলবার, ২৩ অক্টোবর। ১৮৯৪।

পর্‌শু থেকে খুব অল্প অল্প শীত পড়ে চারি দিক আরও যেন প্রফুল্ল হয়ে উঠেছে। বাতাসের ভিতর থেকে সেই ক্লান্তির ভাবটা চলে গেছে। সকাল বেলায় স্নান করে সাফ কাপড়টি পরে এসে বসে যখন গায়ে এই প্রভাতের ঠাণ্ডা বাতাসটি লাগতে থাকে তখন সর্বাঙ্গে আরও যেন খানিকটা নির্মলতার সঞ্চার হয়— চোখের উপরে যে আলোটি এসে পড়ে মনে হয় স্নিগ্ধ শিশিরে অভিষিক্ত এবং শিউলি ফুলের সুশীতল গন্ধে পরিপূর্ণ। আকাশ নীল, গাছপালাগুলি ঝল্‌মল্‌ করছে, মাঠের মাঝে মাঝে সবুজ ধানের ক্ষেত রৌদ্রে কোমল পাণ্ডু আভায় মণ্ডিত হয়েছে, বাতাস কতদূর থেকে অবারিত বেগে শিশিরসিক্ত তৃণাগ্রভাগ চুম্বন করে চলে আসছে তার সন্ধান নেই— শূন্য মাঠের মাঝখানে জনহীন রাঙা বাঁকা রাস্তাখানি কোথা দিয়ে কোথায় চলে গেছে তার শেষ দেখা যাচ্ছে না— আমি এরই মাঝখানে হেমন্তের তুষারনির্মল আলোকপ্লাবনের মধ্যে নিমগ্ন হয়ে, শিশিরস্নিগ্ধ বাতাসের দ্বারা সর্বাঙ্গমনে অভিনন্দিত হয়ে, সম্মুখে একটি-প্লেট স্তূপাকার শিউলি ফুল নিয়ে পুলকিত হয়ে বসে আছি— আমাকে কেউ বিরক্ত করবার নেই, দোতলার তিনটি ঘর সম্পূর্ণ আমার এবং দিবসের অষ্টপ্রহর আমার স্বাধীন অধিকারের মধ্যে। মাঝের বড়ো ঘরের বিস্তীর্ণ ধব্‌ধবে বিছানাটি তাকিয়া বালিশ নিয়ে আমার আরামের জন্যে অপেক্ষা করে আছে— আমার নিজেকে নবাব বলে বোধ হচ্ছে। মনে আছে স··· আমাকে বলেছিল, 'মুসলমান নবাবদের মতো তোমার মধ্যে একটা বিলাসের ভাব আছে।' কথাটা সম্পূর্ণ সত্য নয়; অর্থাৎ আমার নবাবি মানসিক নবাবি— সেখানে আমি আপনার রাজত্বে কোনো রকম বাধা রাখতে চাই নে, সেখানে

আমার অপ্রতিহত অধিকার চাই। কিন্তু নবাবরা যেরকম নবাবি করত তাতে সেই মানসিক নবাবির ব্যাঘাত হ'ত; তাতে এত জিনিষ-পত্র লোক-লস্কর সাজ-সরঞ্জামের আবশ্যক হত যে বস্তুরাশিতে মনকে নিশ্বাস রোধ করে বিনাশ করে ফেলত। আমি বস্তুর উপদ্রব এড়াবার জন্যে পালিয়ে পালিয়ে বেড়াই— প্রমোদের উত্তেজনার মধ্যে থাকলে আমার অন্তঃকরণ ভিতরে ভিতরে বিদ্রোহী হয়ে ওঠে; আমার মনের অন্তঃপুরের ভিতরে যেন কে একজন আছে, যে আমাকে বাইরের সংশ্রবে আসতে দেখলে ঈর্ষান্বিত হয়ে ওঠে।

সাতারা
২৭ অক্টোবর ১৮৯৪

১৬৮

। শান্তিনিকেতন ।

বুধবার, ২৪ অক্টোবর । ১৮৯৪ ।

সত্যি কথা বলতে কী, যখন একবার বিষয়কার্যের মধ্যে ভালো করে মনোনিবেশ করা যায় তখন তার একটা নেশা ক্রমে মনটাকে অধিকার করে নেয়। বহুবিধ পরামর্শ উপায়চিন্তা এবং ভবিষ্যৎ-ভাবনায় বেশ এক রকম ভোর হয়ে যেতে হয়। যখন নারকেল-কুঞ্জে বসে ছেঁড়া Letts' Diary নিয়ে 'পৃথ্বীরাজের পরাজয়' লিখতুম তখন বোধহয় এমন একটা অকবিজনোচিত কথা স্বীকার করতে লজ্জা বোধ হত। কিন্তু ভাবপ্রকাশই কী আর বিষয়কর্মই কী, দুয়ের ভিতরে একটা ঐক্য আছে এবং সেইখানেই আনন্দটা পাওয়া যায়। অব্যক্ত থেকে ব্যক্তি, অসমাপ্ত থেকে সমাপ্তি, chaos থেকে সৃষ্টি শৃঙ্খলা উদ্ভাবনা করার একটা মস্ত সুখ আছে। সমস্ত বাধা অতিক্রম করে মনের ভাবকে সুসমাপ্ত ভাষায় বিন্যাস করতে পারলে একটা সৃষ্টিসুখ পাওয়া যায়; সুবৃহৎ জমিদারি কার্যটাকেও ক্রমশ নিয়মে বদ্ধ এবং শৃঙ্খলায় পরিণত করতে পারলে সেইরকম সৃষ্টিসুখ লাভ করা যায়। আয় বাড়ছে ব'লে তো একটা সুখ থাকতেই পারে, কিন্তু তার চেয়ে বেশি সুখ একটা কার্য সম্পন্ন হচ্ছে বলে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আমি যদি ব্যারিস্টার কিম্বা সিভিলিয়ান হয়ে আসতুম তা হলে আমি আমার নির্দিষ্ট কাজের মধ্যে নিমগ্ন হয়ে যেতুম— সাহিত্যচর্চায় মন দেবার কোনো আবশ্যক অনুভব করতুম না। আইনের কূটমর্ম-উদ্ভাবন, বিপক্ষ পক্ষের যুক্তি-খণ্ডন, বিশৃঙ্খল সাক্ষ্যের মধ্যে থেকে একটা সুসংগত ইতিহাস এবং মত রচনা করে তোলা, এতেই আমার সমস্ত মন অহর্নিশি নিবিষ্ট থেকে একটা বিশেষ আনন্দ এবং আত্মবিস্মৃতি লাভ করত। ভাগ্যি আমি ব্যারিস্টর হয়ে আসি নি!

সাতারা
২৮ অক্টোবর ১৮৯৪

১৬৯

বোলপুর

২৫ অক্টোবর। ১৮৯৪।

কাল রাত্তির থেকে খুব ঘন বর্ষা করে এসেছে। কাল সমস্ত রাত্তির সবেগে বাতাস দিয়ে সশব্দে বৃষ্টি হয়ে গেছে— আজ সকাল বেলায় বাতাস নেই, কিন্তু সমস্ত আকাশ মেঘাচ্ছন্ন করে বৃষ্টি হচ্ছে। একে তো বোলপুর নির্জন, তাতে চতুর্দিকের আকাশমণ্ডপে কালো মেঘের পর্দা টেনে দিয়ে আরও গভীর নিভৃত বলে বোধ হচ্ছে। গাছের পাতার উপর বৃষ্টির ঝর্‌ঝর্‌ শব্দ শোনা যাচ্ছে। এমন দিনে কি হিন্দু মুসলমানের দাঙ্গা নিয়ে পোলিটিকাল প্রবন্ধ লিখতে ইচ্ছা করে! মনের ভিতরে একটা উতলা উন্মনা ভাব নিয়ে আজ প্রাতঃকাল থেকে পদরত্নাবলীর পাত ওল্টাচ্ছি— বৃন্দাবন-নামক বিরহমিলনের একটা মানসরাজ্যে দেখতে পাচ্ছি—

গগনহি নিমগন দিনমণিকাঁতি।
লখই না পারিয়ে কিয়ে দিনরাতি॥
চৌদিকে অথির পবন তরুদোল।
জগভরি শীকরনিকরহিলোল॥
চলইতে গোরি নগরপুরবাট।
মন্দিরে মন্দিরে লাগল কপাট॥

বর্ষার দিনে ঘরে ঘরে দ্বার বন্ধ, মেঘছায়াচ্ছন্ন বৃন্দাবনের জনশূন্য পথ দিয়ে গৌরী চলেছেন— অস্থির পবনে গাছপালা দুলছে এবং সমস্ত জগৎ ভরে বৃষ্টির ছাঁট উড়ে চলেছে— সূর্য কোথায় ডুবে আছে তার সন্ধান নেই, দিনে রাত্রে যেন একাকার হয়ে আছে। এই বৈষ্ণবপদগুলির মোহমন্ত্রটি যে কী সেইটি ব্যাখ্যা করে একটি প্রবন্ধ লেখবার ইচ্ছা আছে, কিন্তু সে আজ থাক্‌— আজ একটি অর্ধসমাপ্ত পোলিটিকাল্‌ প্রবন্ধ শেষ করতে হবে।··· লিখে যে কী ফল হবে তা

অন্তর্যামীই জানেন। ভগবদ্গীতায় আছে কর্মেই আমাদের অধিকার আছে, ফলে অধিকার নেই— অর্থাৎ, ফল পাব কি না পাব সে কথা না ভেবে কাজ করতে হবে। ফল পাব না মনে করেই আমাদের দেশে কাজ করতে হয়।

বেলা যত বাড়ছে বৃষ্টিও তত চেপে আসছে— বাদলার অন্ধকারে বেলা এগচ্ছে কি না ঠিক বোঝা যাচ্ছে না, সময় যেন আজ সমস্ত দিনের মতো ছুটি নিয়েছে। ছেলেবেলায় যখন নর্মাল ইস্কুলে পড়তুম এই রকম বাদলার দিনে ঘর অন্ধকার হয়ে যেত ব'লে পণ্ডিতমশায় পড়া বন্ধ করতেন— যদিও ক্লাশের বাইরে যেতে পারতুম না, তবু বই বন্ধ করে বৃষ্টির শব্দ এবং মেঘের অন্ধকার পুলকিতমনে উপভোগ করতুম। বোধ হয় তখনকার সেই অভ্যাস-বশত আজও এমন বাদলার দিনে কর্তব্য-নামক কঠিন ইস্কুল-মাস্টারের কাছ থেকে ছুটি নিয়ে সমস্ত পুঁথিপত্র বন্ধ করে দিয়ে আপনার মনে আপনার খেয়ালে থাকতে ইচ্ছা করে। কিন্তু সাধনা ছাপাখানায় দেবার সময় হয়ে এসেছে, এবং পোলিটিকাল প্রবন্ধটা আজ যেমন করেই হোক শেষ করতেই হবে।

সাতারা

২৯ অক্টোবর ১৮৯৪

বোলপুর

শুক্রবার [২৬ অক্টোবর ১৮৯৪]

তুই দূর থেকে যে মনে করেছিস, আমি আজকাল সাধারণের সঙ্গে মিলে মিশে, আলাপ আতিথ্য ক'রে খুব একজন দিগ্‌গজ পাব্লিক-ম্যান হয়ে উঠেছি সেটা অত্যন্ত ভুল। হাঁস এবং মাছ দুই ভিন্নজাতীয় জীব— যদিও হাঁস মাঝে মাঝে জলে ডুব মারে এবং মাছ মাঝে মাঝে আকাশে লাফিয়ে উঠে এক গ্রাস হাওয়া খেয়ে নেয়। দূর থেকে অনেক সময় মনে করি এবার আমি খুব লোকজনের সঙ্গে মিশে তাদের সমস্ত কাজের এবং আন্দোলনের মধ্যে আন্দোলিত হয়ে বেড়াব, কিন্তু সে কেবল কল্পনাতেই থেকে যায়। অনেক সময় যেমন কল্পনা করতে বেশ লাগে যে, খুব তরঙ্গিত সমুদ্রের বক্ষ বিদীর্ণ করে আমি পালের জাহাজে বায়ুভরে চলেছি— অথচ তরঙ্গিত সমুদ্রে মুহূর্তের মধ্যে সমস্ত অন্তরিন্দ্রিয় উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে ওঠে— তেমনি লোকসমুদ্রের আন্দোলনে মুহূর্তকাল থাকলেই আমার অন্তরাত্মা পীড়িত হয়ে ওঠে, তার পরে আবার দ্বিগুণ আগ্রহের সঙ্গে আপন নির্জনতার মধ্যে ফিরে আসতে হয়।... তুই লিখেছিস লোকের সঙ্গে মিশলে আমার পার্সোনাল্ ইনফ্লুয়েন্সের দ্বারা অনেকটা উপকার সাধন করতে পারি। কিন্তু পার্সোনাল্ ইনফ্লুয়েন্স্ ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতিতে ভিন্ন উপায়ে বিকীরিত হয়ে থাকে— কেউ বা সম্মুখে বর্তমান থেকে মুখের কথায় এবং চরিত্রের বলে লোককে অভিপ্রেত পথে নিয়ে যেতে পারে, কেউ বা অপ্রত্যক্ষ থেকে কেবল আপনার প্রকৃতির শ্রেষ্ঠ অংশকে সুন্দরভাবে প্রকাশ করে লোকের হৃদয় গ্রহণ করতে পারে। যাদের মনের উপরে সকল রকম শক্তিই কার্য করে, যাদের স্নায়ুতন্ত্রী ছোটো বড়ো সকল-প্রকার আঘাতেই ঝন্ ঝন্ করে বেজে ওঠে, তারা লোকসমাজের মাঝখানে থেকে কখনোই আপনার প্রভাব বিস্তার করতে পারে না,

বরঞ্চ তারা অনেক ক্ষতি করে এবং আপনার প্রভাব নষ্ট করতে থাকে — লোকসমাজ থেকে পালিয়ে গিয়ে তাদের নিজের সুখ দুঃখ বেদনা নিজের ভিতরে সম্পূর্ণ প্রচ্ছন্ন করে রেখে নিরাপদে নির্জনে প্রশান্তভাবে ইহজীবন কাজ করে গেলে তবে তাদের কাজের গৌরব রক্ষিত হতে পারে। নইলে তাদের জীবনের সহস্রবিরোধপূর্ণ সমস্যার সমন্বয় করে তাদের প্রকৃতির যথার্থ অর্থটুকু বুঝে নেবার জন্যে কার এত মাথাব্যথা! যারা অনেকটা পরিমাণে নির্লিপ্ত নিশ্চেতন হয়ে লোকের মাঝখানে থাকে তারাই লোকের উপর আপন প্রভাব বিস্তার করতে পারে। 'মায়ার খেলা'র সে গানটা এ স্থলেও খাটে—

তারে কেমনে ধরিবে, সখি, যদি ধরা দিলে!

সাতারা

৩০ অক্টোবর ১৮৯৪

খাতায় লেখা বা রবীন্দ্রনাথের লিখিত '২৬ কার্তিক ১৩০১' (১১ নবেম্বর ১৮৯৪, রবিবার) লেখায় ভুল সন্দেহ নাই, অপর পক্ষে ২৬ অক্টোবর (শুক্রবার) হইলে সাতারায় চিঠি পাওয়ার তারিখের সহিতও সংগতি হয়।

১৭১

বোলপুর

শনিবার

২৬ অক্টোবর ?। ১৮৯৪।

একে আমরা ভারতবর্ষীয় হিন্দু, তাতে আবার যদি মোটা হয়ে উঠি তা হলে একেবারে সশরীরে নির্বাণমুক্তি। আমি দেখেছি মনের ভিতর থেকে বৈরাগ্য এবং ঔদাসীন্যকে খেদিয়ে রাখতে সর্বদাই চেষ্টা করতে হয়। প্রায়ই এক-একবার ধ্যানের অবস্থা এসে কর্মের উৎসাহকে ম্লান করে দিয়ে যায়। আবার মুশকিল হয়েছে এই যে, জগৎসংসারে বৈরাগ্যটা খুব যুক্তিসংগত। সত্যই সমস্ত অনিত্য, মৃত্যু মানুষের জীবনের চেষ্টাকে প্রশান্ত হাস্যে পরিহাস করছে— একটা জাতি নিজের বংশপরম্পরাগত প্রকৃতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে কোনো-একটা বৃহৎ দুঃসাধ্য চেষ্টাকে সফল করে তুলতে পারে কিনা সন্দেহ। এই-সমস্ত ফিলজফি মনের মধ্যে আপনি উদয় হয়।

সাতারা

৩১ অক্টোবর ১৮৯৪

২৬ অক্টোবর শুক্রবার ছিল, বর্তমান পত্র শনিবারে লেখা হইয়া থাকিলে তারিখ ২৭ অক্টোবর হওয়াই সম্ভব।

১৭২

বোলপুর

২৮ অক্টোবর। ১৮৯৪।

এখনও আটটা বাজে নি, তবু মনে হচ্ছে যেন অর্ধরাত্রি, সমস্ত গভীর নিস্তব্ধ এবং নিষুপ্ত— কেবল ঝিল্লিধ্বনি শোনা যাচ্ছে। তোরা এখন কী করছিস আমি কিছুই জানি নে এবং কিছু কল্পনাও করতে পারি নে। পৃথিবীতে আমরা যাদের জানি সবাইকেই ফুটকি-লাইনে জানি ; অর্থাৎ মাঝে মাঝে অনেকখানি করে ফাঁক— সেই ফাঁকগুলো নিজের মনে যেমন তেমন করে পূরিয়ে নিতে হয়। যাদের মনে করি সব চেয়ে ভালো জানি তাদেরও সঙ্গে বহুল পরিমাণে নিজের কল্পনা মিশিয়ে নিতে হয়। কত জায়গায় ভাঙা পড়ে যায়, পথচিহ্ন লুপ্ত হয়ে যায়, অনিশ্চিত অস্পষ্ট এবং অন্ধকার থেকে যায়, তবু সৃজন-শক্তি-বিশিষ্ট মন সমস্ত ভাঙাচোরা জোড়া দিয়ে সমগ্র করে তুলে নিজের আয়ত্ত করে রাখতে চায়। খুব সুপরিচিত লোকেরাও যদি আমাদের কল্পনাসূত্রে গাঁথা ছিন্ন অংশ মাত্র হয় তা হলে কার সঙ্গে, কিসের সঙ্গেই বা আমার পরিচয় আছে— আমাকেই বা কে সম্পূর্ণ-ভাবে অবিচ্ছিন্ন রেখায় জানে? প্রত্যেক মানুষ কেবল তার ঈশ্বরের কাছেই সম্পূর্ণ, আর-সকলের কাছেই বিচ্ছিন্ন। কিন্তু হয়তো বিচ্ছিন্ন ব'লেই, হয়তো তাদের মধ্যে আমাদের নিজের কল্পনা যোজনা করবার স্থান আছে ব'লেই, তারা এক হিসাবে আমাদের বেশি অন্তরঙ্গ— সেই জন্যেই পরস্পর হয়তো অনেকটা মিশিয়ে নিতে পারি। নইলে অপরিচ্ছিন্ন ব্যক্তি হিসাবে বোধ হয় সকলেই অন্তর্যামী ছাড়া আর সকলের কাছেই দুষ্প্রবেশ্য। আমরা নিজেকেও অংশ অংশ করে জানি, কল্পনা দিয়ে পূরিয়ে নিয়ে একটা স্বরচিত গল্পের নায়ক করে নিই মাত্র— খণ্ড উপকরণ নিয়ে আমরা নিজেকে নিজে সৃষ্টি করে তুলব বলে বিধাতা এই বিচ্ছেদগুলি রেখে দিয়েছেন।

সাতারা। ১ নবেম্বর ১৮৯৪

১৭৩

বোলপুর

৩০ অক্টোবর। ১৮৯৪।

বোলপুরের মতো এমন সুগভীর শান্তি এবং বিরাম আর কোথাও পাওয়া যেত না। দার্জিলিঙের স্যানিটেরিয়মে বিপরীত ভিড়, পরগনাতেও কাজ এবং লোক এসে পড়ে, বোলপুরে কোনো কর্তব্যও নেই লোকের উপদ্রবও নেই— অবিশ্রাম পাখির গান ছাড়া শব্দটি নেই এবং কাঠবিড়ালি ছাড়া আমার দোতলায় আর কোনো প্রাণীই আসে না। দুপুরবেলায় ভ্রমরগুঞ্জনের মতো একটি গুঞ্জনধ্বনি শুনতে পাই— মনে হয় আমার জীবনের সমস্ত সুখস্মৃতি অত্যন্ত দূর থেকে তাদের বিচিত্র মিশ্রিত মর্মরধ্বনি বহন করে নিয়ে আসছে। দুপুর বেলাটি এমন সুগভীর নিস্তব্ধ নির্জন এবং পরিপূর্ণ যে, আমার সমস্ত অন্তঃকরণটিকে একেবারে আবিষ্ট করে রেখে দেয়— লিখি, পড়ি, ভাবি, যাই করি, এই সুবিস্তীর্ণ সুবৃহৎ সকরুণ মধ্যাহ্ন আমাকে নীরবে সস্নেহে বেষ্টন করে থাকে। আজকাল শীত পড়াতে হাত পা একটু ঠাণ্ডা হয়ে আসলেই দক্ষিণের বারান্দাটিতে গিয়ে বসি এবং মাতৃক্রোড়ের মতো প্রকৃতির একটি আতপ্ত স্পর্শে আমাকে আবৃত করে ফেলে ; পায়ের কাছে রোদ্দুরটি এসে পড়ে, সবুজ মাঠের অতি দূর নীলাভ প্রান্তটি পর্যন্ত দেখা যায়, চারি দিকের গাছপালা থেকে পতঙ্গদের একটি অশ্রান্ত গুন্ গুন্ শব্দ আসতে থাকে, মনে হয় যেন সকলের স্নেহ এবং সেবা চার দিক থেকে এসে আমার শরীরের মধ্যে জীবন সঞ্চার করে দিচ্ছে।

সাতারা

৩ নবেম্বর ১৮৯৪

১৭৪

বোলপুর

মঙ্গলবার ?

৩১ অক্টোবর। ১৮৯৪।

প্রথম শীতের আরম্ভে সমস্ত দিন ধরে যে-একটা উত্তুরে বাতাস দিতে থাকে সেইটে আজ সকাল থেকে আরম্ভ হয়েছে— বাতাসটা হী হী করতে করতে আসছে আর শ্রেণীবদ্ধ আমলকী গাছের পাতাগুলি হলদে হয়ে উঠে কাঁপতে কাঁপতে ঝরে ঝরে পড়ে যাচ্ছে এবং গাছের তলা একেবারে ছেয়ে ফেলছে— এই বাতাসে মুখের চামড়া শুকিয়ে যাচ্ছে এবং হাতের চামড়া থেকে খড়ি উঠছে। এখানকার বনরাজ্যের মধ্যে যেন জমিদারের পেয়াদা এসেছে— সমস্ত কাঁপছে এবং ঝরছে এবং দীর্ঘনিশ্বাসে আকুলিত হয়ে উঠছে। দুপুর বেলাকার রোদ্দুরটি বেশ লাগছে, এক-রকম বিশ্রামপূর্ণ ঔদাসীন্যে নিমগ্ন করে দিয়েছে, এবং ঘন আম্রবনের ভিতরে ঘুঘুর অবিশ্রাম কূজনে সমস্ত মাঠ এবং আকাশ এবং বাতাস এবং মধ্যাহ্নের স্বপ্নাতুর ছায়ারৌদ্রময় সুদীর্ঘ প্রহরগুলোকে যেন বিরহবিধুর করে তুলছে— আমার টেবিলের উপরকার ঘড়ির শব্দটাও মধ্যাহ্ন-প্রকৃতির সমস্ত মর্মরধ্বনির সকরুণ ঔদাস্যের সঙ্গে মিশে গেছে। আমার ঘরের ভিতরে সমস্ত দুপুর বেলাটা কেবল কাঠবিড়ালির ছুটোছুটি চলে। খাওয়া-দাওয়ার পর অনেক ক্ষণ পর্যন্ত অলসভাবে বসে বসে এই জন্তুগুলির বিচিত্র ভঙ্গি নিরীক্ষণ করে দেখা আমার প্রতিদিনের একটা নিয়মিত কাজের মধ্যে হয়ে গেছে। ফুলো ন্যাজ, কালো এবং ধূসর রেখায় অঙ্কিত রোমশ নরম গা, ছোট্ট দুটি কালো কৌটার মতো দুটি চঞ্চল চোখ, নিতান্ত নিরীহ অথচ অত্যন্ত ব্যস্তভাব— দেখে মনের মধ্যে ভারী একটা স্নেহের উদয় হয়। এই ঘরের কোণে লোহার-জাল-দেওয়া আল্‌মারির মধ্যে ডাল চাল পাঁউরুটি প্রভৃতি আহার্য দ্রব্যগুলি

এই-সকল লুব্ধস্বভাব চপল প্রাণীদের কাছ থেকে গোপন করে রাখা হয়— কৌতূহলপূর্ণ নাসিকাটি নিয়ে তারা সমস্তদিন এই আল্‌মারিটার চতুর্দিকে ছিদ্র অন্বেষণ করে বেড়াচ্ছে। যে-সব ডাল এবং চালের কণা আল্‌মারির বাইরে ছড়ানো থাকে সেইগুলি সন্ধান করে বের করে সামনের গুটিচারেক ছোটো তীক্ষ্ণ দন্ত দিয়ে কুট্‌কুট্‌ করে পরম তৃপ্তি-সহকারে আহার করা হয়— মাঝে মাঝে লাঙুলের উপর ভর দিয়ে সোজা হয়ে বসে সামনের দুটি ক্ষুদ্র হাত যোড় করে সেই ক্ষুদ্র শস্যকণাগুলিকে মুখের মধ্যে গুছিয়ে-গাছিয়ে জুত করে নেওয়া হয়— এমন সময় আমি একটু নড়েছি কি অমনি চকিতের মধ্যে ন্যাজটি পিঠের উপর তুলে দিয়ে দে-দৌড়— যেতে যেতে হঠাৎ একবার অর্ধপথে পাপোষটার উপর থেমে একটা পা তুলে ফস্‌ করে একটা কান চুলকে নিয়ে আবার এসে উপস্থিত— এমনি সমস্ত বেলাই কুট্‌কাট্‌ দুড়্‌দুড়্‌ এবং প্লেট কাঁটা চামচের মধ্যে টুংটাং ঝুন্‌ ঝুন্‌ চলছেই।···

এখান থেকে যেতে আমার মন-কেমন করছে— কলকাতায় ফিরে গিয়ে এখানকার প্রফুল্ল সকাল বেলা এবং নির্জন দুপুর বেলা আমার সর্বদাই মনে পড়বে— এখানকার শান্তি এবং সৌন্দর্যস্মৃতি আমাকে আকর্ষণ করতে থাকবে। কিন্তু কী করা যাবে! স্বার্থ-পরতাকে দমন করে প্রফুল্লচিত্তে কর্তব্যক্ষেত্রে যাওয়া যাক। ছেড়ে যাবার সময় সৌন্দর্যগুলো আরও যেন মনোহর হয়ে ওঠে। আজকের দিনটা এমনি একটি করুণাপূর্ণ রাগিণীতে আপ্লুত হয়ে উঠেছে।

সাতারা

৪ নবেম্বর ১৮৯৪

১৭৫

কলকাতা

১৯ নবেম্বর। ১৮৯৪।

ছেলেবেলা থেকে দেখেছি ঐ ফেরিওয়ালার হাঁকগুলো আমাকে কেমন একটু বিচলিত করে— নির্জন নিস্তব্ধ দুপুর বেলায় চিলের তীক্ষ্ণ ডাকটাও আমাকে ভারী আঘাত করত, অনেক দিন আর সেই ডাকটা কানে আসে নি। আজকালকার চিল যে ডাকে না তা বোধ হয় না, আমারই বোধ করি এখন অনেক চিন্তা এবং অনেক কাজ— প্রকৃতির সঙ্গে আর আমার সে রকম ঘনিষ্ঠ যোগ নেই। এক সময় ছিল একলা সমস্ত দুপুর বেলা চুপ করে তেতালার ঘরের দক্ষিণের দরজার কাছে কৌচে পড়ে কাটিয়ে দিয়েছি— তখন দীর্ঘ দুপুর বেলাকার প্রত্যেক শব্দটি কম্পনটি এবং ওর ভিতরকার সমস্ত করুণরসটুকু নিঃশেষে অনুভব করতুম। এখন অতখানি সময় ফেলে রাখা অসম্ভব; মনে হয় একটা কিছু পড়ি কিম্বা লিখি। যদি বা মনের গতিকে কোনো বিশেষ কাজ করতে প্রবৃত্তি না হয় তবু একটা কাজের চেষ্টা করতে হয়, নিদেন অন্যমনস্কভাবেও একটা বই পড়বার চেষ্টা করা দরকার হয়। এটা কিন্তু কলকাতায়। মফস্বলে গেলে চুপ করে চেয়ে বসে থাকলেও হৃদয় পরিপূর্ণ হয়ে আসে, কাজের অন্ধ দাসত্ব করতে হয় না। এক রকম কাজ আছে যা কর্তব্যবোধে কাজ, তার বিরুদ্ধে কিছু বলবার নেই, কিন্তু যখন উপস্থিত কোনো কাজ হাতে নেই কিম্বা কোনো কারণে ভালো করে কাজ সম্পন্ন করবার শক্তি নেই তখনও যদি কেবল অভ্যাসবশত কেবল সময়-যাপনের জন্যে একটা কাজ খুঁজে বেড়াতে হয়— তখনও যদি কেবল-মাত্র আপনাকে নিয়ে আপনি শান্তি না পাওয়া যায়, আপনার চতুর্দিক থেকে একটি সঙ্গ আকর্ষণ করতে না পারা যায়— তা হলে অবস্থাটা খারাপ হয়েছে বলতে হবে। কাজ একটা উদ্দেশ্যসাধনের

উপায় মাত্র। মানুষ তো আর কাজের যন্ত্র নয়। পরিপূর্ণ তৃপ্তির সঙ্গে বিরাম লাভ করবার যে শক্তি সেটুকু হারানো কিছু নয়— কারণ, সেটুকুর মধ্যে অনেকখানি উচ্চ-অঙ্গের মনুষ্যত্ব আছে। কাজ খুব ভালো জিনিষ সন্দেহ নেই— কিন্তু কাজের একটা সংকীর্ণতা আছে— তাতে মানুষকে আচ্ছাদন করে রাখে। দিন এবং রাত্রি কাজ এবং বিরামের ঠিক উপমা। দিনের বেলা পৃথিবী ছাড়া আমাদের কাছে আর কিছুই নেই— রাত্রে গ্রহনক্ষত্রমণ্ডলের মধ্যে অনন্ত জগতের সঙ্গে আমাদের যোগ স্থাপন হয়। কাজের সময় আমরা পৃথিবীর মানুষ, বিশ্রামের সময় আমরা জগতের লোক। যখন কাজ করব তখন যুক্তি তর্ক বিজ্ঞানের আলোকে পৃথিবীটাকে পরিষ্কার করে দেখে নেওয়া দরকার, যখন বিশ্রাম করব তখন পৃথিবীটাকে হ্রাস করে দেওয়াই দরকার— তখন অনন্তের সঙ্গে আমাদের যে অনন্ত যোগ আছে সেই-টাকেই বড়ো করে দেখা চাই। তখন সমস্ত কাজের চেষ্টাকে বহুদূরে রেখে দিয়ে পৃথিবীর সমস্ত শব্দ গন্ধ বর্ণ স্পর্শের মধ্যে যে-একটি নিত্য সৌন্দর্য যে-একটি অসীমতার আভাস আছে সেইটেকেই কায়মনে অনুভব করা চাই। এই দুটো ভাবের মধ্যে কোনোটাকেই বাদ দেওয়া উচিত হয় না। সকাল বেলা উঠে জানা চাই আমরা পৃথিবীর লোক এবং দিন অবসান হয়ে গেলে অনুভব করা চাই যে আমরা জগৎবাসী। যারা বড়ো বেশি কাজের লোক তাদের কাছে বৃহৎ জগৎটা চিরকাল গোপন থেকে যায়।

সাতারা

২৩ নবেম্বর ১৮৯৪

কলকাতা

মঙ্গলবার, ২০ নবেম্বর। ১৮৯৪।

কাল তোর চিঠিতে যে কথাটা উত্থাপন করেছিলুম তারই অনুবৃত্তি-স্বরূপে মনে হচ্ছে যে, দিনে এবং রাত্রে যেমন কাজ এবং বিরামকে ভাগ করে নিয়েছে, সাহিত্যে গদ্যে এবং পদ্যেও সেই রকম মানুষের ঐ দুটি অংশকে ভাগ করেছে। গদ্য পরিষ্কার কাজের এবং পদ্য সুবৃহৎ বিশ্রামের। সেই জন্যে পদ্যে আবশ্যক কথার কোনো আবশ্যক নেই। পদ্যে আমাদের জন্যে যে জগৎ সৃজন করে সে জগতের কাছে আমাদের দৈনিক সংসার অত্যন্ত লুপ্তপ্রায় দেখায়। তাই যদি না দেখাত তা হলে নিত্যসৌন্দর্যের জগৎ, ভাবজগৎ, আমাদের কাছে দৃষ্টিগোচর হত না। মানুষের জীবনে এই দুটো জিনিষই যখন সত্য, এবং দুটো সত্য যখন দিন এবং রাত্রির ন্যায় একসঙ্গে দেখবার উপায় নেই, তখন গদ্য পদ্য দুয়েরই আবশ্যক আছে। সেইজন্যে ছন্দে বন্ধে ভাষায় পদ্য প্রাত্যহিক সংসারের সমস্ত সংশ্রব দূর করে দিয়েছে, আবশ্যকের স্থানে সৌন্দর্যের অবতারণা করেছে— আমাদের আবশ্যক-ক্ষেত্রের সম্পূর্ণ বাইরেও-যে একটি অনন্ত আনন্দসমুদ্র অকূলের দিকে প্রসারিত রয়েছে সেই বার্তাটা নানা ভাবে এবং নানা ভঙ্গীতে দেবার চেষ্টা করেছে। এই গদ্য-পদ্যর ভেদ ও সেই প্রভেদের আবশ্যকতা সম্বন্ধে অল্পকাল হল [ঠাকুরদাস] মুখুজ্জের সঙ্গে আমার আলোচনা চলছিল। তাঁর মতে ভবিষ্যতে গদ্য এতদূর পর্যন্ত সুন্দর হয়ে উঠবে যে, পদ্যর বিশেষ প্রয়োজনীয়তা দূর হয়ে যাবে। কথাটা যদি বিশুদ্ধ তর্কের হত তা হলে অনেকটা সহজ হত, কিন্তু এর মধ্যে ভাবের কথা বহুল পরিমাণে আছে বলে মুখে মুখে বোঝানো বড়ো শক্ত হয়। আমি সংক্ষেপে কেবল বললুম —সমতল পৃথিবী সাধারণ সমস্ত কাজের পক্ষে অত্যন্ত উপযোগী এ কথা কেউ অস্বীকার করতে পারে না, কিন্তু অভিনয় করতে গেলে

একটা স্বতন্ত্র স্টেজের আবশ্যক করে ; দর্শকদের মাঝখানে নেবে এসে অভিনয় করলে তাদের মনে সেই বিভ্রমটা উৎপন্ন হয় না। অভিনয়ের বিষয়টাকে চতুর্দিক থেকে বিচ্ছিন্ন করে একটু উপরের দিকে উঠিয়ে দিয়ে আলোক এবং দৃশ্যপট এবং সংগীতের দ্বারা বেশ জাজ্জ্বল্যমান করে সম্মুখে ধরা চাই, তবে সেটা সমগ্রভাবে এবং স্বতন্ত্রভাবে কল্পনা-পটে মুদ্রিত হয়ে যায়। কবিতার ভাষা ও ছন্দ সেই স্টেজ এবং সংগীতের মতো— বিষয়টি সেই-সমস্ত সুন্দর বেষ্টনের দ্বারা বিচ্ছিন্ন হওয়াতেই আমাদের মনে এমন সমগ্রভাবে এবং প্রবলভাবে আঘাত করতে পারে, চারি দিকের দরিদ্র সংসার থেকে সৌন্দর্যলোকে আমাদের আকর্ষণ করে নিয়ে যেতে পারে, প্রথম দৃষ্টিতেই আমরা বুঝতে পারি যে এখন আমরা আমাদের কর্মক্ষেত্রের মধ্যে নেই— এক মুহূর্তেই প্রস্তুত হয়ে নিতে পারি। কিন্তু এ-সমস্ত কথা ঠিকটি বোঝানো শক্ত। ঠা [কুরদাস] বাবুও বোধ হয় আমার কথা মানলেন না। ভাবে বোধ হল তাঁর বিশ্বাস, আমার গদ্যে আমার পদ্যের চেয়ে ঢের বেশি কবিত্ব পরিস্ফুটভাবে প্রকাশ পায় এবং সেইটেই তাঁর মতে স্বাভাবিক। তিনি আমার শেষ দিককার লেখা কতকগুলি কবিতার বই চেয়েছেন— বোধ হয় কোনো প্রবন্ধে প্রমাণ করবেন যে আমার পদ্যই গদ্য এবং গদ্যই পদ্য।

সাতারা
২৪ নবেম্বর ১৮৯৪

কলকাতা। ২৯শে নবেম্বর

অ+ ওবাড়িতে তাদের একেবারে ঘরে বসে এসরাজে ভৈরবী-আলাপ করছে আমি আমার তেতলার কোণের ঘরে বসে সমস্ত শুনতে পাচ্ছি। তোর চিঠিতেও তুই মাঝিদের ভৈরবী-আলাপের কথা লিখেছিস। আজকাল সকালে দেখতে দেখতে বেলা দশটা এগারোটা দুপুর হয়ে যায় — দিনটা যতই উত্তপ্ত হয়ে উঠতে থাকে মনটাও তেমনি একরকম উদাসীন হয়ে আসে, তার উপর কানে যখন বারম্বার ভৈরবীর অদ্ভুত করুণ মিনতির মোচড় লাগতে থাকে তখন আকাশের মধ্যে রৌদ্রের মধ্যে একটা প্রকাণ্ড বিষাদ ব্যাপ্ত হয়ে যায়। কর্মক্লিষ্ট সন্দেহপীড়িত বিয়োগশোককাতর সংসারের ভিতরকার যে চিরস্থায়ী সুগভীর দুঃখটি — ভৈরবী রাগিণীতে সেইটিকে একেবারে বিগলিত করে বের করে নিয়ে আসে। মানুষে মানুষে সম্পর্কের মধ্যে যে একটি নিত্য শোক নিত্য ভয় নিত্য মিনতির ভাব আছে, আমাদের হৃদয় উদ্ঘাটন করে ভৈরবী সেই কান্নাটিকে মুক্ত করে দেয়, আমাদের বেদনার সঙ্গে জগদ্ব্যাপী বেদনার সম্পর্ক স্থাপন করে দেয়। সত্যিই ত আমাদের কিছুই স্থায়ী নয় — কিন্তু প্রকৃতি কি এক অদ্ভুত মন্ত্রবলে সেই কথাটিই আমাদের সর্বদা ভুলিয়ে রেখেছে — সেই জন্যেই আমরা উৎসাহের সহিত সংসারের কাজ করতে পারি — ভৈরবীতে সেই চিরসত্য সেই মৃত্যুবেদনা প্রকাশ হয়ে পড়ে — আমাদের এই কথা বলে দেয়, যে, আমরা যা কিছু জানি তার কিছুই থাকবেনা, এবং যা চিরকাল থাকবে তার আমরা কিছুই জানিনে। —

ইন্দিরাদেবীর অনুলিখনে
খাতার একটি পৃষ্ঠা

১৭৭

কলকাতা

২১ নবেম্বর। ১৮৯৪।

অ [ভিক্ষা ?] ও বাড়িতে তাদের এক তলার ঘরে বসে এস্‌রাজে ভৈরবী আলাপ করছে, আমি আমার তেতলার কোণের ঘরে বসে স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছি। তোর চিঠিতেও তুই মাটাঙ্গের ভৈরবী আলাপের কথা লিখেছিস। আজকাল সকালে দেখতে দেখতে বেলা দশটা-এগারোটা দুপুর হয়ে যায়— দিনটা যতই উত্তপ্ত হয়ে উঠতে থাকে মনটাও ততই এক রকম উদাসীন হয়ে আসে ; তার উপর কানে যখন বারম্বার ভৈরবীর অত্যন্ত করুণ মিনতির খোঁচ লাগতে থাকে তখন আকাশের মধ্যে, রৌদ্রের মধ্যে, একটা প্রকাণ্ড বৈরাগ্য ব্যাপ্ত হয়ে যায়। কর্মক্লিষ্ট সন্দেহপীড়িত বিয়োগশোককাতর সংসারের ভিতরকার যে চিরস্থায়ী সুগভীর দুঃখটি— ভৈরবী রাগিণীতে সেইটিকে একেবারে বিগলিত করে বের করে নিয়ে আসে। মানুষে মানুষে সম্পর্কের মধ্যে যে-একটি নিত্যশোক নিত্যভয় নিত্যমিনতির ভাব আছে, আমাদের হৃদয় উদ্‌ঘাটন করে ভৈরবী সেই কান্নাটিকে মুক্ত করে দেয়, আমাদের বেদনার সঙ্গে জগদ্‌ব্যাপী বেদনার সম্পর্ক স্থাপন করে দেয়। সত্যিই তো আমাদের কিছুই স্থায়ী নয় : কিন্তু প্রকৃতি কী এক অদ্ভুত মন্ত্রবলে সেই কথাটিই আমাদের সর্বদা ভুলিয়ে রেখেছে, সেইজন্যেই আমরা উৎসাহের সহিত সংসারের কাজ করতে পারি। ভৈরবীতে সেই চিরসত্য, সেই মৃত্যুবেদনা প্রকাশ হয়ে পড়ে ; আমাদের এই কথা বলে দেয় যে, আমরা যা-কিছু জানি তার কিছুই থাকবে না এবং যা চিরকাল থাকবে তার আমরা কিছুই জানি নে।

সাতারা

২৫ নবেম্বর ১৮৯৪

১৭৮

শিলাইদহ

শনিবার ?

২৫ নবেম্বর। ১৮৯৪।

গো··· এ যাত্রায় বেঁচে গেল। পরশু প্রায় সমস্ত রাত আমার ঘুম হয় নি। আমার বোটের পিছনেই তার নৌকো ছিল— মাঝে মাঝে তার কাতর শব্দ শুনতে পাচ্ছিলুম আর তার আসন্ন মৃত্যুর কথা ভেবে মনটা উদ্‌বিগ্ন হয়ে উঠছিল। তখন নিস্তব্ধ রাত্রি, আমার ঘর সমস্ত অন্ধকার। বিছানার মধ্যে পড়ে পড়ে মানুষের জীবন-মৃত্যুটাকে ভীষণ একটা রহস্যে আচ্ছন্ন বলে মনে হচ্ছিল— আমাদের চতুর্দিকে একটি নিস্তব্ধ নির্বাক্ অনন্তকাল দাঁড়িয়ে রয়েছে, এক-এক সময় তাকে বড়ো নিষ্ঠুর বলে মনে হয়। তার তুলনায় আমাদের প্রাণটুকু, আমাদের বৃহত্তম সুখদুঃখ, আমাদের মহত্তম আশা-আকাঙ্ক্ষা কত তুচ্ছ— আমি আজ মরি আর কাল মরি সে তার কাছে কিছুই নয়। আমি একলা মরি আর লক্ষ প্রাণী বন্যায় ভেসে যাক্ সেও তার কাছে কিছুই নয়। সূর্য একদিন তার সমস্ত সৌরজগৎ-সুদ্ধ নিবে গিয়ে, বরফে জমে গিয়ে, একেবারে মরে যাবে, সেও তার কাছে কিছুই নয়— এমন কত জগৎ আপন লক্ষকোটি বৎসরের জীবজননলীলা সম্বরণ করে আজ নির্বাপিত মৃত অবস্থায় আকাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে। পৃথিবীর স্তরে স্তরে কত লুপ্ত জীববংশের কঙ্কাল পড়ে আছে, আজ তাদের একটি বংশধরও বর্তমান নেই। তাই আমি বিছানার ভিতর পড়ে পড়ে ভাবছিলুম এই অনন্ত অন্ধকারের মধ্যে এই মুমূর্ষু মানুষটার হয়ে কার কাছে বলব ‘আহা, বেচারা বড়ো কষ্ট পাচ্ছে’ ? আমরা অক্ষম মানুষরা ছাড়া তার জীবনের মূল্য কে বোঝে! তার বেদনা কার কাছে সত্য! মৃত্যু যখন প্রত্যেক জীবের পক্ষে অনিবার্য অবশ্যসম্ভব ঘটনা তখন এমন অসহ্য কষ্ট পাবার কী আবশ্যক ছিল!

আমাদের যেগুলো নিতান্ত ব্যক্তিগত মর্মগত সুখ দুঃখ বাসনা, এক জায়গায় কোথাও তার একটা অনন্ত অবলম্বন আছে, একটা চিরন্তন সমবেদনার আধার আছে, এ কথা মনে না করলে সমস্তই এমন একটা নিষ্ঠুর প্রহসন বলে মনে হয়! মার কাছে তার ছেলের মৃত্যু অত্যন্ত দুঃসহ দুঃখের আকর, কিন্তু অনন্তের কাছে তার যদি কোনো অর্থই না থাকে তবে এ মায়া কেন! আমার কাছে আমার ভালোবাসা কতই নিরতিশয়, কিন্তু অনন্তের মধ্যে তার যদি কোনো স্থান না থাকে তবে তো সে স্বপ্নমাত্র! আমরা দেশের জন্যে প্রাণপণ করছি, মানুষের উন্নতির জন্যে প্রাণ দিচ্ছি। কিন্তু দেশ আমাদেরই কাছে দেশ, অর্থাৎ সমস্ত জগতের চেয়ে বড়ো— মানুষ আমাদেরই কাছে মানুষ, অর্থাৎ বিশ্বের সমস্ত জীবের চেয়ে বেশি— আমাদের বাইরে থেকে দেখতে গেলে এই ভাবগুলো এবং তার সঙ্গে আমাদের সমস্ত প্রাণপণ চেষ্টাগুলো নিতান্তই উপহাসের বিষয়। গো···র আসন্ন মৃত্যুটা আমার কাছে অত্যন্ত গম্ভীর অত্যন্ত গুরুতর বলে মনে হচ্ছিল; কিন্তু সে কেবলমাত্র আমি মানুষ ব'লে, আমি তার পরিচিত এবং নিকটবর্তী ব'লে— ওর ভিতরে কি সত্যকার কোনো গাম্ভীর্য এবং গৌরব আছে? এই তো পিঁপড়ে মরছে, মশা মরছে, তাকে আমরা এত তুচ্ছ মনে করি কেন? একটা পাতা শুকিয়ে পড়ে গেলে, একটা প্রদীপ বাতাসে নিবে গেলে, সেই বা শোকের কারণ কেন না হয়! সেও তো কম পরিবর্তন নয়। অনন্তের কাছে, একটা সৌরজগৎ নিবে যাওয়া, পাতা ঝরে যাওয়া, মানুষ মরে যাওয়া, সব সমান— অতএব আমাদের শোক এবং সুখদুঃখ সব আমাদেরই। আমার এক-এক সময় মনে হয় জগৎটা দুই বিরোধী শক্তির রঙ্গভূমি— একজন আমাদের মধ্যে থেকে নিত্য বাঁচবার চেষ্টা করছে, আর একজন তাকে নিত্য বধ করবার উদ্যম করছে— তা যদি না হত তা হলে মৃত্যু

আমাদের পক্ষে নিতান্ত স্বাভাবিক মনে হত, কিছুমাত্র শোচনীয় বোধ হত না— এক সময় এক রকম ছিলুম আর-এক সময় আর-এক রকম হয়ে গেলুম এটার সঙ্গে কোনো রকম দুঃখশোক বিস্ময় জড়িত থাকত না। কিন্তু আমাদের প্রকৃতির ভিতর থেকে বলছে 'বেঁচে থাকব', বলছে 'মৃত্যু আমার বিরোধী পক্ষ— তাকে জয় করতেই হবে'— অথচ কোনোকালে কেউ তাকে জয় করতে পারে নি। কিন্তু তবুও চেষ্টার ত্রুটি নেই। সেইজন্যেই মৃত্যুযন্ত্রণা, মৃত্যুশোক— বেঁচে থাকবার একটা চিরসম্ভাবনা আছে, মৃত্যু তাকে বারম্বার পরাভূত করছে।

সাতারা

৩০ নবেম্বর ১৮৯৪

১৭৯

শিলাইদহ

বুধবার, ২৮ নবেম্বর। ১৮৯৪।

প্রথম বৎসর যখন শিলাইদহ বোটে এসেছিলুম তখন যে রকম এ পারে বালির চরের সীমা দেখা যেত না, এবারে ঠিক সেইরকম চর পড়েছে। দিগন্তের শেষ সীমা পর্যন্ত সাদা বালির চর ধূ ধূ করছে ; তাতে না আছে ঘাস, না আছে গাছ, না আছে বাড়ি ঘর, না আছে কিছু— সেবারকার চরে মাঝে মাঝে বনঝাউ ছিল, এবার তাও নেই। এত বড়ো প্রকাণ্ড শূন্যতার ভাব চোখে না দেখলে ঠিক কল্পনা করতে পারবি নে। আকাশের শূন্যতা, সমুদ্রের শূন্যতা আমাদের অভ্যস্ত হয়ে গেছে, সেখানে আর-কিছু প্রত্যাশা করি নে : কিন্তু ভূমির শূন্যতাকে সব চেয়ে বেশি শূন্য বলে মনে হয়— কোথাও গতি নেই, জীবন নেই, বর্ণের বৈচিত্র্য নেই, কোমলতার আভাসটুকু মাত্র নেই— যেখানে শস্যে তৃণে তরুলতায় পশুপক্ষীতে ভরে যেতে পারত সেখানে একটি কুশের অঙ্কুর পর্যন্ত নেই— কেবল একটা উদাস কঠিন অসীম বৈধব্যের বন্ধ্যাদশা— পাশ দিয়ে পদ্মা নদী চলে যাচ্ছে, ও পারে ঘাট, বাঁধা নৌকো, স্নানরত লোকজন, নারকেল এবং আমের বাগান— সন্ধ্যাবেলায় নদীর ধারের হাট থেকে কলধ্বনি শোনা যায়, বহুদূরে পাবনার পারের তরুশ্রেণী ঘননীল রেখার মতো দেখা যায়— কোথাও গাঢ়নীল কোথাও পাণ্ডুনীল, কোথাও সবুজ, আর মাঝখানে ঐ রক্তহীন মৃত্যুর মতো ফ্যাকাশে সাদা— নিস্তব্ধ, নিশ্চেষ্ট, জনহীন। সন্ধ্যাবেলা সূর্যাস্তের সময় যখন আমি এই চরের উপর উঠে বেড়াই, সমস্ত অন্তঃকরণের একটা পরম প্রসারতা এবং অবাধ স্বাধীনতা অনুভব করি। কিছু নেই, কেউ নেই, কেবল আমি একলা। আমার যত কথা আছে সমস্ত আমি এই চিহ্নশূন্য বাধাশূন্য ধরণীর উপর ছড়িয়ে ছড়িয়ে ফেলতে পারি ; আমি আমার সঙ্গী, আমার সুখ, সমস্তই সৃজন

করে নিতে পারি। কাল আমি ভাবছিলুম, যখন আমাদের ইন্দ্রিয় কিছুই অনুভব করতে পারে না, আমাদের মনই সমস্ত অনুভব করে, ইন্দ্রিয় কেবল মনের কাছে উপস্থিত হবার দ্বার মাত্র, তখন ইন্দ্রিয়-সাহায্য-ব্যতিরেকেও আমাদের মনের সম্মুখে যা-কিছু উপস্থিত হয় তাকেই বা সত্য না মনে করি কেন? কিম্বা তার থেকেই বা সত্যের মতো সমান সুখ না পাই কেন? আমার বোধ হয় ওটা কেবল অভ্যাস মাত্র। আমরা প্রথম থেকেই ইন্দ্রিয়ের ভিতর দিয়েই সমস্ত অনুভূতিগুলি প্রাপ্ত হয়ে এসেছি। এখন যদিচ কল্পনার সাহায্যে মন স্বাধীনভাবে অনেক জিনিষ গড়তে পারে, তবু সমস্ত সুখদুঃখ ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে ভোগ না করলে স্পষ্টরূপে ভোগ করতে পারে না। যেমন, যদিও মন লেখে, কলম লেখে না, তবু যাদের বরাবর কলমে লেখা অভ্যাস তারা কলম হাতে নিয়ে যেমন ভাবগুলো গুছিয়ে নিতে পারে এমন মুখে মুখে পারে না। আমার স্পষ্ট মনে হয় আমরা যদি একটু মনঃসংযোগ করে সাধন করি, অভ্যাস করি, তা হলে কল্পনার সামগ্রীকে ইন্দ্রিয়গোচর সামগ্রীর মতো অত্যন্ত নিকট অত্যন্ত অধিগম্যরূপে উপলব্ধি করতে পারি। দুর্ভাগ্যক্রমে সকল সময়ে কল্পনাশক্তির সেই স্বচ্ছতা, সেই সূক্ষ্মতা, সেই স্পষ্টতা থাকে না। মফস্বলে আমার সেই শক্তি খুব বিকশিত হয়, আমি দেশকালের ব্যবধানকে আমার কল্পনার দ্বারা পরিপূর্ণ করে তুলতে পারি; কিন্তু কলকাতার আবিলতার মধ্যে সেই মায়াশক্তি কোথায় অন্তর্ধান করে, তখন ইন্দ্রিয়ের দ্বারে শরণাপন্ন হয়ে ক্রন্দন করে মরতে হয়।

সাতারা

৩ ডিসেম্বর ১৮৯৪

শিলাইদহ
বুধবার ?
৬ ডিসেম্বর। ১৮৯৪।

সাধারণত অন্যদিন এই সময়টা কিছু গরম হয়ে ওঠে, জোব্বাটা খুলে ফেলতে হয়— আজ ঠিক উল্টো দেখছি। বাইরে বাতাসটা সোঁ সোঁ শব্দে শিষ্ লাগিয়েছে, নদীর জল কলকল ছলছল শব্দে চঞ্চল হয়ে উঠেছে— অথচ মেঘের কোনো লক্ষণ নেই, রৌদ্র চমৎকার উজ্জ্বল, জলের ধারে কাদা-চরের উপর কাদাখোঁচা পাখিগুলো ল্যাজ নাচিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়াচ্ছে এবং শুশুকগুলো থেকে থেকে খামকা জলের উপরে গুব্ করে দিগ্‌বাজি খেলে যাচ্ছে। যদি সন্ধের সময়ও এইরকম বাতাসটা থাকে তা হলে আমার আজ আর বেড়ানোটা হবে না। আমি আজকাল একটু স্থানপরিবর্তন করেছি। নদীর ঠিক মাঝখানে একটা চরের মতো জেগে উঠেছে, সেই চরে আমি বোট নিয়ে এসে বেঁধেছি। সেই ছড়াটা মনে আছে ?—

এপার গঙ্গা, ও পার গঙ্গা, মধ্যিখানে চর।
তারই মধ্যে বসে আছে শিব-সদাগর।

আমি ঠিক সেই শিব-সদাগর হয়ে বসে আছি। বিকেলে যখন ডাঙায় বেড়াতে যাই তখন জলিবোটে খানিকটা দাঁড় টেনে বেয়ে যেতে হয়; এই সূত্রে আমার দাঁড় টানাও হয় বেড়ানোও হয়। আজকাল শুক্লপক্ষ— খানিকটা বেড়াতে বেড়াতেই চাঁদের আলো ফুটে ওঠে, তখন চরের সীমাহীন ধূসর বালি চাঁদের আলোতে এমন একটা ছায়ারচিত কাল্পনিক আকার ধারণ করে, মনে হয়, এ যেন বাস্তবিক পৃথিবী নয়— আমারই মনের একটা অপরূপ ভাব। কোন্‌কালে ছেলেবেলায় তিনকড়িদাসীর কাছে রাত্রে মশারির মধ্যে শুয়ে রূপকথার প্রসঙ্গে একটা বর্ণনা শুনেছিলেম, 'তেপান্তর মাঠ—

জোচ্ছনায় ফুল ফুটে রয়েছে'— যখনি জ্যোৎস্নারাত্রে চরে বেড়াই তিনকড়িদাসীর এই কথাটি মনে পড়ে। ছেলেবেলায় সেই রাত্রে তিনকড়ির এই একটি কথায় আমার মনটা ভারী চঞ্চল হয়ে উঠেছিল— প্রকাণ্ড মাঠ ধূ ধূ করছে, তারই মধ্যে ধব্‌ধবে জ্যোৎস্না হয়েছে, আর রাজপুত্র অনির্দেশ্য কারণে ঘোড়ায় চড়ে ভ্রমণে বেরিয়েছে —শুনে মনটা এমনি উতলা হয়েছিল! তা ছাড়া, রাজপুত্রের ভাগ্যে প্রায়ই পরমাসুন্দরী রাজকন্যা জুটত কিনা, সেটাতে মনটা আরও ক্ষুব্ধ হত। মনের ভিতরে কেমন একটা দুরাশা বদ্ধমূল হয়েছিল যে, বড়ো হলে এই ধরণের একটা কোনো অদ্ভুত ঘটনা আমার দ্বারাও সম্ভব এবং নানা বিঘ্নবিপদের পারে কোনো-এক জায়গায় কোনো-একটি পরমাসুন্দরীও নিতান্ত দুর্লভ না হতে পারে। জ্যোৎস্নারাত্রে চরে বেড়াতে বেড়াতে ছেলেবেলাকার সেই মশারির ভিতরকার পুলকিত হৃদয়ের মোহ জেগে ওঠে; চারি দিকের সমস্তই এমন অবাস্তব দেখতে হয় যে যা-কিছু অসম্ভব সেইগুলোই আকার ধারণ করে ওঠে; নিজের কল্পনার মরীচিকার মধ্যে নিজে মুগ্ধভাবে ঘুরে ঘুরে বেড়াই— তার আর কোথাও সীমা নেই, বাধা নেই।

সাতারা

১১ ডিসেম্বর ১৮৯৪

১৮১

শিলাইদহ

৭ ডিসেম্বর। ১৮৯৪।

চরের উপর সন্ধেবেলাটা আজকাল এমন চমৎকার হয় সে আমার বর্ণনার অতীত। আমি যখন একলা বেড়াই, খানিক বাদে শৈ··· প্রায়ই আমার সঙ্গ নিতে আসে এবং কাজকর্মের আলোচনা করে। কালও সে এসেছিল। খানিক ক্ষণ ধরে খারিজ দাখিল বন্দোবস্ত প্রভৃতি সম্বন্ধে কথা কওয়ার পরে যেই একটু চুপ করেছি— অমনি হঠাৎ দেখতে পেলুম অনন্ত জগৎ সেই সন্ধ্যার আকাশে নীরবে আমার সম্মুখে দাঁড়িয়ে। তখন আমার আশ্চর্য বোধ হল, কানের কাছে একটা মানুষের সামান্য কণ্ঠস্বরে এই অনন্ত-আকাশ-ভরা নিঃশব্দতা ডুবে গিয়েছিল— ঐ উদ্‌ঘাটিত নিস্তব্ধ জগৎ-চরাচরের মধ্যে খারিজ দাখিল এবং বিরাহিম্‌পুরের জমিদারি সেরেস্তা কোন্‌খানে! আমি শৈ···র কথার কোনো উত্তর দিলুম না, সে মনে করলে আমি বুঝি শুনতে পাই নি। ফের আবার প্রশ্ন করলে, আমি ফের নিরুত্তরে সে কথা কাটিয়ে দিলুম। তখন সে ভারী আশ্চর্য হয়ে চুপ করে গেল। যেই চুপ করলে, অমনি দেখতে দেখতে সমস্ত নিস্তব্ধ নক্ষত্রলোক থেকে শান্তি নেমে এসে আমার হৃদয় পরিপূর্ণ করে তুললে। যে সভার মধ্যে অনন্তকোটি জ্যোতিষ্ক নীরবে সমাগত হয়েছে আমিও সেই সভার এক প্রান্তে স্থান পেলুম। ঐ অসীম শূন্যের মধ্যে তারাও যেমন এক-একটি, এই পদ্মার ধারে দিগন্তবিস্তীর্ণ নির্জন বালির চরের মধ্যে আমিও তেমনি একটি; অস্তিত্ব-নামক এক মহাশ্চর্য ব্যাপারের মধ্যে ওরা এবং আমি স্থান পেয়েছি। অনেক রাত্রি পর্যন্ত জ্যোৎস্নায় চরের মধ্যে বেড়িয়ে শেষকালে বোটের মধ্যে ফিরে এসে বাতি জ্বালিয়ে দরজা বন্ধ করে লম্বা কেদারায় পা ছড়িয়ে বসে ফের আবার বিরাহিমপুরের খারিজ দাখিলের সম্বন্ধে আলোচনা উত্থাপিত হল।

নতুন খেজুরেগুড়-সহযোগে চারি খণ্ড লুচি এবং এক গ্লাস দুগ্ধও খাওয়া গেল। তার পরে খানিকটা সাহিত্যসমালোচনা করে শয্যাশায়ী হয়ে পড়া গেল।

সাতারা

১২ ডিসেম্বর ১৮৯৪

১৮২

শিলাইদহ
১১ ডিসেম্বর। ১৮৯৪।

আজকাল ···র ভয়ে খুব সকাল-সকাল বেড়াতে বেরই; অনেক ক্ষণ একলা বেড়াবার পরে শৈ··· এসে হাজির হয়। ততক্ষণ আমি মনটিকে শান্ত এবং শীতল করে নিই এবং দিনের সমস্ত চিন্তা ও কাজের ছিন্ন আবর্জনাগুলো একেবারে ঝেঁটিয়ে সুদূরে ফেলে দিই। তখন নিদেন খানিক ক্ষণের জন্যে মনে হয় সংসারের সমস্ত লাভক্ষতি এবং সুখদুঃখ কিছুই কিছু নয়। তার পরে হঠাৎ শৈ··· এসে যখনি জিজ্ঞাসা করে 'আজ দুধ খেয়ে আপনার কোনো অসুখ করে নি তো' কিম্বা 'নায়েব-মশায় ঠাকুরবাড়ির সমস্ত হিসেব পেশ করেছিলেন কি'— সেগুলো এমনি অদ্ভুত খাপছাড়া শুনতে হয়! আমরা নিত্য এবং অনিত্য -নামক এমন দুটি অসীম বিরোধের ঠিক মাঝখানে বাস করি! যদিও তারা চিরসংলগ্ন চিরপ্রতিবেশী তবু পরস্পরের কাছে পরস্পর এমনি হাস্যজনক! যখন আধ্যাত্মিক কথা হচ্ছে তখন গায়ের কাপড় এবং পেটের ক্ষিধের কথা আনলে ভারী অসংগত মনে হয়, অথচ আত্মা এবং পেটের ক্ষিধে চিরকাল একত্রে যাপন করে আসছে। যেখানে চন্দ্রালোক পড়ছে সেইখানেই আমার জমিদারি; অথচ জ্যোৎস্না বলছে 'তোমার জমিদারি মিথ্যে', জমিদারি বলছে জ্যোৎস্না সমস্তই ফাঁকি! আমি ব্যক্তি ঠিক মাঝখানে।

সাতারা
১৬ ডিসেম্বর ১৮৯৪

শিলাইদহ

মঙ্গলবার ?

১২ ডিসেম্বর। ১৮৯৪।

তুই যে লিখেছিস [বব] 'ভবের সাথে ভাবের মিলন হবে কবে ?'— সম্পূর্ণ মিলন কোনোকালেই হবে না। কারণ, ভবও যতটা ভাবের কাছে অগ্রসর হতে থাকবে আবার ভাবও ততটা সম্মুখে অগ্রসর হয়ে চলবে : ঠিক যেন ভাবটা ভবের বড়ো ভাই, উভয়ের সমান বয়স হবার কোনো সম্ভাবনা নেই। অতএব উপস্থিতমত যেটা মন্দের ভালো পৃথিবীতে কোনো গতিকে সেইটেই আধা-খেঁচড়া করে করে যেতে পারলেই লোকে জীবনকে সার্থক জ্ঞান করে। বিশেষত যখন সব সময় বুঝতেই পারি নে highest ideal কোন্‌টা— হয়তো যেটা nighest সেইটেই highest, হয়তো নিজের ideal sacrifice করাই অনেক সময় higher ideal, হয়তো জীবনকে যেখানে তুলে রেখে দিতে চাই সেখানে থাকলে জীবনটা নিষ্ফল হবে, হয়তো আর-একটু নেবে এলে আমার নিজের সাধ্যমত এই সংসারে খানিকটা সফলতা লাভ করতে পারি। এ-সমস্ত বিষয়ের মীমাংসা প্রত্যেকের নিজের কাছে [বব]। সবসুদ্ধ জগৎটা এমনি জটিল যে, কোনো দিকে কাউকে পথ নির্দেশ করে দিতে সাহস হয় না, কেননা প্রকৃতিভেদে প্রত্যেকের চলবার প্রণালী এত তফাত! হয়তো খুব বেশি না ভেবে যেটা সব চেয়ে নিকটবর্তী সেই পথটা অবলম্বন করে তার পরে প্রতিদিন যে প্রশ্ন সম্মুখে উপস্থিত হবে সেইটের ভালোরকম মীমাংসা করে চলাই সব চেয়ে সুবিধা। আমাদের এই জীবনটাকে যিনি একটা বিষম সমস্যা করে তুলেছেন অবশেষে তিনি হয়তো এর খুব একটা সহজ মীমাংসা করে দেবেন, তখন হয়তো আমরা এত বেশি ভেবে-ছিলুম ব'লে হাসি পাবে।

সাতারা। ১৭ ডিসেম্বর ১৮৯৪

১৮৪

শিলাইদহ

১৪ ডিসেম্বর। ১৮৯৪।

আজ মনে করলুম সকাল বেলায় চরের উপর খানিকটা বেড়িয়ে আসি, কিন্তু কুয়াশা দেখে পিছিয়ে আসা গেল। আকাশেও কাল-পর্‌শুকার মতো অল্প অল্প মেঘের টুকরো ভাসছে। কাল কিন্তু সূর্যাস্তের সময় এই মেঘের টুকরোগুলোতে সন্ধ্যার আভা লেগে কী-যে চমৎকার দেখতে হয়েছিল সে আমি বলতে পারি নে। পশ্চিম দিকের এক জায়গায় ছোটো ছোটো কোঁচানো কোঁক্‌ড়ানো মেঘ সোনালি হয়ে উঠে এক নতুন রকম শোভা ধারণ করেছিল। কত রকমেরই যে রঙ চতুর্দিকে ফুটে উঠেছিল সে আমার মতো সুবিখ্যাত রঙকানা লোকের পক্ষে বর্ণনা করতে বসা ধৃষ্টতা মাত্র। কেবল আকাশে নয়, পদ্মার জলে এবং বালির চরেও কাল হঠাৎ রঙের ইন্দ্রজাল লেগে গিয়েছিল। আবার নীল পদ্মার জল উত্তুরে বাতাসে আগাগোড়া অল্প অল্প কম্পিত শিহরিত হচ্ছিল— সেই জন্যে সমস্ত নদীতে সূর্যরশ্মির সমস্ত বর্ণের এবং আভার এমন একটি আশ্চর্য স্পন্দন হচ্ছিল যে আমার মনের মধ্যে বিস্ময়ের সীমা ছিল না। আবার পদ্মার মাঝে মাঝে যে-সকল জায়গায় জলের নীচে চর পড়েছে সে জায়গায় জল শান্ত ছিল ; সেই-সব স্থির জলে পরিষ্কার সোনার লাবণ্য একেবারে মসৃণ তরল উজ্জ্বল কোমল নির্মল হয়ে পড়েছিল— চারি দিকে বিচিত্র রঙের বিচিত্র নৃত্যের মাঝে মাঝে সেই স্থির বিষণ্ণ সূর্যাস্তের নিশ্চল আভা অপূর্ব সুন্দর হয়ে উঠেছিল। তার পরে আবার বালির চরের উপরেও সূর্যাস্তের বিচিত্র তূলি পড়েছিল। এই চরগুলো এক সময় জলের নীচে ছিল কিনা, সেই জন্যে এক-এক জায়গায় অনেক দূর পর্যন্ত বালির উপর জলের সেই ঢেউ-খেলানো পদচিহ্ন পড়ে আছে— আবার অনেক জায়গায় সমতল ধূ ধূ করছে

সেই-সমস্ত ঢেউ-খেলানো স্তরে-স্তরে-কোঁচানো বালির উপর নানা রঙের চিকন আভা পড়ে ঠিক যেন একটা প্রকাণ্ড সাপের নানা-রঙা খোলষের মতো দেখাচ্ছিল। আমি মনে করলুম— পদ্মা তো একটা প্রকাণ্ড নাগিনীই বটে, সে এক সময় এই বৃহৎ চরের উপর বাস করত, এখন কেবল তার একটা বৃহদাকার খোলষ বালির উপর পড়ে চিক্ চিক্ করছে— বর্ষার সময় সে আপনার সহস্র ফণা তুলে ডাঙার উপর ছোবল মারতে মারতে গর্জন করতে করতে কেমন করে আপনার প্রকাণ্ড বাঁকা লেজ আছড়াতে আছড়াতে ফুলতে ফুলতে চলত সে দৃশ্যটাও মনে পড়ল— এখন সে শীতকালের সাপের মতো বিবরের মধ্যে অর্ধপ্রবিষ্ট হয়ে সুদীর্ঘ শীতনিদ্রায় প্রতিদিন ক্ষীণতর হয়ে যাচ্ছে। বেড়াতে বেড়াতে ক্রমে এত বিচিত্র রঙ কখন আস্তে আস্তে মিলিয়ে এল, কেবল জ্যোৎস্নার একরঙা শুভ্রতায় জলস্থল আকাশ সমস্ত মণ্ডিত হয়ে গেল— এক সময় যে পূর্বদিকে দিনের উদয় হয়েছিল জগতের কোনো জায়গায় তার তিলমাত্র চিহ্ন রইল না।

সাতারা

১৯ ডিসেম্বর ১৮৯৪

১৮৫

কলকাতা
১৪ জানুয়ারি। ১৮৯৫।

অল্প অল্প করে বসন্ত পড়বার উপক্রম করছে। কাল সমস্ত দিন বেশ গরম পড়েছিল— কাজকর্মে মন লাগছিল না, সমস্ত দিনটা একরকম উদ্‌ভ্রান্তের মতো ঘুরে ঘুরে কাটিয়ে দেওয়া গেছে। কাল অ… এসেছিল, তার সঙ্গে শিষ্টালাপ করাটাও আমার পক্ষে দুঃসাধ্য হয়েছিল। এতদিন শীত ছিল, কাজের উৎসাহ ছিল— মনে করতুম চিরজীবন সাধনার এডিটরি করে কাটিয়ে দেব। এখন একটু গরম হাওয়া পড়বা মাত্রই মনে হচ্ছে, এডিটরি করার চেয়ে আমি সেই-যে কবি ছিলুম সে ছিলুম ভাল। ইচ্ছে করছে একটা খোলা জানলার কাছে পড়ে পড়ে একটা শ্লেট হাতে করে ছন্দ মিলিয়ে মিলিয়ে গুন্ গুন্ করে করে কবিতা লিখে যাই— চোখের সামনে উজ্জ্বল আকাশের গায়ে খানিকটা সবুজ ডালপালা দেখা যায় এবং বাতাসটি এসে সর্বাঙ্গে লাগতে থাকে। কবিতা যদি বা না লিখি গান তৈরি করা একটা কাজ আছে, সেটাও এরকম অবস্থায় বেশ লাগে ভালো। গানের সুরের দ্বারা জগতের সমস্ত চেহারা একেবারে বদলে যায় এবং মাথার ভিতরে একটা অপরূপ নেশা জমে ওঠে। কিন্তু সেরকম নেশাতুর ব্যাকুল এবং আত্মবিস্মৃত পাগলের মতো তৃষার্ত উন্মনা আনন্দচঞ্চল হয়ে থাকার চেয়ে গম্ভীর শান্তভাবে সাবধানে সাধনার এডিটরি করাই আমার পক্ষে ভালো। গানের এবং কাব্যের জগতে একটা চিরযৌবন আছে, জীবনের সঙ্গে সেটার সব সময় সামঞ্জস্য হয় না। এক-এক দিন বেলাটা যখন গরম হয়ে আসে হঠাৎ দরজার বাইরে রোদ্দুরের দিকে চাইবা মাত্র মনের ভিতরটা পুলকিত অথচ পীড়িত হয়ে ওঠে— তখন আমার ভয় হয় এবং নৈরাশ্য আসে, বুঝতে পারি এ কবিত্ব আমার হাড়ের মজ্জার মধ্যে— এ আমার সঙ্গের সঙ্গী, প্রতি বৎসরে নিদেন একবার

করেও আমার হাড়ের ভিতর থেকে পল্লবিত বিকশিত হয়ে উঠবে— এবং আমাকে ভুলিয়ে দেবে যে, আমার অন্তর্জগতের সঙ্গে আমার বহির্জগতের পরস্পর আনুকূল্য নেই।

সাতারা
১৮ জানুয়ারি ১৮৯৫

শিলাইদহ

৪ ফেব্রুয়ারি। ১৮৯৫।

এখানে ভারী শীত পড়েছে [বব]— ইচ্ছা করছে এই জবড়জঙ্গি শীতটা ঘুচে গিয়ে একবার প্রাণ খুলে বসন্তের বাতাস দেয়, এই আচ্‌কানের বোতামগুলো খুলে একবার খোলা জলিবোটের উপর বিছানা পেতে দিয়ে পা ছড়িয়ে বসি এবং কর্তব্যের রাস্তা ছেড়ে দিয়ে দিন-কতক সম্পূর্ণ অকেজো কাজে মন দিই। বছরের মধ্যে ছ মাস আমি এবং ছ মাস আর-কেউ যদি সাধনার সম্পাদক থাকে তা হলে ঠিক সুবিধামত বন্দোবস্ত হয়— কারণ, সম্বৎসর পাগলামি করবার ক্ষমতা মানুষের হাতে নেই এবং সম্বৎসর sanity বজায় রেখে চলাও আমার মতো লোকের পক্ষে দুঃসাধ্য। এত বড়ো বিশ্বব্রহ্মাণ্ড, দু মাস অন্তর তার ঋতু-পরিবর্তন হচ্ছে, আমরা ক্ষুদ্র মনুষ্য বারো মাস সমভাবে ভদ্রতা রক্ষা করে চলি কী করে! মানুষের মহা মুশকিল এই, প্রকৃতির বিরুদ্ধে সমাজের আইন-অনুসারে তাকে তিনশো পঁয়ষট্টি দিন ঠিক এক ভাবে চলতে হয়— আসলে তার ভিতরে যে-একটা চিরনূতন চিররহস্য আছে সেটাকে সলজ্জে সভয়ে গোপন ক'রে নিজেকে সর্বসাধারণের কাছে নিতান্ত চিরাভ্যস্ত-রুটিন-চালিত যন্ত্রনির্মিতবৎ দেখাতে হবে। সেই জন্যে থেকে থেকে মানুষ এমন বিগড়ে যায়, বিদ্রোহী হয়ে ওঠে; সেই জন্যে মানুষ যথার্থ আপনাকে উপলব্ধি করতে সাহিত্যের আশ্রয় গ্রহণ করতে চায়; কর্মক্ষেত্রে আপনাকে বদ্ধ করে রাখে এবং ভাব-রাজ্যে আপনাকে মুক্তি দিতে চেষ্টা করে। সেই জন্যে সাহিত্য conventional হলে সাহিত্যের একটা মহৎ উদ্দেশ্য সংকীর্ণ হয়ে আসে; সেই জন্যে ড্রইংরুম-শিষ্টালাপে যে-সকল কথা উত্থাপন করা যায় না, সাহিত্যে সেগুলি গভীরতা এবং উদারতা লাভ ক'রে অসংকোচে এবং সুন্দর ভাবে আপনাকে প্রকাশ করতে পারে।

এমন-কি, ড্রইংরুম-চা-পান-সভার সুসভ্য সীমার মধ্যে সাহিত্যকে বদ্ধ করতে গেলে উদার বিশ্বপ্রকৃতিকে ছিটের গাউন পরানোর মতো হয়।

সাতারা
৯ ফেব্রুয়ারি। ১৮৯৫।

শিলাইদহ
১ ফাল্গুন ?
[১১ ফেব্রুয়ারি ১৮৯৫]

এ পারে সন্ধের সময় আমার একটি বেড়াবার সঙ্গী পাওয়া গেছে। লোকটির নাম ঠা··· ; বেশ বুদ্ধিমান, প্রৌঢ়বয়স্ক, সাহিত্যানুরাগী, চিন্তাশীল, স্পষ্টবক্তা এবং জমিদারি কাজকর্মে বহুদর্শী।··· রোজ বেড়াবার সময় এঁর সঙ্গে আমার নানা ভাবের আলোচনা হয়ে থাকে। আমি যে কী ভাবে জগৎসংসারকে দেখে থাকি, সমস্ত প্রকৃতির সঙ্গে আমার যে খুব একটা নিগূঢ় অন্তরঙ্গ সত্যিকার সজীব সম্পর্ক আছে, এবং সেই প্রীতি সেই আত্মীয়তাকেই যে আমি যথার্থ এবং সর্বোচ্চ ধর্ম বলে জ্ঞান এবং অনুভব করি এবং আমার এই অন্তরপ্রকৃতিটি না বুঝলে যে আমার অধিকাংশ কবিতার রসাস্বাদন, এমন-কি, অর্থগ্রহণ করা যায় না— এই কথাটা আমি তাঁকে বোঝাচ্ছিলুম। দেখলুম তিনি বেশ বুঝলেন— কেবল বোঝা নয়, বেশ মশ্‌গুল্‌ হয়ে গেলেন। জগৎসংসার থেকে আমার নেশাটিকে যে আমি কোন্‌খান থেকে আদায় করে থাকি সেটা তিনি ঠিক উপলব্ধি করতে পারলেন। আমার যে ধর্ম এটা নিত্যধর্ম, এর উপাসনা নিত্য-উপাসনা। কাল রাস্তার ধারে একটা ছাগ-মাতা গম্ভীর অলস স্নিগ্ধভাবে ঘাসের উপরে বসে ছিল এবং তার ছানাটা তার গায়ের উপরে ঘেঁষে পরম নির্ভরে গভীর আরামে পড়ে ছিল— সেটা দেখে আমার মনে যে-একটা সুগভীর রসপরিপূর্ণ প্রীতি এবং বিস্ময়ের সঞ্চার হল আমি সেইটেকেই আমার ধর্মালোচনা বলি। এই-সমস্ত ছবিতে চোখ পড়বা মাত্রই সমস্ত জগতের ভিতরকার আনন্দ এবং প্রেমকে আমি অত্যন্ত প্রত্যক্ষ সাক্ষাৎভাবে আমার অন্তরে অনুভব করি। এ ছাড়া অন্যান্য যা-কিছু dogma আছে, যা আমি কিছুই জানি নে এবং বুঝি নে এবং বোঝবার

সম্ভাবনা দেখি নে, তা নিয়ে আমি কিছুমাত্র ব্যস্ত হই নে। যেটুকু আমি positively জানতে পারছি সেই আমার পক্ষে যথেষ্ট, তাতেই আমাকে পরিপূর্ণ সুখ দেয়। তার সঙ্গে মিথ্যা অনুমান বিচার মিশিয়ে তাকে একটা systemএ পরিণত করতে গিয়ে তার ভিতরকার প্রত্যক্ষ সত্যটিকেও সংশয়াপন্ন করে তোলা হয়। আমি এইটুকু জানি যে, জগতে একটা আনন্দ এবং প্রেম আছে— তার বেশি জানবার কোনো দরকার নেই।

সাতারা

১৬ ফেব্রুয়ারি ১৮৯৫

শিলাইদহ

১৬ ফেব্রুয়ারি। ১৮৯৫।

এবারে পৃথিবীর হঠাৎ কেমন তাপক্ষয় হয়েছে। খবরের কাগজে শোনা যাচ্ছে য়ুরোপ বরফে আদ্যোপান্ত মণ্ডিত হয়েছে, ইংলন্‌ডে মেরুপ্রদেশের মতো শীত পড়েছে, বোধ করি সেই ধাক্কার কিয়দংশ বঙ্গোপসাগরের কূলে এসেও পৌঁচেছে। ফাল্গুন মাসে এরকম অসংগত শীত বাংলা-দেশে তো কখনো মনে পড়ে না। মনে আছে ছেলেবেলায় বাবামশায়ের সঙ্গে যখন অমৃতসরে গিয়েছিলুম তখন এই ফাল্গুন-চৈত্র মাসে এইরকম শীত বোধ হত, এবং রোজ সকালে স্নানের সময় বড়ো আক্ষেপ উপস্থিত হত। শীতের চোটে সেই বহুদিনকার পূর্বস্মৃতি মনে পড়ছে এবং সেইসঙ্গে মনে পড়ছে— সেখানে দীর্ঘ দুপুর বেলায় একলা বসে অদূরে ইঁদারা থেকে যন্ত্রযোগে গোরুদের জল তোলবার সকরুণ ক্যাঁ-কোঁ শব্দ শুনতে পেতুম, চাষীরা অত্যন্ত উচ্চ সপ্তম সুরে একটা একঘেয়ে তান ছাড়ত, ইঁদারার উপরে একটা তুঁতের গাছ ঝুঁকে পড়েছিল, সেইটে থেকে পাকা তুঁত পেড়ে এনে খেতুম এবং বাড়ির জন্য মন কেমন করতে থাকত। তার থেকে ক্রমে মনে পড়ে সেই ড্যালহৌসিতে ওঠবার সময় প্রথম হিমালয়ের দৃশ্য। তখন আমার মনটা ছোটো ছিল কিনা, বিস্ময়ের পরিমাণ তার মধ্যে কিছুতেই যেন কুলোত না। সেখানকার একটা অন্ধকার নির্জন নিস্তব্ধ গম্ভীর ঠাণ্ডা ছায়াময় প্রকাণ্ড পাইনের বন এখনো মনে পড়ে। আমার সেই ড্যালহৌসিতে আর-একবার যেতে ইচ্ছে করে ; দেখতে ইচ্ছে করে আমার সেই বাল্যকালের প্রথম বিস্ময়ের সঙ্গে এখনকার কিছু মিল পাওয়া যায় কিনা। তখন একটা মস্ত সুবিধে ছিল যে, নিজের জন্যে নিজেকে কিছুই ভাবতে হত না।

সাতারা

২১ ফেব্রুয়ারি ১৮৯৫

শিলাইদহ

১৭ ফেব্রুয়ারি। ১৮৯৫।

আজ সকালবেলায় যদিও শীত যথেষ্ট আছে তবু অন্য দিনের মতো প্রবল উত্তুরে বাতাস নেই— নদীর জলে তরঙ্গের রেখাটি মাত্র দেখা যাচ্ছে না, একেবারে আয়নাটির মতো স্থির হয়ে আছে। ঐ ওপারে একটি নৌকো ধীরে ধীরে চলেছে, তিনটি মানুষ ধূসর বালির চরের উপরে তিনটি কালো রেখাপাত ক'রে গুণ টেনে নিয়ে যাচ্ছে— বাস্, আর কোথাও কর্মস্রোতের কোনো চাঞ্চল্য নেই, কোনো শব্দ নেই, গতি নেই— জলের উপরে এবং বালির চরের উপর সকালবেলাকার রৌদ্র এসে স্থিরভাবে পড়ে রয়েছে, বেলা যেন এগোচ্ছে না, এক রকম শ্রান্ত শান্ত-ভাবে নিস্তব্ধ বিশ্রাম করছে। আমার এতক্ষণে অনেক কাজ সেরে ফেলা উচিত ছিল, কিন্তু আমিও আজকের এই প্রভাতের অলস সৌন্দর্য অলসভাবে উপভোগ করছিলুম— এবং এক-একবার ভাবছিলুম ঐ যে গুটি-দুই-তিন লোক ও পারে জনশূন্য বালির চরের উপর দিয়ে ধীরে ধীরে গুণ টেনে নিয়ে চলেছে, ওটা আমার চোখে এমন বিশেষ সুন্দর ঠেকছে কেন। যারা টানছে তারা পেটের দায়ে রীতিমত কাজ করছে ; আমার চোখে যে তারা একটি শান্তি এবং সন্তোষের ছবি এঁকে দিয়ে যাচ্ছে তাদের মনে ঠিক সেই শান্তি সন্তোষ এবং সৌন্দর্যটুকু নেই। যাই হোক, এ-সমস্ত চিন্তার কোনো মীমাংসা হোক বা না হোক সেজন্যে আমার কোনো মাথাব্যথা ছিল না— প্রভাতের এই সর্বব্যাপী নিস্তব্ধতার একটি প্রান্তভাগে ঐ ধীর-গতিতে গুণ টানা যেমন একটুখানি ভঙ্গ, তেমনি আমার মনেরও শান্ত উপভোগের একটি দূর তীরভাগে ঐ একটুখানি মৃদু অলস চিন্তা একটু ভঙ্গমাত্র, তাতে শান্তিটিকে ঈষৎ বৈচিত্র্য দান করছে। আজকাল প্রতিদিন 'সাধনা' লেখার চিন্তায় মনটিকে সেরকম নিশ্চেষ্ট করে তুলে

সর্বতোভাবে এই প্রকাণ্ড প্রকৃতির মুখোমুখি করে দাঁড় করাবার অবসর পাই নে—নিজের ভিতরে অহরহ একটা-না-একটা-কিছু প্রক্রিয়া চলছে, বাইরে যে কিছু আছে এ কথা ভুলে থাকতে হয়। সৌন্দর্য জিনিষটাও কিছু jealous, সম্পূর্ণ মনটিকে না পেলে সে সম্পূর্ণভাবে ধরা দেয় না। আমি তো সেইজন্যেই বলি কবিতা কিম্বা সাহিত্যের কোনো সুন্দর সৃষ্টি যথার্থ বোঝবার এবং উপভোগ করবার জন্যে যথেষ্ট নির্জনতা এবং শান্তির আবশ্যক— তাড়াতাড়ির কর্ম নয়, দুটো কাজের মাঝখানকার অল্প অবসরের মধ্যে তাকে চট্ করে একটুখানি চেখে নেবার জো নেই। সেই জন্যেই এত অল্প লোকের যথার্থ কবিতা ভালো লাগে। তাদের মনের মধ্যে অপর্যাপ্ত স্থান এবং অবসর নেই — অল্প জায়গাটুকুর মধ্যে বড্ড বেশি ভিড়। মফস্বলে না এলে কলকাতায় কোনো কবিতার বই খুলতে আমার ভয় হয়। মনে হয় সে জিনিষটা নষ্ট হয়ে যাবে, হয়তো উপযুক্ত সময়েও আর ভালো লাগবে না। কলকাতায় কবিতার মতো জিনিষ বড়ো সংকুচিত হয়ে যায়— সেখানে তাকে বড়ো সামান্য মনে হয়। এখানে নির্জনে তার অতলস্পর্শ গভীরতা এবং সত্যতা ঠিক মনের সঙ্গে উপলব্ধি করতে পারি। বুঝতে পারি আমাদের প্রকৃতির পক্ষে ওটা কত একান্ত আবশ্যক এবং এতদিন শহরের মধ্যে মনটা কিরকম উপবাসী হয়েই ছিল।

সাতারা

২২ ফেব্রুয়ারি ১৮৯৫

১৯০

শিলাইদহ

১৮ ফেব্রুয়ারি। ১৮৯৫।

আজকের দিনটি এমনি নিস্তব্ধ এবং সুন্দর যে, পরিপূর্ণ আলস্যরসে নিমগ্ন হবার জন্যে মনটা ব্যাকুল হয়ে আছে। কিন্তু সাধনার জন্যে 'সংক্ষিপ্ত সমালোচনা' এখনো বাকি আছে। দুখানা অপাঠ্য বই পড়ে তার উপরে অপ্রিয় কথা লিখতে হবে। নিতান্ত বাজে কাজ— এ রকম কাজ এমন দিনে করা অন্যায়। কিন্তু অদৃষ্টের পরিহাস-বশত ফাল্গুনের এই প্রশান্ত মধ্যাহ্নে এই নির্জন অবসরে এই নিস্তরঙ্গ পদ্মার উপরে এই নিভৃত বোটের মধ্যে ব'সে, সম্মুখে সোনার রৌদ্র সুনীল আকাশ এবং ধূসর বালুর চর নিয়ে, শ্রীযোগেন্দ্রনাথ সাধু -কর্তৃক প্রকাশিত দেওয়ান-গোবিন্দরামের সমালোচনা করতে প্রবৃত্ত হতে হচ্ছে। সে বইও কেউ পড়বে না, সে সমালোচনাও কেউ পড়বে না, মাঝের থেকে আজকের এই দুর্লভ দিনটা নষ্ট হবে। ভেবে দেখতে গেলে জীবনে এরকম দিন ক'টাই বা আসে! অধিকাংশ দিন-গুলোই ভাঙাচোরা, জোড়াতাড়া— আজকের দিনটি এই স্তব্ধ নদীর উপরে একটি পরিস্ফুট পদ্মের মতো প্রশান্ত-সম্পূর্ণ-ভাবে ফুটে উঠেছে, আমার মনটিকে তার নিভৃত মর্মকোষের মধ্যে আকর্ষণ করে নিচ্ছে। আবার হয়েছে কী, একটা হলদে-কোমরবন্ধ-পরা স্নিগ্ধ নীল রঙের মস্ত ভ্রমর আমার বোটের চার দিকে গুঞ্জনধ্বনি-সহকারে চঞ্চলভাবে উড়ে উড়ে বেড়াচ্ছে। বসন্তকালে ভ্রমরগুঞ্জনে বিরহিণীদের বিরহ-বেদনা বৃদ্ধি পেয়ে থাকে এ কথাটাকে আমি চিরকাল মনে মনে পরিহাস করে এসেছি। কিন্তু ভ্রমরগুঞ্জনের যথার্থ মাধুর্য এবং মর্ম আমি একদিন দুপুরবেলায় বোলপুরে প্রথম আবিষ্কার করেছিলুম। সেদিন এক রকম খ্যাপাটে ভাবে সেখানকার দক্ষিণের বারান্দাটায় নিষ্কর্মার মতো বেড়াচ্ছিলুম— মধ্যাহ্নটা মাঠের উপর প্রসারিত হয়ে

পড়েছিল এবং গাছের নিবিড় নিভৃত পল্লবরাশির মধ্যে একটি শ্রান্ত নিস্তব্ধতা ছায়া বিস্তার করে বিরাজ করছিল— বুকের ভিতরে একটা ব্যথা বোধ হচ্ছিল, আর সেই সময়ে বারান্দার নিকটবর্তী একটা নিম গাছের কাছে ভ্রমরের অলস গুঞ্জনধ্বনি সমস্ত উদাস উদার মধ্যাহ্নের একটা সুর বেঁধে দিচ্ছিল। সেইদিন বেশ বুঝতে পারলুম, মধ্যাহ্নের সমস্ত অনির্দিষ্ট শ্রান্ত সুরের মূল সুরটা হচ্ছে ঐ ভ্রমরের গুঞ্জন। বেশ বুঝতে পারা গেল— ওতে করে বিরহিণীদের বিরহ-ব্যথা বেড়ে ওঠা কিছুই অসম্ভব নয়। আসল কথাটা হচ্ছে, ঘরের মধ্যে যদি একটা ভ্রমর এসে পড়েই ভোঁ ভোঁ করতে আরম্ভ করে তাতে কারও ব্যথা বা সুখের বৃদ্ধি হয় না, কিন্তু গাছপালার মধ্যে খোলা আকাশে সে যে সুরটি লাগায় সেটি ঠিক লাগে। আজকের আমার এই সোনার-মেখলা-পরা ভ্রমরীটিও ঠিক সুর দিচ্ছে— নিশ্চয় বোধ হচ্ছে কোনো গ্রন্থের সমালোচনা করছে না, কিন্তু কেন যে আমার বোটের চার পাশে ঘুর ঘুর করে মরছে আমি তো বুঝতে পারছি নে। আমি যদি শকুন্তলা হতুম তা হলেও একটা মানে বোঝা যেত, কিন্তু অপক্ষপাতী ব্যক্তি মাত্রেই বলবে আমি শকুন্তলা নই : এইমাত্র আমার বোটের পাশ দিয়ে একটা নৌকো চলে গেল। তার একজন মুসলমান দাঁড়ি বুকের উপর এক বই নিয়ে চিৎ হয়ে পড়ে উচ্চৈঃস্বরে সুর করে করে একটি কাব্য পাঠ করছে। ও লোকটারও বেশ রসবোধ আছে— ওকে বোধ হয় ধ'রে পিটলেও দেওয়ান গোবিন্দরামের সমালোচনা করতে বসতে পারে না।

সাতারা

২৩ ফেব্রুয়ারি ১৮৯৫

শিলাইদহ

২২ ফেব্রুয়ারি। ১৮৯৫।

এই-সকল কারণে খানিকটা বিষয়কর্ম ক'রে, খানিকটা চিঠি লিখে, খানিকটা খবরের কাগজ প'ড়ে, খানিকটা প্রবন্ধ সংশোধন ক'রে আজকের দিনটা কেটে গেছে। এখন চারটে বেজে গেছে, রোদ্দুরটা পড়ে গেলেই বেড়াতে বেরব। যে-সব দিনে পুরোপুরি কাজ কিম্বা পুরোপুরি বিশ্রাম দুয়ের কোনোটাই হয় না, সে-সব দিন নিতান্তই ফেলা যায়। আমাদের মূলতান রাগিণীটা এই চারটে-পাঁচটা বেলাকার রাগিণী, তার ঠিক ভাবখানা হচ্ছে— 'আজকের দিনটা কিচ্ছুই করা হয় নি'। বোধ হয় দুপুরবেলায় ঘুমিয়ে উঠে কোনো ওস্তাদ ঐ রাগিণীর সৃষ্টি করেছিল। আজ আমি এই অপরাহ্ণের ঝিক্‌মিকি আলোতে জলে স্থলে শূন্যে সব জায়গাতেই সেই মূলতান রাগিণীটাকে তার করুণ চড়া অন্তরা-সুদ্ধ প্রত্যক্ষ দেখতে পাচ্ছি— না সুখ, না দুঃখ, কেবল আলস্যের অবসাদ এবং তার ভিতরকার একটা মর্মগত বেদনা। দুঃখের এক রকম ব্যথা আছে, কিন্তু তার ভিতরেও একটু রস থাকে। আর, এক রকম দুঃখহীন অনুভূতিহীন অসাড়তার অন্তঃশীলা ব্যথা আছে— সেটা ভারী নীরস, তার ভিতরে একটা উদারতা এবং কল্পনার সৌন্দর্য নেই। আর-একটা বড়ো বিপদ্ হয়েছে —ভারী মশা হয়েছে। তাতে করে মনটাকে নিতান্ত বিক্ষিপ্ত করে দেয়। সর্বদাই গা হাত পা চাপড়াতে গেলে চিন্তার গভীরতা কিম্বা ভাবের মাধুর্য কিছুতেই রক্ষা করা যায় না; একটা হিংস্র প্রবৃত্তি মনের মধ্যে জেগে থাকে, অথচ সেটা উপযুক্ত পরিমাণে চরিতার্থ হতে পারে না। এই রকমের সামান্য পীড়নে, মশার কামড়ে, সহযোগীসাহিত্য-সমালোচনে, মোহনভোগের মধ্যে বালিতে, মানুষকে কোনোরকম বীরত্ব শিক্ষা দেয় না সে আমি বলতে পারি। এই জন্যে আরও পারি

যে, আজই আমার মোহনভোগে বালি ছিল— আমার মনের ভাব কী রকম হয়েছিল স্পষ্ট মনে আছে, সে মনের ভাব খৃস্টান কিম্বা ব্রাহ্মের উপযুক্ত নয়, ··· ··· ভালো মুসলমানেরও অযোগ্য।

সাতারা
২৭ ফেব্রুয়ারি ১৮৯৫

শিলাইদহ
২৩ ফেব্রুয়ারি। ১৮৯৫।

এইবার বসন্ত কালটা পড়ল। এই সময়টা যদি আমার কোনো দায়ে-পড়া কাজ ঘাড়ে না থাকত, যদি বন্ধনমুক্ত থাকতুম, তা হলে বেশ হত। তা হলে কল্পনার রাশ ঢিলে করে দিয়ে পূর্ণ অবসরের মধ্যে দিয়ে ছুটিয়ে নিয়ে চলে যেতে পারতুম। বড়ো আরামে জানলাটির কাছে গিয়ে বসতুম এবং লেখা পড়া ভাবনা সবই বেশ ভরপূর ভাবে হতে পারত। এখন সাধনার জন্যে লিখতে লিখতে কিরকম অন্যমনস্ক হয়ে যাই, বাইরে যা-কিছু ঘটে তাতেই মনকে আকর্ষণ করে নেয়— নৌকো চলে যায় মুখ তুলে দেখি— খেয়া পারাপার করে তাই দেখেও অনেকটা সময় চলে যায়— ডাঙায় আমার বোটের খুব কাছে মন্থরগতি মোষগুলো তাদের বড়ো বড়ো মুখ তৃণগুল্মের মধ্যে পূরে দিয়ে সেগুলো নেড়েচেড়ে নিয়ে ফোঁস্ ফোঁস্ নিশ্বেস ফেলে কচ্ কচ্ শব্দ করতে করতে খেতে খেতে লেজের ঝাপটায় পিঠের মাছি তাড়াতে তাড়াতে চলতে থাকে, তার পরে একটা অতি ক্ষুদ্র শীর্ণ দুর্বল উলঙ্গপ্রায় ছেলে এসে এই প্রশান্ত-প্রকৃতি বৃহৎ জন্তুটার পিঠে একটা ছোটো লাঠির গুঁতো মেরে হঠ্ হঠ্ শব্দ করতে থাকে। জন্তুটা তার বড়ো বড়ো চোখে এক-একবার এই ক্ষীণ মনুষ্যশাবকের প্রতি কটাক্ষপাত করে পথের মধ্যে দুই-এক গ্রাস ঘাস পাতা ছিঁড়ে নিয়ে অব্যাকুলচিত্তে মৃদুমন্দগমনে খানিকটা দূর সরে যায়— এবং ছেলেটা মনে করে তার রাখালের কর্তব্যকর্ম করা হল। আমি রাখাল ছেলেদের এই সাইকলজির রহস্য এ পর্যন্ত ভেদ করে উঠতে পারলুম না— গোরু কিম্বা মোষ যেখানে নিজে ইচ্ছাপূর্বক পরিতৃপ্ত সন্তুষ্ট-ভাবে আহার করছে, অকারণে মার-ধোর করে সেখান থেকে তাড়িয়ে আর খানিক দূরে নিয়ে গিয়ে তাদের কী উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় আমি তো বুঝতে পারি নে। বোধ হয় জন্তুদের

উপরে প্রভুত্ব করা। পোষ-মানা সবল প্রাণীদের উপর অনাবশ্যক উৎপীড়ন করে নিজের ক্ষমতাগর্ব অনুভব করা বোধ হয় মানুষের একটা স্বভাব। আমার কিন্তু এই রাখাল ছেলেগুলোর উপর ভারী রাগ ধরে। খুব ঘন সরস তৃণগুল্মের মধ্যে গোরু-মোষের খাওয়া দেখতে আমার বেশ লাগে। যাদের মধ্যে উন্নততর প্রকৃতি বলে একটা কোনো উপসর্গ নেই, তাদের খাওয়া শোওয়া বসা প্রভৃতি সামান্য ব্যাপারগুলোও বেশ দেখবার যোগ্য বলে বোধ হয়। গরিব ছোটোলোকেরা যখন সামান্য ডাল ভাত নিয়ে উবু হয়ে বসে খেতে থাকে তখন সেটা দেখে বেশ একটু সুখ অনুভব করা যায়। কিন্তু বড়োমানুষ বড়োলোকের ছত্রিশ ব্যঞ্জনের সুদীর্ঘ ভোজন ব্যাপার ভারী বিরক্তিজনক। কী কথা বলতে কী কথা উঠল দেখ্। আমি বলতে যাচ্ছিলুম যে, সাধনার পাঠকদের জন্যে যখন আমি উচ্চ অঙ্গের খোরাক -সংগ্রহে নিযুক্ত তখন নদীর ধারে তৃণগুল্মরাশির উপরে গোরু মোষ চরার সামান্য দৃশ্য আমার সমস্ত মনোযোগ আকর্ষণ করে নিয়ে যায়। তোকে পূর্বপত্রে বলেছি বোধ হয়— কদিন ধরে গোটা-দুয়েক ভ্রমর প্রায়ই মাঝে মাঝে আমার বোটের চার দিকে এবং আমার বোটের মধ্যে এসে অত্যন্ত চঞ্চল ভাবে ব্যর্থ গুঞ্জনে এবং বৃথা অন্বেষণে ঘুরে বেড়াচ্ছে। রোজই বেলা নটা-দশটার সময় তাদের দেখা যায় — তাড়াতাড়ি একবার আমার টেবিলের কাছে, ডেস্কের নীচে, রঙিন সার্শির উপরে, আমার মাথার ধারে ঘুরে আবার হুস্ করে বেরিয়ে চলে যায়। আমি অনায়াসে মনে করতে পারি লোকান্তর থেকে কোনো অতৃপ্ত প্রেতাত্মা রোজ সেই একই সময়ে ভ্রমর-আকারে একবার করে আমাকে দেখেশুনে প্রদক্ষিণ করে চলে যায়। কিন্তু আমি তা মনে করি নে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস ওটা সত্যি-কার ভ্রমর, মধুপ, সংস্কৃতে যাকে কখনো কখনো বলে দ্বিরেফ।

সাতারা। ২৮ ফেব্রুয়ারি ১৮৯৫

১৯৩

শিলাইদহ

বুধবার, ১৬ ফাল্গুন ১৩০১

কাল বিকেলে সাধনার জন্যে একটা গল্প লেখা শেষ করে আজ কতকটা নিশ্চিন্ত হয়ে বসেছি। দুপুরবেলাটিও খুব নিস্তব্ধ এবং গরম এবং শান্ত এবং স্থির হয়ে আছে— খুব ছেলেবেলায় ইস্কুলে একটার সময় ছুটি হলে নির্জন ক্লাসে জানলার কাছে বসে কলকাতার বাড়ি-গুলোর শূন্য নিস্তব্ধ ছাদশ্রেণীর দিকে চেয়ে এবং বহুদূর আকাশের চিলের তীক্ষ্ণ আওয়াজ শুনে যে রকম মন-কেমন করতে থাকত, আজও ঠিক সেই রকম ভাবটা মনে উদয় হয়েছে। নিজের সেই সুগভীর স্বপ্নাবিষ্ট বাল্যকালের উদ্‌ভ্রান্ত কল্পনাগুলির কথা মনে পড়ছে — খুব বেশিদিনের কথা বলে মনে হচ্ছে না। অথচ এবারকার মানব-জন্মের অর্ধেক দিন তো চলে গেছেই। আমরা প্রত্যেক মুহূর্ত প্রত্যেক দিন মাড়িয়ে মাড়িয়ে জীবনটা সম্পূর্ণ করি, কিন্তু মোটের উপরে সবটা খুবই ছোটো। দুটি ঘণ্টা কালের নির্জন চিন্তার মধ্যে সমস্তটাকে ধারণ করা যেতে পারে। শেলি ত্রিশটা বৎসর প্রতিদিন সহস্র কাজে সহস্র প্রয়াসে জীবন ধারণ করে দুটি ভল্যুম জীবনচরিত গড়েছেন মাত্র, তার মধ্যেও ডাউডেন সাহেবের বাজে কথা বাজে তর্ক ঢের আছে— দুখানা বই এক হপ্তার মধ্যে অনায়াসেই শেষ করে ফেলা যায়। আমাদের এই ত্রিশটা বৎসরে বোধ করি দুখানা ভল্যুমও হয় না। এই তো ব্যাপার— এইটুকুমাত্র কাণ্ড, কিন্তু এর কতই আয়োজন— কত দ্বন্দ্ব, কত সংগ্রাম, কত দুশ্চেষ্টা! এইটুকুর রসদ জোগাবার জন্যে কত ব্যাবসা, কত জমিদারি, কত লোকজন! আছি এই দেড়হাত চৌকিতে চুপচাপ করে বসে— কিন্তু কত রকমে পৃথিবীর কত স্থানের কত জায়গাই জুড়ে আছি! সেই সমস্ত বাদ-সাদ প'ড়ে বাকি থাকে কেবল দুটি ঘণ্টার চিন্তা— তাও বেশি দিনের জন্যে নয়।

আজ আমার সেই ছেলেবেলাকার পুকুরের ধারের দক্ষিণ দিকের তোষাখানাটা মনে পড়ছে। তখন ই [রু] খুব ছোটো ছিল, সেও আমাদের দলের একটি ছিল। তোষাখানার সেই ক্ষুদ্র কেন্দ্রটি থেকে সেই ই [রু] কোথায় কতদূরে চলে গেছে, আমিও আর-এক লাইনে বহুদূরে এসেছি। তার পরে এমনি করে লাইন যদি বরাবর সোজা টেনে চলা যায় তা হলে সেই দক্ষিণদ্বারী জোড়াসাঁকোর তোষাখানার ঘর থেকে কোন্ রহস্যান্ধকারের মধ্যে গিয়ে প্রবেশ করতে হয় তার ঠিকানা নেই। আজকের আমার এই একলা বোটের দুপুর বেলাকার মনের ভাব, এই চিন্তা, এই একটা দিনের কুঁড়েমি এবং কল্পনা সেই বৃহৎ লাইনের মধ্যে কোন্‌খানে পড়ে— কোথায় অদৃশ্য হয়ে যায়। এই নিস্তরঙ্গ পদ্মার ধারের নিস্তব্ধ বালির চরের উপরকার নির্জন পরিপূর্ণ মধ্যাহ্নটি আমার অনন্ত অতীত এবং অনন্ত ভবিষ্যতের মধ্যে কি কোথাও একটি অতি ক্ষুদ্র সোনালি রেখার চিহ্ন রেখে দেবে? ভারতবর্ষের রোদ্দুরটার মধ্যে কী-যে একটা বৈরাগ্য আছে সে কারও সাধ্য নেই এড়াতে পারে।

সাতারা
৫ মার্চ ১৮৯৫

বুধবার ১৬ ফাল্গুন— ২৭ ফেব্রুয়ারি ১৮৯৫ তারিখ। পরবর্তী চিঠিতে এই চিঠিরই উল্লেখ আছে মনে করিলে, সম্ভবতঃ উভয়েরই রচনা ২৮ ফেব্রুয়ারি ১৮৯৫ তারিখে।

১৯৪

শিলাইদহ

বুধবার ?

২৮ ফেব্রুয়ারি। ১৮৯৫।

আজ আমি এক অনামিকা চিঠি পেয়েছি। তার আরম্ভই হচ্ছে—

পরের পায়ে ধরে প্রাণ দান করা
সকল দানের সার !

তার পরে অনেক উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছে। আমাকে সে কখনো দেখে নি, কিন্তু আজকাল আমার 'সাধনা'র মধ্যে সে আমাকে দেখতে পায়। তাই লিখেছে— 'তোমার সাধনায় রবিকর পড়িয়াছে, তাই রবি-উপাসক যত ক্ষুদ্র যত দূরে থাকুক তবুও তার জন্যেও আজি রবিকর বিকীর্ণ হইতেছে। তুমি জগতের কবি, তবুও সে ভাবিতেছে আজি তুমি তাহারও কবি।' ইত্যাদি ইত্যাদি। মানুষ ভালোবাসার জন্যে এতই ব্যাকুল যে, শেষকালে নিজের আইডিয়াকে নিয়ে ভালোবাসতে থাকে। আইডিয়াকে রিয়ালিটির চেয়ে কম সত্য মনে করা আমাদের একটা মোহ মাত্র। ইন্দ্রিয়ের দ্বারা আমরা যা পাচ্ছি, বিজ্ঞান এবং দর্শন বলছে, সেটা আমাদের ইন্দ্রিয়ের তৈরি ; প্রকৃত সেটা কী কেউ জানে না— আমরা আইডিয়ার দ্বারা যা পাই সেটা আমাদের মনের সৃষ্টি, তারও প্রকৃত সত্তা কেউ বলতে পারে না। তবু মনের সৃষ্টির চেয়ে ইন্দ্রিয়ের সৃষ্টিকে লোকে বেশি বিশ্বাস করে। যারা আমাকে ইন্দ্রিয়-দ্বারা, সঙ্গসাক্ষাৎ-দ্বারা জানে, তারাও আমার প্রকৃত সত্য থেকে অসীম দূরে আছে— আর এই আমার অনামক ভক্তটি তার আইডিয়ার দ্বারা আমাকে যে রকম করে অনুভব করছে সেটা হয়তো অপেক্ষাকৃত সত্য। প্রত্যেক

মানুষের ভিতরেই একটি আইডিয়াল মানুষ আছে; সেটা কেবল ভক্তি প্রীতি স্নেহের দ্বারা খানিকটা নাগাল পাওয়া যায়, প্রত্যেক ছেলের মধ্যে যে-একটি অসীম আইডিয়াল আছে সে কেবল ছেলের মা তার সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে অনুভব করে— অন্যের ছেলের মধ্যে সে সেই আইডিয়াল সত্তাটি সেই অনির্বচনীয় সত্যটি দেখতে পায় না। রিয়ালিটিতে সেই আইডিয়াল সত্যকে অনেক সময় আচ্ছন্ন করে ফেলে। আমরা হয়তো কল্পনাবলে শিশুজাতিকে মনে মনে স্নেহ করতে পারি, কিন্তু একটা সত্যিকার ছেলের মলিনতা কুশ্রীতা কাঁদুনিতা দেখে আমরা কিছুতেই কল্পনা করতে পারি নে তার মধ্যে এমন কী আছে যে জন্যে তার মা তার জন্যে প্রাণ সমর্পণ করতে পারে— পৃথিবীর সব চেয়ে তাকে প্রিয়তম সুন্দরতম মনে করতে পারে! মা তার ছেলেকে যা মনে করে প্রাণ দেয় সেইটেই কি মিথ্যা আর আমি তার ছেলেকে যা মনে করে তার জন্যে প্রাণ দিতে পারি নে সেইটেই কি বেশি সত্য? আমি এই কথা বলি, প্রত্যেক ছেলে এবং প্রত্যেক বুড়োর মধ্যে এমন একটা জিনিষ আছে যার জন্যে প্রাণ সমর্পণ করতে পারা যায়। আমাদের স্বভাবে যথেষ্ট প্রেম নেই ব'লে আমরা সেই আইডিয়ালকে আবিষ্কার করতে পারি নে। সমস্ত মানুষ এবং প্রত্যেক মানুষের জন্যে যিশুখৃস্টের প্রাণসমর্পণের মধ্যে সেই সত্যটা গোপন আছে। প্রত্যেক জীবই অনন্ত কালের অনন্ত যত্নের ধন, তার মধ্যে একটি অনন্ত সৌন্দর্য আছে। কী কথা থেকে কী কথা উঠল দেখ্। আসল কথাটা হচ্ছে— এক হিসাবে আমি আমার এই ভক্তটির প্রীতি-উপহার গ্রহণ করবার যোগ্য নই, হয়তো সে যদি আমাকে প্রতিদিন ঘনিষ্ঠভাবে জানত তা হলে এ রকম প্রীতি করতে সক্ষম হত না; আর-এক হিসাবে আমিও এই রকম, এমন-কি, এর চেয়ে ঢের বেশি প্রীতি পাবার

অধিকারী। এই কথাটাই হচ্ছে খৃস্টানধর্মের এবং বৈষ্ণবধর্মের মর্মের কথা। আজ দুপুরবেলায় একখানা চিঠিতে অনেক বৈরাগ্যের কথা লিখেছি, আবার সন্ধ্যার সময় আর-একখানা চিঠি লিখতে গিয়ে অনুরাগের কথা এসে পড়ল!

সাতারা
৫ মার্চ ১৮৯৫

১৯৫

শিলাইদহ

১ মার্চ্। ১৮৯৫।

এক-একদিন চিঠি না পেয়ে তার পরদিন পেলে একটা বিশেষ নতুন আনন্দ পাওয়া যায়— হঠাৎ মনের এবং সেই সঙ্গে দৈনিক কাজের কলটা যে বিগড়ে ছিল সেইটে আবার যখন হঠাৎ উৎসাহের সঙ্গে চলতে আরম্ভ করে তখন বেশ একটা উল্লাস অনুভব করা যায়। পৃথিবীটা ঠিক আমার মনের মতো নয় এইটে মনে করে অনেক সময় বিষণ্ণ হয়ে থাকা যায়, কিন্তু এক-এক দিন আসে যখন পৃথিবীটা ঠিক পূর্বের মতোই আছে এইটে মনে করে বুকের মধ্যে রক্ত দ্রুতবেগে বইতে আরম্ভ করে। ক্রিস্টিনা রসেটির যে কবিতা পাঠিয়ে দিয়েছিস সেটা বেশ লাগল। কিন্তু তার প্রথম চার লাইনই ভালো এবং ঐ চার লাইনেই সমস্ত কথাটা সম্পূর্ণরূপে শেষ হয়ে গেছে। তার পরে যেটা জুড়ে দেওয়া হয়েছে তাতে করে ভাবটা অগ্রসর হয় নি, বরঞ্চ কিছু দুর্বল হয়ে পড়েছে। এক-একটা গান যেমন আছে যার আস্থায়ীটা বেশ, কিন্তু অন্তরাটা ফাঁকি— আস্থায়ীতেই সুরের সমস্ত বক্তব্যটা সম্পূর্ণরূপে শেষ হওয়াতে কেবল নিয়মের বশ হয়ে একটা অনাবশ্যক অন্তরা জুড়ে দিতে হয়। যেমন আমার সেই 'বাজিল কাহার বীণা মধুর স্বরে' গানটা— তাতে সুরের কথাটা গোড়াতেই শেষ হয়ে গেছে, অথচ কবির মনের কথাটা শেষ না হওয়াতে গান যেখানে থামতে চাচ্ছে কথাকে তার চেয়ে বেশি দূর টেনে নিয়ে যাওয়া গেছে। কবিতাতেও একটা সুর আছে, ক্রিস্টিনা রসেটির এই কবিতায় সেই আসল সুরটুকু প্রথম চার লাইনেই শেষ হয়ে গেছে। তুই লিখেছিস, 'আমি এপর্যন্ত বুঝতে পারলুম না যে, আসল, ভালো ভাব ভালো প্রকাশ করেছে ব'লে আমার কোনো কবিতা ভালো লাগে— না শুধু একটু 'ধরণে'র জন্যে, শুধু একটু ঘুরিয়ে চুট্ করে বলা একটু ভাষার

চালাকির জন্যে।' আসল কথাটা হচ্ছে এই যে, অধিকাংশ ভাবই আমাদের কাছে পুরাতন ; এবং আমাদের মনের ধর্মই এই যে, পুরাতন অভ্যস্ত জিনিষগুলির সম্পূর্ণ সৌন্দর্য এবং রস আমাদের অনুভব করবার ক্ষমতা নেই— সেই জন্যে কোনো কবি যখন পুরাতন ভাবের মধ্যে ভাষা ছন্দ এবং বলবার নতুন ধরণের দ্বারা আমাদের মনকে আকর্ষণ করে আনে তখন আবার আমরা নতুন করে সেই জিনিষটির আসল রসটুকু আস্বাদন করতে পারি— তখন চিরকেলে শোনা কথাটা নতুন সংগীতে কানের মধ্যে মনের মধ্যে বাজতে থাকে। কবিদের একটা প্রধান কাজ, পৃথিবীটাকে সর্বদা তাজা রেখে দেওয়া— গাছের সবুজ, আকাশের নীল, সন্ধ্যাবেলাকার সোনালি, সমস্ত এতদিনে ধুলো পড়ে অনেকটা ম্যাড়্‌মেড়ে হয়ে আসত, যদি না কবিরা সর্বদাই তার উপরে আপনাদের কল্পনাপাত করে আসত। মানুষের মনটা চিন্তার তাপে শীঘ্র শীঘ্র পেকে যায় বলে কবিত্বের কাজ হচ্ছে কল্পনার অমৃত সিঞ্চন করে তাকে অনন্তকাল সজীব সরস করে রাখা। সে নতুন জিনিষ কিছুই দেয় না, সে কেবল মনটাকে নতুন করে রাখতে চেষ্টা করে।

সাতারা

৬ মার্চ ১৮৯৫

১৯৬

শিলাইদহ

৬ মার্চ। ১৮৯৫।

সৌন্দর্যের চর্চা কিম্বা সুবিধার চর্চা এর মধ্যে কোন্‌টাকে প্রাধান্য দিতে হবে এই নিয়ে তোর আজকের চিঠিতে একটুখানি তর্ক আছে— ওটা অনেকটা অবস্থা এবং অসুবিধার পরিমাণের উপরে নির্ভর করে। ফর ইন্‌স্‌টান্‌স্‌, ছাতা মাথায় দিয়ে ঘোড়ায় চড়ার তুই যে উদাহরণ দিয়েছিস সেটার মধ্যে প্রকৃত পক্ষে সৌন্দর্যের কোনো তর্ক নেই। কেননা, হয়তো ঘোড়ায় চড়ে ছাতা মাথায় দিলে অসুন্দর না হতেও পারে, এ দিকে আবার ঘোড়া চালাবারও অসুবিধে হতে পারে। কিন্তু আমার মতে ওটা অসংগত। ঘোড়ায় চড়ার সঙ্গে পৌরুষের একটা অ্যাসোসিয়েশন আছে ; সেই জন্যে লোকের সহজেই মনে হয়, যদি ঘোড়ায় চড়তেই বসলে তবে আবার ছাতা মাথায় কেন? অসুবিধা অসুন্দর এবং অসংগত এই তিনটেকেই এড়িয়ে চলা আবশ্যক ; কিন্তু বোধ হয় শেষটাকে সব চেয়ে বেশি। মেয়েদের মতো শাড়ি পরলে যদি কোনো পুরুষকে সুন্দর দেখতেও হয় এবং অসুবিধাও না হয়, তবু সে অদ্ভুত কাজে না যাওয়াই সংগত। সে সম্বন্ধে লজ্জাটা একটা স্বাভাবিক লজ্জা। আসলে, নিজেকে বেশি করে কারও চোখে ফেলতে একটা স্বভাবতই সংকোচ হয়— ইংরাজিতে যে-সমস্ত আচরণকে 'লাউড' বলে সেটা ঐ কারণেই নিন্দনীয় এবং যথার্থ ভদ্রতার স্বভাবই হচ্ছে অপ্রগল্‌ভ। অসংগত অদ্ভুত ব্যবহারে লোকের দৃষ্টি যে রকম অধিক ক'রে আকর্ষণ করে তাতে লোকের লজ্জা অনুভব করাই উচিত— যেমন নিজের সম্বন্ধে খুব বেশি করে সচেতন থাকাটা কিছু নয় তেমনি পরের চেতনার উপর প্রবল আঘাতে নিজেকে আছড়ে ফেলতে বিশেষ একটা অপ্রবৃত্তি থাকা উচিত। আমি যদি রাত-কাপড় প'রে ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করি তা হলে মহাভারত

অশুদ্ধ হয় না! এবং হয়তো সুন্দর দেখতে হতেও পারে, কিন্তু অসংগত ব্যবহারের দ্বারা খামকা লোককে আঘাত দেওয়া ঠিক শিষ্টাচার নয়। এর একটা সীমা আছে, কিন্তু সে সীমা অনেক দূরে। যখন কোনো প্রচলিত নিয়ম —কোনো দেশব্যাপী অভ্যাস— আমি অন্যায় এবং সাধারণের অনিষ্টজনক মনে করি, কিম্বা কোনো নূতন প্রথা যদি হিতকর ব'লে মনে হয়, তখন সে বিষয়ে সাধারণকে গুরুতর আঘাত দিতে কুণ্ঠিত হওয়া উচিত হয় না; তখন সংগত অসংগতর তর্কটা ভারী ছোটো। কিন্তু মনের সেই স্থির লক্ষ এবং উচ্চ অভিপ্রায়টা থাকা চাই। আমাদের দেশের মেয়েরা ছাতা মাথায় এবং জুতো পায়ে দেয় না, অতএব যে মেয়ে এ কাজ প্রথমে করবে তাকে সকলের বিদ্রূপ-চোখে পড়তেই হবে— কিন্তু তাই ব'লে সে লোকব্যবহারকে খাতির করে চললে চলে না। কিন্তু সাধারণত সাধারণ মানুষের মতো চলার সুবিধে এই যে, তাতে অন্য লোকেরও চলার বাধা হয় না, নিজেরও চলার সুবিধে হয়— নইলে অন্য লোককেও ব্যাঘাত করা হয় নিজেরও অনর্থক ব্যাঘাতের কারণ হয়। ছোটোখাটো সুবিধা অসুবিধার জন্যেও যদি সাধারণের অভ্যাস এবং সংস্কারের সঙ্গে বিরোধ করে চলতে হয়, তা হলে সেটা ঠিক মশা মারতে কামান পাতার মতো একটা অদ্ভুত অসংগত কাণ্ড হয়। সেই অসংগতির মধ্যে যে-একটা হাস্য অথবা বিরক্তি -জনকতা আছে, সেটা অতিক্রম করবার উপযুক্ত কোনো উচ্চ অভিপ্রায় তার মধ্যে পাওয়া যায় না। তা হলে তো ভদ্রবেশে ভদ্রসমাজে গিয়ে গরম বোধ করবামাত্র চাপকান এবং কামিজ খুলে ফেলে দিব্যি গা'টি অনাবৃত করে বসা যায়— ফিলজফাইজ করতে গেলে, তাতেই বা দোষ কী! লোকে কী মনে করবে বলে আমি গরমে শরীরকে অসুস্থ করব কেন? আমি বক্তৃতা দিচ্ছি বটে, কিন্তু লোকব্যবহারবিরুদ্ধ আচরণ আমি নিজে অনেক

করেছি। কিন্তু তার স্বপক্ষে আমি কোনো কথা বলতে চাই নে— আমি জানি সে আমার খেয়াল, আমার পাগলামি। ব[ড়দা]রও উল্টো জোব্বা এবং ট্রাইসিক্‌লের বেশটাও যে খুব সর্বসম্মত তা কেউ বলবে না, কিন্তু যখন প্রিন্সিপ্‌ল্‌ নিয়ে তর্ক হচ্ছে তখন ব্যক্তিগত আচরণের কথা তোলবার দরকার নেই। যেখানে কেবলমাত্র নিজেকে নিয়ে কথা সেখানে সুবিধা এবং সৌন্দর্যের সামঞ্জস্য করবার চেষ্টা করা আবশ্যক, যেখানে সমাজকে নিয়ে কথা সেখানে সুবিধা সৌন্দর্য এবং সুসংগতি এই তিনটেরই সামঞ্জস্য করা আবশ্যক— এইটে হচ্ছে স্থূল কথা। তর্কেই চিঠি পূরে এল— চিঠির কাগজ ছোটো হওয়ার সুবিধা এই যে তর্ককেও ছোটো করতে হয়, নইলে বড়ো প্রবন্ধ হয়ে উঠত।

সাতারা

১১ মার্চ ১৮৯৫

১৯৭

শিলাইদহ

৭ মার্চ্। ১৮৯৫।

তোর কালকের সেই চিঠিটা পড়ে আমি ভাবছিলুম যে, এটা সত্যি বটে মেয়েরা আপনার চতুর্দিকে সৌন্দর্যরক্ষার প্রতি পুরুষদের চেয়ে ঢের বেশি যত্ন করে, কিন্তু সত্যি-সত্যি পুরুষদের চেয়ে কি তাদের সৌন্দর্যপ্রিয়তা বেশি আছে? এ-সব বিষয়ে সাধারণভাবে কোনো মীমাংসা করা যায় না; কারণ, মেয়ে পুরুষ উভয় জাতির মধ্যেই লোকবিশেষে সকল গুণের ইতরবিশেষ আছে— এরকম বিষয়ে যখন আমরা কোনো কথা বলি তখন প্রায় নিজেকেই নিজের জাতের প্রতিনিধিস্বরূপে ধরে নেওয়া যায়। আমি যদিচ নিজের চারি দিককে সুন্দর করে রাখতে ইচ্ছে করি, কিন্তু অনেক সময়েই নানা কারণে তাতে অবহেলা প্রকাশ করে থাকি— অনেক সময় সব অগোছালো হয়ে যায় এবং সর্বদা নিজেকেও যে পরিপাটী করে রাখি তা নয়। কিন্তু সৌন্দর্য যে আমাকে পাগল করে দেয় সে বিষয়ে আমার কোনো সন্দেহ নেই— সৌন্দর্য এবং ভালোবাসার মধ্যে আমি যতটা অনন্ত গভীরতা হৃদয়ের সঙ্গে অনুভব করি এমন আর কিছুতে না, এবং যখন যথার্থ সেই ভাবাবেশে নিমগ্ন থাকা যায় তখন নিজের ব্যক্তিগত সাজসজ্জা এবং পারিপাট্যকে তেমন বেশি কিছু মনে হয় না— যখন মনটা সৌন্দর্যরসে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে তখন সেইটেই যথেষ্ট হয়। আমার বি[হারীলাল]কে মনে পড়ে; লোকটি নেহাত অসজ্জিত ঢিলেঢালা অপরিপাটী— কিন্তু তার লেখা পড়লে এ বিষয়ে সন্দেহ থাকে না যে, সে একটি সৌন্দর্যের মাতাল ছিল। ব[ড়দাদা] যে এক সময়ে যথার্থ কবির মতো সমুদয় সৌন্দর্য উপভোগ করতেন সে বিষয়েও কোনো সন্দেহ নেই, কিন্তু তিনি যে কোনোকালে তাঁর চারি দিক সুন্দর করে রাখতেন না এবং সুন্দর হয়ে থাকতেন না সেও নিশ্চয়।

নিজের সম্বন্ধীয় সমস্ত জিনিষ এবং সমস্ত ব্যাপারের সঙ্গে একটা সৌন্দর্যের অ্যাসোসিয়েশন থাকে এ ইচ্ছাটা মেয়েদের স্বাভাবিক। যখনই তাকে মনে পড়বে অমনি তার সঙ্গে সুগন্ধ সুদৃশ্য সুপারিপাট্য মনে উদয় হবে, লক্ষ্মীর সঙ্গে সঙ্গে তাঁর সোনার পদ্মটিও চোখে পড়বে এটা খুব আবশ্যক। নিজেকে সৌন্দর্যের আদর্শ করতে হলে চারি দিককে সুন্দর করে তোলা চাই। ফুল প্রভৃতি সমস্ত সুন্দর জিনিষের প্রতি মেয়েদের একটি মমতাপূর্ণ স্নেহ আছে— সে-সমস্ত যেন তাদের নিজের বিশেষ জিনিষ, তারা তাদের সঙ্গে সম্বন্ধে বদ্ধ। কিন্তু সৌন্দর্যের প্রতি পুরুষের মনের ভাব কিছু যেন স্বতন্ত্র প্রকৃতির— আমাদের কাছে সৌন্দর্যের আকর্ষণ ঢের বেশি প্রবল, সৌন্দর্যের অর্থ ঢের বেশি গভীর। আমি হয়তো ঠিক প্রকাশ করতে পারব না এবং প্রকাশ করতে গেলে হয়তো অলীক কবিত্বের মতো শোনাতে পারে— সৌন্দর্য আমার কাছে প্রত্যক্ষ দেবতা-- যখন মনটা বিক্ষিপ্ত না থাকে এবং যখন ভালো করে চেয়ে দেখি তখন এক-প্লেট গোলাপ-ফুল আমার কাছে সেই ভূমানন্দের মাত্রা যার সম্বন্ধে উপনিষদে আছে: এতস্যৈবানন্দস্যান্যানি ভূতানি মাত্রামুপজীবন্তি। সৌন্দর্যের ভিতরকার এই অনন্ত গভীর আধ্যাত্মিকতা এটা কেবল পুরুষরা উপলব্ধি করতে পেরেছে। এই জন্যে পুরুষের কাছে মেয়ের সৌন্দর্যের একটা বিশ্ব-ব্যাপকতা আছে। সেদিন শঙ্করাচার্যর আনন্দলহরী ব'লে একটা কাব্যগ্রন্থ পড়ছিলুম, তাতে সে সমস্ত জগৎসংসারকে স্ত্রীমূর্তিতে দেখছে— চন্দ্র সূর্য আকাশ পৃথিবী সমস্তই স্ত্রীসৌন্দর্যে পরিব্যাপ্ত করে দিয়েছে— অবশেষে সমস্ত বর্ণনা সমস্ত কবিতাকে একটা স্তবে একটা ধর্মোচ্ছ্বাসে পরিণত করে তুলেছে। বিহারী চক্রবর্তীর সারদামঙ্গল সংগীতটাও ঐ শ্রেণীর। শেলির এপিসিকিডিয়নেরও ঐ অর্থ। কীট্‌সের অধিকাংশ কবিতা পড়লে মনে ঐ ভাবটার উদ্রেক হয়। কেবল

চক্ষুকে কিম্বা কল্পনাকে নয়— সৌন্দর্য যখন একেবারে সাক্ষাৎভাবে আত্মাকে স্পর্শ করতে থাকে তখনই তার ঠিক মানেটি বোঝা যায়। আমি যখন একলা থাকি তখন প্রতিদিনই তার সুস্পষ্ট স্পর্শ অনুভব করি, সে যে অনন্ত দেশকালে কতখানি জাগ্রত সত্য তা বেশ বুঝতে পারি— এবং যা বুঝতে পারি তার অর্ধেকের অর্ধেকও বোঝাতে পারি নে।

সাতারা
১২ মার্চ, ১৮৯৫

শিলাইদহ

৮ মার্চ্‌। ১৮৯৫।

সাজাদপুরে গিয়ে একেবারে অনেক চিঠি জমে আছে দেখতে পাব। পৃথিবীতে অনেক মহামূল্য উপহার আছে, কিন্তু সামান্য চিঠিখানি কম জিনিষ নয়। পোস্ট্‌ আফিস হয়ে মানুষের এই একটা নতুন সুখ-বৃদ্ধি হয়েছে। এ একটা নতুন জাতের সুখ। আমি সুবিধার কথা বলছি নে, সে তো আছেই। কিন্তু চিঠির দ্বারা পৃথিবীতে একটা নতুন আনন্দের সৃষ্টি হয়েছে। মানুষের সঙ্গে মানুষের আর-একটা বন্ধন যোগ করে দিয়েছে। আমরা মানুষকে দেখে যতটা লাভ করি, তার সঙ্গে কথাবার্তা কয়ে যতটা লাভ করি, আবার চিঠিপত্র পেয়ে আর-এক দিক থেকে তাকে আর-এক রকম করে পাই। চিঠিপত্র-দ্বারা যে আমরা কেবল প্রত্যক্ষ আলাপের অভাব দূর করি, অসাক্ষাতে থেকেও কথাবার্তা কই, তা নয়, তার মধ্যে আরও একটু রস আছে—ঠিক সেটা প্রতিদিনের দেখাসাক্ষাৎ কথাবার্তার মধ্যে নেই। মানুষ মুখের কথায় আপনাকে যতখানি এবং যে রকম করে প্রকাশ করে লেখার কথায় ঠিক ততখানি করে না, আবার লেখায় যতখানি করে মুখের কথায় ততখানি করে না। উভয়ের মধ্যেই খানিকটা অসম্পূর্ণতা আছে যা কেবল উভয়ে মিলে পূরণ করতে পারে। এই জন্যে মানুষের পরস্পর সম্বন্ধের মধ্যে চিঠিপত্র একটা নতুন-জাতীয় সুখ এবং বার্তা বহন করছে, যা পূর্বে ছিল না। এ যেন মানুষকে দেখবার জন্যে এবং পাবার জন্যে একটা নতুন ইন্দ্রিয়বৃদ্ধি হয়েছে। সামান্য কথা-বার্তা এবং আলোচনা চিঠির মধ্যে বাঁধা প'ড়ে একটা নতুন চেহারা বার করে— কথায় যে জিনিষটা এড়িয়ে যায় এবং প্রবন্ধে যে জিনিষটা কৃত্রিম হয়ে ওঠে, চিঠিতে সেইটে অতি সহজে আপনাকে ধরা দেয়। আমার মনে হয়, যারা চিরকাল অবিচ্ছেদে চব্বিশ ঘণ্টা

পরস্পর কাছাকাছি যাপন করেছে, যাদের মধ্যে কখনো চিঠিপত্র লেখালেখির অবসর হয় নি, তারা পরস্পরকে অসম্পূর্ণভাবে জানে, পরস্পরের চরিত্রের অনেক ডেলিকেট অনেক সত্য এবং সুগভীর জিনিষ তাদের জানবার কোনো উপায়ই হয় না। যেমন বাছুর কাছে এলে গোরুর বাঁটে আপনি দুধ জুগিয়ে আসে, তেমনি মনের বিশেষ বিশেষ রস কেবল বিশেষ বিশেষ উত্তেজনায় আপনি সঞ্চারিত হয়, অন্য উপায়ে হবার জো নেই— এই চার পৃষ্ঠার চিঠি মনের ঠিক যে জায়গাটি দোহন করতে পারে, কথা কিম্বা প্রবন্ধের প্রভাব ঠিক সে জায়গায় কখনো পৌঁছতে পারে না। আমার বোধ হয় ঐ লেফাফার মধ্যে একটি মোহ আছে, লেফাফাটি চিঠির একটি প্রধান অঙ্গ— ওটা একটা মস্ত আবিষ্কার। বোধ হয় ফরাসী জাতিকে এ জন্যে ধন্যবাদ দিতে হয়

সাতারা

১৩ মার্চ ১৮৯৫

১৯৯

শিলাইদহ

১০ মার্চ। ১৮৯৫।

এবারে মনে মনে স্থির করেছি কলকাতায় গিয়ে কোনো গোলমালের মধ্যে প্রবেশ করব না, চুপচাপ করে স্থির শান্ত চিত্তে লেখাপড়া করব। তার চেয়ে সুখের অবস্থা আর কিছু নেই। আজ বোধ হচ্ছে ত্রয়োদশী— খুব জ্যোৎস্না হবে— এই দু-চার দিন জ্যোৎস্নালোকে আমার পদ্মাপারের চরটাকে যতটা পারি অন্তরের মধ্যে বোঝাই করে নিয়ে যেতে হবে। খুব সম্ভব আসছে বারে যখন এখানে আসব তখন এই বিস্তীর্ণ শুভ্র চরখানি আর থাকবে না। তখন হয় ওখানে পদ্মার জল নয় চষা মাটি। আজকাল আর আমার একলা বেড়ানো হয় না। সঙ্গে প্রায়ই শৈ·· এবং ঠা··· বাবু থাকেন। তাঁদের কথাবার্তার মাঝে হঠাৎ এক-একবার অল্পক্ষণের মতো সমস্ত জ্যোৎস্নামণ্ডিত শান্তিপূর্ণ দৃশ্যটি এবং অনন্ত-আকাশ-পূর্ণ নিস্তব্ধতা আমার সম্মুখে এসে উপস্থিত হয়— আমার সেই চিরপরিচিতটি পর্দা সরিয়ে দিয়ে এক-একবার আমাকে দেখা দিয়ে যায়। তখন সমস্ত মনের মধ্যে এক আশ্চর্য পরিপূর্ণতা এসে উপস্থিত হয়— একটা যেন সুবৃহৎ সুকোমল সুগভীর আলিঙ্গনে আমার মনের আকণ্ঠ প্রচ্ছন্ন হয়ে যায়, একটা নিঃশব্দ নিস্তব্ধ একান্ত প্রেম আমাকে নক্ষত্রলোক থেকে এসে আবৃত করে দেয়। হঠাৎ সেই-সব কাজের কথা এবং শুকনো কথার মাঝখানে ক্ষণকালের জন্যে এই একটা সুগম্ভীর সুবিশাল আবির্ভাব আমার নিজের কাছেই আশ্চর্য বোধ হয়, আমার দুই পাশের দুই সঙ্গীকে তখন ভারী অসংগত মনে হয়। আমরা তিনজনে একত্রে বেড়াচ্ছি অথচ, কিছুক্ষণের জন্যে, তারা যেখানে বেড়াচ্ছে আমি সেখানে নেই। আমাকে আমার জ্যোৎস্নামগ্ন গম্ভীর মৌন জগৎ কথাবার্তার ক্ষণিক অবসরে হঠাৎ জানিয়ে দেয়, 'মনে

কোরো না তোমার সঙ্গী কেবল দুজন আছে, আমরাও যেমন সেই চির-দিন দাঁড়িয়ে থাকি তেমনি আজও দাঁড়িয়ে আছি—

আমি নিশিদিন হেথা বসে আছি,
তোমার যখন মনে পড়ে আসিয়ো।

আমি কৌতুকহাস্যের কথা সাধনায় লিখেছি। আমি যখন জ্যোৎস্না-রাত্রে পদ্মার ধারের নির্জন চরে ঠা·· বাবুর মুখ থেকে এখানকার সেরেস্তার রিপোর্ট্ শুনতে থাকি এবং সেই রিপোর্টের ফাঁকে ফাঁকে নক্ষত্রভরা আকাশ উঁকি মারতে থাকে, তখন তার কৌতুকটা আমি এক-একবার অনুভব করতে পারি— ওর মধ্যে কোনো-একজন লোকের একটা মিষ্টি দুষ্টুমির হাসি আছে।

সাতারা
১৫ মার্চ ১৮৯৫

শিলাইদহ

১১ মার্চ । ১৮৯৫ ।

আমার কাছে অনেকগুলো জিনিষ কোনোকালে পুরোনো হয় না— হয়তো যখন তফাতে থাকি তখন অন্যান্য জড় জিনিষের চাপে সেগুলোর উজ্জ্বলতা হ্রাস হয়ে যায়, কিন্তু যেই আবার তাদের সম্মুখবর্তী হই অমনি সমস্ত পুরোনো ভাব একেবারে নতুন হয়ে মনে জেগে ওঠে। আমার এই মফস্বলের প্রবাসটি কলকাতায় অনেক-সময় ম্লান স্মৃতিরূপে মনে থাকে, তখন মনে হয় আমার সেই পদ্মাতীর হয়তো পুরোনো হয়ে গেছে— কিন্তু আশ্চর্য এই, যেই এখানে পা ফেলি অমনি দেখতে পাই সবই সেই প্রথম শুভদৃষ্টির সময়টির মতোই উজ্জ্বল বিস্ময়পূর্ণ হয়ে আছে। রোজই সন্ধ্যার সময় চরে বেড়াবার সময় আমার এই কথাটা মনে উদয় হয় যে, অন্যদিন যেটা আমার কাছে নতুন বলে ঠেকেছিল আজও ঠিক সেইটে আমার কাছে নতুন ঠেকছে— ঠিক সেই ভাবটা সেই রকম করে বুকের মধ্যে পূরে আসছে, যেন আজ এখানে এই প্রথম এলুম। এইটেই আমার কাছে ভারী পুলকের এবং বিস্ময়ের কারণ। আমার বোধ হয় বহুকাল থেকে তোকে আমি এ-সব জায়গা থেকে যে-সকল চিঠি লিখেছি সকলেরই ভাবখানা এক। বারম্বার আমি একই কথা একই আগ্রহকে প্রায় একই ভাষায় প্রকাশ করেছি। আমার আর অন্য উপায় নেই— কারণ, আমি ঠিক একই ভাব প্রতিবারেই নতুন করে অনুভব করি। আমার অনেক সময় ইচ্ছা করে তোকে যে-সমস্ত চিঠি লিখেছি সেইগুলো নিয়ে পড়তে পড়তে আমার অনেক দিনকার সঞ্চিত অনেক সকাল দুপুর সন্ধ্যার ভিতর দিয়ে আমার চিঠির সরু রাস্তা বেয়ে আমার পুরাতন পরিচিত দৃশ্যগুলির মাঝখান দিয়ে চলে যাই। কত দিন কত মুহূর্তকে আমি ধরে রাখবার চেষ্টা করেছি,

•সেগুলো বোধ হয় তোর চিঠির বাক্সর মধ্যে ধরা আছে— আমার চোখে পড়লেই আবার সেই-সমস্ত দিন আমাকে ঘিরে দাঁড়াবে। ওর মধ্যে যা-কিছু আমার ব্যক্তিগত জীবন -সংক্রান্ত সেটা তেমন বহুমূল্য নয়— কিন্তু যেটাকে আমি বাইরের থেকে সঞ্চয় করে এনেছি, যেটা এক-একটা দুর্লভ সৌন্দর্য, দুরমূল্য সম্ভোগের সামগ্রী, যেগুলো আমার জীবনের অসামান্য উপার্জন— যা হয়তো আমি ছাড়া আর কেউ দেখে নি, যা কেবল আমার সেই চিঠির পাতার মধ্যে রয়েছে, জগতের আর কোথাও নেই— তার মর্যাদা আমি যেমন বুঝব এমন বোধ হয় আর কেউ বুঝবে না। আমাকে একবার তোর চিঠিগুলো দিস [বব], আমি কেবল ওর থেকে আমার সৌন্দর্যসম্ভোগগুলো একটা খাতায় টুঁকে নেব। কেননা, যদি দীর্ঘকাল বাঁচি তা হলে এক সময় নিশ্চয় বুড়ো হয়ে যাব; তখন এই-সমস্ত দিনগুলো স্মরণের এবং সান্ত্বনার সামগ্রী হয়ে থাকবে। তখন পূর্বজীবনের সমস্ত সঞ্চিত সুন্দর দিনগুলির মধ্যে তখনকার সন্ধ্যার আলোকে ধীরে ধীরে বেড়াতে ইচ্ছে করবে। তখন আজকেকার এই পদ্মার চর এবং স্নিগ্ধ শান্ত বসন্তজ্যোৎস্না ঠিক এমনি টাটকা-ভাবে ফিরে পাব। আমার গদ্যে পদ্যে কোথাও আমার সুখদুঃখের দিনরাত্রিগুলি এরকম করে গাঁথা নেই।

সাতারা

১৬ মার্চ ১৮৯৫

২০১

কলকাতা

১৫ মার্চ্। ১৮৯৫।

আজ সকালবেলাটা যে কী করে কাটিয়েছি তা বলতে পারি নে। কোনো কাজই করি নি, বোধ হয় বিশেষ কিছু ভাবিও নি। বেশ দক্ষিণের বাতাস দিচ্ছিল এবং গরমে শরীরের সমস্ত গ্রন্থি শিথিল হয়ে এসেছিল, চুপচাপ করে একলাটি পড়ে ছিলুম, গড়াচ্ছিলুম, খবরের কাগজের পাত ওল্‌টাচ্ছিলুম— মনে জানি যে, চিঠিপত্র লেখা আছে, প্রুফ্‌শিট্‌-সংশোধন আছে, সাধনার লেখা আছে, কাছারির কাজ আছে, বাবামশায়ের কাছে হিসেব শোনাতে যাবার কথা আছে, কিন্তু তবু আলস্যের জন্যে মনে অনুতাপ-মাত্র নেই— বোধ হয় অনুতাপ করবার মতো উদ্যম শরীরমনে ছিল না। কিন্তু এই বসন্ত-প্রভাতের বাতাসে আমাকে বড়ো মাটি করে দেয়। কেবল এই উদার উত্তপ্ত বাতাসটিকে সর্বশরীরে লাগানোই একটা যথেষ্ট কর্তব্য কাজ বলে মনে হয়— মনে হয়, এই মিষ্টি বাতাসের প্রবাহটি যেন আমার প্রতি বাইরের প্রকৃতির একটা প্রত্যক্ষ আলাপচারি। পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেছিলুম, বসন্তের বাতাসটি গায়ে লেগেছিল, কনকচাঁপার গন্ধে মস্তিষ্ক ভরে গিয়েছিল, মাঝে মাঝে এক-একটা সকালবেলা এক-একটা দৈববাণীর মতো আমার কাছে এসে উপনীত হয়েছিল— একজন স্বল্পজীবী মানুষের পক্ষে এই বা কম কথা কী! কেবল কবিতা লেখা এবং সাধনার এডিটারি করা নয়, এই-সমস্ত আত্মবিস্মৃত অচেতন ক্ষণগুলিও জীবনের সার্থকতার একটা প্রধান অঙ্গ। সেই জন্যে মাঝে মাঝে এরকম ভরপূর অকর্মণ্যতায় মনে কিছুমাত্র পরিতাপ জন্মায় না। এতক্ষণ একটা ভালো গান শুনলেও তো পরিতাপ হত না। আমার পক্ষে এক-একদিন বাইরের প্রকৃতি সম্পূর্ণরূপে গানের কাজ করে। এই হাওয়া এবং আলো এবং

মার্চ ১৮৯৫

ছোটোখাটো নানা প্রকার শব্দ আমাকে সর্বপ্রকারে নিশ্চেষ্ট করে ফেলে। তখন বেশ বুঝিতে পারি কেবলমাত্র 'হওয়া'তেই একটা আনন্দ আছে— 'আছি' এই কাণ্ডটাই একটা প্রকাণ্ড ব্যাপার, সমস্ত প্রকৃতির এইটেই আদিম এবং সর্বব্যাপী আনন্দ। এই রকম সম্পূর্ণ নিশ্চেষ্ট মনের অবস্থায় বাইরের সঙ্গে নিজের যোগটা সর্বাপেক্ষা ঘনিষ্ঠতম হয়।

সাতারা
১৯ মার্চ ১৮৯৫

২০২

কলকাতা

১৬ মার্চ্‌। ১৮৯৫।

ভালো-মন্দর তর্ক কোনোকালে শেষ হবার না [বব]। মনের গঠন, কিম্বা কাজের ফলাফল, কোন্‌টা থেকে মানুষের ভালোমন্দ বিচার করতে হবে? শুদ্ধমাত্র কাজের ফল থেকে আমরা যদি বিচার করতুম তা হলে যে মানুষ দৈবাৎ একজনকে আঘাত করেছে আর যে ইচ্ছাপূর্বক করেছে, উভয়কে আমরা সমান দোষী করতুম— যে লোক রাগের মাথায় একটা কঠোর কাজ করেছে আর যে লোক শান্তচিত্তে করেছে, উভয়কে আমরা একই দণ্ড দিতুম। অবশ্য, কোন্‌ কাজটা ভালো অথবা মন্দ সে একটা কথা, আর কোন্‌ মানুষটা ভালো অথবা মন্দ সে আর-এক কথা। আমরা অন্তর্যামী নই, আমরা অনেক সময় বাধ্য হয়ে কাজের থেকে মানুষকে বিচার করি সে কথা সত্যি। কিন্তু সেই জন্যেই অনেক সময় আমরা ঠিক বিচার করি নে। কিন্তু শেলির জীবন থেকে তুই যে উদাহরণ দিয়েছিস সেটা স্বতন্ত্রজাতীয়— তাতে এই প্রমাণ হয় যে, একজন মানুষ অনেক বিষয়ে খুব ভালো হলেও হয়তো কোনো কোনো বিষয়ে তার ধর্মবুদ্ধির অসাড়তা থাকে, সে হয়তো বিশেষ স্থলে নিজের সুখে অন্ধ হয়ে পরকে কষ্ট দেয়— সেটা তার পক্ষে কোনো কারণেই প্রশংসার বিষয় নয়। শেলির স্বভাবে যা দোষ ছিল সে দোষকে গুণ বলে প্রমাণ করতে বসবার কোনো ন্যায্য কারণ নেই। এখন কথা এই যে, দোষ ছিল বলে যে তার কোনো গুণ ছিল না তাও নয়। তার চেয়ে অনেক কম গুণবান লোকও তার মতন অমন লোককে কষ্ট দেয় নি। শেলির জীবন থেকে এটা প্রমাণ হয় না যে, লোকবিশেষে দোষও গুণ হয়। কিন্তু এই প্রমাণ হয় যে, কোনো লোকই সম্পূর্ণ ভালো নয়। প্রত্যেক লোকেরই দোষগুণের ওজন করে যেটা বেশি

হয় সেইটার অনুসারেই তাকে ভালো কিম্বা মন্দ আখ্যা দেওয়া হয়ে থাকে। নিজের নিজের প্রকৃতি -অনুসারে শেলিকে কেউ বা খুব প্রশংসা করে, কেউ বা গাল দেয়— কিন্তু আসল শেলিকে কেবল অন্তর্যামীই জানেন। মানুষদের সঙ্গে যখন মানুষের ক্ষণিক সম্বন্ধ তখন কেবল সেই ক্ষণিক জীবনের ফলাফল থেকেই মানুষেরা মানুষকে বিচার করবে এইটেই স্বাভাবিক, যাঁর সঙ্গে মানুষের অনন্তকালের সম্বন্ধ তাঁর বিচারের পদ্ধতি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। খুব সম্ভব, অনেক সাধুর চেয়ে অনেক অসাধু উচ্চতম বিচারালয়ে উচ্চাসন পাবে। সেণ্ট্ পল, সেণ্ট্ অগস্টিন, যদি অল্প বয়সে মারা যেতেন তা হলে তাঁদের যথার্থ মহত্ত্ব কে জানতে পেত? কিন্তু তাই ব'লে সেই কথা ব'লে নিজেকে ভোলাবার কোনো দরকার নেই। দোষ-মাত্রেই দোষ— পৃথিবীতে যখন অল্প দিনের জন্যে এসেছি তখন যথাসাধ্য পরস্পরকে সুখী করে এবং সংসারে স্থায়ী সুখের সৃষ্টি করে যেতে পারলেই ভালো। আমরা কেবল এক সন্ধ্যার জন্যে একটি পান্থশালায় একত্র হয়েছি, এইটুকু সময় যদি সুখে সান্ত্বনায় সাহায্যে সকলকে পরিতৃপ্ত করে যেতে পারি তা হলেই আমি ভালো লোক। নিজের সুখের জন্যে যাকে আমি অন্যায় কষ্ট দেব সেই আমাকে মন্দ লোক বলবে, এবং কোনো কূটতর্কের দ্বারা সেটা অপ্রমাণ করতে বসা সংগত বোধ করি না।

সাতারা

২০ মার্চ্ ১৮৯৫

কলকাতা

সোমবার, ১৮ মার্চ্। ১৮৯৫।

মাঘ মাসের সাধনার সেই গল্পটা সাধারণত অধিকাংশ পাঠকের বিশেষ ভালো লেগে গিয়েছিল— সেই কারণে সাহিত্যের সমালোচনা পড়ে অনেকে চটে গেছে। অন্যের ভালো-লাগা মন্দ-লাগা সম্বন্ধে কিচ্ছু বোঝবার যো নেই— বুঝলেও সে অনুসারে নিজের ক্ষমতাকে গড়ে তোলা যায় না। সেই জন্যে বাইরের লোকের সমালোচনা আমার কাছে সম্পূর্ণ নিষ্ফল এবং অনেক সময়েই হানিজনক মনে হয়। নিজের ভিতরে যে-একটা আদর্শ আছে সেইটেই মানুষের ধ্রুব আশ্রয়। পড়ে শুনে ভেবে, সাহিত্যচর্চা ক'রে, সেই আদর্শটিকে যথাসাধ্য উন্নত করে তোলা আবশ্যক। আমাদের দেশে যে ভাবে সমালোচনা হয় তাতে কোনো শিক্ষা নেই। 'ভালো লাগিল' বা 'ভালো লাগিল না' সে কথা শুনে কোনো ফল নেই। তাতে কেবল লোকবিশেষের একটা মত পাওয়া গেল, কিন্তু মতবিশেষের সত্যতা পাওয়া গেল না। সে মতও যদি যথার্থ রসজ্ঞ বা সাহিত্যব্যাপারে অভিজ্ঞ লোকের কাছ থেকে পাওয়া যায়, তা হলেও খানিকটা ভাবিয়ে দিতে পারে। কিন্তু যে-কোনো লোকের মত মাত্রের কোনো মূল্য নেই। আমাদের দেশে ভালো সমালোচনা নেই— তার প্রধান কারণ, আমাদের দেশের লোকের সাহিত্যের সঙ্গে যথার্থ ঘনিষ্ঠ পরিচয় নেই। তারা সাহিত্যের সৃজনকার্যের মাঝখানে বাস করছে না। তারা যথার্থ অভিজ্ঞতাদ্বারা জানে না কোন্‌টা সহজ কোন্‌টা কঠিন, কোন্‌টা খাঁটি কোন্‌টা মেকি, কোন্‌টা অনিত্য কোন্‌টা নিত্য, কোন্‌টা সেন্টিমেণ্ট্ এবং কোন্‌টা সেন্টিমেণ্টালিজ্‌ম্। আমাদের সাহিত্যে অনেকগুলো এবং অনেক রকমের ভালো লেখা না বেরোলে সমালোচনার সময় উপস্থিত হবে না। প্রথমে একটা

আদর্শ দাঁড় করানো চাই, তার পরে সেই আদর্শ থেকে সমালোচকের শিক্ষা আরম্ভ হবে। যেমন জল না থাকলে সাঁতার শেখা যায় না, তেমনি ভালো সাহিত্য না থাকলে সমালোচনা অসম্ভব। আমি দেখছি, যতই বয়স বাড়ছে অন্য লোকের মতামতের মুখাপেক্ষা ততই কমে যাচ্ছে— প্রশংসা এবং নিন্দা তেমন গভীর ভাবে আঘাত করে না— বোধ হয় দুটোই অনেকটা পরিমাণে অভ্যস্ত হয়ে গেছে। নিজের বিচারের উপর নিজের বিশ্বাসও ক্রমে বোধ হয় দৃঢ় বদ্ধমূল হয়ে যাচ্ছে।

সাতারা
২২ মার্চ ১৮৯৫

২০৪

কলকাতা

২০ মার্চ্‌। ১৮৯৫।

শেলিকে অন্যান্য অনেক বড়োলোকের চেয়ে বিশেষরূপে কেন ভালো লাগে জানিস? ওর চরিত্রে কোনোরকম দ্বিধা ছিল না, ও কখনো আপনাকে কিম্বা আর কাউকে বিশ্লেষণ করে দেখে নি— ওর এক-রকম অখণ্ড প্রকৃতি। শিশুদের, এবং অনেক স্থলে মেয়েদের, এই জন্যে বিশেষরূপে ভালো লাগে— তারা সহজ স্বাভাবিক, তারা নিজের মনের বিতর্ক কিম্বা থিয়োরি -দ্বারা নিজেকে ভেঙেচুরে গড়ে নি। শেলির স্বভাবের যে সৌন্দর্য তার মধ্যে তর্ক বিতর্ক আলোচনার লেশ নেই। সে যা হয়েছে, সে কেবল নিজের ভিতরকার এক অনিবার্য সৃজনশক্তির প্রভাবেই হয়েছে। সে নিজের জন্যে নিজে কিছুমাত্র দায়ী নয়— সে জানেও না সে কাকে কখন্‌ আঘাত দিচ্ছে, কাকে কখন্‌ সুখী করছে— তাকেও কোনো বিষয়ে নিশ্চয়রূপে কারও জানবার যো নেই। কেবল এইটুকু স্থির যে, ও যা ও তাই, তা ছাড়া ওর আর-কিছু হবার যো ছিল না। ও বাইরের প্রকৃতির মতো স্বভাবতই উদার এবং সুন্দর এবং স্বভাবতই নিজের এবং পরের সম্বন্ধে চিন্তা ও দ্বিধা -মাত্র-হীন। এই রকম অখণ্ড প্রকৃতির লোকের ভারী একটা স্বাভাবিক আকর্ষণ আছে। এদের সকলেই মাপ করে এবং মায়া করে— কোনো দোষ এদের স্বভাবে যেন স্থায়ীভাবে লিপ্ত হতে পারে না। এদের স্বভাব প্রথম যুগের আদম ইভের মতো আবরণহীন এবং সেই জন্যেই এক হিসাবে পরমরহস্যময়। এরা এখনোজ্ঞান বৃক্ষের ফল খায় নি বলে একটি নিত্য সত্যযুগে বাস করছে। যারা চিন্তা করে, আলোচনা করে, যারা বিবেচনা ক'রে কাজ করে, যারা জানে ভালোমন্দ কাকে বলে, তাদের সহজে ভালোবাসা ভারী শক্ত। তারা শ্রদ্ধা ভক্তি বিশ্বাস পেতে পারে, কিন্তু তারা

অনায়াস ভালোবাসা পায় না। তারা আত্মবিসর্জন করতে পারে, কিন্তু তারা আত্মবিসর্জন আকর্ষণ করতে পারে না। আমি তো আমার অনেক প্রবন্ধে লিখেছি মানুষের মন-নামক পদার্থটি শ্রদ্ধার যোগ্য, কিন্তু ভালোবাসার পাত্র নয়— আসল খাঁটি বড়ো লোকেরা মনোবিহীন, তারা স্বতঃস্ফূর্তিবিশিষ্ট, তারা বিনা চেষ্টায় বিনা যুক্তিতে অনিবার্য বলে লোককে আকর্ষণ করে নেয়।

সাতারা

২৪ মার্চ, ১৮৯৫

২০৫

কলকাতা

২ এপ্রিল। ১৮৯৫।

আজও সমস্ত দিন সেই বক্তৃতাটা নিয়ে পড়েছিলুম। বাংলায় নিজের মনের ভাবটি ঠিক মনের মতো করে প্রকাশ করা এমনি শক্ত যে, লেখাটা একটা লড়াই-বিশেষ। শক্ত হবার কারণ কেবল ভাষার অক্ষমতা নয়— যারা লেখাটা শুনবে তাদের সাধারণত কোনো বিষয়ে কোনো কথা ভালো করে ভাবা অভ্যাস নেই, সেই জন্যে সব কথাই ছাড়িয়ে ছাড়িয়ে বিস্তারিত করে লেখা দরকার হয়ে পড়ে। যে কথাটাকে সংহত সংক্ষিপ্ত করে লিখলে তার ওরিজিন্যালিটি, তার উজ্জ্বলতা, পরিস্ফুট হত সে কথাটাকে জল মিশিয়ে ব্যাখ্যা করে নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর করে তুলতে হয়— তার পরে নিজের মনে ভারী একটা অসন্তোষের উদয় হয়। আমি বারম্বার দেখেছি বাঙালিরা একটা কোনো ভাবের সূত্র মনে মনে সহজে অনুসরণ করতে পারে না, তারা এক-দম ফীলিঙ্গে মেতে উঠতে চায় — একটা বক্তৃতা এবং প্রবন্ধের মধ্যে যে কত শত জিনিষ ব্যর্থ হয়ে যায় তার ঠিকানা নেই।

সাতারা

৬ এপ্রিল ১৮৯৫

কলকাতা

৪ এপ্রিল। ১৮৯৫।

আমি আজকাল কাজের তাড়ায় দোতলায় নেবে এসেছি। দক্ষিণের বারান্দার কোণে আমি যে একটি অলিন্দবেষ্টিত কাষ্ঠনীড় রচনা করে নিয়েছিলেম, সেইখানে আড্ডা করে নিয়েছি। ঘরে আর কোনো আস্‌বাব নেই, কেবল মাঝখানে তোদের প্রদত্ত সেই চীনে ডেস্ক এবং একটি মাত্র চৌকি। এ আমার পক্ষে একটি নতুন আবিষ্কার বললেই হয়— আমার তেতালার ঘরে কিছুতেই মন বসিয়ে লিখতে পারতুম না, মনে করতুম কলকাতার দোষ, কিন্তু এখন দেখতে পাচ্ছি এ ঘরে এসে লেখার কোনো ব্যাঘাত হচ্ছে না, বেশ মন দিতে পারছি।··· ঘরে কোনো আসবাব না থাকাও একটা মস্ত সহায়। আমি দেখছি plain living, high thinkingএর পক্ষে নিতান্তই দরকার— জড় পদার্থের বন্ধন যতটা পারা যায় ছেদন করে ফেলা আবশ্যক। জড় জিনিষগুলো মনের সঙ্গে কোনো মানসিক সম্বন্ধ স্থাপন করে না, তারা মনের মধ্যে কোনো নিত্যনূতন সংবাদ আনয়ন করে না— আসবাবগুলো চিরকালই একরূপ আকার ধারণ করে থাকে, কেবল উত্তরোত্তর মলিনতা সঞ্চয় করে, ওরা অলক্ষিতভাবে মনের পক্ষে ভার এবং বাধার স্বরূপ কাজ করে। আস্‌বাবের মধ্যে চারি দিকে যতটা সম্ভব আলোক এবং আকাশ সংগ্রহ করে রাখলে মনটা বেশ স্ফূর্তির সঙ্গে অবাধে আপন কাজ করতে থাকে। সামনে গ[গন]দের বাগানটিও আমার পক্ষে বড়ো সুবিধে হয়েছে। গঙ্গার ধারে আমার একটি বাগান থাকে— এবং নদীর ধারেই এক কোণে একটি পাথরে বাঁধানো পরিষ্কার তক্‌তকে নির্মল স্নিগ্ধ ঘর থাকে, ঠেসান দিয়ে বসবার মতো একটি কৌচ এবং লেখবার মতো একটি ডেস্ক থাকে, এবং বাকি সমস্তই কেবল বাগান এবং জল এবং আকাশ— ফুটন্ত ফুলের গন্ধ এবং পাখির ডাক—

তা হলে চুপচাপ করে আপন কবির কর্তব্য করে যেতে পারি। এর চেয়ে ঢের কমেও পৃথিবীতে বেশ চলে যায়, এবং ঢের বেশিতেও অনেকে তিলমাত্র সুখ পায় না।

সাতারা

৮ এপ্রিল ?

১৮৯৫

২০৭

কলকাতা

৬ এপ্রিল। ১৮৯৫।

আমি যে মাঝে মাঝে ভারতবর্ষের হাওয়ার দোহাই দিয়ে কর্তব্য-পালনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের প্রস্তাব করে থাকি, তার মধ্যে একটু গভীর অর্থ আছে [বব]। এক শ্রেণীর কাজ আছে আলস্য যার অঙ্গ, বহুল পরিমাণে আলস্যের থেকে রসাকর্ষণ না করলে সে বাড়তে পারে না। আমার সমস্ত শিক্ষা এবং প্রকৃতি থেকে মনে হয় আমি সেই-জাতীয় কাজের জন্যে জন্মেছিলুম— ঘন ঘন কাজে অনুক্ষণ লিপ্ত থাকলে আমার জীবনের যা স্বাভাবিক এবং যথার্থ কর্তব্য তার ব্যাঘাত হতে পারে। কাজকে কর্তব্যকে গজে মেপে বিচার করা উচিত হয় না— যদি সেই রকম বিচার করতে হত তা হলে মাটি চষার কাজ সকলের চেয়ে ফার্স্ট ক্লাস প্রাইজ পেত। সাধনার জন্যে, সংসারের জন্যে, সমাজের হিতের জন্যে কাজ করতে করতে এক-এক সময় আমার স্বাভাবিক অন্তরপ্রকৃতি নিজের দাবি উত্থাপন করে; সে বলে, 'তোমার কাজকর্ম পরে হবে, আপাতত এই আকাশ এবং বাতাস এবং পৃথিবী থেকে অত্যন্ত অলসভাবে কেবল পরিপূর্ণরূপে রসাকর্ষণ করে নেও।' সেটাকে বাইরে থেকে আলস্য এবং কর্তব্যের অবহেলা বলে মনে হতে পারে, কিন্তু যার মন সে জানে এই আলস্যসম্ভোগ তার প্রকৃতির খাদ্য— এটুকু না হলে তার সমস্ত পত্র পুষ্প ফল বিকশিত হয়ে উঠতে পারবে না। শুষ্ক কাষ্ঠ-স্বরূপ হয়েও গাছ উনুন জ্বালাবার কাজে লাগে, কিন্তু সজীবভাবে থেকে আপনার ফুল ফলকে জন্ম দেওয়াই তার প্রধান কাজ এবং সে কাজ করতে গেলে তার অনেকটা অবকাশ আকাশ এবং আলোকের আবশ্যক। এখন কথাটা কেবল এই যে, যদি মজুরি করার চেয়ে কোনো শ্রেষ্ঠতর কাজ আমার দ্বারা হওয়া সম্ভব হয় তবে

সেই আমার প্রধান কর্তব্য কি না। শ্রেষ্ঠ কাজ মাত্রই খুব বড়ো বনস্পতির ন্যায় অনেকখানি স্থান এবং সময় চায়— তাকেই আমি আলস্য বলি, বৈরাগ্য বলি, ধ্যান বলি।

সাতারা
১০ এপ্রিল ?
১৮৯৫

কলকাতা
৯ এপ্রিল। ১৮৯৫।

ঢং ঢং শব্দে দশটা বাজল। চৈত্র মাসের দশটা নিতান্ত কম বেলা নয়— রৌদ্র ঝাঁ ঝাঁ করে উঠেছে, কাকগুলো কেন যে এত ডাকাডাকি করছে জানি নে, লকেট কমলালেবু এবং কাঁচামিঠে আম-ওয়ালা চুপড়ি মাথায় উচ্চস্বরে সুর করে আমাদের দেউড়ির কাছ দিয়ে ডেকে যাচ্ছে, মুখ একটু শুকিয়ে এসেছে— ইচ্ছে করছে খানিকটে বরফ দিয়ে এক-গ্লাস ঠাণ্ডা দইয়ের সরবৎ খাই।··· ইচ্ছা করছে কোনো-একটা বিদেশে যেতে। বেশ একটা ছবির মতো দেশ— পাহাড় আছে, ঝর্না আছে, পাথরের গায়ে খুব ঘন শৈবাল হয়েছে, দূরে পাহাড়ের ঢালুর উপরে গোরু চরছে, আকাশের নীল রঙটি খুব স্নিগ্ধ এবং সুগভীর, পাখি পতঙ্গ পল্লব এবং জলধারার একটা বিচিত্র মৃদু শব্দমিশ্র উঠে মস্তিষ্কের উপর ধীরে ধীরে তরঙ্গাভিঘাত করছে। দূর হোক গে ছাই, আজ আর কিছুতে হাত না দিয়ে দ্বি [পু] দের দক্ষিণের ঘরে একলাটি হাত পা ছড়িয়ে একটা কোনো ভ্রমণবৃত্তান্তের বই নিয়ে পড়ব মনে করছি, বেশ অনেকগুলো ছবিওয়ালা নতুন-পাত-কাটা বই। একটা চীনদেশের ভ্রমণ হাতে আছে, কিন্তু চীনটা অনেক বইয়েতে পড়েছি। একটা মেয়ের লেখা পারস্য আছে, কিন্তু মেয়েরা ভালো ভ্রমণকারী নয় এবং তাতে যথেষ্ট ছবি নেই। তিব্বত পড়া হয়ে গেছে, আফ্রিকা পড়েছি। যদি দক্ষিণ-আমেরিকার খুব-ছবি-ওয়ালা ভালো বই থাকত তো পড়তুম। কিন্তু থ্যাকারের দোকানে মনের মতো বই খুঁজে পাই নি। আলোচনা করবার মতো, মনের উন্নতিসাধন করবার মতো, শিক্ষা করবার মতো বই পৃথিবীতে অসংখ্য আছে। কিন্তু কুঁড়েমি করবার মতো বই ভারী কম। সে রকম বই লিখতে বিশেষ ক্ষমতার আবশ্যক এবং সে ক্ষমতা ভারী বিরল। অবকাশের

অবকাশটুকু নষ্ট করবে না, বরং তাকে একটু রঙিন এবং রসালো করে তুলবে অথচ পড়ার খোরাক দেবে, এই দুই দিক বাঁচিয়ে লেখা ভারী শক্ত। স্টীল পেনে লিখে মনের উপরে দাগ করে দেবে না, পালকের কলমে লিখে লেখাটা মনের উপর দিয়ে উড়িয়ে নিয়ে যাবে— মনের চার দিকে একটা সুবিস্তীর্ণ দেশ কাল বর্ণ এবং রসের সৃষ্টি করে দেবে। ভালো ভ্রমণবৃত্তান্ত জিনিষটা সব চেয়ে ভারহীন এবং অবকাশের সময় পড়বার সব চেয়ে উপযোগী। কিন্তু কলকাতায় ও-সব বই হাতে করতে ইচ্ছে করে না— কারণ, কলকাতায় সে রকম সুন্দর অবিচ্ছিন্ন অবসর নেই। ও-সব বই আমি মফস্বলের জন্যে জমিয়ে রেখে দিই। সম্পূর্ণ নিরিবিলি মধ্যাহ্নে কিম্বা সন্ধ্যায় ঐ রকম মোটা বই হাতে নিয়ে বসা ভারী আরামের— এমন নবাবিয়ানা পৃথিবীতে অতি অল্প আছে। স [ত্য] বলত আমার স্বভাবের মধ্যে নবাবি আছে— তা, আছে বটে।

সাজাদপুর
১৩ এপ্রিল ?
১৮৯৫

২০৯

কলকাতা

১৪ এপ্রিল। ১৮৯৫।

কাল সমস্ত দিন খুব ঘুরে বেড়াতে হয়েছে। ··· অন্য কোনো দিন হলে আধমরা হয়ে পড়তুম কিন্তু কাল খুব ঠাণ্ডা ছিল— আকাশ ঘন-মেঘাচ্ছন্ন, মাঝে মাঝে টিপ্ টিপ্ করে বৃষ্টি পড়ছে, বেশ লাগছিল। যদিও নিমন্ত্রণ সেরে এবং সভাপতিত্ব করে বেড়ানোর মধ্যে কিছুমাত্র কবিত্ব নেই, তবু কাল একটা জায়গা থেকে আর-একটা জায়গায় যাবার মধ্যবর্তী সময়টুকুতে মনের মধ্যে ভারী একটা অপরূপ কবিত্ব-বেদনার সঞ্চার হচ্ছিল— ঠিক যেন একটা গান শুনছিলুম এবং মনের মধ্যে যে-একটা অনির্বচনীয় ভাবের উদয় হচ্ছিল তার কোনো অর্থ বুঝতে পারছিলুম না। যতদিন যত কবিতা পড়েছি এবং গান শুনেছি এবং আপন মনে কল্পনা করেছি, তার সমস্ত রস মনের কোন্-এক জায়গায় সঞ্চিত আছে। মাঝে মাঝে এক-একদিন কেন তার মদিরতাপূর্ণ সমস্ত লোভনীয় সৌরভ বেরিয়ে পড়ে কিছুই বুঝতে পারি নে এবং এ রস নিয়ে কী করব, কোথায় কার কী কাজে লাগবে কিছুই জানি নে— এর কোনো আধ্যাত্মিক তাৎপর্য, কোনো আধ্যাত্মিক পরিতৃপ্তি আছে কি না তাও বুঝি নে। কিন্তু এর এক অসীমতা গভীরতা এবং রহস্যপূর্ণ পরম ব্যাকুলতায় মনকে উতলা করে দেয় এবং এ জিনিষটাকে কিছুতেই অসত্য এবং অস্থায়ী বলে মনে হয় না— এর মধ্যে যে-একটা আকাঙ্ক্ষার অধীরতা আছে সেও ভালো। কলকাতা শহরের জড় আরাম এবং সন্তোষ এর তুলনায় খুব নিকৃষ্ট মনে হয়। কাল রাত্রে জ্যো [তিদাদা] দের ওখানে অ [ভি] একটা এস্রাজ হাতে করে বসল— বাইরে বৃষ্টি পড়ছে এবং বাতাসে গাছের পাতার শব্দ হচ্ছে। আমি প্রথমে 'ভরা বাদর' গাইলুম। তার পরে গাইলুম 'আমায় বাঁশিতে ডেকেছে কে'— গলাটাও বেশ ছিল, মনটাও

বেশ পরিপূর্ণ ছিল, নববর্ষাটিও বেশ অনুকূল ছিল, বেশ জমে উঠেছিল— ভাবছিলুম এই-যে সুরের এবং ভাবের একটা অপূর্ব রাজ্য এ কি কেবলই আমার মনের ? এর অনুরূপ আর কোথাও কিছুই নেই ? এ কি কেবলই মরীচিকা ?

সাতারা
১৮ এপ্রিল ?
১৮৯৫

কলকাতা

২৪ এপ্রিল। ১৮৯৫।

আজ সকাল বেলা থেকে সুগভীর আলস্যে আমাকে আক্রমণ করেছে।··· আমাদের জোড়াসাঁকোর দোতলার নির্জন ঘর এবং বারান্দায় অকর্মণ্যভাবে কেবলই ঘুর ঘুর করে বেড়িয়েছি। শরীরের সমস্ত সন্ধিগুলো যেন শিথিল হয়ে পড়েছিল, কোনো লেখা অথবা পড়ায় হাত দেবার কিছুমাত্র শক্তি ছিল না। এ দিকে দেখতে দেখতে সমস্ত আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হয়ে এসে গুর্ গুর্ করে মেঘ ডাকতে লাগল এবং মাঝে মাঝে প্রবল বাতাসে দক্ষিণের বাগানের ছোটো বড়ো সমস্ত গাছগুলো হুস্ হাস্ করে নিশ্বাস ফেলতে লাগল। মধ্যাহ্নটি স্নিগ্ধ ছায়াচ্ছন্ন হয়ে চারি দিকে খুব ঘনিষ্ঠ হয়ে এল। মনের ভিতরটা একটা অকারণ চঞ্চলতায় বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠল— তার হাতে যে কাজই দেওয়া যায় সে সমস্তই ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলে দিতে লাগল।··· মনের গতিক আকাশের গতিকের মতো— কিচ্ছুই বলা যায় না। মাসের মধ্যে ঊনত্রিশ দিন সে ছোটোখাটো উপস্থিত কাজ নিয়ে বেশ চালিয়ে দেয়, কোনো গোল করে না— হঠাৎ ত্রিশ দিনের দিন সে-সমস্ত কাজে সে পদাঘাত করতে থাকে। বলে, 'আমাকে এমন একটা-কিছু দাও যা খুব মস্ত— যাতে আমার সমস্ত দিনরাত্রি, সমস্ত ছোটো বড়ো, সমস্ত ভূত ভবিষ্যৎ একেবারে গ্রাস করে ফেলতে পারে।' তখন হাতের কাছে কোথায় বা কী পাওয়া যায়— কেবল ঘরে ঘরে বারান্দায় বারান্দায় ঘুর ঘুর করে বেড়ানো যায়। কতকগুলো ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন খণ্ড-বিখণ্ড সামাজিক কর্তব্যের মধ্যে মনটা যখন লাফ দিয়ে দিয়ে বেড়ায় তখনি তার সুস্থ অবস্থা বলি, আর যখন সে একটা প্রবল আবেগ একটা বৃহৎ কর্মের মধ্যে একটা আত্মবিস্মৃত ঐক্য লাভ করবার জন্যে অধীর হয়ে ওঠে তখন তাকে অসুস্থ মনে করি।

কিন্তু আমি মনে করি মানুষের যথার্থ স্বাভাবিক অবস্থাই হচ্ছে সেই একটি প্রবল নিষ্ঠার মধ্যে আপনার সমস্ত জীবনকে ঐক্যবন্ধনে বদ্ধ করবার ইচ্ছা— সকলের সেই ঐক্যলাভের ক্ষমতা নেই, সেই জন্যে সমাজের বিচ্ছিন্ন যন্ত্রবৎ কাজগুলো তাদের পক্ষে উপযোগী— কিন্তু মনের সুগভীর আকাঙ্ক্ষা সেই সুবিশাল ঐক্যের দিকে। সেই জন্যেই প্রতিদিন সমাজের মধ্যে থেকে, এক-একদিন মনে হয়—

আমায় বাঁশিতে ডেকেছে কে!

পুনা

৩০ এপ্রিল ১৮৯৫

কলকাতা
২ মে। ১৮৯৫।

আজ কোথা থেকে একটা নহবৎ শোনা যাচ্ছে। সকাল বেলাকার নহবতে মনটা বড়োই ব্যাকুল করে তোলে। আমি এ পর্যন্ত কিছুতেই ঠিক করে উঠতে পারলুম না, সংগীত শুনলে মনের ভিতরে যে অনির্বচনীয় ভাবের উদ্রেক করে তার ঠিক তাৎপর্যটা কী। অথচ প্রত্যেক বারেই মন আপনার এই ভাবটাকে বিশ্লেষণ করে দেখতে চেষ্টা করে। আমি দেখেছি গানের সুর ভালো করে বেজে উঠলেই নেশাটি ঠিক ব্রহ্মরন্ধ্রের কাছে ধরে ওঠবা মাত্রই, এই জন্মমৃত্যুর সংসার, এই আনাগোনার দেশ, এই কাজকর্মের আলো-আঁধারের পৃথিবীটি বহুদূরে— যেন একটি প্রকাণ্ড পদ্মানদীর পরপারে গিয়ে দাঁড়ায়— সেখান থেকে সমস্তই যেন ছবির মতো বোধ হতে থাকে। আমাদের কাছে আমাদের প্রতিদিনের সংসারটা ঠিক সামঞ্জস্যময় নয়— তার কোনো তুচ্ছ অংশ হয়তো অপরিমিত বড়ো, ক্ষুধাতৃষ্ণা ঝগড়াঝাঁটি আরামব্যারাম টুকিটাকি খুঁটিনাটি খিটিমিটি এইগুলিই প্রত্যেক বর্তমান মুহূর্তকে কণ্টকিত করে তুলছে, কিন্তু সংগীত তার নিজের ভিতরকার সুন্দর সামঞ্জস্যের দ্বারা মুহূর্তের মধ্যে যেন কী-এক মোহমন্ত্রে সমস্ত সংসারটিকে এমন একটি পার্‌স্‌পেক্‌টিভের মধ্যে দাঁড় করায় যেখানে ওর ক্ষুদ্র ক্ষণস্থায়ী অসামঞ্জস্যগুলো আর চোখে পড়ে না— একটা সমগ্র একটা বৃহৎ একটা নিত্য সামঞ্জস্য -দ্বারা সমস্ত পৃথিবী ছবির মতো হয়ে আসে এবং মানুষের জন্মমৃত্যু হাসিকান্না ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্তমানের পর্যায় একটি কবিতার সকরুণ ছন্দের মতো কানে বাজে। সেই সঙ্গে আমাদেরও নিজ নিজ ব্যক্তিগত প্রবলতা তীব্রতার হ্রাস হয়ে আমরা অনেকটা লঘু হয়ে যাই এবং একটি সংগীতময়ী বিস্তীর্ণতার মধ্যে অতি সহজে আত্মবিসর্জন করে দিই।

ক্ষুদ্র এবং কৃত্রিম সমাজবন্ধনগুলি সমাজের পক্ষে বিশেষ উপযোগী, অথচ সংগীত এবং উচ্চ অঙ্গের আর্ট্ মাত্রেই সেইগুলির অকিঞ্চিৎকরতা মুহূর্তের মধ্যে উপলব্ধি করিয়ে দেয়— সেই জন্যে আর্ট্ মাত্রেরই ভিতর খানিকটা সমাজনাশকতা আছে— সেই জন্যে ভালো গান কিম্বা কবিতা শুনলে আমাদের মধ্যে একটা চিত্তচাঞ্চল্য জন্মে, সমাজের লৌকিকতার বন্ধন ছেদন করে নিত্যসৌন্দর্যের স্বাধীনতার জন্যে মনের ভিতরে একটা নিষ্ফল সংগ্রামের সৃষ্টি হতে থাকে— সৌন্দর্য মাত্রেই আমাদের মনে অনিত্যের সঙ্গে নিত্যের একটা বিরোধ বাধিয়ে দিয়ে অকারণ বেদনার সৃষ্টি করে।

পুনা

৬ মে ১৮৯৫

২১২

পতিসর-পথে

১ জুন। ১৮৯৫।

অনেক দিনের পরে আমার নির্জন বোটটির মধ্যে এসে আমার ভারী আরাম বোধ হচ্ছে। মনে হচ্ছে যেন বিদেশ থেকে বাড়ি ফিরে এসেছি এবং কে একজন থেকে থেকে বলছে— 'তুমি এসেছ, তোমাকে দেখে আমি বড়ো খুশি হয়েছি।' নির্জনতা যেন আমার গায়ে মাথায় সর্বাঙ্গে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে। আজ দিনের বেলাটা তেমন গরম ছিল না— রোদ্‌দুর উঠেছিল, কিন্তু ঠাণ্ডা বাতাসটি বেশ মধুর লাগছিল। নদীটি ছোটো— দুই তীর ঘাসে সবুজ হয়ে গড়িয়ে এসেছে, গোরু চরছে, মেয়েরা জল তুলছে, গা ধুচ্ছে, উলঙ্গ ছেলেগুলো বোট দেখে চীৎকারস্বরে দূরস্থ সঙ্গীদের ডাকাডাকি করছে। ছোটোবড়ো নানাবিধ গ্রাম, তার নানা রকমের নাম— দেখতে দেখতে যাই আর ভাবি যে, আমার কাছে এই গ্রামগুলি এক মুহূর্তের ছবিমাত্র কিন্তু কত লোকের কাছে এইই সমস্ত পৃথিবী। যারা ঐ জলে নেমে স্নান করছে এবং ডাঙায় বসে বাঁখারি ছুলছে তারা যথাসময়ে ঐ ঘন গাছগুলোর আড়ালে কোন্‌-একটা জায়গায় তাদের বাড়িতে যাবে। সেইখানেই তাদের নিত্যকর্ম এবং চিরজীবনের রঙ্গভূমি। সেখানকার অখ্যাতনামা অকৃতকীর্তি লোকরা তাদের সর্বাপেক্ষা পরিচিত এবং প্রভাবসম্পন্ন প্রতিবেশী। এই চিন্তাগুলি খুব যে অপূর্ব এবং অসামান্য তা বলতে পারি নে, কিন্তু তবু এরকম করে ভেবে দেখতে গেলে একটু নতুন রকমের ঠেকে— আমরা সকলে নিজেদের পক্ষে কত বৃহৎ অথচ সাধারণের পক্ষে কত ছোটো সেইটে ভালো করে মনে উদয় হয়। এখন সন্ধ্যা হয়ে এসেছে— দুই ধারের গ্রাম আপন-আপন ঘরে প্রদীপ জ্বেলে নিভৃত নিষ্কর্মা হয়ে বসেছে, গল্প করছে, তামাক খাচ্ছে, ঘুমচ্ছে—

কেবল আমার একটিমাত্র বোট মাঝখানে দাঁড় ফেলে ঝুপ্‌ঝুপ্‌ শব্দ করে চলেছে, দু ধারের লোকালয়ের সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্কই নেই।

খড়কি
৬ জুন ১৮৯৫

২১৩

পতিসর

৩ জুন। ১৮৯৫।

এমন সময় 'গহন ঘন ছাইল গগন ঘনাইয়া'— যেমন ঝড় তেমনি বৃষ্টি। বাতাস কখনো পুব দিক থেকে কখনো পশ্চিম দিক থেকে আসছে— বৃষ্টি যেন একেবারে ছিটেগুলির মতো বিষম জোরে ছট্ ছট্ শব্দে বোটের একটা পাশে আঘাত করছে ·· বাতাস ক্ষিপ্ত জন্তুর মতো সমস্ত আকাশ জুড়ে রাগে গোঙ্‌রাচ্ছে। ··বিদ্যুৎ এবং বজ্রেরও বিরাম নেই। আমার জানলা সার্সি সমস্ত বন্ধ— কেবল যে দিকে বাতাস নেই সেই দিককার একটি খড়খড়ি খুলে মেঘাবৃত ক্ষীণ আলোকে লিখছি। বর্ষাটা এমনি জমে এসেছে যে, ইচ্ছে করছে গদ্যে না লিখে পদ্যে চিঠি লিখে যাই— কিন্তু পদ্যে লিখতে বসলে বোধ হয় লেখা শেষ হবার পূর্বেই ঝড় শেষ হয়ে যাবে। ঝড়কে তো আর অক্ষর মিলিয়ে চলতে হয় না। এই সময়ে বেশ ফেঁদে বসে একটা গল্প লিখতেও বেশ। তাই লিখতুম, কিন্তু পাশে শৈ · বসে আছে— কেউ কাছে বসে থাকলে লেখা হয় না। কিন্তু মনের ভিতর ভারী একটা উল্লাস হচ্ছে— এই ঝড়ের আঘাতে, মেঘের ছায়ায়, বৃষ্টির ঝর্ঝর শব্দে, বজ্রের গর্জনে আমার বুকের ভিতর একটা তুফান উঠছে— একটা-কিছু করতে ইচ্ছে করছে, নিদেন খুব সুখের ভাবনা খুব অসম্ভব কল্পনা ভাবতে ইচ্ছে করছে, নিদেন খুব গলা ছেড়ে দিয়ে একটা কানাড়া কিম্বা মল্লার গেয়ে দিলেও সময়টা বেশ কাটে— কত মেঘলার দিন, কত তেতালার ছাতের উপরকার আকাশ, কত পূর্বস্মৃতি মনের ভিতর দিয়ে ছিন্ন ভিন্ন মেঘের মতো হু হু করে উড়ে যাচ্ছে!

সাতারা

৮ জুন ১৮৯৫

২১৪

পতিসর

৬ জুন। ১৮৯৫।

তার পরে সকলকে বিদায় করে দিয়ে সাধনার জন্যে একটা গল্প লিখতে বসেছিলুম— মাস তো প্রায় শেষ হয়ে এল। তাই দৃঢ় সংকল্প করে খুব নিবিড় ভাবে মনঃসংযোগপূর্বক এইমাত্র লেখা শেষ করে ফেললুম। এখন সাতটা বেজে গেছে। কিন্তু এখন গ্রীষ্মের বেলা খুব দীর্ঘ, তাই এখনো সূর্যালোক বেশ স্পষ্ট আছে। যতক্ষণ একটা লেখা চলতে থাকে ততক্ষণ মনটা বেশ শান্তিতে থাকে— সেটা শেষ হয়ে যাবা-মাত্রই আবার একটা নতূন বিষয়ের অন্বেষণে নিতান্ত দিশেহারার মতো, লক্ষ্মীছাড়ার মতো, চারি দিকে ঘুরে বেড়াতে হয়। ·· এত চিন্তা ক'রে চেষ্টা ক'রে কষ্ট স'য়ে একজনকে লিখতে হয়, অথচ পাঠকেরা কতই অবহেলার সঙ্গে মূঢ়তার সঙ্গে সেগুলো পড়ে এবং অধিকাংশ স্থলেই পড়ে না। সেজন্যে আক্ষেপ করা কাপুরুষতা, অনেক সময়েই করি নে। কিন্তু যখন সমস্ত দিন পরিশ্রমের পর একলা সন্ধ্যাবেলায় শরীর মনকে ক্লান্তি এসে আক্রমণ করে তখন একটা ক্ষণিক ঔদাস্যের হাত কিছুতেই এড়ানো যায় না। রণে ভঙ্গ দিয়ে খ্যাতিহীন নির্জনে আপন মনের মতো কাজ এবং মনের মতো বিশ্রামের মধ্যে আপনাকে সম্পূর্ণ গোপন করে রাখতে ইচ্ছে করে। মানুষের পক্ষে মানুষের জনতার মতো এমন শ্রান্তিজনক আর কিছুই নেই। প্রকৃতির উদারতা এবং প্রেমের গভীরতা তার একমাত্র বিশ্রামের স্থান— আর-সমস্তই ক্লান্তি বহন করে আনে।

সাতারা

১১ জুন ১৮৯৫

কলকাতা

সোমবার, ১১ আষাঢ়। ১৩০২।

ক'দিন খুব রীতিমত বৃষ্টি বাদল হয়ে আজ মেঘ কেটে রৌদ্র দেখা দিয়েছে। মনে আছে এক সময় এই রকম দিনগুলো আমাকে ভারী অভিভূত করত। ভিতরে ভিতরে এমন একটা কম্পান্বিত রকমের আনন্দ উপস্থিত হত সে আমি ঠিক ব্যক্ত করতে পারব না। আজ সেইটে মনে পড়ে গেল। আজ সকালে বাবামশায়ের সঙ্গে দেখা করবার জন্যে পার্ক্ স্ট্রীটে গিয়েছিলুম। যাবার সময় বরাবর এক অমৃতবাজার পড়তে পড়তে যাচ্ছিলুম, ফেরবার সময় হঠাৎ গড়ের মাঠের দিকে দৃষ্টি পড়ল— এবং পৃথিবীটা অনেকটা সেই আগেকার মতোই আছে, কেবল আমার আজকাল অবসর নেই— মাঠের উপর সকালবেলাকার সুকুমার রোদ্দুরটি বিষাদ শান্তি এবং সৌন্দর্যে স্নিগ্ধ সরস নির্মল নবীন শ্যামলশ্রীকে মণ্ডিত করে রেখেছে। মনের ভিতরটাতে সেই আগেকার মতো খানিক ক্ষণের জন্যে একটি অনির্বচনীয় কোমল সুন্দর রাগিণী কম্পিত হয়ে বেজে উঠতে লাগল। এখন এত রকমের বিষয় আমার চার দিকে ব্যূহ বেঁধে রয়েছে যে, জগৎটাকে সম্মুখে দেখতে পাই নে— একেবারে সচেতন মনের সঙ্গে বিশ্বপ্রকৃতির প্রত্যক্ষ সংযোগ ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শ আস্তে আস্তে সরে যাচ্ছে — বিশ্ববীণার যে যন্ত্রী নদীতে তরঙ্গ জাগিয়ে তোলে, দেখতে দেখতে বসন্তের ফুল ফুটিয়ে দেয় এবং জলে স্থলে শূন্যে গানে গুঞ্জনে কাকলীতে কুহরিত মুখরিত করে তোলে, সেই যন্ত্রীর সজীব সচেতন কম্পিত অঙ্গুলিগুলি আমার মনের তারকে স্বয়ং স্পর্শ করে আঘাত করছে না। ভয় হয় পাছে এইরকম অনেক দিন হতে হতে মনের যে তারগুলো সর্বদাই বেজে বেজে উঠত সেগুলোতে ধুলো পড়ে মরচে পড়ে যায়, মনের ভিতরটা ক্রমে বুড়ো হয়ে অসাড় হয়ে আসে। অবিশ্রাম

কাজকর্মে মানুষকে শক্ত এবং প্রবীণ করে দেয়। সেটুকু শক্ত হওয়া দরকার জানি— সংসারক্ষেত্রের উপযোগী হতে গেলে সে পরিমাণে প্রবীণতা অত্যাবশ্যক, কিন্তু তবু সেটা আমার কাছে ভারী অপ্রিয় বোধ হয়। কিন্তু 'সুখং বা যদি বা দুঃখং প্রিয়ং যদি বাপ্রিয়ং' ইত্যাদি শ্লোক স্মরণ করে অবশ্যসম্ভাবনার বিরুদ্ধে বৃথা পরিতাপ পরিত্যাগ করে আপনাকে চারি দিকের সমস্ত অবস্থা এবং উপস্থিত সমস্ত কার্যের জন্যে প্রস্তুত করে নিতে হবে। এখন অনেকটা তাই হয়েছে— কর্তব্যচক্রের ঘানিগাছের [সঙ্গে] মনটাকে শক্ত দড়িতে বেঁধে দেওয়া গেছে— এবং তার চোখেও ঠুলি পড়েছে, কেবল অন্ধ হয়ে প্রতিদিন নিয়মিত ঘুরপাকে যথাসাধ্য তেল বের করে দিয়ে পৃথিবীতে একজন দরকারী জীব হয়ে উঠেছি। সংগীতের চেয়ে তেলে অনেক কাজ দেয়— তাতে আহার চলে, সন্ধ্যার সময় আলোও জ্বলে। অতএব এক্ষণে চিঠি সমাপ্ত করে দিয়ে পুনশ্চ আমার ঘানিগাছে লাগি [বব]— কাছারির চিঠিগুলি সম্মুখে পেশ হয়েছে, সাধনার প্রুফও স্তূপাকার জমেছে।

সাজাদপুর

২৮ জুন ১৮৯৫

২১৬

সাজাদপুর

২৮ জুন। ১৮৯৫।

বসে বসে সাধনার জন্যে একটা গল্প লিখছি, একটু আষাঢ়ে গোছের গল্প। লেখাটা প্রথম আরম্ভ করতে যতটা প্রবল অনিচ্ছা ও বিরক্তি বোধ হচ্ছিল এখন আর সেটা নেই। এখন তারই কল্পনাস্রোতের মাঝখানে গিয়ে পড়েছি— একটু একটু করে লিখছি এবং বাইরের প্রকৃতির সমস্ত ছায়া আলোক এবং বর্ণ এবং শব্দ আমার লেখার সঙ্গে মিশে যাচ্ছে। আমি যে-সকল দৃশ্য এবং লোক এবং ঘটনা কল্পনা করছি তারই চারি দিকে এই রৌদ্রবৃষ্টি, নদীস্রোত এবং নদীতীরের শরবন, এই বর্ষার আকাশ, এই ছায়াবেষ্টিত গ্রাম, এই জলধারাপ্রফুল্ল শস্যের ক্ষেত ঘিরে দাঁড়িয়ে তাদের সত্যে এবং সৌন্দর্যে সজীব করে তুলছে— আমার নিজের মনের কল্পনা আমার নিজের কাছে বেশ রমণীয় হয়ে উঠছে। কিন্তু পাঠকেরা এর অর্ধেক জিনিষও পাবে না। তারা কেবল কাটা শস্য পায়, কিন্তু শস্যক্ষেত্রের আকাশ এবং বাতাস, শিশির এবং শ্যামলতা, সবুজ এবং সোনালি এবং নীল সে-সমস্তই বাদ দিয়ে পায়। আমার গল্পের সঙ্গে সঙ্গে যদি এই মেঘমুক্ত বর্ষাকালের স্নিগ্ধ রৌদ্ররঞ্জিত ছোটো নদীটি এবং নদীর তীরটি, এই গাছের ছায়া এবং গ্রামের শান্তিটি, এমনি অখণ্ডভাবে তুলে দিতে পারতুম তা হলে গল্পটি কেমন সুমিষ্ট সজীব হয়ে দেখা দিত! তা হলে সবাই তার মর্মের সত্যটুকু কেমন অতি সহজেই বুঝতে পারত! তা হলে কেউ তাকে সমালোচনা করতে সাহস করত না। অনেকটা রস মনের মধ্যেই থেকে যায়, সবটা কিছুতেই পাঠককে দেওয়া যায় না। যা নিজের আছে তাও পরকে দেবার ক্ষমতা বিধাতা মানুষকে সম্পূর্ণ দেন নি।

সাতারা

৩ জুলাই ?

১৮৯৫

২১৭

সাজাদপুর

২ জুলাই। ১৮৯৫।

কাল থেকে সাহাজাদপুরের কুঠিবাড়িতে উঠে এসেছি। যা মনে করেছিলুম তাই। বেশ লাগছে। মাথার উপরে ছাদটা অনেক উঁচুতে এবং দুই পাশে দুই খোলা বারান্দা থাকাতে আকাশের অজস্র আলো আমার মাথার উপরে বর্ষণ হতে থাকে— এবং সেই আলোতে লিখতে পড়তে এবং বসে বসে ভাবতে ভারী মধুর লাগে। আর-একটি বেশ লাগে— কাজ করতে করতে কোনো-এক দিকে মুখ ফিরোলেই দেখতে পাই নীল আকাশের সঙ্গে মিশ্রিত সবুজ পৃথিবীর একটা অংশ একেবারে আমার ঘরের লাগাও হাজির। যেন প্রকৃতি কুতূহলী পাড়াগেঁয়ে মেয়ের মতো সর্বদাই আমার জানলা-দরজার কাছে উঁকি মারছে। আমার ঘরের এবং মনের— আমার কাজের এবং অবসরের চারি দিক প্রসন্ন প্রফুল্ল, সরস এবং সজীব, নবীন এবং সুন্দর হয়ে আছে। এই বর্ষণমুক্ত আকাশের আলোকে এই গ্রাম এবং জলের রেখা, এ পার এবং ও পার, খোলা মাঠ এবং ভাঙা রাস্তা, একটা স্বর্গীয় কবিতায়— অ্যাপলোদেবের স্বর্ণবীণাধ্বনিতে মণ্ডিত হয়ে উঠেছে। আমি আকাশ এবং আলো এত অন্তরের সঙ্গে ভালোবাসি! আকাশ আমার সাকী, নীল স্ফটিকের স্বচ্ছ পেয়ালা উপুড় করে ধরেছে, সোনার আলো মদের মতো আমার রক্তের সঙ্গে মিশে গিয়ে আমাকে দেবতাদের সমান করে দিচ্ছে। যেখানে আমার এই সাকীর মুখ প্রসন্ন এবং উন্মুক্ত, যেখানে আমার এই সোনার মদ সব চেয়ে সোনালি এবং স্বচ্ছ, সেইখানে আমি কবি, সেইখানে আমি রাজা, সেইখানে আমার বত্রিশ-সিংহাসন। এই আকাশের মধ্যে আমি একটি সুগভীর নিস্তব্ধ অন্তরঙ্গ ভালোবাসা এবং অনন্ত শান্তিরসপূর্ণ সান্ত্বনা অত্যন্ত প্রত্যক্ষভাবে সর্বাঙ্গে এবং সর্বমনে অনুভব করি। এই

আকাশের ভাণ্ডার, এই আলোক, এই শান্তি কখনো ফুরোবে না— আমার সঙ্গে বরাবর যদি ঐ সুনীল নির্মল জ্যোতির্ময় অসীমতার এই রকম অব্যবহিত প্রত্যক্ষ যোগ থাকে তা হলে আমার জীবন কখনোই সম্পূর্ণ নীরস হবে না।

সাতারা
৭ জুলাই ?
১৮৯৫

২১৮

সাহাজাদপুর
৫ জুলাই। ১৮৯৫।

কাল অনেক রাত পর্যন্ত নহবতে কীর্তনের সুর বাজিয়েছিল সে বড়ো চমৎকার লাগছিল, আর ঠিক এই পাড়াগাঁয়ের উপযুক্ত হয়েছিল— যেমন সাদাসিধে তেমনি সকরুণ। কাল রাত্রে বেশ মৃদুমন্দ বাতাস এবং পরিপূর্ণ জ্যোৎস্না ছিল, আর নহবতটি খুব ইনিয়ে-বিনিয়ে বাজছিল। কাল জানলা খুলে সেই বাজনা শুনতে শুনতে নিদ্রা দিয়েছি। আজ ভোরের বেলায় সেই বাজনার শব্দে জেগে উঠেছি। সেকালের রাজাদের বৈতালিক ছিল— তারা ভিন্ন ভিন্ন সময়ে গান গেয়ে প্রহর জানিয়ে দিত, এই নবাবিটা আমার লোভনীয় মনে হয়। ছেলেবেলায় পেনেটির বাগানে থাকতুম, পাশে দক্ষিণেশ্বর শিবমন্দির থেকে দিনরাত্রির মধ্যে তিন-চার বার করে নহবত বাজত— আমার তখন মনে হত আমি বড়ো হয়ে স্বাধীন হবা মাত্রই একটা এইরকম নহবত রাখব। যে পাষাণদেবতা কাঁসর ঘণ্টার অসহ্য কোলাহল সম্পূর্ণ বধির ভাবে শুনতে পারে, তার পক্ষে চার বেলা নহবতের রাগিণী -আলাপ সম্পূর্ণ অনাবশ্যক। তার চেয়ে আমাদের মতো ঠাকুরের জন্যে যদি কোনো পুণ্যবান্ সদাশয় এই রকম নহবতের ব্যবস্থা করে দেন তা হলে সংগীতটা ব্যর্থ হয় না। তা হলে দৈনিক তুচ্ছ জীবনটা এখনকার চেয়ে ঢের বেশি রমণীয় হয়ে ওঠে এবং দিনের কাজকর্ম-গুলোতে এমন দুঃসহ ক্লান্তি এবং বৈরাগ্য আনয়ন করে না। গান বাজনা শুনলেই তখনি বুঝতে পারি এতদিন আমি সংগীতের জন্যে তৃষিত হয়ে ছিলুম— সেই জন্যে আমার ভারী ইচ্ছে করে আমার খুব একজন কাছের লোক বেশ ভালোরকম বাজনা শিখে নেয়।

সাতারা
১০ জুলাই ?
১৮৯৫

২১৯

সাহাজাদপুর

৬ জুলাই। ১৮৯৫।

কাল আমাদের এখানকার পুণ্যাহ শেষ হয়ে গেল। বিস্তর প্রজা এসেছিল। আমি বসে বসে লিখছিলুম, এমন সময় প্রজারা দলে দলে রাজদর্শন করতে এল— ঘর বারান্দা সমস্ত পূর্ণ হয়ে গেল। আমার একটি বুড়ো ভক্ত আছে তার নাম রূপচাঁদ মৃধা— সে একটি ডাকাত-বিশেষ, লম্বা জোয়ান সত্যবাদী অত্যাচারী রাজভক্ত প্রজা। আমাকে যেন সে পরমাত্মীয়ের মতো ভালোবাসে— সে আমার পায়ের ধুলো নিয়ে সিধে হয়ে দাঁড়িয়ে বললে, 'তোমার চাঁদমুখ দেখতে এসেছি।' চাঁদমুখ এ কথায় বোধ করি কিঞ্চিৎ রক্তিমবর্ণ হবার উপক্রম করলে। রূপচাঁদ বললে, 'কতদিন পরে দেখা— এক বৎসর তোমায় দেখি নি!' মেয়েদের ভালোবাসা অবশ্য খুব মধুর লাগতে পারে, কিন্তু এই রকম সরল সবল পুরুষমানুষের অকৃত্রিম অটল নিষ্ঠা এরও একটি অপূর্ব সৌন্দর্য আছে— এর মধ্যে মানবপ্রকৃতির একেবারে অমিশ্রিত আদিম সহৃদয়তাটুকু প্রকাশ পায়— এর সঙ্গে সঙ্গে যে-একটা বল এবং কাঠিন্য আছে, যে-একটা ঋজুতা এবং directness প্রকাশ পায়, সেইটের জন্যেই এই সরস সুন্দর অনুরক্তি আরও এমন বহুমূল্য বোধ হয়। শিশুর মতো সরল এবং মনের-ভাব-প্রকাশে-অক্ষম সব দাড়ি-ওয়ালা পুরুষমানুষ একে একে এসে আমার পায়ের ধুলো নিয়ে চুমো খেতে লাগল— কখনো কখনো এরা কেউ কেউ একেবারে পায়ে চুমো খায়। একদিন কালীগ্রামে মাঠে চৌকি নিয়ে বসে আছি, সেখানে হঠাৎ এক মেয়ে এসে আমার দুই পায়ে মাথা রেখে চুমো খেলে— বলা আবশ্যক সে অল্পবয়স্কা নয়। পুরুষ প্রজারাও অনেকে পদচুম্বন করে। আমি যদি আমার প্রজাদের একমাত্র জমিদার হতুম তা হলে আমি এদের বড়ো সুখে রাখতুম— এবং এদের ভালো-বাসায় আমিও সুখে থাকতুম।

সাতারা। ১২ জুলাই ১৮৯৫

প্রজাগণের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ

২২০

পাবনা-পথে

৯ জুলাই। ১৮৯৫।

এই আঁকাবাঁকা ইছামতী নদীর মধ্যে দিয়ে চলেছি। এই নদীর ভিতর দিয়ে যাবার পথে এবং আসবার পথে তোকে অনেকবার অনেক চিঠি লিখেছি। এই ছোটো খামখেয়ালি নদী, দুই ধারে সবুজ ঢালু ঘাট, দীর্ঘ ঘন কাশবন, পাটের ক্ষেত আর আখের ক্ষেত, আর সারি সারি গ্রাম —এ যেন একই কবিতার লাইন আমি বারম্বার আবৃত্তি করে যাচ্ছি এবং প্রতিবারেই নতুন বোধ হচ্ছে। পদ্মা প্রভৃতি বড়ো বড়ো নদীগুলি এত বড়ো যে, সে যেন ঠিক কণ্ঠস্থ করে নেওয়া যায় না। আর, এই বর্ষাকালের ছোটো বাঁকা নদীটি যেন বিশেষ করে আমার হয়ে যাচ্ছে— এ নদীতে স্টীমার নেই, নৌকোর ভিড় নেই, আমারই বোট এই পাড়া-গেঁয়ে নদীটির উপরে যেন রাজত্ব বিস্তার করে চলে যায়। কাল থেকে আকাশ খুব মেঘাচ্ছন্ন হয়ে আছে। সমস্ত স্নিগ্ধ এবং শ্যামল, দুই তীর শান্তিপূর্ণ। পদ্মানদীর কাছে মানুষের লোকালয় তুচ্ছ, কিন্তু ইছামতী মানুষ-ঘেঁষা নদী— তার শান্ত জলপ্রবাহের সঙ্গে মানুষের দৈনিক কর্ম-প্রবাহগুলি বেশ সুন্দরভাবে এসে মিশছে। সে ছেলেদের মাছ ধরবার এবং মেয়েদের স্নান করবার নদী— স্নানের সময় মেয়েরা যে-সমস্ত গল্পগুজব নিয়ে আসে সেগুলি এই নদীর হাস্যময় কলস্বরের সঙ্গে বেশ মিশে যায়। আশ্বিন মাসে মেনকার ঘরের মেয়ে পার্বতী যেমন কৈলাস-শিখর ছেড়ে একবার তার বাপের বাড়ি দেখেশুনে যায়, ইছামতী তেমনি সম্বৎসর অদর্শন থেকে বর্ষার কয়েক মাস আনন্দহাস্য করতে করতে তার আত্মীয় লোকালয়গুলির তত্ত্ব নিতে আসে— তার পরে ঘাটে ঘাটে মেয়েদের কাছে প্রত্যেক গ্রামের সমস্ত নতুন খবরগুলি শুনে নিয়ে তাদের সঙ্গে মাখামাখি সখীত্ব করে আবার চলে যায়।

সাতারা
১৪ জুলাই ১৮৯৫

শিলাইদহ
১০ জুলাই। ১৮৯৫।

সন্ধ্যা হয়ে এসেছে— আকাশ মেঘে অন্ধকার। গুরুগুরু মেঘ ডাকছে এবং ঝোড়ো বাতাসে তীরের বনঝাউগুলো আন্দোলিত হচ্ছে। বনের মধ্যে শেয়াল ডাকছে, নদীতে নৌকো নেই— মেয়েরা ঘাট পরিত্যাগ করেছে, ডাঙায় জনমানব নেই— গুটি দুই-তিন গোরু বাবলা-বনের ভিতর দিয়ে গৃহমুখে চলেছে। ডাঙায় বাঁশঝাড়ের মধ্যে ঘন কালীর মতো অন্ধকার এবং জলের উপর গোধূলির একটা বিবর্ণ ধূসর আলো পড়ে একটা অস্বাভাবিক উত্তেজনার মতো দেখতে হয়েছে। আমি সেই ক্ষীণালোকে কাগজের উপর ঝুঁকে পড়ে চিঠি লিখছি— উচ্ছৃঙ্খল বাতাসে টেবিলের সমস্ত কাগজপত্র উড়িয়ে ছড়িয়ে ফেলবার উপক্রম করছে। এ দিকে নদীর চাঞ্চল্যে যে-একটু দোলা দিচ্ছে তাতেও লাইন ঠিক রেখে লেখা একটু কষ্টসাধ্য হয়ে উঠেছে। কিন্তু এই ছোটো নদীর উপরে ঘনবর্ষার সমারোহ বড়ো ভালো লাগছে— এই সময়ে বসে বসে চিঠি লিখতে ইচ্ছা করছে। এই গোধূলির মেঘলা অন্ধকারে নির্জন ছোটো ঘরের মধ্যে বসে মৃদুমন্দস্বরে গল্প করে যাবার মতো চিঠি। কিন্তু সেটা একটা ইচ্ছা মাত্র— কী করলে সে ইচ্ছাকে কার্যে পরিণত করা যায় তা ঠিক জানি নে। অর্থাৎ, চিঠিকে ঠিক সেই নির্জন ঘরের গল্পে পরিণত করার মতো ক্ষমতা নেই। আমাদের মনের খুব সহজ ইচ্ছাগুলিই বাস্তবিক দুঃসাধ্য। সেগুলি হয় আপনি পূর্ণ হয়, নয় কিছুতে পূর্ণ হয় না। অনেক সময় যুদ্ধ জমানো সহজ, কিন্তু গল্প জমানো সহজ নয়।

সাতারা
১৫ জুলাই ১৮৯৫

২২২

কলকাতা

২০ জুলাই। ১৮৯৫।

এবারে আমার পাঞ্চভৌতিকে নিদেন একটা চিন্তা করবার যোগ্য নূতন ভাব আছে, সেটা আমি দেখলুম কোনো পাঠকেই ঠিক গ্রহণ করতে পারে নি। আমি বলি যে, মৃত্যু যদি না থাকত তা হলে বস্তুজগতের মধ্যেই আমাদের কল্পনার অবসান হত, জগতের মধ্যে অনন্তের suggestion থাকত না। বস্তুজগৎটা হচ্ছে অটল reality —তার মধ্যে আমাদের কল্পনা এবং আমাদের ধর্মবুদ্ধির পরিতৃপ্তি হয় না। তার পরিতৃপ্তিসাধন করতে হলেই একটা ideal জগতের সৃজন করতে হয়, সেই ideal জগৎ স্থাপন করব কোথায়? মৃত্যু যেখানে এই বস্তুজগতের মধ্যে ফাঁক করে দিয়েছে। সেই মৃত্যুর পারেই আমাদের স্বর্গ, আমাদের দেবতাসম্মিলন, আমাদের সম্পূর্ণতা, আমাদের অমরতা। বস্তুজগৎ যদি অটল কঠিন প্রাচীরে আমাদের ঘিরে রেখে দিত, এবং মৃত্যু যদি তার মধ্যে মধ্যে বাতায়ন খুলে না রেখে দিত তা হলে আমরা যা আছে তারই দ্বারা সম্পূর্ণ বেষ্টিত হয়ে থাকতুম। এ ছাড়া আর যে কিছু হতে পারে তা আমরা কল্পনাও করতে পারতুম না। মৃত্যু আমাদের কাছে অনন্ত সম্ভাবনার দ্বার খুলে রেখে দিয়েছে। মৃত্যুর পরে কী হতে পারি তার আর সামা নেই, এবং মৃত্যু পুরাতনকে অপসারিত করে দেয় ব'লেই অনাগত অসীম নূতন আমাদের ideal আশাকে পোষণ করতে থাকে। ভালো কবিতার প্রধান কবিত্ব হচ্ছে তার suggestiveness। জগৎ-রচনার মধ্যে সেই suggestiveness মৃত্যুর মধ্যে— সেইখানেই আমরা অনুভব করে থাকি যে, আরও ঢের আছে এবং আরও ঢের হতে পারে। যেমন অন্ধকার রাত্রেই আকাশে অসীম জগতের আভাস দেখা যায়, দিনের আলোকে কেবল এই পৃথিবীই জাজ্বল্য-

মান হয়ে ওঠে— তেমনি মৃত্যুতে অনন্তের সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ আমরা অনুভব এবং অনুমান করি ; যদি মৃত্যু না থাকত তা হলে আপনার দীনহীন অস্তিত্বের মধ্যেই সুকঠিন ভাবে বদ্ধ হয়ে থাকতুম ; মানবাত্মার সর্বাপেক্ষা মহৎ কবিত্বের স্থান, পরলোক এবং দেবলোক, যা আমাদের ধর্মবুদ্ধি এবং সৌন্দর্যবোধের প্রধান পরিতৃপ্তির স্থান, তার আমরা আভাস বা উদ্দেশ পেতুম না। তা ছাড়া আমাদের অস্তিত্ব, মাঝে মাঝে যদি ছেদ না পেত তা হলে বিপর্যয় কুৎসিত হয়ে উঠত। এক দিকে পরিষ্কার definiteness আর-এক দিকে অসীম suggestiveness —এই দুইয়ে মিলে যথার্থ সৌন্দর্য গঠিত হয়— মৃত্যুতেই যেমন আমাদের জীবনকে এক দিকে সীমাবদ্ধ করে তেমনি সেই মৃত্যুতেই আমাদের জীবনকে আর-এক দিকে সীমামুক্ত করে দেয়। ব্যক্তিগত হিসাবে দেখতে গেলে মৃত্যুটা উৎকট এবং তার মধ্যে কোনো সান্ত্বনা নেই। কিন্তু বিশ্বজগতের হিসাবে দেখতে গেলে মৃত্যুটা অতি সুন্দর এবং মানবাত্মার যথার্থ সান্ত্বনাস্থল।

কিন্তু আমি বারম্বার দেখেছি পাঞ্চভৌতিকে আমি যে-সকল চিন্তার অবতারণ করি তার ঠিক মর্মটি প্রায় কেউ গ্রহণ করে না। আসলে বোধ হয় আমি ভালো করে বোঝাতে পারি নে—বোঝানোও বিষম শক্ত।

সাতারা
২৪ জুলাই ১৮৯৫

২২৩

কলকাতা

৩ অগস্ট্‌। ১৮৯৫।

লোকের খ্যাতির মধ্যে খুব একটা মাদকতা আছে সে কথা স্বীকার করতেই হবে, কিন্তু সর্ববিধ মাদকতার মতো খ্যাতির মাদকতায়ও ভারী একটা অবসাদ এবং শ্রান্তি আছে। প্রথম উচ্ছ্বাসের পরেই সমস্ত শূন্য এবং মিথ্যা মনে হয়— মনে হয় এই আত্মাবমাননাজনক আত্মাবনতিকর মোহ থেকে সর্বপ্রযত্নে দূরে থাকা উচিত, এই জিনিষটা যাতে অন্তরাত্মার একটা অত্যাবশ্যক নেশার মতো না দাঁড়িয়ে যায় সে জন্যে বিশেষ সাবধান থাকা উচিত। প্রথমত লোকের খ্যাতি পেলেই নিজের যোগ্যতা সম্বন্ধে একটা অবিশ্বাস জন্মে, তার পরে সেই অনেকখানি মিথ্যা জিনিষ ফাঁকি দিয়ে পাচ্ছি বলে ভারী একটা অসন্তোষের উদয় হয়— অথচ আমি যে বাংলার পাঠক-সাধারণের অনাদরের যোগ্য তাও আমার আন্তরিক বিশ্বাস নয় এই এক আশ্চর্য ব্যাপার। কিন্তু দিন-দিন যতই আমার খ্যাতি বাড়ছে ততই এক দিকে আমি খুশি হচ্ছি অন্য দিকে সব ছেড়েছুড়ে লোকের ভিড় ঠেলেঠুলে নিজের যথার্থ প্রাইভেট বাসস্থানের নিভৃত কোণে ঢোকবার প্রবল ইচ্ছা বোধ হচ্ছে। সাধনায় প্রতি মাসে লোকচক্ষে নিজের নামটার পুনরাবৃত্তি করতে একেবারে বিরক্ত ধরে গেছে। এটা আমি বেশ বুঝতে পারছি খ্যাতি জিনিষটা ভালো নয়— ওতে অন্তরাত্মার কিছুমাত্র ক্ষুধানিবৃত্তি হয় না, কেবল তৃষ্ণা বেড়ে ওঠে।

সাতারা

৭ অগস্ট্‌ ১৮৯৫

৩০

শিলাইদহ

১৪ অগস্ট্‌। ১৮৯৫।

যত বিচিত্র রকমের কাজ আমি হাতে নিচ্ছি, কাজ জিনিষটার প্রতি আমার শ্রদ্ধা মোটের উপর ততই বাড়ছে। অবশ্য, সাধারণভাবে জানতুম যে, কর্ম অতি উৎকৃষ্ট শ্রেষ্ঠ পদার্থ। কিন্তু সে-সমস্ত পুঁথিগত বিদ্যা। এখন বেশ স্পষ্টরূপে বুঝতে পারছি কাজের মধ্যে পুরুষের যথার্থ চরিতার্থতা। কর্মের মধ্যে পুরুষের অনেকগুলি বৃত্তিকে সর্বদাই নিয়োগ করে রাখতে হয়— জিনিষ চিনতে হয়, মানুষ চিনতে হয়, বৃহৎ কর্মক্ষেত্রের সঙ্গে পরিচয় রাখতে হয়। এখন আমার কাছে একটা নূতন রাজ্য খুলে গেছে। দেশ দেশান্তরের লক্ষ লক্ষ লোক যে-এক বৃহৎ বাণিজ্যক্ষেত্রের মধ্যে অহর্নিশি প্রাণপণ প্রয়াসে প্রবৃত্ত আমি তারই মধ্যে অবতীর্ণ হয়েছি— মানুষের পরস্পরের শৃঙ্খলাবদ্ধ সম্বন্ধ এবং কর্মের সুদূরবিস্তৃত উদারতা আমার প্রত্যক্ষগোচর হয়েছে। সমস্ত চিনতে এবং শিখতে, খাটতে এবং চিন্তা করতে, বেশ একটি গৌরব অনুভব করা যায়। পুরুষের কাজের একটা এই মাহাত্ম্য যে, কাজের খাতিরে তাকে নিজের ব্যক্তিগত সুখ দুঃখকে অবজ্ঞা করে সংক্ষেপ করে নিয়ে চলতে হয়। মনে আছে, সাজাদপুরে থাকতে সেখানকার খানসামা একদিন সকালে দেরি করে আসাতে আমি ভারী রাগ করেছিলুম ; সে এসে তার নিত্যনিয়মিত সেলামটি করে ঈষৎ অবরুদ্ধ কণ্ঠে বললে, 'কাল রাত্রে আমার আট বছরের মেয়েটি মারা গেছে।' এই বলে সে ঝাড়নটি কাঁধে করে আমার বিছানাপত্র ঝাড়পোঁচ করতে গেল। আমার ভারী কষ্ট হল— কঠিন কর্মক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা অন্তরঙ্গ শোকেরও অবসর নেই। কিন্তু সে অবসরটা নিয়ে ফল কী? কর্ম যদি মানুষকে বৃথা অনুশোচনার বন্ধন থেকে মুক্ত করে সম্মুখে প্রবাহিত করে নিয়ে যেতে পারে

তবে তার চেয়ে ভালো শিক্ষা আর কী আছে! যা হবার নয় সে তো আয়ত্তের অতীত, যা হতে পারে তা সংসারে যথেষ্ট এবং তা এখনি হাতের কাছে প্রস্তুত। যে মেয়ে মরে গেছে তার জন্যে শোক ছাড়া আর কিছুই করতে পারি নে, কিন্তু যে ছেলে বেঁচে আছে তার জন্যে রীতিমত খাটতে হবে। কল্পনানেত্রে এই পৃথিবীব্যাপী পুরুষের কর্মক্ষেত্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করি— সংসারের রাজপথের দুই ধারে সকলে কঠিন পরিশ্রমে কাজ করছে— কেউ চাকরি করছে, কেউ ব্যাবসা করছে, কেউ চাষ করছে, কেউ মজুরি করছে— অথচ এই কর্মক্ষেত্রের নীচে দিয়ে প্রত্যহই কত মৃত্যু কত শোক দুঃখ নৈরাশ্য গোপনে অন্তঃশিলা বহে যাচ্ছে, যদি তারা জয়ী হতে পারত তা হলে মুহূর্তের মধ্যে সমস্ত কর্মচক্র বন্ধ হয়ে যেত। ব্যক্তিগত শোক দুঃখ নীচে দিয়ে চলে যায় এবং তার উপরে কঠিন পাথরের ব্রিজ বেঁধে লক্ষলোকপূর্ণ কর্মের রেলগাড়ি আপন লৌহপথে হুহুঃ শব্দে চলে যায়— নির্দিষ্ট স্থান ছাড়া কারও খাতিরে কোথাও থামে না। কর্মের এই নিষ্ঠুরতার মধ্যে একটা কঠোর সান্ত্বনা আছে।

সাতারা
১৯ অগস্ট ১৮৯৫

২২৫

শিলাইদহ

১৮ অগস্ট্। ১৮৯৫।

কুটীরবাসের একটা অভিজ্ঞতা আমার মন্দ লাগল না— যদিও টেবিল চৌকি ক্যাম্প্‌খাট নিয়ে ঠিক রীতিমত কুটীরবাস হয় না। তবু ডাঙার উপরে উঠে বর্ষার সবুজ পৃথিবীটা একবার দেখে আসা গেল, সেটা বেশ লাগল। বসে বসে অনেক ক্ষণ প্রচুর ভিজে ঘাসের মধ্যে গোরু এবং ছাগলের চরাটা এবং তার সঙ্গে রাখাল বালিকাদের পর্যবেক্ষণ করে অনেকটা সময় কাটত। মানুষের যে অবস্থাটা গাছপালা শস্য গোরু বাছুর এবং একতলা মেটে ঘরের সঙ্গে সংলগ্ন— এবং ধান কাটা, নৌকোয় খেয়া দেওয়া, জল তোলা, কাপড় কাচার সঙ্গে জড়িত — সেইটে নিকট থেকে দেখলে বেশ একটি মাধুর্য অনুভব করা যায়। অনেকে বলে, ওদের মধ্যে যে সুখ আমরা কল্পনা করি সেটা ঠিক সমূলক নয়। কিন্তু সে কথা মিথ্যা। ওরা অনেকটা ছেলেমানুষের মতো, সেই জন্যে ওরা সমগ্র হৃদয় দিয়ে সুখ সন্তোষ উপভোগ করতে পারে। আমাদের সুখ বড়ো জটিল এবং দুর্লভ এবং বহুল পরিমাণে কৃত্রিম হয়ে পড়েছে। আমাদের মনে সহজে মোহ উৎপন্ন হয় না, আমরা আত্মবিস্মৃত হতে পারি নে, স্বল্পটুকুকে সরল কল্পনার দ্বারা বাড়িয়ে নিতে পারি নে— বরং অনেকখানিকে অসন্তুষ্ট বিশ্লেষণের দ্বারা কমিয়ে নিই। তাই বলে আবার চাষা হতেও চাই নে— কেবল ওদের সন্তোষ এবং সরলতাটুকু চাই আর সমস্ত বুদ্ধিবিদ্যা নিজের যা পুঁজি আছে তাও ছাড়তে চাই নে।

সাতারা

২৩ অগস্ট্‌ ১৮৯৫

২২৬

শিলাইদহ

২০ অগস্ট্‌। ১৮৯৫।

মেঘবৃষ্টি কেটে গিয়ে কাল থেকে নির্মল উজ্জ্বল সুন্দর শরৎকালের ভাব দেখা দিয়েছে। এ ক'দিন নদীর জল কমে গিয়ে নদী হঠাৎ খুব প্রশান্ত নিস্তরঙ্গ ভাব ধারণ করেছে, ও পারে চরের কাছে জেলেরা এক-কোমর জলে নেবে মাছ ধরছে, এ পারে নদীর ধারে গোরু চরছে— একটি সুবিস্তীর্ণ সুন্দর সমুজ্জ্বল শান্তি জলে স্থলে শূন্যে আপন উদার মাতৃক্রোড় প্রসারিত করে বসে আছে, অত্যন্ত নিকটে এসে আমার মস্তক চুম্বন করছে। এইরকম সকালবেলায় অতীত-কালের সমুদয় সুমধুর দিনগুলিকে আজকের দিনের সঙ্গে মিলিয়ে দিয়ে অখণ্ডসমগ্রভাবে দেখতে পাওয়া যায়। তোকে পূর্বে একবার বলেছিলুম, [বব], আমার ইচ্ছে করে আমার সমুদয় চিঠিগুলো থেকে সমস্ত তুচ্ছ ব্যক্তিগত কথা বাদ দিয়ে, কেবল মতামত বর্ণনা এবং সৌন্দর্যসম্ভোগ, কেবল চিন্তা এবং কল্পনাগুলিকে বেছে নিয়ে একত্র গেঁথে গেলে আমার অধিকাংশ জীবিতকালের সমস্ত মাধুর্য একেবারে ঘনীভূতভাবে পাওয়া যেতে পারে— আমার পক্ষে সে একটা বৃহৎ বিস্তীর্ণ উপবনের মতো বেড়াবার জায়গা হয়— যদি এক সময়ে মনের সূক্ষ্ম সম্ভোগশক্তি হ্রাস হয়ে আসে, যদি নূতন জগৎ তার দ্বার-গুলি একে একে আমার কাছে রুদ্ধ করতে থাকে, তা হলে আমার সেই অমূল্য পুরাতন জগৎটি আমার কাছে পরম আশ্রয়ের মতো থাকে। বিশ্বজগতের সঙ্গে আমার অন্তরঙ্গ আত্মীয়তার কথা আমার অন্য কোনো লেখায় তেমন যথার্থ সত্যভাবে নেই যেমন আমার চিঠির মধ্যে আছে— সেই অংশগুলি যদি পাই তা হলে আমার জীবন অনেকটা বৃহত্তর হয়ে ওঠে।

সাতারা

২৫ অগস্ট্‌ ১৮৯৫

শিলাইদহ

২৩ অগস্ট। ১৮৯৫।

এই বর্ষার বিপুল নদীস্রোত তার অবিশ্রাম কলশব্দ নিয়ে আমাকে এমন পরিপূর্ণ সঙ্গদান করে কেন তাই ভাবছিলুম। তার কারণ আমি বেশ বুঝতে পারছি, কিন্তু প্রকাশ করে বলা শক্ত। নদীটা যেন একটা সুবৃহৎ প্রাণপদার্থের মতো— একটা প্রবল উদ্যমরাশি বহুদূর হতে গর্ব-ভরে কলস্বরে অবহেলে চলে আসছে। তাই দেখে আমাদের প্রাণের মধ্যে একটা আত্মীয়তার স্পন্দন অনুভূত হতে থাকে। একটা দুর্ধর্ষ বন্য ঘোড়াকে যদি প্রান্তরের মধ্যে স্বাধীনতার উদ্দাম আনন্দে ছুটতে দেখা যায় তা হলে সেই দেখে আমাদের ভিতরকার প্রাণের উদ্যম আন্দোলিত হয়ে ওঠে। আমি অনেকবার ভেবে দেখেছি, প্রকৃতির মধ্যে যে এমন একটা গূঢ় গভীর আনন্দ পাওয়া যায় সে কেবল তার সঙ্গে আমাদের একটা সুবৃহৎ আত্মীয়তার সাদৃশ্য অনুভব ক'রে— এই নিত্যসঞ্জীবিত সবুজ সরস তৃণলতা-তরুগুল্ম, এই জলধারা, এই বায়ু-প্রবাহ, এই সতত ছায়ালোকের আবর্তন, এই ঋতুচক্র, এই অনন্ত-আকাশ-পূর্ণ জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর প্রবহমাণ স্রোত, পৃথিবীর অনন্ত প্রাণী-পর্যায়, এই সমস্তের সঙ্গেই আমাদের নাড়ীর রক্তচলাচলের যোগ রয়েছে— সমস্ত বিশ্বচরাচরের সঙ্গে আমরা একই ছন্দে বসানো— এই ছন্দের যেখানে যতি পড়ছে, যেখানে ঝংকার উঠছে, সেইখানেই আমাদের মনের ভিতর থেকে সায় পাওয়া যাচ্ছে— প্রকৃতির সমস্ত অণুপরমাণু যদি আমাদের সগোত্র না হত, যদি প্রাণে সৌন্দর্যে এবং নিগূঢ় একটা আনন্দে অনন্তকাল স্পন্দমান হয়ে না থাকত, তা হলে কখনোই এই বাহ্য জগতের সংসর্গে আমাদের এমন একটা আন্তরিক আনন্দ ঘটত না। যাকে আমরা অন্যায়পূর্বক জড় বলে থাকি সেই জগতের সঙ্গে আমাদের চেতনার একটা যোগাযোগের গোপন পথ

আছে ; নইলে কখনোই নির্জীবের প্রতি জীবনের, জড়ের প্রতি মনের, বাইরের প্রতি অন্তরের এমন একটা অনিবার্য ভালোবাসার বন্ধন থাকতেই পারে না। আমার সঙ্গে এই বিশ্বের ক্ষুদ্রতম পরমাণুর বাস্তবিক কোনো জাতিভেদ নেই, সেই জন্যেই এই জগতে আমরা একত্রে স্থান পেয়েছি— নইলে আমাদের উভয়ের জন্যে দুই ভিন্ন জগৎ সৃজিত হয়ে উঠত। আমি যখন মাটির সঙ্গে মাটি হয়ে যাব, তখনও আমার অনন্ত প্রাণময় বিশ্বাত্মীয়ের সঙ্গে বন্ধন বিচ্ছিন্ন হবে না— আমি আমার নিজের ভিতরকার সহজ আনন্দ থেকে এইটে অনুভব করি। আমার আর-কোনো যুক্তি নেই।

সাতারা

১৮ অগস্ট, ১৮৯৫

শিলাইদহ

২৪ অগস্ট্। ১৮৯৫।

এই-যে অনাদি অনন্ত আকাশ -পূর্ণ নিত্য স্পন্দমান ঘূর্ণ্যমান অণু-পরমাণুর সঙ্গে আমাদের একটা নিগূঢ় আনন্দময় আত্মীয়তার বন্ধন আছে এ সত্যটা মাঝে মাঝে আমার মন থেকে ম্লান হয়ে অদৃশ্যপ্রায় হয়ে যায়—হয়তো অনেক দিনের অভ্যাস-বশত কথাটা আমার স্মৃতি-পটে লেখা থাকে, কিন্তু সেটাকে প্রত্যক্ষ দীপ্যমান -ভাবে অন্তরাত্মার মধ্যে অনুভব করতে পারি নে। তখন ওটাকে কবিকল্পনা বলে ভ্রম হয়। নিজের মধ্যে নিজে অনুভব করার মতো সত্যের এমন প্রত্যক্ষ প্রমাণ আর কী আছে? কিন্তু অনেক সময় মন নানা কাজে নানা চিন্তায় বিক্ষিপ্ত উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে যায়, কল্পনার সূক্ষ্ম অনুভবশক্তি রসাভাবে শুষ্ক হয়ে আসে, তখন অন্তঃকরণের সেই প্রশান্তগভীর পরিপূর্ণ প্রসারতা থাকে না যার অপার নিস্তব্ধতার মধ্যে সত্যের সমস্ত দূরাগত ধ্বনিগুলি নিজেরই ভিতরকার কথাগুলির মতো অত্যন্ত স্পষ্টরূপে শোনা যায়। তখন সমস্তই জড়িয়ে মিশিয়ে ঘুলিয়ে যায়, তখন কেবল বাইরের গোলমালগুলোকেই সত্য বলে মনে হয় এবং অন্তরের চিরন্তন কথা-গুলিকেই স্বপ্নদর্শীর কাল্পনিকতা বলে ভ্রম হতে থাকে। তা যদি না হত, যদি এই অনন্ত বিশ্বের সজীব আকর্ষণ চিরকাল স্পষ্ট এবং একান্ত সত্যভাবে অনুভব করতে পারতুম, তা হলে এমন চিরশান্তি এমন চিরসান্ত্বনা আর কিসে থাকত? তা হলে পৃথিবীর প্রাণময়ী মাটিকে বুকের মধ্যে আলিঙ্গন করে ধরে হৃদয়কে এই জগদ্‌ব্যাপী সৌন্দর্যের মধ্যে প্রসারিত করে দিতে পারতুম। দুঃখের বিষয় এই যে, ভিতরে খানিকটা শান্তি না থাকলে এই অখণ্ড শান্তিকে আপনার মধ্যে প্রতিফলিত দেখা যায় না, নিজের খানিকটা আনন্দ না থাকলে এই অখণ্ড আনন্দের সঙ্গে যোগ রক্ষা করতে পারা যায় না। সেই জন্যেই

মাঝে মাঝে মফস্বলে এলে হঠাৎ এই বৃহৎ সত্য আমার সম্মুখে এক মুহূর্তে প্রতিভাত হয়ে ওঠে। কিন্তু যদি কালক্রমে আমার কল্পনার এই সজীবতা চলে যায়, বাহ্যপ্রকৃতি আমার মনেরই জড়ত্ব-বশত জড়বৎ প্রতিভাত হয়, তা হলে আজ যে কথাটাকে এমন অন্তরঙ্গ সত্য বলে জানছি সেইটেকে যৌবনকালের এক সময়ের একটা খেয়াল বলে মনে হবে— মনে হবে, বেশ একটি সুন্দর থিয়োরি— হয়তো প্রবীণ বয়সের শুষ্ক হাস্য উদ্রেক করবে। কিন্তু আমার এই প্রত্যক্ষ-অনুভূত গভীর আনন্দ তোর অনেক চিঠিতে লিপিবদ্ধ হয়ে আছে, সেইগুলো দেখলে বোধ হয় শুষ্ক চিত্তের মধ্যে সরসতার সঞ্চার হতে পারবে— আমার প্রকৃতিনিহিত ধর্মটি (religion) ফিরে পাব।

কলকাতা

২ সেপ্টেম্বর ১৮৯৫

শিলাইদহ

২০ সেপ্টেম্বর। ১৮৯৫।

আজ সেই ঝড়ের ভাবটা থেমে গিয়ে সকালে অল্প অল্প রোদ্‌দুর ওঠবার চেষ্টা করছে, কিন্তু এখনো সম্পূর্ণ কৃতকার্য হতে পারে নি। মেঘ আকাশময় ছড়ানো, পুবে হাওয়া খুব বেগে বইছে। ও পারে বিকশিত কাশবন আগুনের শিখার মতো ক্রমাগত কাঁপছে। এখান থেকে দূরের পদ্মার গর্জন শোনা যাচ্ছে। কাল পর্‌শু দুদিন ঠিক আমার সেই নতুন গানের মতো দৃশ্যটা হয়েছিল—

ঝরঝর বরষে বারিধারা—
ফিরে বায়ু হাহাস্বরে জনহীন অসীম প্রান্তরে—
অধীরা পদ্মা তরঙ্গ-আকুলা—
নিবিড় নীরদ গগনে—

ইত্যাদি।

তার মধ্যে এই হতভাগ্য গৃহহারা ব্যক্তিটি স্টীমারের ছাতের উপরে আপাদমস্তক ভিজে একেবারে কাদা হয়ে গিয়েছিল। গায়ে সেই আমার মস্ত রেশমের আলখাল্লা পরা ছিল, সেটা ঝোড়ো বাতাসে চতুর্দিকে অত্যন্ত হাস্যকরভাবে উড়ে বেড়াতে লাগল— চোখের চশমা জল লেগে ঝাপসা হয়ে এল— হাতে যে বই ছিল তার মলাটটা আমার কর-কমলে অবিরল রঙিন অশ্রুপাত করতে লাগল। আমি কাল পর্‌শু প্রায় মাঝে মাঝে সেই গানটা গাচ্ছিলুম। গাওয়ার দরুন বৃষ্টির ঝরঝর, বাতাসের হাহাকার, গোরাই নদীর তরঙ্গধ্বনি একটা নূতন জীবন পেয়ে উঠতে লাগল— চারি দিকে তাদের একটা ভাষা পরিস্ফুট হয়ে উঠল এবং আমিও এই ঝড়-বৃষ্টি-বাদলের সুবিশাল গীতিনাট্যের একজন প্রধান অভিনেতার মধ্যে দাঁড়িয়ে গেলুম। সংগীতের মতো এমন আশ্চর্য ইন্দ্রজালবিদ্যা জগতে আর কিছুই নেই— এ এক নূতন সৃষ্টি-

কর্তা। আমি তো ভেবে পাই নে, সংগীত একটা নতুন মায়াজগৎ সৃষ্টি করে না এই পুরাতন জগতের অন্তরতম অপরূপ নিত্যরাজ্য উদ্‌ঘাটিত করে দেয়। গান প্রভৃতি কতকগুলি জিনিষ আছে যা মানুষকে এই কথা বলে যে,* 'তোমরা জগতের সকল জিনিষকে যতই পরিষ্কার বুদ্ধিগম্য করতে চেষ্টা করো-না কেন এর আসল জিনিষটাই অনির্বচনীয় এবং তারই সঙ্গে আমাদের মর্মের মর্মান্তিক যোগ— তারই জন্যে আমাদের এত দুঃখ, এত সুখ, এত ব্যাকুলতা।

কলকাতা

২১ সেপ্টেম্বর ১৮৯৫

২৩০

শিলাইদহ

২১ সেপ্টেম্বর। ১৮৯৫।

আমি নিশ্চয় জানি যে, একবার যদি আমি নিজেকে ঘাড় ধরে কোনো একটা রচনাকার্যে নিযুক্ত করাতে পারি তা হলে লেখা বেশ হু হু করে এগোতে থাকে, এবং যতই সে লেখার মধ্যে মন নিবিষ্ট হতে থাকে ততই মনটা একটা বিশুদ্ধ আনন্দের দ্বারা পরিব্যাপ্ত হয়ে ওঠে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, প্রথম লিখতে প্রবৃত্ত হবার পূর্বে কিছুতেই মনকে লওয়াতে পারি নে। মন বলে, 'আমার লেখা-ফেখা সব ফুরিয়ে গেছে, আর আমার লেখবার বিষয়ও কিছু নেই, আমার লেখবার ক্ষমতাও প্রায় শেষ হয়ে এল— এ অবস্থায় তুমি আমাকে খোঁচা দিয়ে লিখিয়ে সাধারণের সামনে অপদস্থ কোরো না।' আমি তাকে বলি, 'ঐ কথা তো তুমি বরাবর বলছ, কিন্তু লিখতেও তো কসুর করো না।' আমার মন একশ্রেণীয় ঘোড়ার মতো যারা প্রথম গাড়িতে জোৎবামাত্র লাথি ছুঁড়ে পিছন হঠতে থাকে, কিন্তু একবার যদি মেরে-কেটে বাপুবাছা ব'লে দুই পা এগিয়ে দেওয়া যায় তা হলে বাকি রাস্তাটা একেবারে চার পা তুলে ছুটতে থাকে। এখন সে কেবলই তার কলকাতার আস্তাবলটার দিকে ঝুঁকছে— আবার একবার যখন সে আপনার রচনার এবং কল্পনার মধ্যে আপনার পূর্ণ অধিকার ফিরে পাবে, খানিকটা দূর এগিয়ে যাবে, তখন মনে করবে এই কল্পনালোকের মধ্যে আমার বাস্তবলোক প্রকৃতভাবে আছে। লিখতে গিয়ে আপনার নিগূঢ় মানসরাজ্যের মধ্যে গভীর ভাবে প্রবেশলাভ হতে থাকে এবং সেখানে গিয়ে দেখি, জীবনে আমার বাঞ্ছিত পুষ্প থেকে যত মধু আহরণ করেছিলুম তার অধিকাংশই সেখানে সঞ্চিত হয়ে আছে। মনের সেই নিত্যরাজ্যের মধ্যে প্রবেশ করবার দ্বার সব সময়ে খুঁজে পাওয়া যায় না।

কাল থেকে মেঘ কেটে গিয়ে নবীন শরৎকাল আমার চতুর্দিকে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে, তাই আমাকে এক রকম স্মৃতিশিশিরসিক্ত করে তুলেছে।

কলকাতা
২২ সেপ্টেম্বর ১৮৯৫

২৩১

শিলাইদহ

২৫ সেপ্টেম্বর। ১৮৯৫।

মানুষ আপনাদের সমাজটাকে নিজের হাতে এমনি জড়িয়ে পাকিয়ে তুলেছে যে, এ সমাজে সুখী হওয়া এবং সুখী করা বিষম একটা সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু দুঃখটা হয়তো মানুষের পক্ষে অত্যন্ত দরকারী জিনিষ। যুদ্ধ করা, চেষ্টা করা, সহ্য করা, ত্যাগ করা— হয়তো সুখী হওয়ার চেয়ে বেশি আবশ্যক। কষ্টে মানুষকে মানুষ করে তুলতে থাকে, এবং সে মনুষ্যত্বের মূল্য কোথাও না কোথাও আছে। ধর্মব্যবসায়ীরা বলে, ঈশ্বর যাকে ভালোবাসেন তাকে পীড়া দেন। কথাটা অনেক সময় কপট 'ক্যাণ্ট্'এর মতো শুনতে হয়, কিন্তু তাই বলে ওটা একেবারে অমূলক নয়। কষ্টই আমাদের আত্মার আমাদের প্রেমের আমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদের একমাত্র মূল্য।··· দুর্ভাগ্যের বিষয় আমাদের এমন সংগতি নেই যে কারও দুঃখ দূর করতে পারি। সেই জন্যে টাকা করা কাজটাকে ছোটো মনে হয় না। যদি আমাদের এই ব্যবসায়ে কিছু টাকা সংগ্রহ করে উঠতে পারি তা হলে অনেক মনের আক্ষেপ মেটাতে পারব—- এই মেট্যিরিয়ল পৃথিবীতে কেবলমাত্র কামনার দ্বারা ভালোবাসার দ্বারা কারও দুঃখ দূর করা যায় না।

কলকাতা

২৩ সেপ্টেম্বর ১৮৯৫

২৩২

শিলাইদহ

২৬ সেপ্টেম্বর। ১৮৯৫।

যদিও ঝড় হবার কোনো লক্ষণ দেখছি নে— আকাশে মেঘ অতি অল্প, নদী অতি প্রশান্ত, দিবালোক নির্মল এবং উজ্জ্বল— স্রোতের মুখে বোট হুহুঃশব্দে ভেসে চলেছে, মৃদুমন্দ বাতাস দিচ্ছে, শরীর এবং মনের মধ্যে একটি পুলকমিশ্রিত জড়িমার সঞ্চার হচ্ছে। আজ আমার নির্জনবাসের শেষ দিন ; কাল থেকে অন্যান্য কাজের মধ্যে আতিথ্যে মন দিতে হবে ·· আমার সাধনা লেখার কাজে এখনও হাত দিই নি। কেবল সংগীত-আলোচনায় সরস্বতীর সঙ্গে খানিকটা সম্বন্ধ রেখেছি। এখানে প্রকৃতি এত নিকটবর্তিনী, তার হৃৎকম্প এবং তার নিশ্বাস-হিল্লোল এত কাছে অনুভব করা যায় যে, সংগীত ছাড়া আর কোনো-রকম চেষ্টাসাধ্য উপায়ে ভাবপ্রকাশ করতে ইচ্ছা হয় না। প্রকৃতির সঙ্গে গানের যত মিকট সম্পর্ক এমন আর কিছু না— আমি নিশ্চয় জানি এখনি যদি আমি জানলার বাইরে দৃষ্টি রেখে রামকেলি ভাঁজতে আরম্ভ করি তা হলে এই রৌদ্ররঞ্জিত সুদূরবিস্তৃত শ্যামলনীল প্রকৃতি মন্ত্রমুগ্ধ হরিণীর মতো আমার মর্মের কাছে এসে আমাকে অবলেহন করতে থাকবে। যতবার পদ্মার উপর বর্ষা হয় ততবারই মনে করি মেঘমল্লারে একটা নতুন বর্ষার গান রচনা করি, কিন্তু ক্ষমতা কৈ ? এবং শ্রোতাদের সম্মুখে তো এই বর্ষার নিত্যমোহ নেই, তাদের কাছে একঘেয়ে ঠেকবে। কারণ, কথা তো ঐ একই— বৃষ্টি পড়ছে, মেঘ করেছে, বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। কিন্তু তার ভিতরকার নিত্য-নূতন আবেগ, অনাদি-অনন্ত বিরহবেদনা, সেটা কেবল গানের সুরে খানিকটা প্রকাশ পায়।

কলকাতা

২৭ সেপ্টেম্বর ১৮৯৫

২৩৩

শিলাইদহ

৩০ সেপ্টেম্বর। ১৮৯৫।

তুই 'আমরা ও তোমরা' -লেখকের উপর ভয়ানক চটেছিস দেখলুম। লোকটা কিন্তু 'খুব মজা করেছি' মনে করে বসে আছে। মুশকিল এই-যে, রস যে বোঝে না তাকে বোঝানো যায় না; কারণ, রস-বোধ ইন্দ্রিয়বোধের মতো প্রত্যক্ষবোধ। এমন-কি, ভালোমন্দ বিচারের সময় রসজ্ঞ ব্যক্তিদের মধ্যেই মতভেদ হয়। এই জন্যে সমালোচনার কাজটাকে ঝক্‌মারি মনে হয় এবং রচনার কাজটাও প্রায় তথৈবচ। কিন্তু তবুও তো সংসারে মোটের উপরে ভালো-মন্দের বিচার এক রকম চলে যাচ্ছে এবং নিতান্ত মন্দ চলছে না— যদিচ ব্যক্তিগত মতবৈষম্যের অপ্রতুল নেই, তবুও তো কালক্রমে সাধারণ মতের অনেকটা ঐক্য দাঁড়িয়ে যাচ্ছে। কতকটা natural selectionএর মতো— বৈষম্য (variation) প্রতিদিন নানা আকারে দেখা দিচ্ছে, কিন্তু যেগুলো টেঁকবার নয় সেগুলো নানা উপায়ে নষ্ট হচ্ছে এবং যেগুলো টেঁকসই সেগুলোর মধ্যে একটা ঐক্য দেখা যায়। আমরা লেখকরা যে-সমস্ত বীজ বপন করে যাচ্ছি যদি মানুষের মনের পক্ষে তার যথার্থ স্থায়ী উপযোগিতা থাকে তা হলে যে সমালোচক যেমনি নিন্দা করুন বীজ ব্যর্থ হবে না। আসল কথাটা এই যে, মানুষের মন জিনিষটা তেমন সুপরিচিত নয়— আমার মনে আপাতত কোন্‌টা ভালো লাগল বা না লাগল তা আমি বলতে পারি এবং মোটামুটি অন্য লোকের কী ভালো লাগবে বা না লাগবে তাও বলতে পারি, কিন্তু ব্যাপারটা একটু সূক্ষ্ম বা জটিল হলেই খুব নিপুণ সমজদার ব্যতীত কেউ হিসাব করে বলতে পারে না। এবং নিপুণ সমজদারের হিসাবেও মাঝে মাঝে ভুল থেকে যায়। সমজদার লোকের লক্ষণ এই যে, তার বোধ-

শক্তি যেমন সূক্ষ্ম সমবেদনাশক্তি তেমনি ব্যাপক, এবং সাহিত্য-অভিজ্ঞতাও খুব বিস্তৃত। নিজের ব্যক্তিগত ভালোমন্দ লাগাকে অতিক্রম করে সমবেদনাশক্তি-প্রভাবে ভিন্ন রুচি এবং ভিন্ন অবস্থার মধ্যে প্রবেশ থাকা চাই। সে রকম লোক বড়ো দুর্লভ। বরঞ্চ লেখক অনেক ভালো পাওয়া যায়, কিন্তু প্রকৃত সমজদার দুর্লভ। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই, তবুও উপযুক্ত-শিক্ষা-প্রাপ্ত সাধারণ পাঠকের কাছে সাধারণত ভালো জিনিষেরই আদর দাঁড়িয়ে যায়। অতএব রুচির কোনো প্রকৃত আদর্শ আছে কি না তা নিয়ে তর্কের দ্বারা কোনো সূক্ষ্ম মীমাংসা করা যায় না, অথচ ব্যবহারত মানুষের সমাজে একটা রুচির আদর্শ দাঁড়িয়ে যাচ্ছে এবং সম্পূর্ণ কদর্যতা কখনোই সৌন্দর্যরূপে টিঁকে যাচ্ছে না— ভ্রম হচ্ছে এবং তা সংশোধনও হয়ে যাচ্ছে। তাই যদি না হত, তা হলে সৌন্দর্যসৃষ্টির সম্পূর্ণতাসাধনের জন্যে চিরকাল থেকে গুণীবর্গের এত প্রাণপণ চেষ্টা থাকত না— রুচির অমোঘ আদর্শ তারা প্রমাণ করতে পারে না, অথচ তার সত্যতার প্রতি তাদের অটল নিষ্ঠা।

কলকাতা
১ অক্টোবর ১৮৯৫

শিলাইদহ

৪ অক্টোবর। ১৮৯৫।

মেঘ বৃষ্টি কেটে গিয়ে আজ অতি সুন্দর দিন হয়েছে। আজ থেকে বোধ হয় শরৎকালটা ঠিক রীতিমত প্রতিষ্ঠিত হল। সুন্দর কথাটা অনেকবার অনেক জিনিষে ব্যবহার হয়— সেই জন্যে ও কথাটা অব্যবহার্য হয়ে এসেছে; অথচ ওর প্রতিশব্দও বড়ো বেশি নেই। যাই হোক, আজকের দিনটি দুর্লভ দিন— আমার মনটা এই আলোকে, স্তব্ধতায়, এই নির্মল শুভ্র স্বচ্ছ আকাশে একেবারে পরিপূর্ণ হয়ে গেছে। কে একজন যাদুকরী তার কোমল হস্তে আমার দুই চক্ষে একটি অমৃতময় মোহ মাখিয়ে দিয়ে গেছে, এই মধ্যাহ্নের নিস্তরঙ্গ নদী এবং ও পারের প্রফুল্ল-কাশবন-শোভিত বালির চর আমার কাছে একটি সুদূর পূর্বস্মৃতির মতো মনোহর লাগছে। বোটে লোকজন এলে আমার এই শরতের সুগভীর দিনগুলি আর এমন অখণ্ডভাবে পাব না ব'লে মনের ভিতরে ভারী একটা স্বার্থপর পরিতাপ উপস্থিত হচ্ছে। বোধ হয় সেই ব্যাঘাতের সম্ভাবনা আসন্ন হওয়াতেই আজকের এই নিস্তব্ধ নিভৃত উপভোগটি মনের মধ্যে এমন নিবিড়তর হয়ে এসেছে। যেন আমার কাছে আমার এই অভিমানিনী প্রবাসসঙ্গিনী করুণ-অনিমেষ-নেত্রে বিদায় নিতে এসেছে। আমাকে যেন বলছে, 'কিসের তোমার ঘরকন্না এবং আত্মীয়তাবন্ধন— আমি তোমার অনন্তকালের সাধনা, তোমার সহস্রজন্মপূর্বের প্রিয়তমা, অনন্ত জীবনের অসংখ্য খণ্ডপরিচয়ের মধ্যে তোমার একমাত্র চিরপরিচিতা— কোনো কারণেই আমার দুর্লভ সঙ্গ তুমি অবহেলা কোরো না, তোমার অন্তরাত্মা আমি ছাড়া আর কারও হাত থেকে সুখ দুঃখ সৌন্দর্যের চরমতম ফল গ্রহণ করে না।' কিন্তু বর্তমানের কর্মক্ষেত্রে এবং প্রত্যক্ষ সংসারে এ-সমস্ত কথা অলীক অমূলক শোনাবে— যদিও একটু দূর

থেকে এবং একটু গভীর ভাবে পর্যালোচনা করে দেখলে কথাটাকে তেমন লঘু মনে হয় না। এই শরতের অপর্যাপ্ত শান্তির মধ্যে আমার আত্মাকে স্তরে স্তরে সিক্ত করে নেওয়া আমার পক্ষে সামান্য ব্যাপার নয়। আমি যদি পাটের ব্যবসায়-উপলক্ষে কোনো দুর্গম স্থানে গিয়ে একলা পড়ে থাকি তা হলে লোকে আমার প্রশংসা করবে এবং আমারও কর্তব্যবুদ্ধি শান্ত থাকবে, কিন্তু যদি বিনা কার্যে কিছুদিন নিরুদ্দেশ থাকি তা হলে আপনাকে এবং পরকে ভুলিয়ে রাখা শক্ত হয়। এ জীবনে আমার যা-কিছু গভীরতম তৃপ্তি এবং প্রীতি, সে কেবল এই রকম নির্জনে সুন্দর মুহূর্তে পুঞ্জীভূতভাবে আমার কাছে ধরা দেয়— খণ্ডভাবে মিশ্রিতভাবে সংসার থেকে সেগুলো সংগ্রহ করা আমার পক্ষে অসম্ভব হয়েছে। আমার জীবনের অন্তস্তলে ক্রমশই একটা নূতন সত্যের উন্মেষ হচ্ছে— কেবল তার আভাস পাই। আমার পক্ষে সে একটা স্থায়ী নিত্য সম্বল, আমার সমস্ত জীবনখনিজ-গলানো খাঁটি সোনাটুকু— আমার সমস্ত দুঃখ কষ্ট বেদনার ভিতরকার অমৃতশস্য— সেটাকে যদি স্পষ্ট পরিস্ফুট নির্ভরযোগ্য দৃঢ় আকারে পাই তা হলে সে আমার টাকাকড়ি খ্যাতি-প্রতিপত্তি সুখ-সম্পদ সব চেয়ে বেশি জিনিষ হয়— যদি সম্পূর্ণ নাও পাই তবু সেই দিকে চিত্তের স্বাভাবিক অনিবার্য প্রবাহ এও একটা পরম লাভ। যদি চিরকাল সুখে থাকতুম, মনের আশা মিটিয়ে নিয়ে দিনের সমস্ত কাজগুলি সেরে সহজেই দিন কাটত, তা হলে এই মানবজন্মে কতটুকুই বা পেতুম— কী বা জানতুম!

কলকাতা

৫ অক্টোবর ১৮৯৫

২৩৫

শিলাইদহ

৪ অক্টোবর। ১৮৯৫।

দিনগুলি আজকাল অত্যন্ত সুমধুর হয়ে এসেছে— বাতাস সুশীতল, আকাশ সমুজ্জ্বল, তটরেখা শ্যামল, নদী সুপ্রশান্ত, মন স্বপ্নাতুর, কাজকর্ম স্বল্প, লেখা-টেখা বন্ধ, চারি দিকে ছুটি, এবং অন্তরে বাহিরে সৌন্দর্যপ্রবাহ। জলের কলস্বরে যেন কার অত্যন্ত সুকোমল আদরের কণ্ঠ মাখা রয়েছে; স্বচ্ছ নীলাকাশও স্নেহভারে আবিষ্ট এবং স্নিগ্ধ সমীরণও প্রীতিসুধায় পরিপূর্ণ; এইসব রঙগুলি— এই জলের গেরুয়া, এ পারের সাদা, ও পারের সবুজ, আকাশের নীল, রৌদ্রের সোনা, এ-সমস্ত কতই বেশভূষা দৃষ্টিহাসির অজস্রতারূপে আমার চতুর্দিকে শরৎকিরণে ঝলকিত হচ্ছে! সমস্ত আকাশ যেন হৃদয়পুঞ্জের মতো আমাকে বেষ্টন করে ধরেছে। আশ্চর্য এই যে, পরশু আমার এখানে যখন জনসমাগম হবে তখন এরা যেন আর এখানে থাকবে না— মানুষ এলে যেন প্রকৃতির মধ্যে আর প্রকৃতির স্থান থাকবে না। মানুষ এত বেশি জায়গা জোড়ে, চতুর্দিকে এতটা জিনিষের অপব্যয় করে!

কলকাতা

৫ অক্টোবর ১৮৯৫

কুষ্টিয়া

৫ অক্টোবর। ১৮৯৫।

কে আমাকে গভীর গম্ভীর ভাবে সমস্ত জিনিষ দেখতে বলছে, কে আমাকে অভিনিবিষ্ট স্থিরকর্ণে সমস্ত বিশ্বাতীত সংগীত শুনতে প্রবৃত্ত করছে, কে আমার উপরে একটি উদার বিষাদমন্ত্র পাঠ করে আমার সমস্ত চাপল্য প্রতিদিন মিলিয়ে নিয়ে আসছে এবং বাইরের সঙ্গে আমার সমস্ত সূক্ষ্ম ও প্রবলতম যোগসূত্রগুলিকে নিভৃত নিস্তব্ধ সজাগ সচেতন ভাবে অনুভব করতে দিচ্ছে! জীবনে অনেকবার অনেকদিন উপবাসী থেকে অনেক দুঃখব্রত উদ্‌যাপন করেছি— সেই তপস্যার ফলেই বিশ্বজগতের অনন্ত রহস্যময় গভীরতা আমার সম্মুখে প্রায় সর্বদাই সমুদ্রের মতো প্রসারিত হয়ে রয়েছে। হৃদয়ের প্রাত্যহিক পরিতৃপ্তিতে মানুষের কোনো ভালো হয় না, তাতে প্রচুর উপকরণের অপব্যয় হয়ে কেবল অল্প সুখ উৎপন্ন করে, এবং কেবল আয়োজনেই সময় চলে যায়— উপভোগের অবসর থাকে না। কিন্তু ব্রতযাপনের মতো জীবনযাপন করলে দেখা যায় অল্প সুখও প্রচুর সুখ এবং সুখই একমাত্র সুখকর জিনিষ নয়। চিত্তের দর্শন স্পর্শন শ্রবণ মনন -শক্তিকে যদি সচেতন রাখতে হয়, যা-কিছু পাওয়া যায় তাকে সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করবার শক্তিকে যদি উজ্জ্বল রাখতে হয়, তা হলে হৃদয়টাকে সর্বদা আধ-পেটা খাইয়ে রাখতে হয়— নিজেকে প্রাচুর্য থেকে বঞ্চিত করতে হয়। Goethe-র একটি কথা আমি মনে করে রেখে দিয়েছি— সেটা শুনতে খুব সাদাসিধে, কিন্তু আমার কাছে বড়ো গভীর বলে মনে হয়—

Entbehren sollst du, sollst entbehren.

Thou must do without, must do without.

কেবল হৃদয়ের আহার নয়, বাইরের সুখস্বাচ্ছন্দ্য জিনিষপত্রও আমাদের

অসাড় করে দেয়— বাইরের সমস্ত যখন বিরল তখনি নিজেকে ভালোরকমে পাওয়া যায়। সেই জন্যে কলকাতার অপেক্ষাকৃত স্বাচ্ছন্দ্য আমাকে অল্পকালের মধ্যেই পীড়ন করতে থাকে, সেখানকার ছোটোখাটো সুখসম্ভোগের মধ্যে আমার যেন নিশ্বাস রুদ্ধ হয়ে আসে।

কিন্তু তপস্যা আমার স্বেচ্ছাকৃত নয়, সুখ আমার কাছে অত্যন্ত প্রিয়, তবু বিধাতা যখন বলপূর্বক আমাকে তপশ্চরণে প্রবৃত্ত করিয়েছেন তখন বোধ হয় আমার দ্বারা তিনি একটা বিশেষ কিছু ফল পেতে চান— শুকিয়ে গুঁড়িয়ে পুড়ে ঝুড়ে সব-শেষে বোধ হয় এ জীবনের থেকে একটা কিছু কঠিন জিনিষ থেকে যাবে। মাঝে মাঝে তার আবছায়া-রকম অনুভব পাই। আমরা বাইরের শাস্ত্র থেকে যে ধর্ম পাই সে কখনো আমার ধর্ম হয়ে ওঠে না, তার সঙ্গে কেবল একটা অভ্যাসের যোগ দৃঢ় হয়ে আসে— যে ধর্ম আমার জীবনের ভিতরে সংসারের দুঃসহতাপে ক্রিস্টলাইজ্‌ড্‌ হয়ে ওঠে সেই আমার যথার্থ। আর-কাউকে তা ঠিক বোঝানো যাবে না, এবং বোঝাবার দরকারও নেই— তারা তার ঠিক মর্ম গ্রহণ করতে পারবে না এবং গ্রহণ করলেও বিকৃত করে ফেলবে— কিন্তু সেই জিনিষটাকে নিজের মধ্যে উদ্‌ভূত করে তোলাই মানুষের পক্ষে মনুষ্যত্বের চরম ফল। চরম বেদনায় তাকে জন্মদান করতে হয়, নিজের শোণিত দিয়ে তাকে প্রাণদান করতে হয় — তার পরে জীবনে সর্বতোভাবে সুখী না হয়েও চরিতার্থ হয়ে মরা যেতে পারে।—

Entbehren sollst du, sollst entbehren

কলকাতা
৬ অক্টোবর ১৮৯৫

২৩৭

কুষ্টিয়া

৬ অক্টোবর। ১৮৯৫।

আমার দিনগুলি রথীর কাগজের নৌকোর মতো আলস্যস্রোতে একটি একটি করে ভাসিয়ে দিচ্ছি। কেবল মাঝে মাঝে একটি আধটি করে গান তৈরি করছি এবং চৌকিটাতে অকর্মণ্যভাবে বসে সুর গুন্ গুন্ করা যাচ্ছে; সুর ভুলছি এবং তৈরি করছি এবং সুখস্মৃতিময় বিষাদ-কোমল প্রশান্ত শরৎকালের মধ্যে কুণ্ডলায়িত হয়ে পড়ে রয়েছি। কবে থেকে যে কোমর বেঁধে রীতিমত কাজ আরম্ভ করতে পারব তা তো বুঝতে পারছি নে। এই বিস্তীর্ণ জল এবং নদীতীর থেকে একটি নিশ্বাস আমার গায়ের উপর এসে পড়ছে— একটি অত্যন্ত নিকটবর্তী প্রাণময় প্রীতিময় ভাবময় সঙ্গ আমার অন্তরে বাহিরে সংলগ্ন হয়ে রয়েছে, তাকে আমি কিছুতেই যেতে বলতে পারছি নে। এই অপর্যাপ্ত জ্যোতির্ময় নীলাকাশ আমার হৃদয়ের মধ্যে যেন অবনত হয়ে পড়েছে, এই আলোক আমার রক্তের মধ্যে প্রবেশ করছে, সর্ব-ব্যাপী নিস্তব্ধতা আমার বক্ষকে দুই হাতে বেষ্টন করে ধরেছে, একটি সকরুণ অশ্রুসজল শান্তি আমার চোখের উপরে ললাটের উপরে চুম্বন করছে— আমি একটি পরিব্যাপ্ত অথচ নিভৃত সৌন্দর্যের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে রয়েছি। পূজার ছুটিতে সবাই কাজকর্ম ছেড়ে দিয়ে বাড়িতে এসেছে, আমারও এই বাড়ি— আমার বাড়ির লোকটি আমার সমস্ত খাতাপত্র কেড়েকুড়ে নিয়ে বলছে, 'তুমি কাজ ঢের করেছ, এখন একটুখানি থামো।' আমিও নিরাপত্তিতে থেমে আছি, এর পরে কর্ম যখন আবার আমাকে একবার হাতে পাবেন তখন টুঁটি চেপে ধরবেন— তখন আমার এই ঘরের লোকটি, আমার এই ছুটির কর্ত্রী যে কোথায় থাকবেন, তাঁর আর কোনো উদ্দেশ পাওয়া যাবে না। এখন প্রায় মাঝে মাঝে মনে করি সাধনা,

অক্টোবর ১৮৯৫

ত্রৈমাসিক এবং মাসিক, এই পদ্মার জলে ভাসিয়ে দিয়ে যাব। কিন্তু জানি, ভাসিয়ে দিলেও তিনি আমাকে পিছন-পিছন টেনে নিয়ে যাবেন।

কলকাতা

৭ অক্টোবর ১৮৯৫

শিলাইদহ

১০ অক্টোবর। ১৮৯৫।

ঠিক যাকে সাধারণত ধর্ম বলে সেটা যে আমি আমার নিজের মধ্যে সুস্পষ্ট দৃঢ়রূপে লাভ করতে পেরেছি তা বলতে পারি নে, কিন্তু মনের ভিতরে ভিতরে ক্রমশ যে-একটা সজীব পদার্থ সৃষ্ট হয়ে উঠছে তা অনেক সময় অনুভব করতে পারি। বিশেষ কোনো-একটা নির্দিষ্ট মত নয়— একটা নিগূঢ় চেতনা, একটা নূতন অন্তরিন্দ্রিয়। আমি বেশ বুঝতে পারছি আমি ক্রমশ আপনার মধ্যে আপনার একটা সামঞ্জস্য স্থাপন করতে পারব, আমার সুখ-দুঃখ অন্তর-বাহির বিশ্বাস-আচরণ সমস্তটা মিলে জীবনটাকে একটা সমগ্রতা দিতে পারব। শাস্ত্রে যা লেখে তা সত্য কি মিথ্যা বলতে পারি নে, কিন্তু সে-সমস্ত সত্য অনেক সময় আমার পক্ষে সম্পূর্ণ অনুপযোগী— বস্তুত আমার পক্ষে তার অস্তিত্ব নাই বললেই হয়। আমার সমস্ত জীবন দিয়ে যে জিনিষটাকে সম্পূর্ণ আকারে গড়ে তুলতে পারব সেই আমার চরম সত্য। জীবনের সমস্ত সুখদুঃখকে যখন বিচ্ছিন্ন ক্ষণিকভাবে অনুভব করি তখন আমাদের ভিতরকার এই অনন্ত সৃজনরহস্য ঠিক বুঝতে পারি নে— প্রত্যেক কথাটা বানান করে পড়তে হলে যেমন সমস্ত পদটার অর্থ এবং ভাবের ঐক্য বোঝা যায় না। কিন্তু নিজের ভিতরকার এই সৃজনশক্তির অখণ্ড ঐক্যসূত্র যখন একবার অনুভব করা যায় তখন এই সৃজ্যমান অনন্ত বিশ্বচরাচরের সঙ্গে নিজের যোগ উপলব্ধি করি ; বুঝতে পারি, যেমন গ্রহ নক্ষত্র চন্দ্র সূর্য জ্বলতে জ্বলতে ঘুরতে ঘুরতে চিরকাল ধরে তৈরি হয়ে উঠছে, আমার ভিতরেও তেমনি অনাদিকাল ধরে একটা সৃজন চলছে— আমার সুখ-দুঃখ বাসনা-বেদনা তার মধ্যে আপনার স্থান গ্রহণ করছে— এর থেকে কী হয়ে উঠবে জানি নে, কারণ আমরা একটি ধূলিকণাকেও জানি নে,

কিন্তু নিজের প্রবহমাণ জীবনটাকে যখন নিজের বাইরে অনন্ত দেশ-কালের সঙ্গে যোগ করে দেখি তখন জীবনের সমস্ত দুঃখগুলিকেও একটা বৃহৎ আনন্দসূত্রের মধ্যে গ্রথিত দেখতে পাই— আমি আছি, আমি হচ্ছি, আমি চলছি, এইটেকেই একটা বিরাট বৃহৎ ব্যাপার বলে বুঝতে পারি। আমি আছি এবং আমার সঙ্গে আর-সমস্তই আছে, আমাকে ছেড়ে এই অসীম জগতের একটি অণু পরমাণুও থাকতে পারে না ; আমার আত্মীয়দের সঙ্গে আমার যে যোগ, এই সুস্নিগ্ধ সুন্দর শরৎপ্রভাতের সঙ্গে তার চেয়ে কিছু কম ঘনিষ্ঠ যোগ নয়, সেই জন্যে এই জ্যোতির্ময় শূন্য আমার অন্তরাত্মাকে তার নিজের মধ্যে এমন করে পরিব্যাপ্ত করে নেয়— নইলে সে কি আমার মনকে তিলমাত্র স্পর্শ করতে পারত ? নইলে তাকে কি আমি সুন্দর বলে অনুভব করতুম ? আমার সমস্ত বাসনাস্বপ্নকে তার মধ্যে পরিপূর্ণ আকারে প্রতিফলিত করতে পারতুম ? আমার সঙ্গে আর অনন্ত জগৎপ্রাণের সঙ্গে যে চিরকালের নিগূঢ় সম্বন্ধ সেই সম্বন্ধের প্রত্যক্ষগম্য বিচিত্র ভাষা হচ্ছে বর্ণ গন্ধ গীত— চতুর্দিকে এই ভাষার অবিশ্রাম বিকাশ আমাদের মনকে লক্ষ্য অলক্ষ্যভাবে ক্রমাগতই আন্দোলিত করছে— কথাবার্তা দিনরাত্রিই চলছে।

কলকাতা
১১ অক্টোবর ১৮৯৫

২৩৯

শিলাইদহ

১৫ অক্টোবর। ১৮৯৫।

রৌদ্র ঝাঁ ঝাঁ করছে, জল ঝিক্‌মিক্ করছে, একটু একটু শীতের বাতাস দিচ্ছে, নদীর জল আয়নার মতো স্থির, মাঝে মাঝে এক-আধটা নৌকো পাশ দিয়ে ছল্ ছল্ শব্দে চলে যাচ্ছে। যদি একলা থাকতুম তা হলে এই সময়টাতে জানলার কাছে লম্বা কেদারায় আবিষ্টচিত্তে পড়ে থাকতুম— দিবাস্বপ্ন দেখতুম, এই রৌদ্রোজ্জ্বল আকাশের ভিতরকার একটি গভীর বেলাবলী রাগিণী শুনতে পেতুম এবং নিজের অস্তিত্বকে এই রৌদ্র জল বায়ুর ভিতরে সম্মিশ্রিত পরিব্যাপ্ত হিল্লোলিত অনুভব করতুম— নিজেকে অখণ্ড অনন্তকালের শয্যাতলে শয়ান উপলব্ধি করতুম— সমস্ত পৃথিবী জুড়ে তৃণগুল্ম তরুলতা পশুপক্ষী -রূপে যে জীবনরাশি উচ্ছ্বসিত হচ্ছে নিজেকে সেই কলধ্বনিমুখরিত চির-নির্ঝরের মধ্যে প্রবাহিত বোধ করতুম— আমার নিজের ব্যক্তিগত নিজত্ব-আবরণ এই শরতের রৌদ্রে বিগলিত হয়ে এই স্বচ্ছ আকাশের সঙ্গে মিশে যেত এবং আমি দেশকালের অতীত হয়ে যেতুম। কিন্তু এখন এ অবস্থায় ঠিক সেই আত্মবিস্মৃত ভাবের মধ্যে নিমগ্ন হওয়া শক্ত। আমি যে আমি, অর্থাৎ অমুকের বাপ, অমুকের স্বামী, অমুকের বন্ধু, শ্রীযুক্ত অমুক, সে সম্বন্ধে বিচিত্র প্রমাণ চতুর্দিকেই বর্তমান।

কলকাতা

১৬ অক্টোবর ১৮৯৫

২৪০

শিলাইদহ

১৬ অক্টোবর। ১৮৯৫।

কাল অনেক রাত পর্যন্ত ঘুম হয় নি, অনেক ক্ষণ জলিবোটে পড়েছিলুম— তার পরে বোটে আমার শোবার ঘরে এসে জানলার ধারে বেঞ্চিতে বসে অনেক দিন পরে একাকী যাপন করেছিলুম। নদীর জল স্থির আয়নার মতো ছিল— তারার আলোতে রাত্রের অন্ধকার স্বচ্ছ হয়ে এসেছিল, যেন একটা কালো কাঁচের ভিতর দিয়ে বিশ্বজগৎ দেখা যাচ্ছিল। রাত্রি যদিও গভীর ছিল কিন্তু সম্পূর্ণ নিস্তব্ধ ছিল না, কারণ, আমার পাশের বোট থেকে আমার দুই প্রতিবেশিনী বিছানায় পড়ে পড়ে হাস্যালাপ করছিলেন এবং তখনো দুই-একটা নৌকো এসে গোলমাল করছিল— ও পারটা বেশ একটি স্নিগ্ধ অন্ধকারে আবৃত শান্তিময় দেখাচ্ছিল— আমাদের কুঠিবাড়ির বাগানের দীর্ঘ নারকেল গাছগুলি প্রহরীর মতো স্থির দাঁড়িয়ে ছিল এবং খুব দূর থেকে একটা কীর্তনের শব্দ শোনা যাচ্ছিল। একটুও বাতাস ছিল না। আমাদের জনপ্রাণীহীন বালির চরের উপর কাশবন তাদের শুভ্র পুষ্পস্তবকগুলি নম্র করে যেন ঘুমে ঢুলে পড়েছিল— অবশেষে অনেক ক্ষণ বসে বসে যখন আমার মাথাটাও নিদ্রাভারে সেই রকম অবনত হয়ে এল তখন আমি বিছানার মধ্যে শুয়ে পড়লুম। আজ সকালে স্নানের পর মনে হচ্ছে যথেষ্ট ঘুম হয় নি। শরীরে যে-একটা ক্লান্তি বোধ হচ্ছে সেটা বেশ লাগছে— বেশ বুঝতে পারছি, এখনি যদি বিছানার উপর পা ছড়িয়ে দিয়ে পড়ি, হাতে একখানা ভ্রমণের বই তুলে নিই, গায়ে এই অল্প-অল্প শীতের বাতাসটি লাগতে থাকে, তা হলে ভারী আরাম করবে। সেই জন্যে সকাল-বেলাকার এই রকম ক্লান্তি আমার বড়ো ভালো লাগে— বেশ বিনা পরিতাপে হাতের সমস্ত কাজ ফেলে দিয়ে এক বেলার মতো ছুটি

নেওয়া যায়। আজকাল আমার ছুটি বাঁধা— কিন্তু এরকম অকর্মণ্য দশা ভালো লাগে না। শরীরটা যখন সম্পূর্ণ সক্ষম থাকে তখন সে আপনিই কর্ম অন্বেষণ করে, মানুষকে অস্থির করে তোলে। কিন্তু আজ সে বেশ শান্ত আছে, নিজের পৃষ্ঠের মেরুদণ্ডটাই তার ভার বোধ হচ্ছে, সেটাকে শয্যার উপর বিস্তার করে দিতে পারলে সে নিশ্চিন্ত হয়।

কলকাতা

১৭ অক্টোবর ১৮৯৫

২৪১

পতিসর-পথে।

২২ নবেম্বর। ১৮৯৫।

ছোট্ট নদীটির মধ্যে দিয়ে আমার বোট চলেছে— সমস্ত দিন একলা রয়েছি, কারও সঙ্গে একটিমাত্র কথাও কইতে হয় নি। এখানকার নদীতে স্রোত প্রায় নেই, শৈবাল ভাসছে, তার থেকে এক রকম নতুন ধরণের সুগন্ধ আসছে। পালে অত্যন্ত মৃদুমন্দ বাতাস লেগেছে— বোট খুব আস্তে আস্তে চলেছে, জলের উপর যে-একটি সুকোমল আলো পড়েছে এবং অদূরবর্তী তীরের উপর যে বিচিত্র সজীব সবুজ রঙের পর্যায় এবং নিভৃত গ্রামদৃশ্য শ্রেণীবদ্ধ হয়ে দেখা দিচ্ছে তাতে আমাকে আমার অহমিকা থেকে ক্রমশই বাইরে আকর্ষণ করে আনছে, জীবনের জটিল গ্রন্থিগুলি যেন একে একে উন্মোচিত হয়ে যাচ্ছে এবং আত্মগত হৃদয়ের তীব্রতা ধীরে ধীরে শান্ত হয়ে আসছে। কলকাতার নানান কঠিন করস্পর্শের অনুরণন এখনো সমস্ত স্নায়ুর মধ্যে রীরী করছে— কিন্তু বেশ বুঝতে পারছি, ক্রমে ক্রমে সে সমস্তই থেমে যাবে, জগৎকে অনন্তবৃহৎ বলে জানব এবং জগতের সঙ্গে আমার সমস্ত সম্বন্ধ সহজ ও সরল হয়ে আসবে। এই সুস্নিগ্ধ অগাধ জনহীনতার মধ্যে প্রথম ঝাঁপ দিয়ে পড়বার সময় অনেকগুলি বন্ধনে টান পড়ে এবং কিছু ক্ষণের জন্যে বেদনা বোধ হয়— তার পরে অতল সান্ত্বনার মধ্যে যখন একটি অসীম স্নেহের আলিঙ্গন অনুভব করি, অত্যন্ত নিবিড় নিভৃত অন্তরতম আত্মীয়তার উদার বক্ষের মধ্যে নিজেকে ঘনিষ্ঠরূপে আবদ্ধ বোধ করি, তখন অন্তঃকরণের চিরসঞ্চিত উত্তাপ গভীর দীর্ঘনিশ্বাসের সঙ্গে মুক্তি লাভ করে; বুঝতে পারি 'সুখ অতি সহজ সরল', যথার্থ পরিতৃপ্তি নিজের অন্তরাত্মার মধ্যে এবং তার থেকে কোনো বিমুখ অদৃষ্ট আমাকে বঞ্চিত করতে পারে না। অহমিকার বাইরে একবার পদক্ষেপ করবা মাত্রই দেখা যায়

সম্মুখে আনন্দময় প্রকাণ্ড জগৎ জীবনে যৌবনে সৌন্দর্যে সুবিস্তীর্ণ হয়ে রয়েছে— তখন মনে হয় আমি এ জগতে জন্মগ্রহণ করেছি ব'লে ধন্য, এ জগতে অনন্তকাল থাকব ব'লে আমি ধন্য— আমি যা জেনেছি, যা পেয়েছি, যা অনুভব করেছি, তা একটিমাত্র হৃদয়ের পক্ষে আশ্চর্য বৃহৎ।

কলকাতা

২৩ নবেম্বর ১৮৯৫

২৪২

পতিসর

২৫ নবেম্বর। ১৮৯৫।

আমরা এম্‌নি গৃহপালিত প্রাণী যে, কলকাতা থেকে দুই পা বাড়িয়ে এই কালীগ্রামটিতে এসে মনে করছি একটা কী বিরাট ব্যাপার করে বসেছি। বাড়ির খুঁটির সঙ্গে এম্‌নি ছোটো দড়িতে আমাদের পা বাঁধা যে একটুখানি নড়লে-চড়লেই অমনি টান পড়ে— কেনই বা এত চিঠিপত্র লেখা এবং চিঠিপত্রের প্রত্যাশা! আমি সরে আসবা-মাত্রই আমার আত্মীয়সংসার একেবারে অগাধ সমুদ্রের মধ্যে পড়ে নি সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। এই বৃহৎ পৃথিবীর মধ্যে মুক্তভাবে আনন্দে সঞ্চরণ করে বেড়াবার অধিকার বিধাতা বাঙালির ছেলেদের দেন নি — আমরা সব গোয়ালের গোরু, বড়ো জোর গ্রামের মাঠ পর্যন্ত আমাদের চ'রে বেড়াবার সীমা— তাও সর্বদাই রাখাল বালক লাঠি হাতে পিছন-পিছন লেগেই থাকে। কাল সন্ধেবেলায় গেটের উপর ডাউডেনের একটি প্রবন্ধ পড়ছিলুম— তাতে দেখছিলুম গেটে দুই বৎসরের জন্যে সমস্ত ছেড়েছুড়ে দিয়ে ইটালিতে গিয়ে নিবিষ্টমনে শিল্পালোচনা এবং সৌন্দর্যসম্ভোগ করে কী-এক নূতন প্রাণ এবং নূতন সম্পদ লাভ করেছিলেন, তাতে করে তাঁর প্রতিভা সহসা কী-এক অপূর্ব পরিণতি প্রাপ্ত হয়েছিল, তাঁর সমস্ত প্রকৃতি কী-একটা বিস্তীর্ণ শান্তি এবং বৃহৎ মর্যাদা অর্জন করেছিল। পড়লে আমাদের মতো কারাবাসীর চিত্ত বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে— মনে হয়, যা হতে পারা যেত তার অর্ধেকও হওয়া যায় নি, শিক্ষা এবং সাধনার অনেক বাকি আছে। মনে হয়, যদি গেটের মতো শুভাদৃষ্ট আমার হত, যদি এই বাংলাদেশে আমি জন্মগ্রহণ না করতুম, যদি এ দেশে মানবপ্রকৃতিবিকাশের উপযোগী সমস্ত খাদ্য থাকত, তা হলে আমি

সমস্ত পৃথিবীর মধ্যে অমরতা লাভ করতে পারতুম— এখন আমি অনেকটা পরিমাণে কৃপাপাত্র দীন। যদি পারি তো আমিও এক সময়ে জগতে বেরিয়ে পড়ব— এই আমার নিতান্ত ইচ্ছা।

কলকাতা

২৬ নবেম্বর ১৮৯৫

পতিসর

২৮ নবেম্বর ?। ১৮৯৫।

একটা কোনো লেখায় হাত দেব দেব করছি, কিন্তু এখনও কিছুতেই মনটাকে কাজে নিবিষ্ট করতে পারছি নে— এই সুগভীর ঔদাসীন্য দূর করতে কতদিন যাবে জানি নে, আবার ততদিনে হয়তো কলকাতায় ফেরবার সময় এসে পড়বে। মনে হচ্ছে যেন অনেক দিন হল মফস্বলে এসেছি এবং এতদিন অবিচ্ছেদে অকর্মণ্যভাবে কাটিয়েছি— যদি গান তৈরি করবার সেই ঝোঁকটা থাকত তা হলে অবিশ্রাম গুন্ গুন্ শব্দে দিনগুলো উন্মত্তভাবে চলে যেত, সংগীতের নেশায় অচেতনভাবে বেলা কাটিয়ে দিতুম। সম্প্রতি জমিদারি কাজ দেখছি, খবরের কাগজ পড়ছি, বই পড়ছি এবং আহার করছি। কোনোমতে ঘাড় ধরে নিজেকে একবার লেখার স্রোতের মাঝখানে টেনে এনে ফেলতে পারলে আমি আর জগৎসংসারকে কেয়ার করি নে— তখন আমার জগৎ আমার নিজেরই জগৎ, সেখানে আমি একমাত্র রাজা, সেখানে আমি সমস্ত সুখ দুঃখ সৌন্দর্যের বিধাতাপুরুষ। আমি কত দিনেরই বা, আমার সুখ দুঃখ কত ক্ষণই বা থাকবে— কিন্তু আইডিয়ার প্রবাহ অনাদি উৎস থেকে উচ্ছ্বসিত হয়ে শত সহস্র মনের মধ্যে দিয়ে অনন্তকালের দিকে প্রবাহিত হয়ে চলেছে, সেই সূত্রে আমার সঙ্গে সমস্ত অতীতকালের এবং অনাগতকালের যোগ— সেই ভাবরাজ্যে আমি সমস্ত মনুষ্য, আমি রবি-নামক ব্যক্তিবিশেষ নই— সেখানে আমার আনন্দ এবং বেদনা বিশ্বব্যাপী। দুঃখের বিষয় এই যে, সেই ভাবরাজ্যের অধিষ্ঠাত্রীদেবী, চঞ্চলা লক্ষ্মীর চেয়ে ঢের বেশি চঞ্চলা— আমি যখন তাঁকে চাই তখন তিনি সব সময়ে দেখা দেন না, কিন্তু তিনি যখন আমাকে চান তখন আর আমার এক মুহূর্ত বিলম্ব করবার যো নেই। তখন দুনিয়ার সমস্ত জরুরি কাজ ফেলে দিয়ে তাঁর পদপ্রান্তে

গিয়ে হাজির হতে হয়। কলকাতায় যখন নানাপ্রকার সংঘাত-সংঘর্ষে উদ্‌ভ্রান্ত ক্লিষ্ট হয়ে পড়ি তখন মনে মনে কল্পনা করি, সুদূর নির্জনে আমার জন্যে আমার ভাবলক্ষ্মী সুধাপাত্র নিয়ে বসে আছেন— যখন সেখানে এসে উপস্থিত হই তখন দেখি পাষাণী কলকাতাও আমার পিছনে পিছনে এসেছে এবং আমার ভাবলক্ষ্মী সুদূরতর নির্জনে গিয়ে লুকিয়েছেন। একদিন সন্ধ্যাবেলায় হয়তো নক্ষত্রালোকে বোটের ছাতের উপর আমার পিছনে নিঃশব্দপদে এসে দাঁড়াবেন এবং আমার কাঁধের উপর তাঁর কোমল হস্তখানি ধীরে ধীরে স্থাপিত করবেন, এবং আমি আস্তে আস্তে মুখ তুলে অনন্ত মৌন আকাশের মধ্যে তাঁর সেই মৌনমুখখানি দেখতে পাব— এবং তার পরে আমার আর কোনো অসম্পূর্ণতা থাকবে না।

কলকাতা

২৯ নবেম্বর ?

১৮৯৫

পতিসর

২৯ নবেম্বর। ১৮৯৫।

কালীগ্রাম জায়গাটির কথা অবশ্য আমার অনেক চিঠিতে অনেক বার পেয়েছিস তার আর সন্দেহ নেই, কিন্তু তবু পুনরুক্তি না করলে চিঠি-পত্র লেখা চলে না এবং হয়তো ঠিক পুনরুক্তি হবে না— কারণ, পুরাতন জিনিষও আমাকে নূতন করে আঘাত করে; আমার চিরপরিচিত প্রিয়-পদার্থগুলির সঙ্গে প্রত্যেক পুনর্মিলনের মধ্যে একটা অংশ থাকে যেটা প্রথম মিলন, প্রত্যেক বারেই একটা নূতন বিস্ময় কোথা থেকে আবির্ভূত হয়। কালীগ্রাম স্থানটি ঠিক আমার প্রিয়পদার্থের মধ্যে নয়, কিন্তু তবু এখানে একবার এসে উপস্থিত হলে এর পুরাতন মুখশ্রী আমার কাছে একটি নবীন মনোহারিতা আনয়ন করে। এই অতি ছোটো নদী এবং নিতান্ত ঘোরো রকমের বহিঃপ্রকৃতি আমার কাছে বেশ লাগছে। ঐ অদূরেই নদী বেঁকে গিয়েছে— ওখানটিতে একটি ছোটোগ্রাম এবং গুটিকতক গাছ, এক তীরে পরিপক্বপ্রায় ধানের ক্ষেত, নদীর উঁচু পাড়ের উপর পাঁচ-ছটি গোরু ল্যাজ দিয়ে মাছি তাড়াতে তাড়াতে কচ্‌মচ্‌ শব্দে ঘাস খাচ্ছে, অন্য তীরে শূন্য মাঠ ধূ ধূ করছে— নদীর জলে শ্যাওলা ভাসছে, মাঝে মাঝে জেলেদের বাঁশ পোঁতা, বাঁশের উপর মাছরাঙা পাখি ছবির মতো স্থির হয়ে বসে রয়েছে, আকাশে উজ্জ্বল রৌদ্রে এক পাল চিল উড়ছে। দুপুর বেলা, সামনে গয়লাদের বাড়ির কাছে একখণ্ড শর্ষের ক্ষেতে বিকশিত শর্ষে ফুল একেবারে যেন আগুন করে রয়েছে— তাদের বাড়ির মেয়েরা জল তুলে নিয়ে গোরুর জাবনা দিচ্ছে, মাটি দিয়ে নিকোনো আঙিনায় বাঁধা গোরু গামলার মধ্যে মুখ ডুবিয়ে জাব খাচ্ছে, খড় স্তূপাকার করা রয়েছে, গয়লাদের বাড়ির কাছে আমাদের কাছারির একটা পুষ্করিণী-খনন হচ্ছে, রঙিন-কাপড়-পরা হিন্দুস্থানি মেয়েরা মাথায় ঝুড়ি করে

মাটি নিয়ে একটা ডোবার মধ্যে ফেলে যাচ্ছে। এখানে সমস্তই খুব কাছাকাছি। নদীটির এ দিকে, ও দিকে, দু দিকেই বাঁকের অন্তরালে অদৃশ্য হয়ে গিয়ে একটি অনতিদীর্ঘ ঝিলের মতো দেখতে— এই ঝিলের দুই প্রান্তে দুটিমাত্র গ্রাম। আমি এই ঝিলটির মাঝখানে বসে দুটি গ্রামের সমস্ত দৈনন্দিন কার্যকলাপের দ্বারা বেষ্টিত। এই আমার সমস্ত জগৎ। এরা দাওয়ায় বসে তামাক খাচ্ছে, স্নান করছে, কাপড় কাচছে, ছোটো ডোঙায় চ'ড়ে হাত দিয়ে জল কেটে ছোটো নদী পার হচ্ছে, অপরাহ্ণে গৃহভিত্তির যে দিকটাতে ছায়া পড়ে সেই দিকে দীর্ঘকাল স্থিরভাবে বসে দুই-একটি কর্মহীন মেয়ে সম্মুখজগতের চলাচল দেখে বেলা কাটিয়ে দিচ্ছে, গ্রাম্য পাঠশালার ছেলেরা মলিন খাতাপত্রের পুঁটুলি হাতে বাড়ি ফিরছে— সন্ধ্যাবেলায় ঘরে আলো জ্বালছে, গোয়ালে ধোঁওয়া দিচ্ছে, দুটি গ্রাম দুটি নীড়ের মতো নিস্তব্ধ হয়ে যাচ্ছে— আমি খড়্‌খড়েগুলো তুলে দিয়ে ভাইমার রাজসভায় গেটের কীর্তিকাহিনী অধ্যয়ন করছি। কোথায় নদীতীরে পতিসর, বোটের মধ্যে আমি, আর কোথায় বিচিত্রকর্মসংকুল ভাইমার রাজসভার রাজকবি গেটে!

কলকাতা

৩০ নবেম্বর ১৮৯৫

সাহাজাদপুর
১৯ অগ্রহায়ণ। ১৩০২।

সকাল থেকে অত্যন্ত একটা পুরাতন কথা ক্রমাগতই মনে উদয় হচ্ছে যে, সংসারটা অনিত্য। কিন্তু তবু শোক দুঃখ মৃত্যু এমনভাবে আমাদের আঘাত করে, যেন সংসারটা নিত্য। সমস্ত মরীচিকা হোক, মায়া হোক, যাই হোক, তবু তো বিধবা স্ত্রীকে আপন শিশুসন্তানগুলিকে মানুষ করে তুলতে হবে— বেদান্তদর্শনে তো মায়ের মন থেকে স্নেহকে উড়িয়ে দিতে পারে না! মৃত্যু যতই অপ্রতিহত ক্ষমতাবান্ হোক, ভালোবাসার বন্ধন তো কম প্রবল নয়। অনাদিকাল থেকে পদে পদে পরাজয়ের পরেও স্থিরনিশ্চয়ের সঙ্গে বিফল বাসনার এই অনন্ত বিরোধ লেশমাত্র শিথিল হয় না কেন? আমি বসে বসে কল্পনাকে আর এক-শো-বৎসর-পরবর্তী ভবিষ্যতের মধ্যে প্রেরণ করছিলুম। ভাবছিলুম এক-শো বৎসরের আগের দিন, ১৭৯৫ খৃস্টাব্দের অগ্রহায়ণের সকাল বেলাটা ঠিক আমাদের আজকের দিনের মতো এই রকম প্রত্যক্ষ বর্তমান ছিল— এই রকম শীত, এই রকম রৌদ্র, এই রকম জনকোলাহল— কিন্তু আজকের সকালে সেই সকালের ছায়ামাত্রও নেই। তখনকার দিনেও কত উৎসব, কত শোক, কত জন্মমৃত্যু, কত হাসিকান্না জাজ্বল্যমান সত্যরূপে দেখা দিয়েছিল। আবার ১৯৯৫ খৃস্টাব্দে একদিন ১৯শে অগ্রহায়ণের সকাল বেলাটি ঠিক যথাসময়ে জগৎসংসারের উপর প্রকাশিত হবে। এইরকম শিশিরসিক্ত ঘাস, এইরকম শীতের হাওয়া, এইরকম মৃদু রৌদ্র— কিন্তু সেদিন জ্ঞা···র মৃত্যু, তার অনাথা বিধবা এবং পিতৃহীন সন্তানদের কঠোরতম শোকদুঃখের ছায়ামাত্র স্মৃতিমাত্র থাকবে না— এবং আমিও এক-শো বৎসর আগের দিনে সকালে সম্পূর্ণ সজীব সত্য আকারে নিজেকে অসীম জগৎ ও অনাদিকালের কেন্দ্রবর্তী জ্ঞান করে

আমার আত্মীয় বান্ধব ও প্রিয়পরিজনদের মধ্যে নিজেকে চিরপ্রতিষ্ঠিত অনুভব করছিলুম, সেদিন সকালের সমস্ত জাগ্রত মানবহৃদয়ের স্মৃতির মধ্যে আমার রেখামাত্র কোথায় থাকবে! আমার সেদিন শোক নেই, বাসনা নেই, পরিতাপ নেই— অথচ এই পৃথিবী এবং এই আকাশ আছে।

কলকাতা

৫ ডিসেম্বর ১৮৯৫

কালীগ্রাম

[৬ ডিসেম্বর ১৮৯৫]

তোকে লিখেছিলুম কালীগ্রামের সমস্ত ছোটোখাটো এবং কাছাকাছি। কিন্তু সে কেবল যখন এই নদীর উপর বোটের মধ্যে থাকি। নদীটি ছোটো, দুই পাড় উঁচু, বোটটিও সংকীর্ণ, সেই জন্যে চারি দিকে বেশি দূর দেখা যায় না— কেবল একটি ক্ষুদ্রায়তন গ্রাম্য ছবি চোখে পড়ে। কাল অনেক দিন পরে সূর্যাস্তের পর ও পারে পাড়ের উপর উঠে বেড়াতে গিয়েছিলুম— সেখানে উঠেই হঠাৎ দেখলুম আকাশের আদি অন্ত নেই, জনহীন মাঠ দিগ্‌দিগন্ত ব্যাপ্ত করে হা হা করছে— কোথায় আমার সেই দুটি ক্ষুদ্র গ্রাম! কোথায় এক প্রান্তে সংকীর্ণ একটু জলের রেখা! শিলাইদহের মাঠে গাছপালা গ্রাম বনের দর্শন পাওয়া যায়— এখানে কোথাও কিছু নেই, কেবল নীল আকাশ এবং ধূসর পৃথিবী, এবং তারই মাঝখানে একটি সঙ্গীহীন গৃহহীন অসীম সন্ধ্যা— মনে হয় যেন একটি সোনার-চেলি-পরা বধূ অনন্ত প্রান্তরের মধ্যে মাথায় একটুখানি ঘোমটা টেনে একলা চলেছে। ধীরে ধীরে কত সহস্র গ্রাম নদী প্রান্তর পর্বত সাগর নগর বনের উপর দিয়ে যুগ যুগান্তর কাল সমস্ত গোল পৃথিবীটি, একাকিনী, স্তম্ভিত অশ্রুপূর্ণ ম্লান দৃষ্টিতে, মৌন মুখে, শ্রান্ত পদে, প্রদক্ষিণ করে আসছে— তার বর যদি নেই তবে তাকে এমন সোনার বিবাহবেশে কে সাজিয়ে দিলে! কোন্ অনন্ত পশ্চিমের পারে তার পতিগৃহ! কাল হঠাৎ সেই মাঠের উপরে উঠে মাথার মধ্যে যেন একটা ছন্দ এবং সংগীত এবং কবিতা উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল। কিন্তু তাকে আকারবদ্ধ করা হল না এবং করাও বোধ হয় অসম্ভব। সন্ধ্যার সমস্ত ঝিকিমিকি'কে গলিয়ে নিয়ে একটি সোনার প্রতিমা তৈরি করা যেমন অসাধ্য এও তেমনি অসাধ্য। আমার সেই অন্তরের উচ্ছ্বাস, পতিসরের প্রান্তরের উপর

কালকের সেই নিঃশব্দ নিস্তব্ধ নির্জন সন্ধ্যার মধ্যে বিকীর্ণ হয়ে তারই সঙ্গে অস্তমিত হয়েছে। সেই সন্ধ্যাকাশের অসীম চিত্রপটের উপরে আমার মন যদি তার নিজের দুই-একটা সোনালি রেখা এঁকে থাকে, সে কি আর দেখা যাবে? আবার আজ যখন সেই মাঠের মধ্যে সেই সন্ধ্যা দেখা দেবে তখন কালকের চিহ্ন সঙ্গে আনবে না।

কলকাতা
৭ ডিসেম্বর ১৮৯৫

২৪৭

জলপথে

শনিবার

[৭ ডিসেম্বর ১৮৯৫]

বোট আজ ভোরের বেলায় ছেড়ে দেওয়া গেছে— সংকীর্ণ নদী ছাড়িয়ে এখন বিস্তীর্ণ বিলের মধ্যে এসে পড়েছি। উজ্জ্বল রৌদ্র এবং কন্‌কনে শীতের হাওয়াটা বেশ লাগছে। সকাল বেলাকার ফুলের মতো শিশিরোজ্জ্বল জগৎটি আকাশের মধ্যে নববিকশিত দেখাচ্ছে। অনেক দিন পরে পতিসরের সেই ছোটো নদীগহ্বরটির মধ্যে থেকে বেরিয়ে এসে আমার মন আজকে তার সমস্ত ডানা আকাশে মেলে দিয়েছে, আমার বোট ভেসে চলেছে, আমি যেন এই স্নিগ্ধ নির্মল রৌদ্রের মধ্যে দিয়ে উড়ে চলেছি। এ জায়গাটাও অপূর্ব রকমের। স্থলে জলে সংলগ্ন যমজ ভাই-বোনের মতন— উভয়ের মধ্যে বিশেষ প্রভেদ নেই, জলস্থল সমতল, খানিকটা ইস্পাতের মতো রৌদ্রে ঝিক্‌ ঝিক্‌ করছে আবার খানিকটা নানাপ্রকার শ্যাওলায় ঘাসে উদ্ভিদ্‌মিশ্র মাটির স্তরে সবুজ হয়ে আছে। সাদা থেকে পাট্‌কিলে পর্যন্ত নানা জাতের বক ও চিল উড়ে বেড়াচ্ছে, পানকৌড়ি তার চিক্‌চিকে কালো লম্বা গ্রীবাটি নিয়ে একবার করে জলে ডুব মারছে এবং তার পরে বুক ফুলিয়ে অবলীলাগতিতে ভেসে বেড়াচ্ছে, বাঁশের উপরে জেলেদের জাল খাটানো রয়েছে— তারই উপর যত লম্বচঞ্চু মাছরাঙার আড্ডা। দেখতে দেখতে কোথায় এক জায়গায় দুই ধারের ডাঙা উঁচু হয়ে উঠল— জলে স্থলে ভাগ হয়ে গেল— মাঝখানে নদী, দুইধারে তীর, তীরে অঘ্রান মাসের হলদে ধানের ক্ষেত, উঁচু পাড়ের উপর একমনে ঘাড় হেঁট করে গোরু চরছে এবং তাদেরই মুখের গ্রাসের কাছাকাছি শালিখ পাখি নৃত্য করতে করতে কীটশিকারে প্রবৃত্ত— দ্বীপের মতো এক-এক খণ্ড উচ্চভূমির উপর গুটিকতক কলাগাছ এবং কুলগাছের

মধ্যে কুষ্মাণ্ডলতায় সমাকীর্ণ গুটি দুই-তিন খোড়ো ঘর, তারই অঙ্গনে দাঁড়িয়ে উলঙ্গ শিশু এবং কৌতূহলী বধূগণ বিস্মিত দৃষ্টিতে আমার বোট নিরীক্ষণ করছে— সাদা-কালো রঙের পাতিহাঁস জলের ধারে দল বেঁধে ঠোঁটের খোঁচা দিয়ে শশব্যস্তে পিঠের পালকগুলি পরিষ্কার করছে, দূরে বাঁশঝাড় এবং ঘনতরুশ্রেণী দিগন্ত অবরোধ করে দাঁড়িয়ে আছে— খানিকটা দূর দুই ধারে শূন্য মাঠ— আবার হঠাৎ এক জায়গায় ছেলেদের চেঁচামেচি, স্নানার্থিনী মেয়েদের কলহাস্যালাপ, শোকাতুরা প্রৌঢ়ার বিলাপধ্বনি, কাপড় কাচার ছপ্ছপ্— স্নানাভিহত জলের ছল্ছল্ শব্দ শুনে মুখ তুলে দেখি ঘনচ্ছায়া গ্রামের ধারে একটি ঘাট এসেছে, গোটা দুয়েক নৌকো বাঁধা আছে এবং অনিচ্ছুক রোরুদ্যমান ছেলের নড়া ধরে তার মা জোর করে স্নান করাচ্ছে।

কলকাতা

৮ ডিসেম্বর ১৮৯৫

শিলাইদহ-জলপথে

[রবিবার, ৮ ডিসেম্বর ১৮৯৫]

কাল থেকে জলপথেই আছি। আশা ছিল আজ শিলাইদহে পৌঁছব, কিন্তু তার কোনো লক্ষণ দেখছি নে। সেজন্যে দুঃখ করতে চাই নে — পথের মধ্যে যে ক'টা দিন পাওয়া যায় সেই ক'দিন আমার পক্ষে অবিমিশ্র ছুটি— স্বেচ্ছাকৃত চিন্তা এবং কাজ ছাড়া কোনো কর্তব্যই নেই। দুই জানলা দিয়ে চেয়ে দেখছি, পড়ছি এবং লিখছি— চারি দিকে ধূসর চর এবং ঈষৎ নীল জল, দূরে সবুজ গ্রাম এবং ঊর্ধ্বে নীল আকাশ। মাঝে মাঝে দু-চার জায়গায় আশঙ্কার স্পর্শও পাওয়া গিয়েছিল— শীতে পদ্মার জল কমে আসছে কিনা, সেই জন্যে সংকীর্ণ প্রবাহ স্থানে স্থানে প্রচণ্ড বেগ ধারণ করেছে। জল যেন ইস্পাতের করাতের মতো বোটের তলাটা খর্‌খর্‌ শব্দে কাটতে কাটতে চলেছে। সেই তীব্রগতি জলের দিকে চেয়ে দেখলে চোখের ত্বকে যেন আঘাত লাগতে থাকে। সমস্ত দিন আমার খসড়া কবিতার খাতাটা খুলে পেন্সিল হাতে যখন-তখন দু-চার লাইন করে লিখছি, এবং তার পরে অলসভাবে কোনো একটা দিকে চেয়ে আছি। আজ ভোর চারটের সময় ঘুম ভেঙে গেল— উঠে কতকগুলো গরম কাপড় জড়িয়ে বাতি জ্বেলে উর্বশী-নামক একটা কবিতা শেষ করে ফেললুম, যখন সাড়ে সাতটা তখন স্নান করতে গেলুম— এমনি করে এই দু দিনে দুটি বেশ বড়োসড়ো রকমের কবিতা শেষ করে ফেলেছি। সমস্ত দিন খোলা আকাশ এবং অজস্র আলোকের মধ্যে এই রকম অবিশ্রাম অখণ্ড অবসর পেলে তবে প্রকৃতি যে রকম করে তার ফুল ফোটায় এবং ফল পাকায় সেই রকম করে সমস্ত রঙ ফলিয়ে এবং রস রসিয়ে কবিতার পরিণতি সাধন করা যায়। নইলে ভিতরে ভিতরে সর্বদা একটা তাড়া থাকে— ইচ্ছাক্রমে এবং অনিচ্ছাক্রমে মন এমন-সকল

পথ এবং বিপথে ধাবিত ও তাড়িত হয় যেখানে কল্পনার সহায়কারী কিছুই নেই। তাই এক-একবার মনে করি, বোটে করে যদি মাস-খানেক মাস-দেড়েকের মতো একেবারে পশ্চিমে চলে যাই— বাড়ির সমস্ত খবর এবং কাজকর্মের সমস্ত আলোচনা থেকে নিজেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে দিই— বিস্মৃতি এবং বিরামের মধ্যে, সুদূরে উড্ডীয়মান পাখির মতো একেবারে অদৃশ্য হয়ে যাই— তা হলে প্রভূত অবসরের মধ্যে কতকগুলো লেখা শেষ করে আসতে পারি। লেখার চেয়ে প্রবলতর কর্তব্য আমার আর কিছুই নেই। আমার অন্তঃকরণের ভিতরে এই অনুশাসনটি গ্রহণ করে আমি সংসারক্ষেত্রে এসেছি— যখন সেটা পালন করি তখন সুখদুঃখ সমস্তই লঘু হয়ে আসে, যখন না করি তখন সুখদুঃখের দল এক-পাল ডালকুত্তার মতো একেবারে কণ্ঠ চেপে ধরতে আসে— মানুষের উপর এ এক বিষম জুলুম !

কলকাতা
১৪ ডিসেম্বর [?]
১৮৯৫

২৪৯

সাহাজাদপুর-পথে

[১১ ডিসেম্বর ১৮৯৫]

ওরে বাস্ রে! কী তুমুল ব্যাপার! এইমাত্র কাঁচিকাটা পার হওয়া গেল— একটা মস্ত ফাঁড়া কেটে গেল। এ জায়গাটা একটা সংকীর্ণ খালের মতো, আঁকাবাঁকা— এইটুকুর ভিতর দিয়ে বিপুল জলস্রোত ফেনিয়ে ফুলে একেবারে যেন ঝর্নার মতো ঝরে পড়ছে— ক্রুদ্ধ জল সমস্ত বোটটাকে একেবারে কেড়ে-ছিঁড়ে ঝুঁটি ধ'রে টেনে নিয়ে চলে— বিদ্যুতের মতো ছুটে যায়, কী হল কী হচ্ছে কিছু বোঝবার অবসর পাওয়া যায় না— মাঝিমাল্লার মধ্যে একটা কেবল হৈ-হৈ হাঁ-হাঁ রব ওঠে— জল কল্‌কল্ গল্‌গল্ করতে থাকে, বুকের মধ্যে প্রাণটা নিশ্বাস রুদ্ধ করে স্তম্ভিত হয়ে থাকে, তার পরে মিনিট দশেকের মধ্যে সংকটের জায়গা উত্তীর্ণ হয়ে নিরাপদের ক্রোড়ের মধ্যে একেবারে ঝাঁপিয়ে এসে পড়তে হয়। কালীগ্রামের বিলগুলো ছাড়িয়ে এবারে নদীর মধ্যে এসেছি। এখন আঁকাবাঁকা উঁচু পাড়ের মাঝখান দিয়ে দুই তীরে পাকা ধান এবং বিকশিত শর্ষেক্ষেতের প্রান্ত দিয়ে অনুকূল স্রোতে হুহুঃশব্দে চলে যাব। এই শর্ষেক্ষেতের গন্ধটি আমাকে ভারী মুগ্ধ করে, আমার মনে কী-একটা ছবি এবং সৌন্দর্যের আবেশ আনয়ন করে— যেন অনেক দিনের দেখা একটা রৌদ্ররঞ্জিত মাঠ, শীতল স্নিগ্ধ বাতাস, পুষ্করিণীর ধার দিয়ে বাঁকা গ্রামের পথ, ঘটকক্ষ অবগুণ্ঠিত বধূ এবং সেই সঙ্গে ঐ শর্ষেক্ষেতের মৃদু সুগন্ধে অনুপ্রবিষ্ট একটি উদার নির্মল আকাশ মনে পড়ে— যেন কোন্-এক সময়ের পরিতৃপ্ত প্রেম এবং পরিপূর্ণ শান্তির সুগভীর সুখস্মৃতি ঐ শর্ষেফুলের গন্ধের সঙ্গে জড়িত আছে।

- কলকাতা

১২ ডিসেম্বর ১৮৯৫

শিলাইদহ

১২ ডিসেম্বর। ১৮৯৫।

সেদিন একটা অতি সামান্য এবং ছোটো ঘটনায় আমার হঠাৎ ভারী চমক লেগে গিয়েছিল। আমি তোকে পূর্বেই লিখেছি আজকাল আমি সন্ধ্যার সময় বোটের মধ্যে বাতি জ্বেলে, যতক্ষণ না ঘুম পায়, বসে বসে পড়ি— কারণ, নিজের বিজন সঙ্গ সকল সময়, বিশেষত সন্ধ্যার সময়, সকল অবস্থায় প্রার্থনীয় নয়। প্রবাদ আছে, কাজ না থাকলে লোকে জ্যাঠাইমার গঙ্গাযাত্রা করে— সুবিধামত অনাবশ্যক জ্যাঠাইমা প্রায়ই হাতের কাছে পাওয়া যায় না, তখন নিজের মনটাকেই নিয়ে পড়তে হয়— আমি তার চেয়ে বই নিয়ে পড়াই শ্রেয়স্কর মনে করি। সেদিন সন্ধ্যাবেলায় একখানা ইংরাজি সমালোচনার বই নিয়ে কবিতা সৌন্দর্য আর্ট্ প্রভৃতি মাথামুণ্ডু নানা কথার নানা তর্ক পড়া যাচ্ছিল— এক-এক সময় এই সমস্ত মর্মগত কথার বাজে আন্দোলন পড়তে পড়তে শ্রান্তচিত্তে সমস্তই মরীচিকাবৎ শূন্য বোধ হয়— মনে হয় এর বারো-আনা কথা বানানো, শুধু কথার উপরে কথা। সেদিনও পড়তে পড়তে মনটার ভিতরে একটা নীরস শ্রান্তির উদ্রেক হয়ে একটা বিদ্রূপপরায়ণ সন্দেহ-শয়তানের আবির্ভাব হয়েছিল। এ দিকে রাত্রিও অনেক হওয়াতে বইটা ধাঁ করে মুড়ে ধপ্ করে টেবিলের উপর ফেলে দিয়ে শুতে যাবার উদ্দেশে এক ফুৎকারে বাতি নিবিয়ে দিলুম। নিবিয়ে দেবা মাত্রই হঠাৎ চারি দিকের সমস্ত খোলা জানলা থেকে বোটের মধ্যে জ্যোৎস্না একেবারে বিচ্ছুরিত হয়ে উঠল। এমন অপূর্ব আশ্চর্য বোধ হল! আমার ক্ষুদ্র একরত্তি বাতির শিখা শয়তানের মতো নীরস হাসি হাসছিল, অথচ সেই অতিক্ষুদ্র বিদ্রূপহাসিতে এই বিশ্বব্যাপী গভীর প্রেমের অসীম হাসি একেবারে আড়াল করে রেখেছিল! নীরস গ্রন্থের

বাক্যরাশির মধ্যে কী খুঁজে বেড়াচ্ছিলুম— যাকে খুঁজছিলুম সে কতক্ষণ থেকে বাইরে সমস্ত আকাশ পরিপূর্ণ করে নীরবে দাঁড়িয়ে ছিল। যদি দৈবাৎ না দেখে অন্ধকারের মধ্যে শুতে যেতুম, তা হলেও সে আমার সেই ক্ষুদ্র বর্তিকাশিখার কিছুমাত্র প্রতিবাদ না করে নীরবেই অস্ত যেত। যদি ইহজীবন নিমেষের জন্যও তাকে না দেখতে পেতুম এবং শেষ দিনের অন্ধকারের মধ্যে শেষ বারের মতো শুতে যেতুম তা হলেও সেই বাতির আলোরই জিত থেকে যেত, অথচ সে সমস্ত বিশ্ব ব্যাপ্ত করে সেই রকম নীরবে সেই রকম মধুর মুখেই হাস্য করত— আপনাকে গোপনও করত না, আপনাকে প্রকাশও করত না।

তার পর থেকে আজকাল সন্ধ্যাবেলায় বাতির আলো নিবোতে আরম্ভ করেছি।

কলকাতা
১৩ ডিসেম্বর ১৮৯৫

শিলাইদহ

১৪ ডিসেম্বর। ১৮৯৫।

(আজকাল আমি আমার লেখা এবং আলস্যের মাঝে মাঝে কবি কীট্‌সের একটি ক্ষুদ্র জীবনচরিত অল্প অল্প করে পাঠ করি। পাছে এক দমে একেবারে শেষ হয়ে যায় সেই জন্যে রেখে রেখে রয়ে রয়ে পড়ি— পড়তে বেশ লাগে।) আমি যত ইংরাজ কবি জানি সব চেয়ে কীট্‌সের সঙ্গে আমার আত্মীয়তা আমি বেশি করে অনুভব করি। তার চেয়ে অনেক বড়ো কবি থাকতে পারে, অমন মনের মতো কবি আর নেই। দুর্ভাগ্যক্রমে বেচারা অল্প দিন বেঁচে ছিল, এবং অল্পই লিখতে সময় পেয়েছিল।·· কীট্‌সের ভাষার মধ্যে যথার্থ আনন্দসম্ভোগের একটি আন্তরিকতা আছে। ওর আর্টের সঙ্গে আর হৃদয়ের সঙ্গে বেশ সমতানে মিশেছে— যেটি তৈরি করে তুলেছে সেটির সঙ্গে বরাবর তার হৃদয়ের একটি নাড়ীর যোগ আছে। টেনিসন স্যুইন্‌বরন্‌ প্রভৃতি অধিকাংশ আধুনিক কবির অধিকাংশ কবিতার মধ্যে একটা পাথরে-খোদা ভাব আছে— তারা কবিত্ব করে লেখে এবং সে লেখার প্রচুর সৌন্দর্য আছে, কিন্তু কবির অন্তর্যামী সে লেখার মধ্যে নিজের স্বাক্ষর-করা সত্যপাঠ লিখে দেয় না। টেনিসনের 'মড' কবিতায় যে-সমস্ত লিরিকের উচ্ছ্বাস আছে সেগুলি বিচিত্র এবং সুতীব্র হৃদয়বৃত্তি -দ্বারা উচ্ছলরূপে পরিপূর্ণ বটে, কিন্তু তবু মিসেস ব্রাউনিঙের সনেটগুলি তার চেয়ে ঢের বেশি অন্তরঙ্গরূপে সত্য। টেনিসনের অচেতন কবি যে-সমস্ত ছত্র লেখে টেনিসনের সচেতন আর্টিস্ট্‌ তার উপর নিজের রঙিন তুলি বুলিয়ে সেটাকে ক্রমাগতই আচ্ছন্ন করে ফেলতে থাকে। কীট্‌সের লেখায় কবিহৃদয়ের স্বাভাবিক সুগভীর আনন্দ তার রচনার কলানৈপুণ্যের ভিতর থেকে একটা সজীব উজ্জ্বলতার সঙ্গে বিচ্ছুরিত হতে থাকে। সেইটে আমাকে ভারী আকর্ষণ করে। কীট্‌সের লেখা

সর্বাঙ্গসম্পূর্ণ নয় এবং তার প্রায় কোনো কবিতারই প্রথম ছত্র থেকে শেষ ছত্র পর্যন্ত চরমতা প্রাপ্ত হয় নি, কিন্তু একটি অকৃত্রিম সুন্দর সজীবতার গুণে আমাদের সজীব হৃদয়কে এমন ঘনিষ্ঠ সঙ্গদান করতে পারে। কলকাতায় ফিরে গিয়ে কীট্সের জীবনচরিতটি তোকে পড়তে দেব। ওর অসম্পূর্ণ ক্ষুদ্র জীবনটি বড়ো সকরুণ।

কলকাতা

১৫ ডিসেম্বর ১৮৯৫

শিলাইদহ

১৫ ডিসেম্বর। ১৮৯৫।

দিনটা এই রকম কাটে। তার পরে সন্ধ্যাবেলায় দাঁড় টেনে ও পারে চরে গিয়ে বেড়িয়ে ফিরে আসতে আসতে রাত হয়ে যায়। ও পার থেকে নিস্তরঙ্গ নিস্তব্ধ নদী এবং পরপারের গাছপালার উপর সন্ধ্যাবেলাটি যে কী অপরূপ সুন্দর তা অনেকবার বর্ণনা করবার চেষ্টা করেছি, কিন্তু সে বর্ণনার অতীত— সেই সৌন্দর্য এবং শান্তি দূরে থেকে কল্পনা করাই যায় না। কলকাতায় গিয়ে আমিই হয়তো ঠিক মনে আনতে পারব না। কাল সন্ধ্যাবেলায় যখন এই সান্ধ্যপ্রকৃতির মধ্যে সমস্ত অন্তঃকরণ পরিপ্লুত হয়ে জলিবোটে করে সোনালি অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে আস্তে আস্তে ফিরে আসছি এমন সময়ে হঠাৎ দূরের এক অদৃশ্য নৌকো থেকে বেহালা যন্ত্রে প্রথমে পুরবী ও পরে ইমন-কল্যাণে আলাপ শোনা গেল— সমস্ত স্থির নদী এবং স্তব্ধ আকাশ মানুষের হৃদয়ে একেবারে পরিপূর্ণ হয়ে গেল। ইতিপূর্বে আমার মনে হচ্ছিল মানুষের জগতে এই সন্ধ্যাপ্রকৃতির তুলনা বুঝি কোথাও নেই— যেই পুরবীর তান বেজে উঠল অমনি অনুভব করলুম এও এক আশ্চর্য গভীর এবং অসীম সুন্দর ব্যাপার, এও এক পরম সৃষ্টি— সন্ধ্যার সমস্ত ইন্দ্রজালের সঙ্গে এই রাগিণী এমনি সহজে বিস্তীর্ণ হয়ে গেল, কোথাও কিছুই ভঙ্গ হল না— আমার সমস্ত বক্ষস্থল ভরে উঠল। বোটে ফিরে এসে অনেক দিন পরে আবার একবার হার্মোনিয়মটা নিয়ে বসলুম। একে একে নতুন-তৈরি-করা অনেক-গুলো গান নিচু সুরে আস্তে আস্তে গেয়ে গেলুম— ইচ্ছে হল আবার কতকগুলো গান তৈরি করে ফেলি, কিন্তু সে আর হয়ে উঠছে না।

কলকাতা

১৬ ডিসেম্বর ১৮৯৫

১৮৮৭ সেপ্টেম্বর হইতে ১৮৯৫ ডিসেম্বরের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রী ইন্দিরাদেবীকে যে চিঠিগুলি লেখেন তাহারই কতকগুলি ১৩১৯ বঙ্গাব্দে 'ছিন্নপত্র' গ্রন্থে অংশতঃ সংকলিত হয়।[১] পূর্বোক্ত আট বৎসর কয় মাসের প্রায় অধিকাংশ চিঠির সারাংশ দুটি বাঁধানো খাতায় স্বহস্তে নকল করিয়া ইন্দিরাদেবী রবীন্দ্রনাথকে উপহার দেন; রবীন্দ্রনাথ বহু চিঠি পুরাপুরি আর বহু চিঠির বহু অংশ পুনশ্চ বর্জন করিয়া, প্রয়োজনমত ভাষা ও ভাব -গত সংস্কার করিয়া, সর্বসাধারণের পাঠোপযোগী কতকটা 'সাহিত্যিক' আকার দেন—ইহাই ছিন্নপত্র-সংকলনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। এই পত্রগুলি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বিভিন্ন সময়ে কী ভাবিয়াছিলেন এবং কোন্ আদর্শেই বা 'ছিন্নপত্র' -প্রকাশের পূর্বে চিঠিগুলির সম্পাদনা করিয়াছিলেন 'ছিন্নপত্র' গ্রন্থের প্রচলিত সংস্করণে সংযোজন-অংশে সংকলিত তিনটি চিঠিতে তাহা স্পষ্ট হইয়াছে আর বর্তমান গ্রন্থের ১৬০ ও ২০০ -সংখ্যক পত্রে ও ২২৮ সংখ্যক পত্রের শেষাংশ-পাঠেও বুঝিতে পারা যাইবে।

ইন্দিরাদেবীর পূর্বোক্ত খাতা-দুটিতে রবীন্দ্রনাথের যতগুলি চিঠি মূলতঃ যেভাবে পাওয়া যায় বর্তমান গ্রন্থ তাহারই সম্পূর্ণ সংকলন। এজন্য ইহাতে ছিন্নপত্রে-বর্জিত বহু চিঠি আছে (সংখ্যার হিসাবে ইন্দিরাদেবীকে-লেখা ১০৭টি অতিরিক্ত চিঠি আছে) আর বহু চিঠির বহু অংশ, পূর্বে যাহা বর্জিত ছিল, তাহাও সংকলন করা হইয়াছে।

স্থলবিশেষে লুপ্তপ্রায় অথবা ছিন্ন পাঠ অনুমান-পূর্বক, [ ] এরূপ বন্ধনী-মধ্যে দেওয়া হইয়াছে, আর যে-সকল নামের আদ্যক্ষর বা বিশেষ সংকেত-মাত্র খাতায় দেখা যায় তাহাও ঐভাবে অনুমানের আশ্রয়ে মুদ্রিত। অনুমানে সন্দেহের অবকাশ থাকিলে, উপরন্তু প্রশ্নচিহ্ন দেওয়া হইয়াছে।

ছিন্নপত্রাবলীতে পত্রগুলির ছিন্নাবস্থা না ঘুচিলেও, ইন্দিরাদেবীর প্রতিলিপির প্রায় যথাযথ অনুসরণে এগুলি যে অনেকটা পূর্ণতা পাইয়াছে, অনেক নূতন তথ্য

১ ছিন্নপত্রের প্রথম হইতে অষ্টম অবধি আটখানি পত্র কবিবন্ধু শ্রীশচন্দ্র মজুমদারকে লেখা, অবশিষ্ট ১৪৫টি চিঠি শ্রীমতী ইন্দিরাদেবীকে লিখিত।

পাওয়া গিয়াছে, লোকোত্তর কবি -মনের অনেক অন্ধিসন্ধির নূতন পরিচয় উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে —ইহা পাঠকমাত্রেই দেখিতে পাইবেন।

চিঠিগুলির সূচনাতেই ছোটো হরপে স্থান-কালের নির্দেশ রবীন্দ্রনাথের চিঠির নকল বুঝিতে হইবে। চিঠিগুলি পৌঁছিবার স্থান-কাল পত্রশেষে আরও ছোটো হরপে মুদ্রিত— এগুলি ইন্দিরাদেবী স্বয়ং সযত্নে রক্ষা করায় বা খাতায় টুকিয়া দেওয়ায় পত্রের পারম্পর্য-নির্ণয়ে যার-পর-নাই সুবিধা হইয়াছে এবং সময়ে সময়ে কবির লেখায় তারিখ প্রভৃতির নির্দেশে অভাব বা ভ্রান্তি থাকিলে তাহারও কথঞ্চিৎ পরিপূরণ বা সংশোধন অসম্ভব হয় নাই।

যে তারিখ মাস অথবা সাল রবীন্দ্রনাথ লেখেন নাই, অথচ অনুমান করিতে কোনোই অসুবিধা নাই, এই গ্রন্থে তাহা আগে পরে পূর্ণচ্ছেদ বসাইয়া যথাস্থানে ছাপা হইয়াছে। যে তারিখ নানা যুক্তিবিচারে স্থির হয় তাহা, [ ] বন্ধনীমধ্যে মুদ্রিত। পত্রপ্রাপ্তির স্থলে প্রশ্নচিহ্ন থাকিলে সেগুলি সবই শ্রদ্ধেয়া ইন্দিরাদেবীর খাতায় ছিল বুঝিতে হইবে (মাত্র এক স্থলে, [?] এরূপ প্রশ্নচিহ্ন গ্রন্থ-সম্পাদককে বসাইতে হইয়াছে)— অপর পক্ষে, চিঠি লেখার বার বা তারিখে কতকগুলি প্রশ্নচিহ্ন খাতায় থাকিলেও, অনেকগুলি বর্তমান গ্রন্থ-সম্পাদনা-কালে বসিয়াছে। ২৪৬ পৃষ্ঠার পাদটীকায় বলা আছে, শতাব্দপঞ্জী দেখিলে বহু স্থলে কবির-লেখা বারে ও তারিখে সংগতি পাওয়া যায় না। বার বা তারিখের যেটি সন্দেহজনক তাহাতেই প্রশ্ন দেওয়া হইয়াছে। বারগুলি অনেক স্থলে তারিখের অগ্রবর্তী হইলেও (পূর্বোক্ত পাদটীকা দ্রষ্টব্য) অন্য অনেক স্থলে তারিখের দু-এক পা পিছে পড়িয়া নাই এমনও নয়। প্রায়শঃ তারিখই অধিক নির্ভরযোগ্য মনে হয়।

কয়েকটি পত্রের গ্রন্থে-মুদ্রিত তারিখ সম্পর্কে বিশেষ বক্তব্য আছে।—

বর্তমান গ্রন্থের ৮০-সংখ্যক পত্রের একাংশই ছিন্নপত্রে পূর্বাপর 'পুরী। ১৫ ফেব্রুয়ারি' শিরোলিখনে ছাপা হইয়া আসিতেছে। ইন্দিরাদেবীর খাতাতেও তাহাই আছে। অথচ ছিন্নপত্রাবলীর পূর্ণতর পাঠে দেখি (পৃ ১৭০) 'কালকের সেই ইংরেজটার স্পর্ধার কথাগুলো'— এই 'কাল' যে ১০ ফেব্রুয়ারি তারিখের

কথা এবং এ চিঠি কটক ছাড়িয়া পুরী পৌঁছিবার মধ্যপথে ১১ তারিখে লেখা ইহাতে সন্দেহের কোনো অবকাশ নাই। ১১ তারিখে লেখা হইয়া থাকিলেও পরবর্তী চিঠি (৮১-সংখ্যক) পড়িলে বুঝা যাইবে যে পুরী পৌঁছিয়া ১৩ তারিখে ডাকে ফেলা হয় এবং সেই কারণেই ১৪ তারিখের চিঠির ঠিক একদিন পূর্বে সোলাপুরে পৌঁছে— এ চিঠি ১৫ তারিখে লেখা মনে করিতে গেলে যেমন ঘটনার ধারাবিবরণে বহু গরমিল হয়, তেমনি চিঠি পৌঁছানোর ব্যাপারেও।

১৭০-সংখ্যক পত্র কেন যে ২৬ কার্তিক ১৩০১ তারিখে লেখা নয়, তাহা ৩৭১ পৃষ্ঠার পাদটীকায় বিশদভাবে বলা হইয়াছে।

২৩৬ ও ২৩৮-সংখ্যক পত্র-দুইটি (যথাক্রমে ৫ ও ১০ অক্টোবর ১৮৯৫ তারিখের) মিলাইয়া পড়িলে দেখা যাইবে যে, ছিন্নপত্রে ৫ অক্টোবরের যে মূল্যবান চিঠিখানি দেখা যায় তাহা কোনো একখানি চিঠির সুসংস্কৃত রূপ নয়; পরন্তু প্রথমোক্ত পত্রের প্রথম অংশে তাহার সূচনা (পৃ ৪৮৫) আর দ্বিতীয় পত্রের কিয়দংশে (পৃ ৪৮৯) তাহার উপসংহার।

২৪৬-সংখ্যক পত্রের রূপান্তরই ছিন্নপত্রের সর্বশেষ পত্রে অপরূপতা পাইয়াছে ইহা পাঠকমাত্রেই দেখিতে পাইবেন। ছিন্নপত্রে প্রথমাবধি মুদ্রিত '১৬ ডিসেম্বর ১৮৯৫' তারিখটি কিন্তু খাতার সহিত বা ঘটনাপরম্পরার সহিত মিলাইয়া পাওয়া যায় না, চিঠি পাওয়ার তারিখ হইতে লেখার তারিখ '৬ ডিসেম্বর' মনে করাই সংগত।

২৪৮-সংখ্যক পত্রের তারিখ চিত্রা কাব্যের 'উর্বশী' কবিতার তারিখের সহিত অভিন্ন হওয়ায় ৮ ডিসেম্বর ১৮৯৫ তাহাতে সন্দেহ নাই; 'কাল থেকে জলপথেই আছি' এই প্রথম বাক্যের সহিতও তাহাতে কোনো অসংগতি হয় না। এই পত্রে উল্লিখিত 'দুটি বড়োসড়ো রকমের কবিতা'র একটি যেমন চিত্রা কাব্যের 'উর্বশী' অন্যটি 'আবেদন'— ১৮৯৫ সনের ৮ ও ৭ ডিসেম্বর তারিখে রচিত।

এই গ্রন্থে বানান, মোটের উপর, বিশ্বভারতী-কর্তৃক প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের অন্যান্য গ্রন্থের অনুরূপ। শব্দের আরম্ভে 'অ্যা' উচ্চারণ বুঝাইতে, ে স্থলে ে হরফের ব্যবহার আছে।

কোথাও 'জাজ্জ্বল্যমান' কোথাও বা 'জাজ্বল্যমান' বানান থাকিলেও উভয়ই মূলানুসারী বুঝিতে হইবে— শ্রীনিত্যানন্দবিনোদ গোস্বামী বলেন যে, উভয়ই পাণিনিসূত্রানুসারে সিদ্ধ হইতে পারে। ইহাও মনে রাখা কর্তব্য যে, উল্লিখিত প্রথম বানানই অনেকটা বঙ্গীয় উচ্চারণের অনুরূপ।

এই গ্রন্থে এক স্থলে 'অন্তঃশিলা' বানান মূলানুযায়ী রক্ষা করা হইয়াছে। 'শিলার অন্তরে প্রবাহিত' এরূপ অর্থই হয়তো রবীন্দ্রনাথের অভিপ্রেত ছিল— ব্যুৎপত্তি বা ব্যাকরণের বিধি লঙ্ঘিত হইয়াছে কিনা পণ্ডিতেরা বিচার করিবেন।

শ্রীমতী ইন্দিরাদেবীর দুখানি খাতা হইতে অপ্রকাশিত পত্রগুলি সংকলন করিয়া শ্রীপুলিনবিহারী সেন ও শ্রীনির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বিশ্বভারতী পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে (কার্তিক-পৌষ ১৩৫১ - শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৫৩) প্রকাশ করেন; ছিন্নপত্রে সংকলিত কতকগুলি পত্রের বর্জিত অংশ শ্রীপুলিনবিহারী সেন ১৩৬১ সনের শারদীয়া আনন্দবাজার পত্রিকায় সংকলন করিয়া দেন; ইহা ছাড়া ১৩৫৪ বৈশাখের 'খেয়া' পত্রিকায় 'ছিন্নপত্রাবলী' গ্রন্থের দ্বিতীয় পত্রখানি প্রকাশিত হয়।

ইন্দিরাদেবীর হাতে-লেখা খাতা-দুখানি হইতে বর্তমান গ্রন্থের সংকলন ও সম্পাদনা করিয়াছেন শ্রীকানাই সামন্ত; সংকলন-ব্যাপারে শ্রীমান্ সুবিমল লাহিড়ী তাঁহার সহযোগিতা করিয়াছেন।

মূল খাতা-দুইখানি বর্তমানে শান্তিনিকেতনে-স্থিত রবীন্দ্রসদনে সংরক্ষিত আছে।

—

চিত্রসূচী

		সম্মুখীন পৃষ্ঠা
১	রবীন্দ্রনাথ : অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর -অঙ্কিত	আখ্যাপত্র
২	ইন্দিরাদেবী	প্রবেশক
৩	শিলাইদহ কুঠিবাড়ি	৮৮
৪	‘পদ্মা’ : কবির বাসগৃহ	৮৯
৫	‘পদ্মা’ : গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর -অঙ্কিত	২০০
৬	জলপথে : অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর -অঙ্কিত	৩৩৩
৭	ইন্দিরাদেবী : জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর -অঙ্কিত	৩৪৪
৮	ইন্দিরাদেবীর অনুলিখনে খাতার একটি পৃষ্ঠা	৩৮০
৯	প্রজাগণের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ	৪৬০

১ বসুবিজ্ঞানমন্দির-সংগ্রহ

৫-৬ রবীন্দ্রভারতী-সংগ্রহ

৮ এই খাতা রবীন্দ্রসদন-সংগ্রহ-ভুক্ত

বিশ্বভারতী